সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

বড়দিন সংখ্যা
২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
Christmas

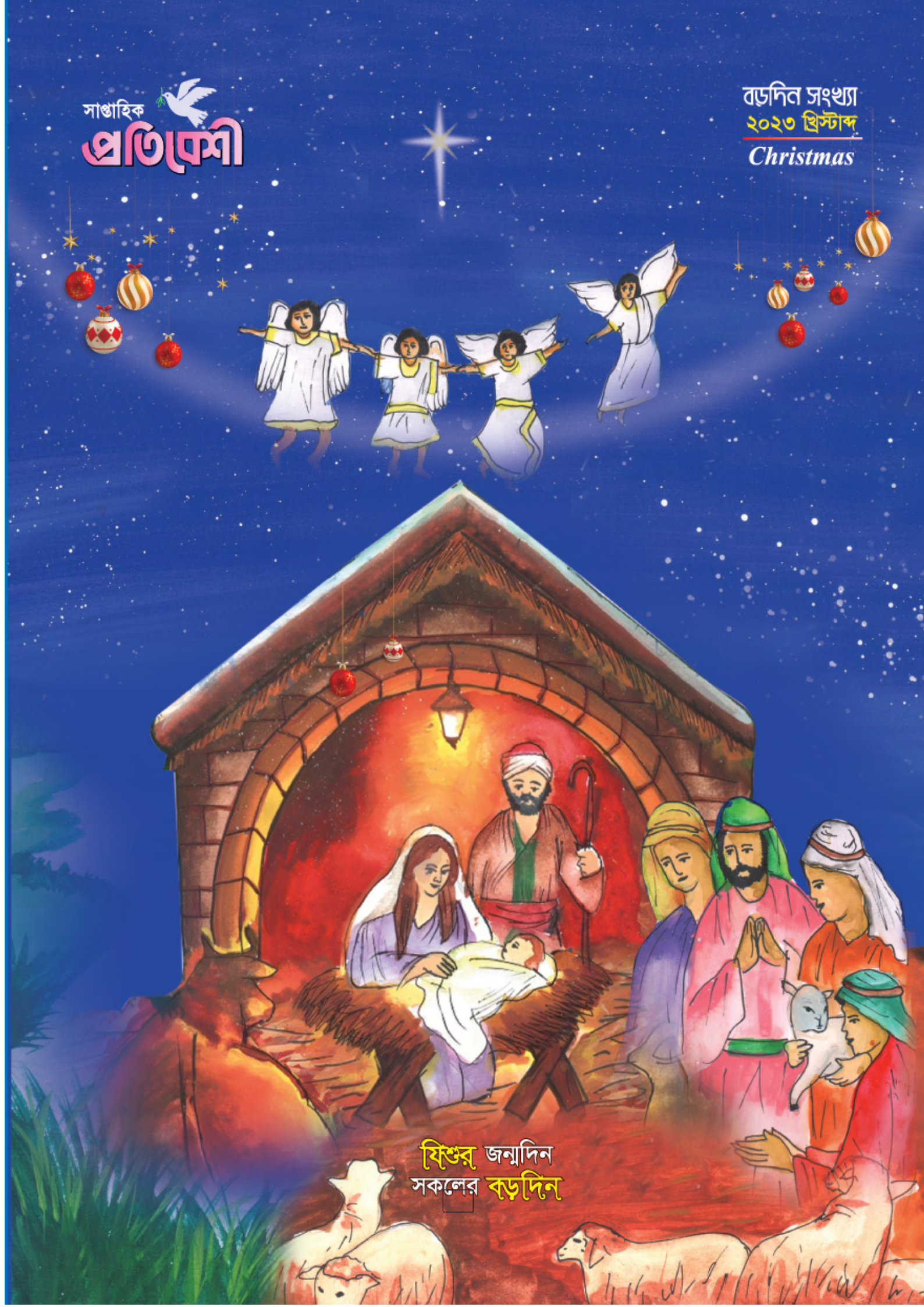

যিশুর জন্মদিন
সকলের বড়দিন

DIVINE MERCY HOSPITAL LTD.

Love Care Compassion

MOTHBARI, ULUKHOLA, NAGORI, KALIGANJ, GAZIPUR, BANGLADESH

300 BEDDED MULTI-DISCIPLINARY MODERN HOSPITAL

A Project of The Christian Co-Operative Credit Union Ltd., Dhaka

OUR SERVICES

- 24 hours Emergency and Ambulance Services
- 24 hours Pharmacy with highly skilled Pharmacist
- Clinical Laboratory with State-of-the-Art technology
- Fully equipped Radiology & Imaging Department
- World famous German technology SIEMENS 128 slice CT Scan
- ECG, ECHO, ETT, USG, Digital X-ray
- Fully equipped Hemodialysis Centre
- Modern Gastroenterology Department
- A Complete Gynecology and Obstetrics facility
- Fully Fledged Physiotherapy Centre
- Highly skilled medical & support services
- Cordial & dedicated customer service

09678777895
/dmhlimited
info@divinemercyhospital.com
divinemercyhospital.com

The Christian Co-Operative Credit Union Ltd., Dhaka

Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban
Established: 1955 AD: Reg: No. 42/1958
173/1/A, East Tejturibazar, Tejgaon, Dhaka-1215
Phone: 09678771270, 0248121156, 0248121157, 0258152640, 0258153316, 0258150276
Loan Related Hotline: 01709815406, ATM Hotline: 01709815400
Fax: 88-02-9143079, Email: info@cccul.com, Website: www.cccul.com
Online News: dcnewsbd.com, Online TV: dctvbd.com, Facebook: facebook.com/dhakacredit

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

- বড়দিন:পরিবারে মিলন ও শান্তি নবায়নের দিন -*নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি* ◆৮
- গোশালা : খ্রিস্টমণ্ডলী প্রকাশ -*ফাদার শিপন পিটার রিবেরু* ◆১১
- ষোড়শ সাধারণ সম্মেলন: বিশ্ব বিশপদের সিনড (৪-২৯ অক্টোবর ২০২৩): ভাটিকান সিটি -*আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই* ◆১৩
- বড়দিন ও আশার আলো -*সিস্টার গ্লোরিয়া এমপিডিএ, জেমস্ শিমন দাস* ◆১৬
- বড়দিনের গোশালায় শিশু যিশু : এ যুগের অভিবাসী, শরণার্থী ও বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর প্রতিচ্ছবি -*ড. ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি* ◆১৭
- যুদ্ধ বিধ্বস্ত বিশ্ব ও বড়দিন ভাবনা -*জের্ভাস মিন্টু রোজারিও* ◆২১
- মা-মারীয়ার বড়দিন -*ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি'ক্রুশ* ◆২৩
- বড়দিনে মানব সত্তায় জীবনের দায়িত্ব ও স্বাধীনতা -*ব্রাদার জেমস্ রিপন গমেজ সিএসসি* ◆২৫
- বাণীর দেহধারণ: বড়দিন উৎসব -*ফাদার দিলীপ এস কস্তা* ◆২৭
- বড়দিনে আনন্দ ও পরিবর্তনের আহ্বান -*এমরোজ গোমেজ* ◆২৯
- বড়দিনে পিতামাতার ভাবনা -*শিল্পী ক্রুশ* ◆৩০
- "বড়দিন হল প্রত্যাশা পূরণের দিন"-*ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি* ◆৩১
- যিশু নামের সার্থকতা তথা খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জীবনে খ্রিস্টীয় নামের গুরুত্ব -*জে. আর. এ্যাগ্নেস* ◆৩২
- ক্রোড়ে ক্রোড়ে শিশু যিশু -*ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি* ◆৩৪
- প্রবাসের মাটিতে বাঙালির বড়দিন আনন্দ -*বিপুল এলিট গনছালভেস* ◆৩৬
- বড়দিন ও পুনর্মিলন -*ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী* ◆৩৭
- 'বড়দিনকে ঘিরে সামাজিক লোকাচার: অতীত ও বর্তমান বাস্তবতা' - *যোয়াকিম মান্না বালা* ◆৩৯
- বড়দিনের আনন্দবার্তা ও এর তাৎপর্য -*ড. সিস্টার মেরী হেনরীয়েটা এসএমআরএ* ◆৪১
- মহান মুক্তিদাতা প্রভু যিশুর আবির্ভাব -*এরশাদ আল মামুন* ◆৪৩
- মুক্তিযুদ্ধে খ্রিস্টান সমাজ -*সুনীল পেরেরা* ◆৪৪
- কারিতাস : ভালোবাসা ও সেবা কাজে কারিতাস বাংলাদেশ ◆৪৬
- ধন্য বাসিল মরো'র স্বর্গলাভের সার্ধশত বর্ষপূর্তি - *ফাদার গৌরব জি. পাথাং, সিএসসি* ◆৫০
- সংঘ প্রদেশপালের বাণী -*ফাদার জর্জ কমল রোজারিও সিএসসি* ◆৫১
- ধন্য বাসিল মরো'র স্বর্গলাভের সার্ধশত বর্ষপূর্তি এলাকা সমন্বয়কারীর বাণী -*ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও সিএসসি* ◆৫২
- ধন্য বাসিল মরো'র স্বর্গলাভের সার্ধশত বর্ষপূর্তি এলাকা সমন্বয়কারীর বাণী -*সিস্টার ভায়োলেট রড্রিকস্ সিএসসি* ◆৫৩
- ধন্য ফাদার মরোর আধ্যাত্মিকতা -*ব্রাদার ষ্টিফেন বিনয় গমেজ সিএসসি* ◆৫৪
- ধন্য বাসিল আন্তনী মেরী মরো'র গুণাবলী -*ব্রাদার রিপন জেমস গমেজ সিএসসি* ◆৫৯

খোলাজানালা

- জীবনের তত্ত্বকথা ও জীবনের ভক্তিকথা -*বিশপ থিয়োটনিয়াস সিএসসি* ◆৬০
- "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা" একটি নৈতিক প্রশ্ন -*ফাদার সুনীল রোজারিও* ◆৬২
- মট্স: যেখানে শিখতে শিখতে আয় করা যায় -*ড. আলো ডি'রোজারিও* ◆৬৩
- চতুর্থ শিল্প বিপ্লব: ভবিষ্যত কর্ম ও কর্মীদের নিয়ে ভাবনা -*চয়ন এইচ রিবেরু* ◆৬৪
- আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও বাণী প্রচারে খ্রিস্টভক্তদের ভূমিকা -*চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু* ◆৬৭
- YMCA-এর কাজেই অনুপ্রাণিত আমার অনেক গান -*ড. বার্থলমিয় প্রত্যুষ সাহা।* ◆৭০
- সিনড বিশিষ্ট মণ্ডলী : বাইবেল পালকীয় কার্যকলাপকে অনুপ্রাণিত করুক - *ফাদার নরেন জে বৈদ্য* ◆৭৩
- 'উত্তম'নেতার খোঁজে' বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নেতৃত্ব -*ফাদার পলাশ হেনরী গমেজ এসএক্স* ◆৭৪
- জগতের কিছু নতুন বাস্তবতা -*হৃদয় সুইডেন রোজারিও* ◆৭৭

যুবতরঙ্গ

- তথ্য প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যুবাদের নৈতিক গঠন - -*ফাদার নিখিল এ. গমেজ* ◆৭৮
- যুব ভাবনায় বড়দিন -*ফাদার নয়ন লরেন্স গোছাল* ◆৮০
- ধর্মপল্লীর পালকীয় কাজ ও যুব সংগঠন -*অরণী রেজিনা গমেজ* ◆৮২
- শিশু বিকাশে ও সুরক্ষায় মণ্ডলীর চিন্তা ও কর্ম পরিকল্পনা -*লিলি আন্তনিয়া গমেজ* ◆৮৩
- শিশুর নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গঠনে আমাদের ভূমিকা -*আগষ্টিন ডি' ক্রুজ* ◆৮৫

মহিলাঙ্গণ

- নারী ও উন্নয়ন -*মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া* ◆৮৭
- যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় খ্রিস্ট মণ্ডলীতে প্রথম বাংলাদেশী সিস্টার -*জেম্স গমেজ (আদি)* ◆৮৮

স্বাস্থ্য কথা

- শীতকালে চর্মরোগের প্রকোপ: উপসর্গ ও করণীয় -*ডা. নেলসন ফ্রান্সিস পালমা* ◆৮৯
- নারী মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ ও আমাদের করণীয় -*ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও* ◆৯০

ভ্রমণকাহিনী

- লেহ লাদাখ ভ্রমণ! -*রোজলিমা রোজারিও* ◆৯২
- দেখে এলাম ত্রেনতো -*দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ* ◆৯৪
- ঘুরে এলাম দার্জিলিং -*মাইকেল ডেরিক গমেজ* ◆৯৫

স্মৃতিচারণ

- মধুর ভান্ডার -*ডেভিড স্বপন রোজারিও* ◆৯৬
- স্মৃতিকথা -*মাস্টার সুবল* ◆৯৮
- আমার বাবা ও সেনাসংঘ -*চিত্রা রোজারিও* ◆৯৯

সাহিত্যমঞ্জুরী

- ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা -*এ এম আন্তোনী চিরান* ◆১০০
- তৃতীয় সহস্রাব্দের বাস্তবতায় খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য, নৈতিকতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ -*ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি* ◆১০৩
- উন্মাদ! -*মিল্টন রোজারিও* ◆১০৭

ইতিহাস

- ইতিহাস কথা কয় পূর্ব বঙ্গের ক্যাথিড্রালের যাত্রাপথ : লক্ষীবাজার থেকে রমনা! -*ডা. নেভেল ডি রোজারিও* ◆১০৯
- বান্দুরার রসগোল্লা ও চারা বিস্কুটের ইতিহাস -*জেমস আনজুস* ◆১১৩

কলাম

- কাথলিক মণ্ডলীতে মূর্তি ও সাধু-সাধ্বীদের প্রতি ভক্তি - *ফাদার দিলী এস. কস্তা* ◆১১৪
- সেদিনের গল্পকথা : বাংলায় মানুষ বিক্রির দলিল -*হিউবার্ট অরুণ রোজারিও* ◆১১৫

গল্প

- বড়দিনের উপহার -*ষ্টিফেন কোড়াইয়া* ◆১১৬
- সুখ-অসুখ -*খোকন কোড়ায়া* ◆১১৯
- সিগারেট -*সাগর কোড়াইয়া* ◆১২১
- ফিরে আসুক সেলুলয়েড! -*রবীন ভাবুক* ◆১২২
- অনিরুদ্ধ -*প্রদীপ মার্সেল রোজারিও* ◆১২৩
- নব জীবনের আয়োজন -*খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন* ◆১২৬
- অপেক্ষা -*শিউলী রোজলিন পালমা* ◆১৩০
- God is with you! -*জেরী জুলিয়াস রোজারিও* ◆১৩২
- আতিথেয়তায় অতিথি আপন -*ভ্যালেন্তিনা অপর্ণা গমেজ* ◆১৩৪
- জুম ঘরে পূর্ণিমার চাঁদ -*গৌরব জি. পাথাং* ◆১৩৫
- তুমি এসেছিলে তাই -*মালা রিবেরু* ◆১৩৭
- অনিচ্ছুক -*ব্রাদার অয়ন ম্যাথেডিওস গমেজ সিএসসি* ◆১৩৯
- পথহারা প্রবাসী -*সামুয়েল মানিক রোজারিও* ◆১৪১

ছোটদের আসর

- বা! কী অপরূপ? -*সিস্টার মিলন স্কলাষ্টিকা ক্রুশ এলএইচসি* ◆১৪৬
- ফুগো ফিস -*জয়ন্ত ভিক্টর গমেজ* ◆১৪৭
- কেমন তোমার ছবি এঁকেছি ◆১৪৮

বিশ্বমণ্ডলী সংবাদ

- পোপ ফ্রান্সিসের পোপীয় দায়িত্ব পালনের দশম বর্ষ পূর্তিতে তাঁর শাসনামলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী -*ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু* ◆১৪৯

আসন্ন বড়দিন-২০২৩ উপলক্ষে
‘সাপ্তাহিক প্রতিবেশী’-এর সকল পাঠক/পাঠিকাবৃন্দকে

বড়দিনের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই

কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট বিশ্বাস করে

মানুষের সার্বিক উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও
নারী পুরুষের সমতাভিত্তিক ক্ষমতায়ন একটি সুষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থার পূর্ব শর্ত।

আমরা সম্পূর্ণ আবাসিক ও সর্বাধুনিক ভেন্যুতে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করে থাকি। আমাদের সঙ্গে আছেন দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক, যারা সার্বক্ষণিক কারিতাস ও সমমনা প্রতিষ্ঠান সমূহের সক্ষমতা অর্জনে দীর্ঘ সময় ধরে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে আসছে। আমাদের মেধাবী গবেষকদল অব্যাহতভাবে দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের বেইজ লাইন সার্ভে, প্রকল্প মূল্যায়ন, প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি, এ্যাকশন রিসার্চ, ইমপ্যাক্ট স্টাডিসহ যে কোনো সামাজিক গবেষণাসমূহ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করে আস্থা অর্জন করেছে।

পরিচালক ও কর্মীবৃন্দ

কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট

২ আউটার সার্কুলার রোড, শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭

ফোন: ০২২২২২২৯৬২৫, ইমেইল- cdi@caritascdi.org

www.caritascdi.org

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩ : বড়দিন সংখ্যা
ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
পৌষ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

ঐশী সরকার (বয়স ১০)
সেন্ট লুইস স্কুল, রাজশাহী

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

শান্তি আসুক ধরাতলে

পবিত্র বাইবেলের আদিপুস্তকে বর্ণিত আছে, সৃষ্টিকর্তা উত্তম করেই জগতের সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেন। শুরুতে প্রকৃতি, জীবজগৎ ও ঈশ্বরের আপন প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকায় বিশ্বজগৎ ছিল সুখ-আনন্দ ও শান্তিতে ভরপুর। জগতে শান্তি বিরাজ করায় মর্তের মানুষ স্বর্গের আনন্দে বাস করতো। ঐশ সান্নিধ্যে মানবের সুখ-শান্তি দেখে সুচতুর শয়তান মানুষকে প্রলুব্ধ করে 'বড় হবার'। বড় হবার বাসনায় ঈশ্বরের সাথে মানবের সংযুক্ততা ভুলে গিয়ে মানব নিজের স্বার্থচিন্তা ও অহমকে প্রধান স্থানে নিয়ে আসে। ফলশ্রুতিতে মানুষের মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে অবিশ্বস্থতা, অসততা, স্বার্থপরতা, দলাদলি, রেষারেষি, হিংসা, বিবাদ-বিভেদসহ হাজারো রকম পাপ। অন্যায়-অবিচার, অনাচার-অত্যাচার ও পাপাচারে নিমজ্জিত হয় মানুষ। মানুষের এমন করুণ অবস্থায় দয়াময় ঈশ্বর বিভিন্ন প্রবক্তা ও ঘটনার মধ্যদিয়ে মানুষকে সুপথের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। কিন্তু কঠিন হৃদয়ের মানুষ মন্দতা ও পাপের পথ ছাড়তে পারেনি। সময়ের পূর্ণতায় মানুষকে পাপ থেকে মুক্তিকল্পে ঈশ্বর আপন পুত্রকে এ জগতে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। অসীম ঈশ্বর অসীম তাঁর ভালোবাসা। তিনি নিজেই ভালোবাসা। তাই মানুষকে উদ্ধার করার জন্য স্বর্গোলোক থেকে নিজেই আসলেন মর্ত্যলোকে মানুষ হয়ে। কুমারীর গর্ভে এসে নাম নিলেন যিশু। এই ঈশ্বর তনয় 'যিশুর জন্মদিনই' বড়দিন। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আশ্চর্য কাজটি সেদিনই সংগঠিত হয়েছিল যেদিন ঈশ্বর মানুষ হলেন। সৃষ্টিকর্তার মানব হবার দিনটিই যে পৃথিবীর বড়দিন বলে বিবেচিত হবে তা কতই না নিশ্চিত। ঐতিহ্যগতভাবে ২৫ ডিসেম্বর যিশুর জন্মদিন তথা বড়দিন পালন করা হয়।

ঈশ্বর মানুষ হলেন যাতে করে মানুষ তার হারানো মর্যাদা পুনরায় লাভ করে সুখ-শান্তিতে থাকতে পারে। আর সে মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে মানুষকে প্রতিনিয়তই সংগ্রাম ও সাধনা করতে হয় শয়তানের প্রলোভনের বিরুদ্ধে। শয়তানের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধাস্ত্র হলো ক্ষমা, ভালোবাসা, সহযোগিতা, সহভাগিতা; যার সবটাই আমরা যিশুর মধ্যে পাই। বড়দিন, যিশুর জন্ম জয়ন্তী, আমাদের সেই যুদ্ধের আহ্বান জানায়। এই যুদ্ধ-উত্তাল (রাশিয়া-ইউক্রেন; ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন) পৃথিবীতে বড়দিন সবার বিবেকে নাড়া দিক, যেন মানুষের জীবনে চেতনা আসে। মানুষ যেন ঘুরে দাঁড়ায়, শান্তির সপক্ষে, যিশুর রাজত্বে। বিশ্ব জগৎ জানুক যিশু, যিনি ঈশ্বর, যিনি শান্তিরাজ তিনি যুদ্ধের অবসান করে শান্তি দিতেই দেহধারণ করেছেন। ঈশ্বর হয়েও জন্ম নিয়েছেন ধূলার ধরায়। পরবর্তীতে, আপন রক্ত মূল্যেই সকলকে ক্রয় করে মুক্তি এনেছেন। জগতের প্রথাগত ধারণার বাইরে গিয়ে ক্ষমা ও ভালোবাসার এক সমাজ বিনির্মাণের শাশ্বত পথ দেখিয়েছেন ও সেই পথে চলে শান্তিতে থাকতে সবাইকে আহ্বান করছেন।

যিশুর জন্মের অনেক আগেই প্রবক্তা ইসাইয়া ঘোষণা করেছেন 'আমাদের জন্য এক শিশু জন্ম নিয়েছেন... তাঁর কাঁধে রয়েছে আধিপত্যভার, তাঁর নাম আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা, শক্তিশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ' (৯:৫)। তাই শান্তিরাজ যিশুর জন্ম-স্মরণ উৎসব বড়দিন যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ ও মানবতার কাছে যুদ্ধ নয় শান্তির বার্তা নিয়ে আসে। যিশুর জন্মদিনে শুধুমাত্র বাহ্যিক আনন্দ উৎসবে মত্ত না থেকে যারা যিশুর কথা শুনে ও মেনে চলে তারা শান্তি'র স্বপক্ষের লোক। তারা যুদ্ধ নয়, ক্ষমা, ভালোবাসা, সহযোগিতা, সহভাগিতার প্রবক্তা হয়ে বিশ্ব ব্যাপি আলো ছড়াচ্ছেন। খ্রিস্টের সেই আলোই তাঁর জন্মে দেখতে পেয়েছিল প্রাচ্য দেশীয় রাজা ও পণ্ডিতগণ। তারা যেমন সব ভুলে রাজাকে প্রণাম করতে ও উপহার দিতে ছুটে এসেছিলেন; বড়দিন আমাদের আহ্বান করে আমরা যেন সেই নব জ্যোতিতে আলোকিত হয়ে পথ চলি এবং বিশ্বকে আলোকিত করি। বিশ্বকে আলোকিত করতে হলে প্রথমে নিজের মনের অন্ধকার দূর করি। কালো থেকে ভালোতে, অন্ধকার থেকে আলোতে আসতে আমাদের প্রত্যেককেই প্রতিদিন যুদ্ধ করতে হবে নিজেকে শুদ্ধ করে তোলার জন্য। আমি চিন্তা-চেতনায়, কর্ম ও বিবেচনায় শুদ্ধ ও সৎ হলে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শী ও প্রতিবেশি সকলের সাথেই যেকোন মূল্যে শান্তি বজায় রাখতে চেষ্টা করবো।

বড়দিন হলো মানুষের মাঝে মানুষের মতো হয়ে ঈশ্বরের আগমন; যে ঈশ্বর শান্তিরাজ। তাই যুদ্ধরত এই বিশ্বে বড়দিন উদ্‌যাপন শুধু বিশ্বাসীদের জন্য নয় কিন্তু সবার জন্যই শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি আহ্বান। যেহেতু জগৎ যিশুকে বিশ্বাসীদের মত করে জানে না, তাই বিশ্বাসীদের উপর দায়িত্ব পড়ে শান্তিরাজ যিশুকে পরিচয় করে দেয়ার। যখন যিশু বিশ্বাসীরা নিজেদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখতে পারবে তখনইতো শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠা পাবে। শান্তিরাজ যিশুর আশীর্বাদে আমাদের প্রতিটি পরিবারই শান্তির আবাসে পরিণত হোক।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সকল পাঠক, লেখক, সমালোচক, পরামর্শক, উপকারি বন্ধু-বান্ধব; সকলের প্রতি রইলো বড়দিন ও নববর্ষের প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা॥ ✝

আজ দাউদ নগরীতে তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন-তিনি খ্রিস্ট প্রভু। তোমাদের জন্য এই চিহ্ন, তোমরা কাপড়ে জড়ানো ও জাবপাত্রে শোয়ানো একটি শিশুকে দেখতে পাবে। - লুক ২: ১১-১২

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

বড়দিনের শুভেচ্ছা

যিশুখ্রিস্টের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে সকলকে জানাই বড়দিনের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সকল বিশপ, পুরোহিত, ব্রাদার, সিস্টার, বিশপীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের চেয়ারম্যান বিশপ জেমস রমেন বৈরাগীসহ সকল সদস্য-সদস্যা, 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল পাঠক, শুভাকাঙ্ক্ষী, লেখক-লেখিকা, উপকারী বন্ধু-বান্ধব ও বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি রইল কৃতাঞ্জলি। বাণীদীপ্তি, রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা বিভাগ, জ্যোতি কমিউনিকেশন, প্রতিবেশী প্রকাশনী, জেরী প্রিন্টিং প্রেস-এর সকল সম্মানিত ক্রেতা, গ্রাহক ও শ্রোতাদের প্রতি রইল আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। সকলের দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য এবং সফল আরেকটি বছর কামনা করছি। খ্রিস্টবর্ষ ২০২৪ সকলের জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল সুখ ও আনন্দ।

ছুটির নোটিশ

শুভ বড়দিন উপলক্ষে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের সকল বিভাগ ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ থেকে ২ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। প্রতিবেশীর পরবর্তী সাধারণ সংখ্যা প্রকাশ করা হবে আগামী ১৪ জানুয়ারি, রবিবার ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ।

পরিচালক
খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র

বিশেষ ঘোষণা

২০২৪ খ্রিস্টাব্দ হতে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৪০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। -বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

রেডিও ও টিভি চ্যানেলে বড়দিনের অনুষ্ঠানমালা

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের সরাসরি প্রযোজনা ও সহযোগিতায় রেডিও ও টিভি চ্যানেলে বড়দিন উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এসব অনুষ্ঠানগুলো দেখা ও শোনার জন্য সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

বিটিভি'র অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠান : **"আলোকিত বড়দিন"**
মূলভাবনা : **ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু**
রচনা : **সুনীল পেরেরা**
সম্প্রচারের সময় : রাত ১০টার সংবাদের পর (ব্যতিক্রম হলে প্রতিবেশী'র ফেইসবুক পেইজে ও স্থানীয় পুরোহিতের মাধ্যমে পরিবর্তিত সম্প্রচার সময় জানিয়ে দেয়া হবে)।
সহযোগিতা : বাণীদীপ্তি
তারিখ : ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী (ফেইসবুক)

অনুষ্ঠান : **"গানে গানে শিশু যিশুর বন্দনা"**
তারিখ : ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সন্ধ্যা ৬:০০ টা

অনুষ্ঠান : **"বড়দিনের আনন্দ"**
তারিখ : ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল ৯:০০ টা

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিসের বিশেষ অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠান : **"বড়দিন এলো ঘরে আনন্দধ্বনি বাজে রে প্রাণে"**
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা : **ফাদার নিখিল গমেজ**
সম্প্রচারের সময় : সকাল ৮:০০ মিনিট
তারিখ : ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

www.veritasbangla.org
www.facebook.com/veritasbangla1

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন
ইমেইল : wklypratibeshi@gmail.com
ওয়েবসাইট : https://weekly.pratibeshi.org/

ব্যবহার করুন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো
ফেইসবুক : www.facebook.com/weeklypratibeshi
ইউটিউব:https://www.youtube.comBanideeptiMedia

পরিশোধ করুন গ্রাহক চাঁদা বিকাশে
বিকাশ নম্বর : ০১৭৯৮৫১৩০৪২

বড়দিন উপলক্ষে বাণী

আজ ২৫ ডিসেম্বর, প্রভু যিশুর জন্মদিন, আমাদের বড়দিন। এ বড়দিন হচ্ছে মিলনের বড়দিন: ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মিলন এবং মানুষে মানুষে মিলন; তাই বড়দিনে উপলব্ধি করি মিলনের আনন্দ! মিলনময় আনন্দের শুভেচ্ছা জানাই সদিচ্ছাপূর্ণ সকল অনুগৃহীত মানুষের প্রতি। বিগত চারটি সপ্তাহ ধরে, আমরা খ্রিস্টবিশ্বাসীরা, অনেক প্রত্যাশা, প্রতীক্ষা ও প্রস্তুতি নিয়ে প্রভু যিশুর আগমনের বার্তা শুনতে চেষ্টা করেছি। এই সময়ে আমাদের একটা প্রশ্ন ছিল: "প্রভু যিশু এবছর কোথায় ও কীভাবে আগমন করবেন?" বড়দিন যদিও মিলনের উৎসব এবং ঠিক এই সময়ে যখন নির্বাচন প্রসঙ্গে সব পার্টির মধ্যে মিলন দেখা যাচ্ছে না, সেহেতু মিলনের একটি অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। কেউ কেউ জাতীয় নির্বাচনের অপেক্ষা করছে ও আগ্রহভরে প্রস্তুতি নিচ্ছে, আবার কেউ কেউ নির্বাচনী মিলনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারছে না। দেশের অরাজনৈতিক নাগরিক হিসেবে আমাদের অন্তরে এই বিভেদের একটি ব্যাথা এবং নির্বাচনী মিলনের একটা আনন্দের অভাব অনুভব করছি। স্বীকার করতে হয় যে, বড়দিন মানুষের সৃষ্টি নয়, ঈশ্বরের একটি মহান দান। আমরা তাই বাইবেলে শুনছি : "আমি এক মহা আনন্দের সংবাদ তোমাদের জানাতে এসেছি; এই আনন্দ সমস্ত জাতির জন্য সঞ্চিত হয়ে আছে" (*লুক ২:১০*)। আরও শুনছি স্বর্গীয় দূতবৃন্দের মুখে: "ইহলোকে নামুক শান্তি তাঁর অনুগৃহীত মানবের অন্তরে (*লুক ২:১৪*)।" সাথে সাথে যিশুর মতো আমাদের অন্তরে ডাক আসে: "প্রভুর আত্মিক প্রেরণা আমার ওপর অধিষ্ঠিত, তিনি আমাকে করেছেন অভিষিক্ত। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীনদরিদ্রের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার, বন্দীর কাছে মুক্তি আর অন্ধের কাছে নবদৃষ্টি-লাভের কথা ঘোষণা করতে, পদদলিত মানুষকে মুক্ত করে দিতে এবং প্রভুর অনুগ্রহদানের বর্ষকাল ঘোষণা করতে" (*লুক ৪:১৮-১৯*)। বড়দিনের সকল কথা ও বার্তার পেছনে আছেন স্বয়ং ঈশ্বর যিনি মানুষ হয়ে আমাদের জীবনে আগমন করতে চান। আমাদের সকল অযোগ্যতা ও রাশিরাশি পাপ-অপরাধ থাকা সত্ত্বেও, ঈশ্বর ভালবেসে দীনদরিদ্র মানুষকে নির্বাচন করে রেখেছেন, যেন তাদের মাঝে তিনি জন্ম গ্রহণ করতে পারেন, তাদের সাথে একাত্ম হতে পারেন এবং "মানুষের-মাঝে-ঈশ্বর" হিসেবে তিনি বাস করতে পারেন। বড়দিন উৎসবে ও জাতীয় নির্বাচন-ক্ষণে দেশবাসী সকল মানুষের মধ্যে প্রভুর আগমন হোক ––এই প্রতীক্ষায় আমরা থাকি অনেক প্রত্যাশা ও প্রার্থনা নিয়ে।

To celebrate Christmas during the time of the coming national election is a grace of God and at the same time a call of taking challenge of Christmas. We pray that all the people participate in bringing about the message of Christmas through the process of election of leaders who will work for justice, peace and harmony. With this thought I wish you a fruitful Christmas and a graceful New Year.

Since my retirement as Archbishop of Dhaka in October 2020 I have lived at the CBCB Center, Mohammadpur. At the completion of 80 years of my age, I have decided to move from CBCB to Holy Cross House in Rampura on December 4, 2023. It is a kind of returning home which I joined sixty two years ago, and an awaiting for the final journey to Eternal Home.

In the moment of transition to another phase of my life, my heart is so grateful to God and to all those with whom I have lived, worked and shared life. Ever grateful to those who have made my life and living fruitful and pleasant.

+ Patrick D'Rozario, csc.

Cardinal Patrick D'Rozario, csc
Archbishop Emeritus of Dhaka,
Moreau House, Plot-B, House 28, Road 3,
Banashree, Rampura, Dhaka 1219. Bangladesh

বড়দিন উপলক্ষে বাণী

কাথলিক মণ্ডলীর জীবনে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দটি ছিল অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ বছর অক্টোবর মাসে ভাটিকানে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশপদের সিনড। এই সিনডের মূলভাব হলো: মণ্ডলী হলো একটা মিলন সমাজ, সবার অংশগ্রহণ এবং মিশন দায়িত্ব পালন। ৩৫০ জন প্রতিনিধি নিয়ে এই সিনড সভাটি ভাটিকানে অনুষ্ঠিত হয়।

সিনোডাল মণ্ডলী হলো উন্মুক্ত, অতিথিপরায়ণ গৃহ এবং ঈশ্বরের গৃহ যেখানে সবাইকে সাদরে গ্রহণ করা হয়। এই সিনডে কয়েকটি বিশেষ বিষয় উঠে এসেছে: প্রথম: পরিবার হলো এই সিনোডাল মণ্ডলীর প্রাণকেন্দ্র: পরিবারে গুরুজন এবং পিতা-মাতাগণ হলো পরিবারে প্রথম মিশনারী। তারাই প্রথম বিশ্বাস ও মণ্ডলীর শিক্ষা সন্তানদের নিকট হস্তান্তরিত করে। দ্বিতীয়: বাপ্তিস্মের মধ্যদিয়ে নারী-পুরুষ সবই সম-মর্যাদার অধিকার লাভ করেছে। বাপ্তিস্মের এই মর্যাদা আমাদের কাছে দাবী করে যে আমাদের মধ্যে যেন কোন বৈষম্য না থাকে। এ ক্ষেত্রে নারী ও যুবাদের মণ্ডলীতে স্বীকৃতি, পুরুষদের সাথে নারীদের সম-অধিকার, মর্যাদা, অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। তৃতীয় বর্তমানে আমরা আর একটা নতুন কৃষ্টি-সংস্কৃতির মধ্যে প্রবেশ করেছি আর সেটা হলো ডিজিটাল মিডিয়ার সংস্কৃতি। মঙ্গলবাণী প্রচার এবং যারা এই মিডিয়ার মধ্যে আবস্থান করছে তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন, মানবীয় ও পালকীয় সেবা দানের জন্য এই সংস্কৃতিতে প্রবেশ করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। চতুর্থ: সব শিষ্য সবাই মিশনারী: শুধু কয়েক মিশনারী নয় বরং সমগ্র মণ্ডলীই মিশনারী। মণ্ডলীর ক্যারিজম ও ভক্তজনগণের সেবা কাজের মধ্যে সমন্বয় ও সংলাপ এবং ঐশ রাজ্য স্থাপনে তা নিয়োগ করা। পঞ্চম: দরিদ্রদের অবস্থান সিনোডাল মণ্ডলীর কেন্দ্রে। যিশু নিজে দরিদ্র জীবন-যাপন করেছেন এবং দীন-দরিদ্রদের তিনি আপন করে নিয়েছেন। যারা দুঃখ কষ্টের মধ্যে যাদের জীবন যাপন তারা যিশু দুঃখভোগের খুব নিকটে তাদের অবস্থান। তাদের মানবিক মর্যাদা দান, তাদের কথা শুনা ও তাদের কাছ শিক্ষা গ্রহণ করা। ষষ্ঠ: মণ্ডলী হতে চায় আরও স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও আস্থাভাজন। দায়িত্ব পালনে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে আরও অনেকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। মণ্ডলী সবার সাথে একত্রে পথ চলতে চায়, অন্যের কথা শুনতে চায় এবং পথ চলায় অন্যের সাথে সহ-যাত্রী হতে চায়। পৃথিবীতে সব ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও কৃষ্টির মানুষদেরকে নিয়ে স্বর্গরাজ্যের দিকে একত্রে তার যাত্রা। সপ্তম: সিনোডাল মণ্ডলী হলো সংলাপী মণ্ডলী: তার তাঁবুর প্রান্ত প্রসারিত করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। অন্যান্য খ্রিস্টমণ্ডলীকে নিয়ে দৃঢ়ভাবে মাণ্ডলিক ঐক্যের পথে চলতে চায়। অন্যান্য ধর্মগুলোর সাথে সংলাপ, সম্প্রীতি ও ঐক্য স্থাপন গভীর ইচ্ছা প্রকাশ করে। পরিশেষে পবিত্র আত্মার আলোকে অবধারণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

প্রভু যিশুর জন্মতিথি আমাদের মণ্ডলীতে, সমাজে ও পরিবারে বয়ে আনুক আরও মিলন এবং একতা। দূর হোক সমস্ত বৈষম্য, ভেদাভেদ, বিচ্ছিন্নতা এবং দলাদলি। মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং জনকল্যাণে নিবেদিত হোক আমাদের জীবন। বড়দিন আমাদের প্রত্যেকের জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল, সুখ, শান্তি ও ঈশ্বরের আশীর্বাদ। নববর্ষ হয়ে উঠুক অনেক আনন্দের ও সফলতার বছর।

. . . .

This year has been very significant and memorable for the Catholic Church, as Pope Francis took timely initiative to bring renewal and new life in the Church by re-introducing the thought and spirit of Synodality through the Synodal session which took place in Vatican in October 2023

The word Synodality literally signifies “on the road together”, namely on the road of life together in communion and participation; it can be understood as Christians walking in communion with Christ towards the Kingdom along with the entire human community.

The Synodality emphasized the following aspects: Firstly, the Synodal Church means a welcoming and a fraternal Church, as family of God. The family is the pillar of every Christian community, and for that matter of any human community. In the family grandparents and parents through transmitting Christian faith, teaching and life to children become the first missionary to the family. Secondly, our baptism gives genuine equality and dignity to everyone without any discrimination. The Baptismal grace establishes an equal dignity between women and men, and brings about also worthy recognition, responsibility and participation. Thirdly, the poor are at the centre of the Synodal Church. They are not merely object of our charity but they have equal honour and dignity with all. We also can learn from their rich experience of life. Jesus himself lived a poor and simple life, befriended the poor and gave them hope for new life. Fourthly, the Synod on Synodality also asks from all to be engaged into ecumenical efforts to enhance Christian unity and for inter-religious dialogue toward building harmony among all peoples of our world. Fifthly as we advance more and more into the on-growing “digital culture” today, as we live and work more and more in the digital arena, it is important that we proclaim the Good News and give pastoral care to people and maintain relationship with them through the digital media.

Through our life, activities and celebrations let us bring joy, peace and harmony in our polarized and fragmented world.

I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

+ বিজয় ডি'ক্রুজ, ওএমআই

আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই
আর্চবিশপ, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ
সভাপতি, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী

বড়দিন উপলক্ষে বাণী

যে জাতি অন্ধকারে পথ চলত, তারা মহান এক আলো দেখতে পেল" (*ইসা ৯ঃ১*)।
পরিবারে একটি শিশু সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন পরিবারটিকে আলোকিত করে আনন্দে ভরিয়ে তোলে। প্রভু যিশু একটি মানব পরিবারে জন্ম নিয়েছিলেন এবং মানুষের মত হয়ে ঐ পরিবারে বাস করেছিলেন, অর্থাৎ ঈশ্বর মানব রূপে মানব পরিবারে জন্ম নিয়েছিলেন। রক্ত মাংসের মানুষ রূপে ঈশ্বর এই জগতের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। তাই সাধু যোহন বলেছেন,

"বাণী একদিন হলেন রক্তমাংসের মানুষ
বাস করতে লাগলেন আমাদেরই মাঝখানে"।

একটি পরিবারকে আলো করে প্রভু যিশু জন্ম নিয়েছিলেন। পরিবারের আলো সমস্ত জগতের সাথে এক হয়ে জগতের অন্ধকারকে দূর করতে এই জগতের মাঝে এসেছিলেন। কারণ "ঈশ্বর আলো, তাঁর মধ্যে কোন অন্ধকার নেই" (*১ যোহন ১:৫*)। কিন্তু জগতের মধ্যে আলো যেমন আছে তেমনি অন্ধকারও রয়েছে, রয়েছে পাপ ও পুণ্য, ভাল ও মন্দ, বিশ্বস্ততা ও অবিশ্বস্ততা, বাধ্যতা ও অবাধ্যতা, ন্যায় ও অন্যায় ইত্যাদি। মানব জীবনে এই আলো ও অন্ধকার রয়েছে। পোপ মহোদয় বলেছেন যে, আমরা যদি ঈশ্বর ও আমার প্রতিবেশি ভাইবোনকে ভালোবাসি তাহলে আমরা আলোর পথে চলি। কিন্তু আমরা যদি অহংকার, প্রতারণা, আত্মকেন্দ্রিকতা দ্বারা প্রভাবিত হই তখন অন্ধকার আমাদেরকে ঘিরে ধরে। তাইতো পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে, "কিন্তু নিজের ভাইকে যে ঘৃণা করে, সে অন্ধকারে রয়েছে ও অন্ধকারে চলে; কোথায় যাচ্ছে তা জানে না, কারণ অন্ধকার তার চোখ অন্ধ করেছে" *(১ যোহন ২:১০)*।
যিশু আমাদের এই অন্ধকার অবস্থা থেকে মুক্ত করতে এই জগতে এসেছিলেন। যিশু ঈশ্বরের সেই ভালোবাসা প্রকাশ করতে মানব দেহ ধারণ করে এই জগতের মাঝে মানুষ রূপেই জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি আমাদের জীবনের অন্ধকার দূর করতে চান। কিন্তু আমরা যদি আমাদের হৃদয় দুয়ার বন্ধ করি, যিশুকে আসতে না দেই তাহলে আমরা আলোর মানুষ হতে পারব না। আমরা আলো দেখতে পারব না।
অন্ধকারে পথ চলছিল যারা, সেই জাতির মানুষেরা দেখেছে এক মহান আলোক। অন্ধকার হচ্ছে পাপ অন্যায় অবিচার, অন্যায্যতার পথ, সেই পথে যারা পড়েছিল তারা আজ আশার আলো দেখতে পেয়েছে। আলো হচ্ছে ঈশ্বরের পথ, ন্যায়ের পথ, পবিত্রায় ও শান্তির পথ।
জাগতিক অন্ধকার, অরাজকতা, অশান্তি ও অন্যায় অপরাধের পথ থেকে বেরিয়ে শান্তি, ন্যায্যতার পথে নিয়ে আশার জন্য যিশু এই জগতের মাঝে এসেছিলেন, তাই আমাদের লক্ষ্য হবে যিশুর দিকে তাকান, তার সাথে একসাথে পথ চলা, তার প্রশংসা গৌরব করা ও নির্যাতিত অবহেলিতদের সাথে একাত্ম হওয়া।
আমাদের কাজ হবে যে যিশু এই বড়দিনে আসছেন তাঁর প্রতি গভীর মনোযোগী হওয়া, তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাস, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দেখানো যার বাস্তবতা হবে মানব যিশুর মধ্যদিয়ে জগতের মানুষের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার মাধ্যমে একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজ, মণ্ডলী ও পরিবার গড়ে তোলা। প্রভু যিশু খ্রিস্টের এই জগতে আগমনের বিশেষ লক্ষ্য হল পাপকে জয় করে মিলনের, শান্তির ও ভালোবাসার রাজ্য গড়ে তোলা। সেই দায়িত্ব তিনি আমাদের উপর ন্যাস্ত করেছেন। সুতরাং আমাদের জীবনের কেন্দ্রে থাকবে যিশু যিনি আমাদের মধ্যে বাস করতে এসেছেন। পোপ মহোদয় আমাদের আহ্বান করেছেন, "এসো একসঙ্গে পথ চলি: বিনম্রতার সাথে, আগ্রহভরে ও আনন্দচিত্তে।"

আমাদের প্রত্যেকের কাজ হবে পবিত্র আত্মার ও শিশু যিশুর অনুগ্রহ লাভ করার জন্য অন্তর দুয়ার খুলে দেওয়া, মনের অন্ধকার দূর করে আলোর মানুষ হওয়া এবং প্রভু যিশুর সাথে একাত্ম হয়ে মিলনের মণ্ডলী গড়ে তোলা। প্রভু যিশু খ্রিস্টের শান্তি ও আশীর্বাদ আমাদেরকে আনন্দে ও ভালোবাসায় জীবন যাপন করতে অনুপ্রাণিত করুক।

আপনাদের সবার প্রতি জানাই শুভ বড়দিন ও আনন্দময় নতুন বর্ষের শুভেচ্ছা। প্রার্থনা করি নতুন বছর আপনাদের সবার জীবনে বয়ে আনুক সফলতা, আনন্দ ও শান্তি।

খ্রিস্টেতে বিনিত,

+ জেমস্ রমেন বৈরাগী
খুলনা ধর্মপ্রদেশ।
সভাপতি, বিশপীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশন, সিবিসিবি

বিশেষ প্রবন্ধ

বড়দিন:পরিবারে মিলন ও শান্তি নবায়নের দিন

নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি

ছবি: ইন্টারনেট

প্রারম্ভিকতা: "আমি এক মহা আনন্দের সংবাদ তোমাদের জানাতে এসেছি; আর এই আনন্দ জাতির সমস্ত মানুষের জন্যেই সঞ্চিত হয়ে আছে। আজ দাউদ নগরীতে তোমাদের ত্রাণকর্তা জন্মেছেন; তিনি সেই খ্রিস্ট, স্বয়ং প্রভু" (*লুক ২:১১*)। বড়দিন আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন। বড়দিনে এক মহা আনন্দের সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে স্বর্গীয় দূতবাহিনীর কণ্ঠে, "জয় উর্ধ্বলোকে পরমেশ্বরের জয়! ইহলোকে নামুক শান্তি তাঁর অনুগৃহীত মানবের অন্তরে" (*লুক ১:১৩*)! সেই থেকে আজ দুই সহস্রাব্দ পেরিয়ে গেল; তবুও প্রতিবার বড়দিন আমাদের কাছে আসে প্রেম, মিলন ও শান্তির বার্তা নিয়ে। বড়দিন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সর্বোত্তম অলৌকিক কর্ম; স্বর্গ-মর্তের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর মানুষ হলেন আর বাস করতে লাগলেন আমাদেরই মাঝে, আমাদেরই সাথে। বড়দিন আমাদের জন্য প্রেমময় ঈশ্বরের মহান মুক্তি পরিকল্পনা। ঈশ্বরের অন্য আরেকটি মহান পরিকল্পনা হল আমাদের পরিবার। পরিবার হচ্ছে সমাজের জীবন্ত কোষ ও খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রাণকেন্দ্র। পরিবার ব্যক্তি ও সমাজের জন্য মানবীয়করণের প্রাথমিক স্থান এবং জীবন ও প্রেমের আশ্রয়স্থল। খ্রিস্টীয় পরিবার একজন পুরুষ এবং নারীর একত্র জীবন যাপনের জন্য একটি পবিত্র সন্ধি ও অবিচ্ছেদ্য বন্ধন; যেখানে স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানেরা খ্রিস্টের মধ্যে বাস করে এবং খ্রিস্ট তাদের জীবনে বাস করেন।

খ্রিস্টীয় পরিবার পারস্পরিক সহভাগিতা, মিলন ও শান্তিময় জীবনকে দাবি করে; যা ত্রি-ব্যক্তি পরমেশ্বরের মধ্যে অন্তর্নিহিত। পরিবার গঠনের লক্ষ্যে বিবাহ সংস্কারে একজন নারী ও পুরুষ একটা নির্দিষ্ট উপলক্ষ বা সময়ের জন্য তাদের ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করে না বরং তাদের বিবাহিত জীবনের উত্থান-পতনের প্রতিটি মুহূর্তে পারস্পরিক ভালোবাসা ধরে রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। পরিবারের অবিচ্ছেদ্যতা ও প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রভু যিশু বলেন, "স্বয়ং ঈশ্বর যা যুক্ত করেছেন, মানুষ যেন তা কখনো বিচ্ছিন্ন না করে" (*মথি ১৯:৫-৬*)। সাধু পল খ্রিস্টীয় পরিবার ও বিবাহের পবিত্রতাকে গুরুত্বারোপ করে বলেন, "এ এক মহান রহস্যাবৃত সত্য" (*এফে ৫:৩২*)। আমাদের কাথলিক মণ্ডলীতে বিবাহ ও পরিবার প্রভু যিশুখ্রিস্টের ভালোবাসার চিহ্ন ও সংস্কার। খ্রিস্টীয় পরিবার মণ্ডলীর প্রতি দেহধারী ঈশ্বরের অর্থাৎ খ্রিস্টের অদৃশ্য ভালোবাসাকে দৃশ্যমান করে এবং অন্তর্নিহিত ভালোবাসাকে প্রকাশ করে। তাই পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর প্রেম ও মিলন, খ্রিস্ট ও মণ্ডলীর মধ্যকার প্রেম ও মিলনেরই প্রকাশ। প্রতিবছর বড়দিন আমাদের কাছে পারিবারের এই প্রেম, মিলন ও শান্তি নবায়নের বার্তা নিয়ে আসে।

ঈশ্বরের প্রেমময় পরিকল্পনায় পরিবার ও বড়দিন: পরিবার হল সৃষ্টিকর্তা ও জীবনদাতা ঈশ্বরের ভালোবাসার অমেয় প্রকাশ। কেননা ঈশ্বরের ভালোবাসার কারণেই মানবজীবন ও পরিবারের সূচনা, "ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করলেন, তাকে সৃষ্টি করলেন ঈশ্বরেরই প্রতিমূর্তিতে; পুরুষ ও নারী ক'রেই সৃষ্টি করলেন। ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ ক'রে বললেন: 'ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর! তোমরা পৃথিবীকে ভরিয়ে তোল, তাকে বশীভূত কর" (*আদি ১:২৭-২৮*)! এই কারণেই মানবজীবন ও পরিবার ঈশ্বরের দান এবং একটি মূল্যবান ও পবিত্র সম্পদ। এতে আমরা অনুভব করতে পারি, ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে মিলন ও শান্তির বন্ধনে মানুষকে আবদ্ধ রাখার জন্যই তিনি প্রেমময় পরিবার ও জীবনদায়ী প্রভু যিশুর এই জগতে আবির্ভূত হওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। মানবজীবন রক্ষা করার উদ্দেশেই ঈশ্বরের এই মহান পকিল্পনা। প্রাক্তন সন্ধিতে আমরা দেখি, মনোনীত জাতির সঙ্গে ঈশ্বরের পারিবারিক মিলন-সন্ধি অপরিসীম ধৈর্য, উদারতা, নিয়ত নবায়নের আহ্বান, দয়া ও ক্ষমা দ্বারা পরিবেষ্টিত। নব সন্ধিতে আমরা দেখি, প্রভু যিশুর জীবনের আলোকে মানুষের জীবন পরিপূর্ণ অর্থ লাভ করে। বড়দিনে প্রভু যিশুর মধ্যদিয়ে ঈশ্বর এই জগতে মানবদেহ ধারণ করলেন, যাতে মানুষ জীবন পেতে পারে; আর তা পরিপূর্ণভাবেই পেতে পারে। প্রভু যিশুই আমাদের পরিবারে মিলন ও শান্তি নবায়নের দেহধারী বাণী এবং এই দেহধারী বাণীতেই পরিবারের জীবন, "আদিতে ছিলেন বাণী; বাণী ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর...তাঁর মধ্যে ছিল জীবন; সেই জীবন ছিল মানুষের আলো" (*যোহন ১:১*)। তাই বড়দিনে প্রভু যিশুখ্রিস্টের আশ্রয়ে পরিবারে মিলন ও শান্তি নবায়ন ক'রে জীবন যাপন করা-ই হচ্ছে পবিত্র আত্মায় বলীয়ান হয়ে যিশুতে জীবন যাপন করা।

পারিবারে মিলন ও শান্তি নবায়নে বড়দিন: সৃষ্টির আরম্ভ থেকেই ঈশ্বর চেয়েছেন বিবাহ ও পরিবার যেন অবিচ্ছেদ্য হয় এবং ঈশ্বরের দান ব'লে নতুন জীবনকে গ্রহণ করতে পিতামাতা সম্মত থাকে। এই লক্ষ্যেই ঈশ্বর পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব প্রস্ফুটিত ক'রে তোলার জন্য মানুষকে পুরুষ ও নারী করেই সৃষ্টি করলেন। সন্তান জন্মদান ও তাদের গঠন দেওয়ার জন্য দায়িত্ব পালন করার উদ্দেশে প্রতিটি পরিবার নিবেদিত। পরিবারে অবিচ্ছেদ্যতা ঈশ্বরেরই দান এবং এই

কারণেই স্বামী-স্ত্রী একদেহ হয়ে ওঠে তাদের প্রতিদিনকার ভালোবাসা ও জীবনধারণের মধ্যদিয়ে। এই একত্ব সন্তানদেরকে আবদ্ধ করে পারিবারিক ভালোবাসা ও জীবনযাপনের পবিত্র বন্ধনে। পরিবারে মিলন ও শান্তি স্থাপন করতে, সন্তানদেরকে মানুষ করতে, খ্রিস্টবিশ্বাস ও ঐশরাজ্যের জীবন গড়ে তুলতে প্রতিটি পরিবার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আর এই প্রতিশ্রুতি পূরণে আমাদের জীবনে আসে বড়দিন। আমাদের সামনে বড়দিন মিলন ও শান্তি নবায়ন ও প্রতিষ্ঠার একটি অপূর্ব মাধ্যম। পারিবারিক মিলন ও শান্তি নবায়নে বড়দিনের ভূমিকা সম্পর্কে এখানে কয়েকটি বিষয়ের অবতরণা করা হল।

ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে তোলা: ঈশ্বর পরিবারের মধ্যদিয়ে আমাদের ভালোবাসেন। তিনি আমাদেরকে পরিবারে শুধু সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হননি; তিনি আমাদেরকে বড়দিনের মধ্যদিয়ে পবিত্রকারী অনুগ্রহ দান ক'রে স্বর্গীয় মহিমার স্তরে তুলে ধরতেও চাইলেন। এজন্য তিনি তাঁর আপন পুত্র যিশুখ্রিস্টকে এই জগতে আমাদের কাছে প্রেরণ করলেন। তিনি এসে আমাদেরকে দেখালেন মিলন ও শান্তির পথ, শোনালেন মিলন ও শান্তির বাণী। তিনি নিজেকে উজার করে আমাদের ভালোবাসলেন, "পিতা যেমন আমাকে ভালোবেসেছেন, তেমনি আমিও তোমাদের ভালোবেসেছি" (*যোহন ১৫:৯*)। পরিবারে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গড়ে উঠবে তখনই, যখন আমরা পরিবার জীবনের সবকিছু ঈশ্বরের গৌরবের জন্য করব। আমাদের পরিবারে অবশ্যই সবকিছুর মধ্যে ঈশ্বরকে জানতে ও ভালোবাসতে হবে এবং তাঁকে অনুসন্ধান করতে হবে; কেননা এরই মধ্যে আমাদের জীবনের পূর্ণতা ও সুখ নিহিত। আর এই পূর্বশর্ত হল বড়দিনের আদর্শ ও আলোতে জীবনযাপন।

পারিবারিক প্রার্থনা ও বিশ্বাসে বলীয়ান থাকা: আমাদের খ্রিস্টীয় পারিবারিক জীবনে প্রার্থনা ও বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান বিষয়। খ্রিস্টীয় প্রার্থনা পরিবারকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত রাখে। ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে সহায়তা করে। 'জপমালা যাজক' ঈশ্বরের সেবক ফাদার প্যাট্রিক পেইটন সিএসসি বলেন, "যে পরিবার প্রার্থনা করে সেই পরিবার একত্রে থাকে।" পরিবারে অদ্ভুত কিছু করা বা অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করার মধ্যে প্রার্থনা নির্ভর করে না বরং প্রার্থনায় প্রকাশ পায় ঐশ অনুগ্রহ ও বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন। প্রার্থনা পবিত্রতার একটি পথ। এই পথেই সাধু-সাধ্বীগণ খ্রিস্টীয় পূর্ণতার চরম স্তরে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। বড়দিন আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে, জগত ও জীবনের সাধারণ কর্তব্যগুলো যথাসম্ভব সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে। তাই খ্রিস্টের শিক্ষা ও ঐশ বিধানকে পারিবারিক জীবনের সার্বক্ষণিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, "জেগে থাকো তোমরা, সব সময় প্রার্থনাই কর... যেন মানবপুত্রের সামনে দাঁড়াবার মত মনের ভরসা তোমরা পেতে পার" (*লুক ২১:৩৬*)। বড়দিনে তাই পরিবারে পারস্পরিক মিলন ও শান্তির জন্য প্রত্যেক সদস্যের জীবন বাণী এমন হতে হবে, "আমি সব সময় তা-ই করি, যা তাঁর কাছে সন্তুষ্টিজনক" (*যোহন ৮:২৯*)।

সর্বদা যিশুখ্রিস্টকে অনুসরণ করা ও সামনে রাখা: পরিবার হল ক্ষুদ্র গৃহমণ্ডলী, মণ্ডলী হল খ্রিস্টের দেহ আর খ্রিস্ট হলেন সেই দেহের মস্তকস্বরূপ। প্রভু যিশু বলেন, "আমিই দ্রাক্ষালতা, আর তোমরা আমার শাখা-প্রশাখা; যে আমাতে থাকে এবং আমি যার মধ্যে থাকি সে প্রচুর ফলে ফলবান হয়ে উঠবে; কারণ আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না" (*যোহন ১৫:৫-৬*)। এজন্য আমাদের উচিত সর্বদা খ্রিস্টকে অনুসরণ করা। বড়দিনের নতুন আলোতে যিশুখ্রিস্টকে অনুসরণ করলে আমরা কেউ কখনো অন্ধকারের পথে চলব না। কেননা বড়দিনে ঈশ্বরের 'সেই জ্যোতি ঊর্ধ্ব থেকে আমাদের সামনে এসে দেখা দেয়। দেখা দেয় তাদেরই আলো দিতে, যারা পড়ে আছে অন্ধকারে, আছে মৃত্যুর ছায়ায়; আর আমাদের পদক্ষেপ চালিত করতে মহা শান্তির পথে (*দ্র. লুক ১:৭৮-৭৯*)। আমরা যখন আমাদের পারিবারিক জীবনের নানা বাস্তবতায় অবিচলভাবে প্রভু যিশুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব, তখন আমরা একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয় খুঁজে পাব। বড়দিনে আমাদের চিন্তায়, ভালোবাসায়, কথায় ও কাজে সকল ক্ষেত্রেই খ্রিস্ট নিজেকে আমাদের সামনে রাখেন, যেন আমরা তাঁকে অনুসরণ ক'রে প্রচুর ফলে ফলবান হয়ে উঠতে পারি।

পরিবারে ক্ষমা ও গ্রহণীয়তার মনোভাব চর্চা: আমরা মানুষ মাত্রই ক্ষমাদান ও ভালোবাসা প্রদর্শন করতে আহূত; কারণ ঈশ্বর নিজেই আমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং ভালোবেসেছেন। আজ আমরা যেন পারিবারিক জীবনে সংলাপ, জীবন সাধনা ও জীবনাদর্শে আরো বেশি ক্ষমাশীল হয়ে উঠতে পারি, ঈশ্বর এই-ই চান। আমাদের পারিবারিক জীবনের ভিত্তিই হচ্ছে ক্ষমা করা, ক্ষমা দেওয়া এবং ভ্রাতৃপ্রেমে জীবন যাপন করা। মাণ্ডলিক ও পারিবারিক সকল প্রৈরিতিক ও সংস্কারীয় সেবা হলো ক্ষমা ও ভ্রাতৃপ্রেমের জীবন্ত সাক্ষ্য। খ্রিস্টমণ্ডলীর কোন সত্য ও কর্মপ্রয়াস কখনো ক্ষমা ও ভালোবাসা বিমুখ হতে পারে না। এই ক্ষমা ও ভালোবাসা অর্থাৎ ভ্রাতৃপ্রেমই খ্রিস্টীয় পরিবারের সৌন্দর্য। আমরা যখন কাউকে ক্ষমা করি, তখন আমরা তাকে গ্রহণ করি; আর গ্রহণ করার অর্থই হল ভালোবাসা। এ বিষয়ে প্রভু যিশু বলেন, "বিবাদে বিভক্ত যে কোন রাজ্যই তো ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলে। তেমনি বিবাদে বিভক্ত কোন শহর বা পরিবার কখনো টিকে থাকতে পারে না" (*মথি: ১২:২৫*)। ঈশ্বরের ভালোবাসার মধ্যেই নিহিত আমাদের পাপের ক্ষমা আর প্রভু যিশুর মধ্যদিয়েই আমরা সেই ক্ষমা বুঝতে পেরেছি। প্রভু যিশু নিজে ক্ষমা করেছেন তাঁর হত্যাকারীদের এবং সত্তরগুণ সাতবার ক্ষমা করার নির্দেশও দিয়েছেন, "আমি বলছি, সাতবার কেন, বরং সত্তরগুণ সাতবার ভাইকে ক্ষমা করতে হবে" (*মথি: ১৮:২২*)। পরিবারে মিলন ও শান্তি নবায়নের জন্য প্রভু যিশুর আগমন ও বড়দিন আমাদেরকে পরিবারে ক্ষমা অনুশীলন করতে অনুপ্রাণিত করে।

প্রাত্যহিক প্রলোভন, লোভ ও চ্যালেঞ্জ জয়: পারিবারিক জীবনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রলোভন ও চ্যালেঞ্জ আসলে আমরা অনেক সময় ভেঙে পড়ি। অথচ এই প্রলোভন ও চ্যালেঞ্জ ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের একটি অন্যতম মাধ্যম। এজন্য আমাদের সব সময় স্মরণ রাখতে হবে, প্রলোভন ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন হলে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন খাঁটি হয়; নতুন শক্তি, নতুন উদ্যম, নতুন সাহস ও গুণাবলী অর্জিত হয় এবং তাতে পরিবারে একে অন্যকে আরো ভালোমত জানতে, বুঝতে ও ভালোবাসতে পারে। যেখানে নাজারেথের পবিত্র পরিবারে, বিশেষ ক'রে যিশু-মারীয়া-যোসেফের জীবনে বারংবার প্রলোভন ও চ্যালেঞ্জ এসেছে। সেখানে আমাদের সাধারণ মানব জীবনে প্রলোভন ও চ্যালেঞ্জ আসাটা নিতান্তই স্বাভাবিক। মরুভূমিতে চল্লিশ দিন-রাত অবস্থানকালীন সময়ে প্রভু যিশু তাঁর জীবন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমাদের শিখিয়েছেন কিভাবে প্রলোভন, লোভ ও চ্যালেঞ্জের সময় ধৈর্য ধরে তা মোকাবেলা করতে এবং জয়ী হতে হয়। প্রভু যিশুর এই নির্দেশ মেনে চললেই আমরা সগৌরবে সকল প্রকার প্রলোভন ও চ্যালেঞ্জের সময় মা মারীয়ার মত বলতে পারব, "আমার অন্তর গেয়ে ওঠে প্রভুর জয়গান; আমার পরিত্রাতা ঈশ্বরের কথা ভেবে প্রাণ আমার উল্লসিত" (*লুক ১:৪৬*)!

আত্মত্যাগ ও সেবার মনোভাব গঠন: পরিবারের একটি অত্যন্ত সুন্দর বিষয় হল একে অন্যের জন্য আত্মত্যাগ ও সেবা করা। এই দু'টি বিষয় পারিবারিক জীবনকে এক অনন্য মর্যাদায় নিয়ে যায়। আত্মত্যাগ ও সেবার মধ্যদিয়ে প্রকাশ পায় একে অন্যের জন্য আমাদের ভালোবাসা, দরদবোধ, সহযোগিতা ও শুভচিন্তা। এজন্য প্রয়োজন আমাদের জীবনের মন্দ প্রবণতাগুলো, যা আমাদের জীবনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়; সুদৃঢ়ভাবে সেগুলো মোকাবেলা ও নিয়ন্ত্রণ করা। কেননা আমাদের হৃদয় মন্দতায় পরিপূর্ণ থাকলে কখনোই অন্যের জন্য আত্মত্যাগ করতে পারব না। আর আত্মত্যাগ ও সেবার মনোভাব ছাড়া যথাযথভাবে কেউ নিজের কর্তব্যও পালন করতে পারে না; সদগুণের চর্চাও তখন সম্ভব হয় না। ধন্যা কুমারী মারীয়া দূতসংবাদ লাভের পর তাঁর বৃদ্ধা জ্ঞাতিবোন এলিজাবেথের সেবা

করার জন্য নাজারেথ থেকে চারদিনের পথ পায়ে হেঁটে তার কাছে ছুটে গেছেন। প্রভু যিশু নিজেও বারবার আত্মত্যাগ করেছেন; তিনি ঈশ্বর হওয়া সত্বেও মানুষ হয়ে এই জগতে এসেছেন। যেন মানুষ তাঁকে ও তাঁর বাণীকে নিজের ও আপন করে পেতে পারে। মানুষ যেন তাঁকে জানতে ও ভালোবাসতে পারে। প্রভু যিশু বলেন, "কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে আত্মত্যাগ করুক এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক" (*মথি ১৬:২৪*)। তাই পরিবারে মিলন ও শান্তির জন্য আমাদেরকে বড়দিনের যথার্থ মর্মার্থ উপলব্ধি ক'রে একে অন্যের জন্য আত্মত্যাগ ও সেবার মনোভাব নবায়ন করতে হবে।

নিঃস্বার্থ ভালোবাসার বন্ধন প্রতিষ্ঠা: ভালোবাসার জন্যই আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। আমাদের ভালোবাসার অনুভূতিগুলোর মধ্যেই ভালোবাসার পরিচয় মেলে। সাধু আগষ্টিন বলেন, "যদি তুমি জগতকে ভালোবাস, তাহলে তুমি জগতেরই রইলে; আর যদি তুমি ঈশ্বরকে ভালোবাস, তাহলে তমি ঈশ্বরের অনুরূপ হয়ে উঠলে।" প্রভু যিশুর নির্দেশ অনুসারে আমাদের ভালোবাসার মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে; তা হল ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবাসা। আমাদের পরিবার সেই ভালোবাসার চর্চা ও প্রতিষ্ঠার একটি সুন্দর ক্ষেত্র। পরিবার থেকেই আমরা ভালোবাসার শিক্ষা পাই। বড়দিন আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয়, আমরা যখন পরিবারে একে অপরকে ভালোবাসতে পারব, তখন আমরা অন্যকেও ভালোবাসতে পারব। ভালোবাসা আমাদের আনন্দ, মিলন ও শান্তি বৃদ্ধি ও দীর্ঘস্থায়ী করে। সাধু পল বলেন, "আমি যদি মানুষদের ও স্বর্গদূতদের ভাষায় কথা বলতে পারি, অথচ আমার অন্তরে যদি না থাকে ভালোবাসা, তাহলে আমি ঢংঢঙানো কাঁসর বা ঝনঝনে করতাল ছাড়া আর কিছুই নই! আর আমি যদি প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণা করতে পারি, যদি উপলব্ধি করতে পারি সমস্ত রহস্যাবৃত্ত সত্য, জানতে পারি ধর্মজ্ঞানের সমস্ত কথা, যদি আমার অন্তরে থাকে পর্বত সরিয়ে দেবার মত পূর্ণ বিশ্বাস, অথচ না থাকে ভালোবাসা...তাহলে তাতে আমার কোন লাভই নেই" (*১ করি ১৩:১-৩*) ।

আনাবিল শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি: ঈশ্বর নিজেই শান্তিস্বরূপ। প্রভু যিশুখ্রিস্ট শান্তিরাজ। পরম পবিত্র আত্মা শান্তিদাতা। ধন্যা কুমারী মারীয়া শান্তির রাণী। আর আমরা মানুষ হিসেবে শান্তি অন্বেষণকারী। আমাদের পরিবারে যখন শান্তি থাকে, তখন আমরা অন্য কোন কিছুই প্রয়োজন বোধ করি না। খ্রিস্টীয় শান্তি অনেকগুলো বিষয়ের সমাহার। প্রভু যিশু বলেন, "তোমরা কাঁধে তুলে নাও আমার জোয়াল, আমারই শিষ্য হও তোমরা; কারণ আমি যে কোমল, বিনম্র-হৃদয় আমি। দেখো, পাবে তোমরা প্রাণের আরাম" (*মথি ১১:২৯*)। বড়দিনের মধ্যদিয়ে প্রভু যিশু এই জগতে এসেছেন, 'আমাদের পদক্ষেপ চালিত করতে মহাশান্তির পথে' (*দ্র. লুক ১:৭৯*)। আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের বড়দিনে স্বর্গদূতেরাও প্রত্যাশা করেন, 'ইহলোকে নামুক শান্তি তাঁর অনুগৃহিত মানবের অন্তরে' (*লুক ২:১৪*)। বড়দিনের শান্তি আমাদের অনুপ্রাণিত করে পরিবারে আমরা যেন একে অপরের প্রতি কোমল ও বিনম্রপ্রাণ হই। কোমলতা ও বিনম্রতা কোন দুর্বলতা নয় বরং এগুলো আমাদের পারিবারিক জীবনের আনন্দ ও বেদনার মুহূর্তগুলো থেকে অনন্য এক উচ্চতায় আমাদের তুলে ধরে। বড়দিনকে কেন্দ্র ক'রে যখন আমরা পরিবারে শান্তি ও মিলন নবায়ন ক'রে শান্তিময় এক পরিবেশ গড়ে তুলতে পারব; তখনই আমরা প্রভু যিশুর পরম পবিত্র হৃদয়ের অনেক কাছাকাছি অবস্থান করব।

আন্তরিক সততা ও সৌন্দর্যবোধ লালন: কথায় আছে, সত্য-ই সুন্দর, সুন্দর-ই সত্য। ঈশ্বর সত্যময়। তিনি চান, আমরা সকলেই যেন সত্যকে ভালোবাসি। আমাদের সামনে প্রভু যিশুখ্রিস্ট সত্য, পথ ও জীবন। তিনি তাঁর অবিস্মরণীয় কথার মাধ্যমে সত্যকে ভালোবাসার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, "তোমাদের কথা সরল হোক, হ্যাঁ, হ্যাঁ আর না, না-ই হোক" (*দ্র. মথি ৫:৩৭*)। তাই যে কেউ সত্যের অপব্যবহার করে, সে প্রভু যিশুখ্রিস্টের বিরুদ্ধেই পাপ করে। আর যারা তাঁকে সম্ভ্রম করে, যুগে যুগে তাদেরই তো দয়া করেন তিনি। আন্তরিক সততা হল সত্য বলা ও তা হৃদয়ে ধারণ করা; যা আমাদের মানবীয় মর্যাদা বৃদ্ধি করে। পরিবারের কারো মধ্যে কখনো অসত্যতা, প্রতারণা, কপটতা, বা ভণ্ডামীকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। কেননা তাতে পারিবারিক মিলন ও শান্তি নষ্ট হয়। আন্তরিক সততা আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজকে অলঙ্কৃত করে এবং এর মধ্যদিয়ে বাইরের মানুষটি তার ভেতরের মানুষটিকেই প্রতিফলিত করে। বড়দিন আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে, একজন খাঁটি অন্তরের মানুষ হতে; এমন খাঁটি, যার কথা ও কাজ সৎ এবং যার মধ্যে কোন ছলনা-ই নেই।

সৃজনশীল ও পরিশ্রমী মানুষ হওয়া: আদিপুস্তকে আমরা দেখি, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিজ হাতে এই জগত ও জগতের সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন। আমরা মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে ঈশ্বরের পরিকল্পিত কাজ করার জন্যই আমাদের জন্ম হয়েছে। কেননা জগত ও জীবনের আরম্ভ থেকেই ঈশ্বর মানুষের উপর তাঁর পরিকল্পনা ও দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। "তুমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই আহার করবে, যতদিন না তুমি মাটিতেই ফিরে যাও; যেহেতু মাটি থেকেই তোমাকে তুলে নেওয়া হয়েছে" (*আদি ৩:১৯*)। এই থেকেই আমরা বুঝতে পারি, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমাদেরকে পরিশ্রম করে যেতে হবে। কথায় আছে, পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি। সর্বোপরি, আমাদের গুরু ও আদর্শ প্রভু যিশুখ্রিস্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে, খ্রিস্টভক্ত হিসেবে কাজ ও পরিশ্রমকে আমাদের ভালোবাসতে হবে। আমাদের সামনে যিশুখ্রিস্ট, তাঁর প্রকাশ্য জীবনের শুরু থেকেই কাজ করে গেছেন এবং নিজেকে একজন অক্লান্ত পরিশ্রমী ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। পরিবারে মিলন ও শান্তি বজায় রাখার জন্য আমাদেরকে তাই খ্রিস্টের কাছ থেকে শিখে নিতে হবে- কঠোর পরিশ্রম করা, ছোট বড় যেকোন কাজকে ভালোবাসা, কর্মশক্তি বাড়িয়ে তোলা এবং সবকিছু ঈশ্বরের গৌরবের জন্য করা। প্রভু যিশুর জন্মের সময়ে অনেক বড় বড় জ্ঞানী-গুণী, গুরু-শাস্ত্রী ও রাজা-বাদশা থাকা সত্বেও শিশুযিশুকে প্রথম দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল রাখালদের; যারা কিনা সারা রাত মাঠে জেগে থেকে তাদের মেষপাল পাহারা দিত। বড়দিন তাই আমাদেরকে আহ্বান করে, পরিবারে মিলন ও শান্তি স্থাপন ও নবায়নের জন্য পরিশ্রম ও সৃজনশীলতা খুবই প্রয়োজন।

শেষ কথা: ঈশ্বরের ভালোবাসা ও পরিকল্পনা পুরুষ ও নারীকে মিলিত করে বিবাহ বন্ধনে; আর বিবাহের ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় পরিবার। বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবনের আধ্যাত্মিকতা ভালোবাসা ও মিলনের উপর প্রতিষ্ঠিত; যা মানুষের আবেগ-অনুভূতি এবং দেহ-মনকে স্পর্শ করে, ঈশ্বর ও মানুষের মিলন-বন্ধন দৃশ্যমান করে, আত্মত্যাগী ভালোবাসার সাক্ষ্যদান করে এবং পারিবারিক সম্পর্ককে আরো গভীর করে। ঈশ্বরের সাথে মিলন, দম্পতির মধ্যে মিলন, পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে মিলন, যুব ও বৃদ্ধের মধ্যে মিলন, যৌথ পরিবারের মধ্যে মিলন, প্রতিবেশিদের সাথে মিলন ইত্যাদি বিষয়গুলো পরিবারে আনন্দ ও শান্তি আনয়ন করে। আমাদের ত্রাণদাতা প্রভু যিশুখ্রিস্ট মিলন ও শান্তির পথস্বরূপ বড়দিনের আদর্শ ও আধ্যাত্মিকতা আমাদের পরিবারের সামনে রেখেছেন; যেন পরিবারগুলো সেই পথস্বরূপ আদর্শ ও আধ্যাত্মিকতায় জীবন যাপন করতে পারে। পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহে; অর্থাৎ আনন্দ-প্রত্যাশা, দুঃখ-বেদনা, চিন্তা-উদ্বিগ্নতা, সমস্যা-সংকট ইত্যাদি সময়ে বড়দিনের মর্মার্থ অনুসরণ ও ঐশইচ্ছা আবিষ্কার করলে আমাদের পরিবারগুলো সহজেই বড়দিনের আলোয় আলোকিত মিলন ও শান্তির পরিবার হয়ে উঠবে। পরিশেষে, সাধু লুক রচিত মঙ্গলসমাচারের ২:১৫ পদের আলোকে বলতে চাই, ''চল এখন আমরা বেথলেমে যাই; সেখানে যা ঘটেছে ব'লে প্রভু আমাদের জানিয়েছেন, তা একবার দেখে আসি!"

গোশালা : খ্রিস্টমণ্ডলী প্রকাশ

ফাদার শিপন পিটার রিবেরু

খ্রিস্টবিশ্বাসের অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে ত্রিত্ব ঈশ্বরের দ্বিতীয় ব্যক্তির মানবদেহ ধারণ। তিনি পবিত্র আত্মার শক্তিতে কুমারী মারীয়ার গর্ভে এই জগতে মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করেন এবং স্বর্গদূত গাব্রিয়েলের নির্দেশনা অনুসারে তার নামকরণ করা হয় 'যিশু' (*দ্র. লুক ১:৩১*)। এই যিশুখ্রিস্ট নামেই পরবর্তীতে তিনি সবার কাছে পরিচিত হয়েছেন। মহান শিশুটির জন্মদিন সারা জগতে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সবাই বিভিন্ন আঙ্গিকে খুবই ঘটা করে উদ্‌যাপিত করে। তবে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জন্য এটি অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এটি বড়দিন, আনন্দ ও জয়গানের দিন। কেননা যার দ্বারা জগতের সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে, অস্তিত্ব লাভ করেছে, তিনি এখন আমাদের মাঝে, আমাদেরই একজন হয়ে আমাদের সাথে বাস করছেন (*দ্র. যোহন ১:১.১৪*)।

ছবি: ইন্টারনেট

বড়দিন উৎসবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রকম বাহ্যিক আয়োজন ও সাজসজ্জা করা হয়। এর ব্যাপ্তি শুধুমাত্র গির্জাঘর, খ্রিস্টীয় পরিবার বা সমাজেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, বড় বড় বিপনণ কেন্দ্র, হোটেল-রেষ্টুরেন্ট পর্যন্ত বিস্তৃত। চতুর্দিকে রমরমা সাজগোজ ও আলোকসজ্জা বড়দিনের আনন্দের মাত্রাকে আরো কয়েকগুণ বাড়িয়ে তোলে। সকল বাহ্যিক আয়োজনের মধ্যে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে, তা-হলো 'গোশালা'। বড়দিন উৎসবকে কেন্দ্র করে সকল গির্জায়, অনেক পরিবারে এবং কিছু কিছু ব্যবসায়িক কেন্দ্রে ছোট-বড় বিভিন্ন ধরণের গোশালা তৈরি করা হয়, যেখানে নবজাত শিশু যিশু, কুমারী মারীয়া ও যোসেফ, বিভিন্ন ধরনের গবাদি পশু, প্রাচ্যদেশের পণ্ডিত, উদীয়মান তারা প্রভৃতির প্রতিমূর্তি রাখা হয়। এগুলোর মধ্যদিয়ে প্রকৃতপক্ষে সাধু লুকের লেখা পবিত্র মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত যিশুর জন্ম ও তার জন্মের সময়কার বাস্তবতার একটি চিত্র তুলে ধরে: "আর তিনি নিজ প্রথমজাত পুত্র প্রসব করলেন। কাপড়ে জড়িয়ে তিনি তাঁকে একটা যাবপাত্রে শুইয়ে রাখলেন, কারণ পান্থশালায় তাঁদের জন্য স্থান ছিল না" (*লুক ২:৭*)।

যিশুখ্রিস্টের দেহধারণের এই উৎসব 'বড়দিন' আদিমণ্ডলী থেকেই খুব ঘটা ক'রে পালন করতে দেখা যায়। কিন্তু গোশালা তৈরির প্রাতিষ্ঠানিক রেওয়াজ খ্রিস্টমণ্ডলীর শুরুতে এর তেমন কোন নমুনা পাওয়া যায় না। তবে কিছু কিছু কাটাকুম্বের (মাটির নিচে খ্রিস্টীয় কবরস্থান) কবরে নবজাত শিশুযিশুকে দেখতে রাখালদের আগমনের বা প্রাচ্যদেশের পণ্ডিতদের উপহার প্রদানের খোঁদায়কৃত কিছু চিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু গির্জায় বা পরিবারে বড়দিন উপলক্ষে এটি তৈরির প্রচলন ছিল না। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কাছে অতি প্রিয় ও পরিচিত বড়দিনের বাহ্যিক চিহ্ন 'গোশালা'র বর্তমানরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করে মূলত আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের হাত ধরে। বলা হয় যে, ১২২৩ খ্রিস্টাব্দে, ২৯ নভেম্বর পোপ অনোরিউসের কাছ থেকে তার নতুন সংঘের অনুমোদন পাওয়ার পর রোম থেকে আসিসি ফিরে যাবার পথে গ্রেচ্চো নামক এক শহরে একটি ছোট গুহা দেখতে পান- যা তাকে বেথলেহেমের যিশুর জন্মের গুহার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কেননা তিনি ইতিপূর্বে পুণ্যভূমিতে যিশুর জন্মের সেই গুহাতে তীর্থযাত্রা করেছিলেন। একই সাথে খুব সম্ভবত রোমে অবস্থিত কুমারী মারীয়ার নামে উৎসর্গকৃত মহামন্দিরে (মারী মাজ্জরে) সংরক্ষিত শিশুযিশুকে রাখার কাঠের যাবপাত্রটির পাশে মোজাইক পাথরে অংকিত যিশুর জন্মের চিত্রটিও তাকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। সম্ভবত এই সমস্ত অভিজ্ঞতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সেই বছরের বড়দিনের পূর্বে ফ্রান্সিস স্থানীয় একজন ব্যক্তির (যোহন) সহায়তায় গ্রেচ্চোর সেই গুহায় প্রথম গোশালাটি তৈরি করেছিলেন- যা ১২২৩ খ্রিস্টাব্দে ২৫ ডিসেম্বর ফ্রান্সিস ও তার সংঘের সদস্যদের উপস্থিতিতে একজন যাজক তা আশীর্বাদ করেছিলেন। এভাবে খ্রিস্টমণ্ডলীতে গোশালার এই ঐতিহ্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয়েছিল।

বড়দিন উৎসবকে কেন্দ্র ক'রে নির্মিত এই গোশালা কাঠের বা অন্যকোন উপাদানে তৈরি শুধুমাত্র একটি ছোট গৃহ বা গুহা নয়, বরং এটি বিশ্বাসের মৌলিক কিছু অন্তর্নিহিত অর্থ বহন করে। এটি যেন খ্রিস্টবিশ্বাস ও খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রতিচ্ছবি হিসাবে জগতের মানুষের সামনে প্রতিবছর বড়দিনের সময় হাজির হয়, দিয়ে যায় যিশুখ্রিস্টের জীবন ও শিক্ষার সাক্ষ্য, হয়ে ওঠে বাণীপ্রচারক। অন্য কথায়, গোশালার মধ্যেই খ্রিস্টের দেহ অর্থাৎ খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রকৃত রূপ খুঁজে পাওয়া যায়।

১) খ্রিস্টবিশ্বাসের পরমসত্য ঈশ্বরপুত্রের 'দেহধারণ' মূলত বাস্তবরূপ নেয় এই গোশালায়: "বাণী হলেন রক্তমাংসের দেহ" (*যোহন ১:১৪*)। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যুগ যুগ ধরে যে পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার বাস্তবায়ন ঘটে গোশালায় যিশুর জন্মের মধ্যদিয়ে। এটা যেন প্রাক্তনসন্ধির পূর্ণতার মূর্তরূপ, মানবমুক্তির ইতিহাসে অন্যান্য সন্ধিক্ষণ। এই সত্যটিই স্বর্গ-পৃথিবীতে ধ্বনিত হচ্ছিল রাখালদের কাছে স্বর্গদূতের আবির্ভাব ও সুসংবাদ প্রচারে, এবং স্বর্গে বিশাল দূতবাহিনীর ঈশ্বর প্রশংসার মধ্যদিয়ে, "উর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব, ইহলোকে তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুষের জন্য শান্তি" (*লুক ২:১৪*)। গোশালা যেন সত্যিই হয়ে ওঠেছে এক জীবন্ত মঙ্গলসমাচার- যা মানুষের জন্য মঙ্গলময় ঈশ্বরের চিরস্থায়ী মুক্তি শুভবার্তা ঘোষণা করছে।

২) সাধু লুকের বর্ণনা অনুসারে জন্মের পর মারীয়া যিশুকে একটি কাপড়ে জড়িয়ে পশুদের খাবার দেবার জায়গা 'যাবপাত্রে' শুইয়ে রাখেন (*লুক ২:৭*)। মণ্ডলীর ঐতিহ্য অনুসারে যাবপাত্রটি ছিল কাঠের তৈরি- যা এখনো রোমে

মারী মাজ্জরের মহামন্দিরে সংরক্ষিত রয়েছে। মারীয়ার দ্বারা সম্পাদিত এই সংকেতিক ক্রিয়াটি যেন যিশুর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাকে সরাসরি নির্দেশ করছে। গবাদিপশু যেভাবে যাবপাত্রে রাখা খাবার খেয়ে বেঁচে থাকে, শক্তি লাভ করে, একইভাবে যিশু হচ্ছেন "সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে" (*যোহন ৬:৪১*) সকল মানুষকে প্রকৃত জীবন ও মন্দতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের শক্তি দিতে। যিশু তার প্রকাশ্য জীবনের শেষ প্রান্তে আপন শিষ্যদের নিয়ে শেষভোজ ও ক্রুশে মৃত্যুবরণের মধ্যদিয়ে মারীয়ার প্রাবক্তিক ভঙ্গিকে তিনি সুনির্দিষ্টভাবে বাস্তবরূপ দান করেন। প্রতিটি খ্রিস্টযাগে যিশুর এই ঘটনা প্রতিনিয়ত খ্রিস্টমণ্ডলীতে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

৩) বেথলেহেমের পশুদের থাকার স্থান অর্থাৎ গোশালা ও তাতে যিশুর উপস্থিতি খ্রিস্টমণ্ডলীর দরিদ্রতার প্রতিচ্ছবি বহন করছে। ঈশ্বরপুত্র যিশু দরিদ্রতম হয়ে এই জগতে এসেছিলেন তিনি সকল দরিদ্র মানুষের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। তিনি তার বাণীপ্রচারের প্রারম্ভে এই বিষয়টি খুবই দৃঢ়তার সাথে উচ্চারণ করেন: "কেননা তিনি দীন-দুঃখীদের কাছে শুভসংবাদ দেবার জন্য আমাকে অভিষিক্ত করেন" (*লুক ৪:১৮*)। এজন্য দেখা যায়, যিশু তার প্রচার কাজে দরিদ্র মানুষ অর্থাৎ মন্দ আত্মা পাওয়া ব্যক্তি, কুষ্টরোগী, করগ্রাহক, সমাজচ্যুত, পতিতা এবং সমাজের নিচুশ্রেণীকে বিশেষ বিবেচনায় নিয়েছেন, তাদেরকে কাছে টেনে নিয়েছেন, মুক্তির স্বাদ দিয়েছেন। বর্তমান খ্রিস্টমণ্ডলীর কর্ণধার পোপ ফ্রান্সিস যিশুখ্রিস্টের প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীর এই আদিরূপকে ফিরিয়ে আনার জন্য বারবার তাগিদ দিচ্ছেন এবং তিনি নিজেও সেই পথে হাঁটছেন। সুতরাং যিশুর জন্মোৎসবকে কেন্দ্র করে নির্মিত এই 'গোশালা' যিশুর জীবনের বিশেষ অগ্রাধিকারের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছে। এটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, খ্রিস্টমণ্ডলী কোনরূপ একটি উৎসবমুখর প্রতিষ্ঠান নয় বরং প্রান্তিক-দরিদ্র-অবহেলিত মানুষের কাছে একটি আশার স্থান ও আশ্রয়।

৪) যিশুর জন্মের পর স্বর্গদূতের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে বেথলেহেমের গুহায় রাখালগণই এই নবজাতককে প্রথম দেখতে গিয়েছিলেন: "তাই তারা ইতস্তত না করেই গিয়ে মারীয়া ও যোসেফ ও যাবপাত্রে শোয়ানো শিশুটিকে খুঁজে পেল" (*লুক ২:১৬*)। তৎকালীন সময়ে রাখাল ও তাদের কাজ সমাজের দৃষ্টিতে ছিল অতি সাধারণ। এরা পশু রাখার গুহার পাশেই রাত্রি-যাপন করত- যা আজও এর কিছু নমুনা বেথলেহেমে দেখা যায়। তাদের খুব সম্ভবত তেমন কোন ভালো বাসস্থান বা থাকার জায়গা ছিল না। সুতরাং যিশু যদি রাজ পরিবার বা ধনীর ঘরে জন্ম নিতেন, তাহলে এই নগণ্য রাখালেরা কোনভাবে সেখানে প্রবেশ করার অনুমতি বা যিশুর সন্ধান পেতো না। গোশালাতে যিশুর জন্ম অবশ্যই ঐশ পরিকল্পনার অংশ। যাতে জগতের সকল শ্রেণীর মানুষ- ধনী-উচ্চশ্রেণী (প্রাচ্যদেশের পণ্ডিতগণ) ও দরিদ্র-নিম্নশ্রেণী (রাখালগণ)- ঈশ্বরপুত্রের সাথে যুক্ত হাতে পারে। ঈশ্বরের মুক্তির মহাপরিকল্পনায় যেন সবাই সংযুক্ত থাকে। এটি খ্রিস্টমণ্ডলীর আরেকটি সুন্দর রূপ ফুটিয়ে তুলেছে। যিশুর প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীতে সবার প্রবেশাধিকার রয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ সবার জন্য ঈশ্বরপুত্র মানুষ হয়ে জন্মেছেন, এবং তাঁর মুক্তি ও অনুগ্রহ সবার জন্য উন্মুক্ত।

৫) প্রতিটি পরিবারই হচ্ছে এক একটি গৃহমণ্ডলী, যা হচ্ছে বিশ্বাস ও মূল্যবোধ চর্চার প্রাণকেন্দ্র (*কা.ম.ধ., ১৬৫৬*)। গোশালায় উপস্থিত যিশু, মারীয়া ও যোসেফ হচ্ছেন সেই গৃহমণ্ডলীর রূপকার ও আদিরূপ। যিশুর জন্মের পরই যোসেফ ও মারীয়া তাদের অন্যান্য ভূমিকা পালন করেন। যিশুকে তারা লুকিয়ে রাখেন নি বরং সবার জন্য তাকে উন্মুক্ত করে দেন। তাই তো যখন মাঠের রাখালরা শিশুকে দেখতে আসল তখন তারা তাদের বাধা দেন নি বা ভয়ে শিশুটিকে নিয়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যান নি বরং তাদের সাদরে গ্রহণ ক'রে তারা ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশে সহায়তা করেন (*লুক ২:২০*)। অন্যদিকে, প্রাচ্যদেশের পণ্ডিতগণ যখন শিশুটিকে খুঁজে পেয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল এবং শিশুটির জন্য তারা সোনা, ধূপধুনো ও গন্ধনির্যাস দিলেন, তাতে মারীয়া বা যোসেফ কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া করেননি বরং নম্র হয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে সবকিছুকে সানন্দে গ্রহণ করেন (*মথি ২:১১*)। এভাবে যিশুখ্রিস্টের জন্ম নেয়া গোশালাটি হয়ে ওঠেছে প্রতিটি খ্রিস্টীয় পরিবারের প্রতিচ্ছবি। মারীয়া ও যোসেফ যেভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পালন এবং তার মহিমা প্রকাশে সচেষ্ট ছিল, সেভাবে প্রতিটি খ্রিস্টীয় পরিবার যেন খ্রিস্টের উপস্থিতিতে বিশ্বাসের লালন-পালন এবং মানবীয় মূল্যবোধ চর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, ঈশ্বর-পুত্র যিশু একটি পরিবারে এসেছেন, একটি গোশালায় এসেছেন, ঘরে এসেছেন। এটা যেন তার গভীর আকাঙ্খার প্রতিফলন- তিনি প্রতিটি পরিবারের স্থায়ীভাবে বাস করতে চান, পরিবারের একজন হয়ে থাকতে চান।

৬) বেথলেহেমের তৃণভূমিতে গবাদি পশুকে নিরাপদে রাখার জন্য, বিশেষভাবে তাদের রাত্রিযাপনের জন্য অনেক ছোট-বড় গোশালা বা গুহা রয়েছে। লোকালয় থেকে কিছুটা দূরে প্রাকৃতিক তৃণভূমিতেই মূলত এগুলোর অবস্থান। যিশুখ্রিস্টের জন্ম হয় এই রকমই একটি স্থানে, প্রাকৃতিক পরিবেশে। পশুদের মধ্যে তার জন্ম যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে তিনি প্রকৃতির একজন হয়েই এই জগতে এসেছেন। প্রকৃতির সাথে তিনি বাস করেছেন এবং প্রকৃতিকে তিনি ভালোবাসেছেন। খ্রিস্টমণ্ডলীর মস্তক হিসাবে তিনি যেন তার ভক্তদের এই নির্দেশনাই দিচ্ছেন যে, তারা যেন প্রকৃতিকে ভালোবাসেন, এর যত্ন ও রক্ষা করেন। কেননা এই জগৎ তথা প্রকৃতি সেই বাক্য অর্থাৎ তাঁর দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছে, তাকে ছাড়া কোন কিছুই অস্থিত্ব পায় নি (*দ্র.যোহন ১:৩*)। এভাবে যিশুর জন্মস্থান 'গোশালা' খ্রিস্টমণ্ডলীর আরেকটি অগ্রাধিকার তুলে ধরছে। এটা সত্য যে, খ্রিস্টমণ্ডলী সুপ্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্নভাবে প্রকৃতি তথা জগতের যত্নে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে কাজ করে আসছে এবং এখন করে যাচ্ছে। মণ্ডলীর এই বিবেচনার সর্বোচ্চ প্রকাশ হচ্ছে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিসের প্রকাশিত প্রৈরিতিক পত্র লাউদাতে সি (Laudate Si)। তিনি পৃথিবী নামক গ্রহের সকল জীবিত প্রাণীকে সম্বোধন ক'রে পত্রটি আরম্ভ করেন *(এলএস ৩)* এবং প্রতিটি সত্তাকে রক্ষা ও যত্ন নেবার বিশেষ আহ্বান জানান। খ্রিস্টমণ্ডলী তথা সমগ্র বিশ্বজগতের পোপের আহ্বানের সাথে একাত্ম ঘোষণা করে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

প্রতিবছর ভাতিকানের সাধু পিতরের চত্বরে বেশ ঘটা ও অর্থপূর্ণভাবে যিশুর জন্মের স্মরকচিহ্ন 'গোশালা' তৈরি করা হয়। একই সাথে চত্বর বেষ্টনীতে সারিবদ্ধভাবে যে স্তম্ভ রয়েছে তার নিচে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যক্তি বা দলের তৈরি গোশালা পরিদর্শনের জন্য ব্যবস্থা করা হয়। রোমে থাকা অবস্থায় ইতালীর মিলান ধর্মপ্রদেশে একটি ধর্মপল্লীতে ছুটির সময় যেতাম, সেখানে আমি দেখেছি যে, ধর্মপল্লীতে একদল স্বেচ্ছাসেবী রয়েছে যারা ছয় মাস বা আরো আগে থেকেই বড়দিনের গোশালা তৈরির পরিকল্পনা ক'রে ধীরে ধীরে খুবই অর্থপূর্ণভাবে সেটি তৈরি করে। প্রতিবছরই মঙ্গলসমাচারের বিশেষবার্তা তারা খ্রিস্টভক্তদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করে। এগুলোর প্রেক্ষাপটে আমার উপলব্ধি হচ্ছে, খ্রিস্টমণ্ডলীর সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বড়দিনের বাহ্যিক চিহ্ন গোশালাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তৈরি করা হয়। অতি চমৎকার এই ঐতিহ্যটিকে খ্রিস্টমণ্ডলী ধারণ করে রেখেছে এবং দিন দিন একে আরো যত্ন সহকারে তা উপস্থাপনের প্রচেষ্টা চলছে। বর্তমান এই দ্রুত ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনশীল জগতে খ্রিস্টবিশ্বাসকে পরবর্তী প্রজন্মে হস্তান্তরের এটি সত্যিই হয়ে ওঠেছে এক শক্তিশালী মাধ্যম। এটা শুধুমাত্র খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং ভিন্ন বিশ্বাসীদের কাছেও খ্রিস্টধর্মের একটি বাহ্যিক প্রকাশ। সুতরাং বড়দিন উপলক্ষে নির্মিত গোশালা শুধুমাত্র একটি ছোট কুঁড়ে ঘরই নয় বরং জগতের সামনে খ্রিস্ট ও তার প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীর পূর্ণ প্রকাশ।

তথ্যসূত্র

১. Pope Francis, *Admirabile Signum. Apostolic Letter*, Rome 2019.

ষোড়শ সাধারণ সম্মেলন: বিশ্ব বিশপদের সিনড (৪-২৯ অক্টোবর ২০২৩): ভাটিকান সিটি

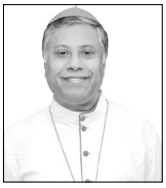

আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই

কাথলিক মণ্ডলীর জীবনে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দটি ছিল অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ বছর অক্টোবর মাসে ভাটিকানে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশপদের সিনড যার কার্যক্রম শুরু হয়েছিল ২০২১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে। এই সিনডের মূলভাব হলো: মণ্ডলী হলো একটা মিলন সমাজ, সবার অংশগ্রহণ এবং মিশন দায়িত্ব পালন। এই বিষয়গুলো স্থানীয় মণ্ডলীতে, তারপর জাতীয় এবং মহাদেশীয় পর্যায়ে ধ্যান ও আলাপ আলোচনার ও সহভাগিতার মধ্যদিয়ে ভাটিকানে প্রেরণ করা হয়। তারপর সিনড পরিচালনার জন্য সহকারী পুস্তিকা প্রস্তুত করা হয়। অক্টোবর মাসে কার্ডিনাল, বিশপ, কিছু সংখ্যক পুরোহিত, ব্রতধারী ও ব্রতধারিণী, খ্রিস্টভক্ত ও অন্য মণ্ডলীর ৩৫০ জন প্রতিনিধি নিয়ে এই সিনড সভাটি ভাটিকানে অনুষ্ঠিত হয়। তাই এই সিনড সভাটি হয়ে উঠেছিল বিশ্ব মণ্ডলীর ভ্রাতৃত্বের মিলন উৎসব। বিশ্বে প্রায় ২০০ কোটি কাথলিকদের মধ্যে মাত্র ৩৩৫ জন এখানে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। তাই এই সিনড আমাদের নিকট দাবী রাখছে যে আমরা যেন এই সিনডের বিষয় বস্তু নিয়ে আবার স্থানীয় মণ্ডলীর চিন্তা-ভাবনা, মতামত ও পরামর্শ নিয়ে পুনরায় অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে সব কিছু নিয়ে বিশ্বমণ্ডলীর জন্য একটা শিক্ষা ও দিক-নির্দেশনা দেয়া হবে। এই সিনডের উদ্দেশ্য ছিল না অনেক ডকুমেন্ট তৈরী করা তবুও সিনড সভা শেষে আমাদের আলাপ আলোচনা ও সহভাগিতার একটি ছোট সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে তিনটি মূল বিষয় রয়েছে এবং ২০টি বিষয় বস্তু রয়েছে। নিম্নে তার কয়েকটি বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করলাম:

- *সিনডাল মণ্ডলীর মুখমণ্ডল:* এই অংশে সিনডাল মণ্ডলী সম্পর্কে ধারণা ও চর্চার কথা বলা হয়েছে।
- *সবাই শিষ্য-সবাই মিশনারী:* এই অংশে বলা হয়েছে তাদের সম্পর্কে যারা মিশনে রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে: সিনড হলো ঈশ্বরের পবিত্র জনগণের একত্রে পথ চলা এবং মণ্ডলীতে ক্যারিজম ও বিভিন্ন সেবা কাজের মধ্যে আন্তরিক সংলাপ যা ঐশরাজ্যের সেবায় নিয়োজিত।
- *সম্পর্ক স্থাপন ও খ্রিস্টসমাজ প্রতিষ্ঠা করা:* এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে প্রধানত: পদ্ধতি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্কে সক্ষম করে তোলা যাতে তারা ক্যারিজম ও খ্রিস্টীয় সেবাগুলো মধ্যে সফল সংলাপ করে এই জগতে।

১) সিনড বৈশিষ্ট্য মণ্ডলীর চর্চা: প্রথমত আমরা আদি মণ্ডলীতে দেখতে পাই এবং বিভিন্ন মণ্ডলীতেও বিভিন্ন ভাবে এর চর্চা আমরা দেখতে পাই। দ্বিতীয়ত: দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা এ বিষয়ের উপর আবার আলোকপাত করেছে। পোপ ফ্রান্সিস এই সিনড বৈশিষ্ট্য মণ্ডলীর মধ্যদিয়েই বিশ্বমণ্ডলীতে একটি জাগরণ ও নবায়ন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পবিত্র ত্রিত্বের একাত্মতা ধ্যানেই নিহিত মণ্ডলীর মিলন ও একাত্মতা।

২) খ্রিস্টীয় জীবনে প্রবেশ সাক্রামেন্ত: আমরা সবাই বাপ্তিস্মের দ্বারা এক দেহ হয়ে উঠেছি। আমরা সবাই একই মর্যাদা ও সমতা লাভ করেছি। আমাদের সবার জন্য একই মিশন। মঙ্গলসমাচারের সত্য: sensus fidei. এই গুণ আমরা লাভ করি। তাই বাপ্তিস্ম গ্রহণ আমাদের প্রত্যেকের জন্য অনেক বড় একটা ব্যাপার। দীক্ষা গ্রহণ একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় যা আমরা সমাজ থেকে আলাদা করতে পারি না। এই সিনড চলাকালীন সময়ে আমরা গোল টেবিল বসেছিলাম যা ছিল ভোজের টেবিলের প্রতীক। এই টেবিল (প্রভুর ভোজ) হলো আমাদের মিলন ও একতার সর্বোচ্চ শিখর এবং এর কেন্দ্রে রয়েছে প্রভুর বাণী। একত্রিত হওয়া বিশেষভাবে রোববারের যার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের জনগণ একত্রিত হয়। যেখানে প্রভুর ভোজ করা সম্ভব নয় সেখানে একত্রে প্রভুর বাণী পাঠ, ধ্যান ও সহভাগিতা করা যেতে পারে। এখানে প্রভু তাঁর দেহ ও রক্তে অংশগ্রহণ করার জন্য আমাদের আহ্বান করেন। প্রভু আমাদেরকে এক দেহ হিসাবে গঠন করেন। আমরা মিলিত হই ঈশ্বরের সাথে এবং মানুষের সাথে। communion শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ভোজে পূর্ণ অংশগ্রহণ প্রকাশ করার জন্য। আমাদের সম্পর্ক একে অপরের সাথে এবং অন্য মণ্ডলীর সাথে। এটা আমাদের পবিত্র ত্রিত্বের একাত্মতায় প্রবেশের গভীরতার প্রকাশ। আবার এই সম্পর্ক হলো একটা প্রতিদিনের বিষয়। এই যে একটা মিলন প্রভুর ভোজ থেকে আসে যা আবার আমাদেরকে একত্রিত করে সেবা দায়িত্ব পালনের মধ্যদিয়ে আমাদেরকে রূপান্তরিত করে। এটা আবার সিনডের পথ নির্দেশ করে। এই প্রভুর ভোজে রয়েছে একটা একতা ও ভিন্নতা। একদিকে মণ্ডলীর একতা আবার এর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন খ্রিস্টীয় সমাজ। আবার

রয়েছে সাক্রামেন্তীয় একতা সাথে ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা পদ্ধতি, উদ্‌যাপনে একতা এবং বিভিন্ন ঐশ অনুগ্রহ ও খ্রিস্টীয় সেবা। প্রভুর ভোজ উদ্‌যাপন করা আমাদের জন্য মঙ্গল এবং যিশুর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন। প্রভুর ভোজের সৌন্দর্য এবং সহজ সরলতা আমাদেরকে যে কোন গঠন প্রোগ্রামের চেয়ে বেশি গঠন দান করে। পঞ্চাশত্তমীর প্রসাদ মণ্ডলীতে স্থায়ীভাবে রয়েছে, পবিত্র আত্মার দান লাভ করেছি। হস্তার্পনে বিশ্বাসীদের মধ্যে সমাজ গঠন, মিশন দায়িত্ব ও সাক্ষ্য দানে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

৩) দরিদ্রদের নেতৃত্ব: দরিদ্ররা আমাদের নিকট থেকে খাবার ও টাকা প্রত্যাশা করে না - তারা চায় আমাদের ভালোবাসা। তারা চায় স্বীকৃতি ও মানব মর্যাদা। তারা আমাদের দান-দক্ষিণার বিষয় নয়। তাদের সক্ষম করে তোলা যাতে তারা মর্যাদা সম্পন্ন জীবন যাপন করতে পারে। যিশু নিজে দরিদ্র জীবন যাপন করেছেন, তাদের নিকট মঙ্গলবাণী প্রচার এবং তাদের সুস্থতা দান করেছেন। মঙ্গলসমাচারীয় দরিদ্রতা আমাদের দান করে শান্তি ও আনন্দ। দরিদ্রতার কারণ তিনি প্রত্যাখান করেছেন। দরিদ্রতার বিভিন্ন দিক রয়েছে: মানব মর্যাদা থেকে বঞ্চিত, সহিংসতার শিকার, abuse, drug, exploitation ইত্যাদি। কণ্ঠে নেই তাদের ভাষা। বৃদ্ধদের নিরপত্তাহীনতা, বর্ণ বৈষম্য ও মানব পাচার ইত্যাদি। এই সভা দরিদ্রদের কান্না শুনতে চেষ্টা করেছে। শুধু বস্তুর দৈন্যতা নয় আধ্যাত্মিক দৈন্যতা রয়েছে, যারা জীবনের অর্থ হারিয়েছে। দরিদ্রদের অধিকার রক্ষা করতে হবে। সব ধরণের অন্যায্যতা প্রত্যাখান করতে হবে। গণমঙ্গল প্রতিষ্ঠা ও মানব মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা অনুসরণে তা করতে হবে। সুধী সমাজের সাথে অংশগ্রহণ, ট্রেড ইউনিয়ন, মানবাধিকার সংস্থা, পরিবেশবাদীদের সাথে একত্রে কাজ করে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যিশু দরিদ্র হয়েছেন আমাদের ধনবান করার জন্য (*২ করি ৮:৯*)। আমাদের কাছ থেকে দাবী করা হয় যাতে আমরা দরিদ্রদের পাশে দাঁড়াই। তাদের নিকট থেকে শিখি। যারা কষ্ট ও দরিদ্রতার মধ্যে জীবন-যাপন করে, তারা যিশু খ্রিস্টের যাতনাভোগের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কাছে তাদের অবস্থান (*মঙ্গলসমাচারের আনন্দ ১:৯৮*)। The poor are not object of sympathy and charity. The prophetic denunciation of injustice, lobbing and advocacy, promotion of human dignity are very important. সব ধরণের বৈষম্য দূর করতে হবে। মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার বিস্তার করতে হবে।

৪) মণ্ডলী: বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী, ভাষা, বর্ণ ও দেশের জনগোষ্ঠির মানুষের মধ্যে

বাণী প্রচার ও সাক্রামেন্ত প্রদানের মধ্যদিয়ে মণ্ডলী গড়ে উঠে প্রতিটি গোষ্ঠী, ভাষা, প্রতিটি জাতি ও দেশের মানুষদের নিয়ে (*প্রত্যাদেশ ৫:৯*)। মণ্ডলীর বাস বিভিন্ন কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ধর্মের মানুষের মধ্যে। সেজন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ধর্ম ও কৃষ্টির সাথে সংলাপে অংশগ্রহণ করা। এখানে প্রয়োজন আমাদের এক ধরণের উপস্থিতি, সেবা এবং বাণী প্রচার উদ্দেশ্য হবে সবার সাথে সেতু বন্ধন স্থাপন করা, সুন্দর বুঝাপড়ার সৃষ্টি করা এবং খ্রিস্টাদর্শ প্রচার করা, তাদের সঙ্গী হয়ে, শোনা এবং শেখার মধ্যদিয়ে। পাদুকা খুলে প্রবেশ করার অর্থ হলো আমাদের নম্রতা, অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা একই সাম্যতার মনোভাব নিয়ে। মিশনারীগণ যুগ যুগ ধরে বাণী প্রচার করেছেন এই খ্রিস্টাদর্শ প্রচার করার জন্য। আবার আধিপত্যবাদী দেশ ও জাতির সাথে খ্রিস্টধর্ম এক হয়ে কাজ করার জন্য মানুষের মধ্যে কষ্টের কারণ ও ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে ক্ষমা চাইতে হবে। মণ্ডলীর শিক্ষা দেয় যে, আন্তঃধর্মীয় সংলাপের চর্চা করা হলো সমস্ত জাতি-গোষ্ঠীর মিলন ও একতা সৃষ্টি করা যে জগতে রয়েছে অনেক সহিংসতা ও ভঙ্গুরতা। আমাদের স্মরণ করতে হবে যে, আমাদের সবার একই উৎস ও লক্ষ্য অর্জন করি পারস্পরিক সমর্থন ও সহযোগিতার মধ্যদিয়ে যাতে আমরা ন্যায্যতা, শান্তি, পুনর্মিলন স্থাপন ও আমাদের সবার বসতবাটির যত্ন নিতে পারি। মণ্ডলী সচেতন যে, পবিত্র আত্মা সব ধর্মের ও কৃষ্টির নারী ও পুরুষদের সাথে কথা বলতে পারেন। অভিবাসীরা আমাদের মণ্ডলীকে নতুন রূপ দিচ্ছে। যুদ্ধ, সহিংসতা, নিরাপত্তাহীনতা জন্য অনেকে তাদের দেশ, পরিবার ও কৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবন যাপন করে। তারা মণ্ডলীকে সমৃদ্ধশালী করে। আবার কখনও কখনও তারা ঘৃণা অথবা বিরোধিতার সম্মুখীন হন। আমরা সবাই আহূত তাদের স্বাগতম জনানোর জন্য যাতে তারা নিরপত্তা ও সবার সাথে একতাবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করতে পারে। তাই বিভিন্ন ধরণের উপাসনা ও চর্চার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হলো সত্যিকার গ্রহণের চিহ্ন। আমাদের জীবন সাক্ষ্যের উপর জোর দিতে হবে, মানব উন্নয়ন, অন্য ধর্ম ও কৃষ্টির সাথে সংলাপ এবং মঙ্গলবাণী প্রচারের উপর জোর দান করা।

৫) একই সাথে খ্রিস্টীয় ঐক্য স্থাপনের উপর জোর দেয়া হয়েছে। "তোমাদের আহ্বান করে ঈশ্বর তোমাদের সকলেরই সামনে যে আশা তুলে ধরেছেন, সেই আশা যেমন এক, তেমনি (খ্রিস্টের) সেই দেহটিও এক আর পবিত্র আত্মাও এক। প্রভু এক, খ্রিস্টবিশ্বাসও এক, দীক্ষাস্নানও এক (*এফে ৪:৩-৫*)। আন্তঃমাণ্ডলিক ঐক্য স্থাপনের যেন এখনই একটা মোক্ষম সময় এবং আমরা আরও বলতে পারি: যা আমাদের বিচ্ছিন্ন করে তার চেয়ে যা আমাদের মধ্যে একত্রিত সৃষ্টি করে সেগুলোই বেশি। দীক্ষাই হলো সিনড বিশিষ্ট মণ্ডলীর উৎস এবং খ্রিস্টীয় ঐক্যের ভিত্তি। অন্য মণ্ডলীর কথা আমাদের শুনতে হবে। খ্রিস্টীয় ঐক্য ছাড়া সিনড বিশিষ্ট মণ্ডলী তৈরী করা সম্ভব নয়। এটা মণ্ডলীতে নবায়নের সহায়তা করবে। এই ঐক্য প্রতিদিনের জীবনে চর্চা করতে হবে। বিভিন্ন মণ্ডলীতে সাক্ষ্যমরের মৃত্যুতে আমরা এই একতা আরও বেশি উপলব্ধি করি। এই ঐক্য আসে যিশুর ক্রুশ থেকে।

৬) মণ্ডলী মিশনে: মণ্ডলীর শুধু একটা মিশন আছে তা নয়, মণ্ডলীই মিশন। মণ্ডলী তার মিশন লাভ করেছে যিশু খ্রিস্টের কাছ থেকে, যেভাবে পিতা তাঁকে পাঠিয়েছেন। পবিত্র আত্মার শক্তিতে মণ্ডলী প্রভুর বাণী প্রচার করে। গরীবদের প্রতি প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। ঈশ্বরের রাজ্য আসার জন্য মণ্ডলী সর্বদা কাজ করে। বাপ্তিস্মে ফলে আমরা সবাই একই মর্যাদা লাভ করেছি। সবাই শিষ্য - সবাই মিশনারী। প্রতিটি খ্রিস্টানেরই এই জগতে একটা করে মিশন।

পরিবার হলো মণ্ডলীর স্তম্ভ স্বরূপ। ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমা, নানা, নানী সবাই মিলে বিশেষ করে পিতা মাতা হলেন পরিবারে প্রথম মিশনারী। মণ্ডলীতে পরিবারের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। তারা যুগ যুগ ধরে খ্রিস্টীয় বিশ্বাস ও শিক্ষা সন্তানদের নিকট হস্তান্তর করে যাচ্ছেন। মিশন যদি একটা অনুগ্রহ তা হলে সাধারণ খ্রিস্টভক্তগণই তাদের জীবন-যাপন ও কাজ কর্মের মধ্যদিয়ে প্রতিদিনের জীবনে এই দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। তারাই মণ্ডলীর বিভিন্ন সেবা কাজে অংশগ্রহণ করছে। মণ্ডলীকে সবার

নিকট নিয়ে যাচ্ছে। তাদের এই সেবা কাজের স্বীকৃতি দিতে, প্রশংসা করতে এবং শক্তিশালী করতে হবে। যাজকতন্ত্র তাদের অনেক সময় অনেক আঘাত দেয়, কাজ করিয়ে নেয় কিন্তু তাদের সেবার মূল্য দেয় না আবার অনেক সময় তাদের বিকশিত হতে দেয় না। মণ্ডলীর এই মিশন নবীকৃত হয় খ্রিস্ট প্রসাদের মধ্যদিয়ে বিশেষ করে যখন এটা একত্রে সম্মিলিতভাবে উদ্‌যাপন করা হয়।

৭) নারী: মণ্ডলী ও মিশন: ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট নর ও নারী। এই সৃষ্টি ঘোষণা করে দু'য়ের মধ্যে একতা ও ভিন্নতা এবং তাদের দু'জনেরই একই মানব স্বভাব। আবার দুই ভিন্ন অভিজ্ঞতা করে মানুষ হিসাবে। যিশু তাদের সাথে আলাপ আলোচনা, চলাফেরা, ঐশরাজ্যের বাণী ঘোষণা করেছেন এবং তারা তাঁকে অনুসরণ করেছেন। তারা যিশুকে আতিথেয়তা দান করেছে এবং তারাও যিশুর বাণী শুনেছে, সান্ত্বনা ও সুস্থতা লাভ করেছেন। তারাও শিষ্যদের সাথে গালিলি থেকে জেরুশালেমে যাত্রা করেছে (*লুক ৮:১-৩*)। তিনি মারীয়া মাগ্দালীনাকে পুনরুত্থানের কথা ঘোষণা করতে দায়িত্ব দিয়েছেন। খ্রিস্টেতে বাপ্তিস্মের মধ্যদিয়ে তারা একই মর্যাদা লাভ করেছেন এবং পবিত্র আত্মার একই দান তারা লাভ করেছেন (*গালে ৩:২৮*)। নারী পুরুষের দায়িত্ব হলো non-competitive co-responsibility.

মহিলারা এই সিনডে ইচ্ছা প্রকাশ করে যে, তাদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করে পবিত্রতা লাভের পথে এক সাথে পথ চলতে চায়। অনেক মহিলারা মর্মাহত ও ক্ষত বিক্ষত যৌন সহিংসতা, অর্থনৈতিক অসাম্যতা ও তাদেরকে বস্তু হিসাবে ব্যবহারের জন্য। মানব পাচারের, জোরপূর্বক অভিবাসীকরণ, যুদ্ধে নিয়োগের কারণে তারা অন্তরে একটা ক্ষত বহন করে চলছে। অথচ তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ মণ্ডলীর কার্যক্রমে অংশগ্রহণে এবং তারাই প্রথম মিশনারী যারা পরিবারে বিশ্বাস হস্তান্তর করে। ব্রতধারিণীগণ ধ্যান-প্রার্থনা ও কাজের মধ্যদিয়ে চিহ্ন ও সাক্ষ্য বহন করে যাচ্ছে। মারীয়া, বিশ্বাসী নারী যিনি হয়ে উঠেছেন ঈশ্বরের মাতা এবং আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন আধ্যাত্মিক ও ঐশতাত্ত্বিক পূর্ণতা। কুমারী মারীয়া আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, কি করে মনোযোগ সহকারে একনিষ্ঠভাবে ঈশ্বরের কথা শুনতে হয় এবং পবিত্র আত্মার প্রতি উন্মুক্ত থাকতে হয়। তিনি যিশুকে জন্মদানের আনন্দ, তাঁর যত্ন নেয়া ও বৃদ্ধিতে তৃপ্তি এবং যিশুর সাথে কষ্ট ও যাতনাভোগ করেছেন। তাদের অনেকে বিশপ ও ফাদারদের জীবন ও ভাল কাজের প্রশংসা করেছে। আবার একই সাথে তারা বলেছে মণ্ডলী তাদের অন্তরে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে - যাজকতন্ত্র ও ক্ষমতার অপব্যবহার মণ্ডলীতে ক্ষতের সৃষ্টি করে চলছে এবং মিলন সমাজের ক্ষতি করছে। একটা গভীর আধ্যাত্মিক মন পরিবর্তন প্রয়োজন যা structural change করার ভিত্তি হয়ে উঠবে। যৌন সহিংসতা, ক্ষমতা প্রয়োগ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা অপব্যবহার দাবী করে ন্যায্যতা, নিরাময় ও পুনর্মিলন। মণ্ডলীর তাবুটা আরও প্রসারিত হোক যাতে সবাই এখানে নিরাপদে থাকতে পারে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মণ্ডলীর বাণী ঘোষণা বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা কমে আসে। এই সিনড আমাদের সম্পর্ক নবায়ন এবং structural change দাবী করে। এই সিনড আহ্বান করে যাতে মহিলাদের কাজের ও অবদানের স্বীকৃতি এবং মণ্ডলীর জীবন ও মিশনে অংশ গ্রহণে তাদের আরও সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। আবার কারও কারও মতে মহিলা ডিকন অভিষেকের মধ্যদিয়ে আদি মণ্ডলীর রীতি ফিরিয়ে আনা যেতে পারে।

৮) বিভিন্ন ধর্মসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাত্রীগণ পবিত্র আত্মার বিশেষ অনুগ্রহ ও দান লাভ করে মণ্ডলীকে যুগে যুগে অনেক সমৃদ্ধশালী করেছেন। একই সাথে খ্রিস্টভক্তদের সঙ্ঘ, সমিতি, আন্দোলন ও সেবা গুলো এবং তাদের ক্যারিজমের মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটিয়ে এক সাথে পথ চলার আহ্বান করা হয়।

৯। বিশ্ব ডিজিটাল কালচারে প্রবেশ করেছে তাই মণ্ডলীকে আরও সক্রিয়ভাবে এখানে উপস্থিত থেকে প্রভুর বাণী প্রচার ও মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। আবার এর মন্দতার হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে হবে।

১০) মণ্ডলীতে বিবাহিত ডিকনদের শুধু ধর্মীয় কাজে নিযুক্ত না রেখে তাদের দীন-দরিদ্রদের সেবা কাজে নিয়োগ করতে হবে।

১১) যুবক-যুবতীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ও খ্রিস্টীয় গঠন দান নিশ্চিত করতে হবে।

১২) পুরোহিত, ডিকন, ব্রতধারী ও ব্রতধারিণীদের ও বিশপদের সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে যাতে সিনড বিশিষ্ট মণ্ডলী কার্যকারী হতে পারে। মণ্ডলীকে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও দায়িত্বের সংস্কৃতিতে প্রবেশ করতে হবে। কোন কোন জায়গাতে মণ্ডলীতে অনেক বুরোক্রেসি কাজ করছে তাতে মণ্ডলীর সুনাম ক্ষুন্ন হচ্ছে।

১৩) সম্পর্ক তৈরী, সমাজ গঠন: যিশু তাঁর শিষ্যদের গঠন দান করেছেন, শুধু তাদের শিক্ষা দান করেন নি, তাদের সাথে তাঁর জীবন সহভাগিতা করেছেন। তিনি ক্ষুধার্তকে খাওয়াতে বলেছেন। প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন। মঙ্গলসামাচার থেকে দেখতে পাই গঠন একটা ক্ষমতা বা দক্ষতা বৃদ্ধি নয় এটা হলো স্বর্গরাজ্যের যুক্তিতে মন পরিবর্তন। যার মধ্যদিয়ে পরাজয় এবং ব্যর্থতা হয়ে উঠে ফলপ্রসূ। সিনডাল মণ্ডলীর জন্য গঠন অত্যন্ত প্রয়োজন। এই গঠন আসে যিশুর সাথে সাক্ষাতের মধ্যদিয়ে। প্রশিক্ষণ হতে হবে: সহ-দায়িত্ব পালন, শোনা, অবধারণ, খ্রিস্টীয় ঐক্য, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, দরিদ্রদের সেবা, সবার আবাস, এই ধরিণীর যত্ন নেয়া। গঠন প্রশিক্ষণের মধ্যদিয়েই ঈশ্বরের জনগণ তাদের বাপ্তিস্মের দায়িত্ব পালন করবে, পরিবারে, কর্ম ক্ষেত্রে, মণ্ডলীতে, সমাজে, বুদ্ধির জগতে, যা তাকে মণ্ডলীতে পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে সহায়তা করবে এবং তার মিশন দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম করে তুলবে। শোনা ও সহযাত্রী মণ্ডলী হয়ে উঠ। যিশুর মত অন্যের কথা শুনা।

১৪) অংশ গ্রহণের জন্য structural change is needed এবং মাণ্ডলিক আইনে পরিবর্তন আনয়ন এবং মণ্ডলীর অন্যান্য নিয়ম-নীতিও পরিবর্তন আনয়ন করতে হবে। উপরোক্ত বিষয়গুলো আমাদের দেশের ও মণ্ডলীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক ধ্যান-প্রার্থনা, আলোপ-আলোচনা ও সহভাগিতা করতে হবে, আমাদের মণ্ডলীর জন্য প্রধান বিষয়গুলোও নির্ধারণ করতে হবে এবং পরিশেষে সেগুলো অবধারণ (discernment) করতে হবে। আবার এই বিষয়গুলো আগামী সিনডে, অক্টোবর মাসে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে তুলে ধরা হবে যাতে পুণ্যপিতার মধ্যদিয়ে আমরা আমাদের দেশে মণ্ডলীর নবায়নের জন্য যথাযখ শিক্ষা ও পথ খুঁজে পেতে পারি॥

বড়দিন ও আশার আলো

ড. লিপি গ্লোরিয়া রোজারিও (সিস্টার গ্লোরিয়া এমপিডিএ), জেমস্ শিমন দাস

অশান্ত ধরণীর বুকে শান্তির বারতা নিয়ে শান্তিরাজ যিশুখ্রিস্টের জন্মতিথি বড়দিন আমাদের মাঝে এসেছে। বড়দিন আমাদের মনে আশার আলো জাগায় এবং নতুন আশায় নতুন করে জীবন শুরু করার আহ্বান জানায়। চারিদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা, কোভিড-১৯ মহামারি পরবর্তী ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থা, দেশে-দেশে যুদ্ধ, নতুন রোগের অজানা আশঙ্কা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আবিষ্কার ও তথ্য-প্রযুক্তির উন্নতির ফলে চাকরি হারানোর ভয় এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নানা কারণে আমাদের মধ্যে ভয়, উদ্বিগ্নতা ও আশঙ্কার সৃষ্টি হচ্ছে। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে তাহলে কীভাবে শান্তিতে থাকা যায়? একটু ধীর-স্থির হয়ে চিন্তা করুন, আমাদের মধ্যে যেসব নেতিবাচক অনুভূতির তৈরি হচ্ছে সেগুলো ভবিষ্যৎ আশঙ্কা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের উদ্বিগ্নতা ও আশঙ্কার যে ঘটনা সেটি বর্তমানে আমাদের সাথে ঘটছে না কিন্তু আমরা নেতিবাচকভাবে অনুমান করি ভবিষ্যতে আমাদের সাথে কত ভয়ানকভাবে ঘটনাটি ঘটবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কীভাবে তাহলে বর্তমানে আমাদের মধ্যে এসব নেতিবাচক অনুভূতির তৈরি হচ্ছে? আমেরিকান সাইকোলজিস্ট অ্যারণ টি ব্যাক এর মতে, আমরা যেভাবে চিন্তা, অনুমান, কল্পনা ও প্রত্যক্ষণ করি, আমাদের শরীরের মধ্যে ঠিক সেভাবে আবেগ-অনুভূতির তৈরি হয় এবং আবেগ-অনুভূতি অনুসারে আমাদের আচরণ তৈরি হয়। যদি আমাদের চিন্তা, কল্পনা ও প্রত্যক্ষণ করা ইতিবাচক হয় তাহলে আমাদের অনুভূতি ইতিবাচক হয় এবং আমাদের আচরণগুলো প্রত্যাশিত হয়। আর যদি চিন্তা নেতিবাচক হয় তখন আপনার অনুভূতিও নেতিবাচক হবে এবং আচরণ হবে অপ্রত্যাশিত। ফলে যদি আপনি চিন্তা করেন যে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে আপনার অফিস বন্ধ হয়ে যাবে, তখন অনুভূতি কেমন হবে? আপনার মধ্যে অস্থিরতা, উদ্বিগ্নতা, ভয়, আশাহীনতা অনুভূত হবে। আচরণ হিসেবে দেখা যাবে, আপনি কাজে মনোযোগ দিতে পারবেন না, অল্পতেই অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়া দেখাবেন ও শারীরিক অসুস্থতাজনিত ছুটির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এখন এই একই ঘটনাকে যদি আপনি ইতিবাচকভাবে অনুমান করেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে যদি আপনার অফিস বন্ধ হয়ে যায় তখন আপনি আপনার পূর্ব পরিচিত শিমশোন সাহেবের প্রতিষ্ঠানে যোগ দিবেন কারণ তিনি অনেক দিন থেকেই আপনাকে ভালো বেতনসহ অন্যান্য সুবিধাদি দিয়ে চাকরির প্রস্তাব দিয়ে রেখেছেন কিংবা বাড়িতে বসে ফ্রিল্যান্সিং করা শুরু করবেন। বাড়িতে ফ্রিল্যান্সিং করলে আপনার ক্লায়েন্টের অভাব হবে না কারণ তারা আপনার কাজ সম্বন্ধে জানেন। এখন আপনার অনুভূতি কেমন হবে? নিশ্চয় আপনার হতাশা, ভয়, উদ্বিগ্নতা, আশঙ্কার মাত্রা নেতিবাচকভাবে চিন্তার মত একই হবে না। সুতরাং এ কঠিন মুহূর্তের সময়ও আপনি চাইলেই কল্পনা শক্তির ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করে শান্ত, ধীর-স্থির ও শিথিল থাকতে পারেন। আর একটি বিষয় স্মরণে রাখুন আপনি যতবেশি ইতিবাচকভাবে আপনার কল্পনা শক্তিকে ব্যবহার করবেন ততবেশি আপনার নিজের মধ্যে ইতিবাচক বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। আপনি এই ইতিবাচক বিশ্বাস দ্বারা অনেক অসম্ভব কাজকে সম্ভব করতে পারবেন। ঈশ্বর আমাদের বুদ্ধি দান করেছেন যেন আমরা এর যথাযথ ব্যবহার করে সুখী ও সাফল্যমণ্ডিত জীবন যাপন করতে পারি। জীবনের এই কঠিন মুহূর্তগুলো কোন সুনির্দিষ্ট ভালো উদ্দেশে ঈশ্বর আমাদের জীবনে দেন (*রোমীয় ৮: ২৮*) এই বিশ্বাসে আমাদের জীবন যাপন করতে হয়। স্মরণে রাখুন, ঈশ্বর আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করে রেখেছেন, ''না, আমি তোমাকে কখনো ছেড়ে যাব না, ফেলে যাব না কোন দিন (*হিব্রু ১৩:৫*)।'' এখন আপনার কাজ হচ্ছে, ঈশ্বরের উপর ভরসা করে তাঁর উপর আপনার সকল উদ্বিগ্নতা ও হতাশার ভার অর্পণ করা কারণ তিনি আপনার জন্য চিন্তা করেন (*১ পিতর ৫:৭*)। আপনার এই বিশ্বাস আর ভরসার সাথে সাথে আপনার নিজের কিছু কাজও করতে হবে। কারণ পবিত্র বাইবেল আমাদের শেখায় ''বিশ্বাসও ঠিক তেমনি সৎকর্ম ছাড়া তা সম্পূর্ণ মৃত'' (*যাকোব ২:১৭*)। সুতরাং ভীষণ অস্থির এ মুহূর্তে নিজেদের ভালো রাখা ও নিজেদের মধ্যে আশার সঞ্চার করার জন্য আপনি নিচের কাজগুলো করে দেখতে পারেন।

- আপনি যাকে ভালোবাসেন এমন প্রিয়জনের গুণের কয়েকটি কথা লিখে তার হাতব্যাগ/মানিব্যাগ/বাইবেল/বই/ বালিশের উপরে রেখে দিন
- আপনার পরিচিত কিন্তু আত্মীয় নয় এমন বৃদ্ধ দম্পতি/এতিম শিশুর জন্য রান্না করে তাঁর বাড়িতে বেড়াতে যান
- আপনার মিশনের কোন ব্যক্তির অসুস্থতার কথা জানা মাত্রই তাকে দেখতে যান এবং তার খোঁজ-খবর রাখুন
- প্রতিদিন সকালবেলা উঠে খুঁজে বের করুন গতকালের কোন তিনটি ঘটনার জন্য আপনি কোন ব্যক্তি, প্রকৃতি ও ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ; আপনি সেগুলো আপনার ডায়েরিতে/মোবাইলের নোট-প্যাডে লিখে রাখুন
- প্রতিদিন আপনি কতজনকে ধন্যবাদ বলেন সেটির হিসাব রাখুন এবং পরের সপ্তাহে তার সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করুন
- দিনে অন্তত একবার সততার সাথে নিজের দোষ স্বীকার করুন এবং সেটি শুধরানোর দায়িত্ব নিন
- যখন আপনার কারো প্রতি বিরক্ত হওয়া বা রাগ করা যুক্তি সংগত তারপরেও আপনি সেটি তার সামনে প্রকাশ না করে প্রকৃতির মাঝে/গির্জায় যান/পছন্দের কাজ করুন এবং তাকে ক্ষমা করুন
- কাউকে ক্ষমা করে একটি চিঠি/এসএমএস লিখুন এবং সেটি তাকে না পাঠিয়ে প্রতিদিন দিনে একবার চিঠিটি পড়ুন
- স্মরণ করুন, অতীতে কোন কঠিন পরিস্থিতিতে আপনি কীভাবে সফল হয়েছিলেন কিংবা অসম্ভব চ্যালেঞ্জকে সুযোগ হিসেবে দেখে বার বার চেষ্টা করে সফল হয়েছিলেন

সবশেষে অস্ট্রিয়ান সাইকিয়াট্রিস্ট ও লেখক ভিক্টর এমিল ফ্র্যাঙ্কলের বিখ্যাত *'Man's Search for Meaning'* বইয়ের বিখ্যাত কয়েকটি লাইন দিয়ে আপনাকে উৎসাহিত করতে চাই–"আমরা যারা নাৎসি বাহিনীর যুদ্ধবন্দি শিবিরে ছিলাম, আমরা স্মরণ করতে পারি সেইসব দিনে যারাই সেলের পাশ দিয়ে হেঁটে যেত অন্যদের সান্ত্বনা দিত, শেষ রুটির টুকরোও বিলিয়ে দিত...সংখ্যায় সেটা অনেক কম; কিন্তু তারা এটা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে সব কিছু কেড়ে নেওয়া হতে পারে কিন্তু সর্বশেষ যা অবশিষ্ট থাকে তা মানব হৃদয়ের স্বাধীনতা। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন আমাদের আত্মার স্বাধীনতা আছে যে কোনো কিছুকে বেছে নেওয়ার।" শ্রদ্ধাভাজন পাঠক, পবিত্র বড়দিনের মাস থেকে আসুন, আমরা নতুন করে চিন্তায়, কথায় ও আচরণে নিজের মধ্যে আশার সঞ্চার করি এবং অন্যের মধ্যে আশার আলো জ্বালাতে ছোট **ছোট কাজ করি! সকলকে বড়দিনের শুভেচ্ছা!!**

বড়দিনের গোশালায় শিশু যিশু : এ যুগের অভিবাসী, শরণার্থী ও বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর প্রতিচ্ছবি

ড. ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি

ক) বড়দিনের গোশালায় উদ্বাস্তু শিশু যিশু এ যুগের অভিবাসী, শরণার্থী ও বাস্তুচ্যুত জনগণের চরম দুঃখ-দুর্দশার প্রতিচ্ছবি

গত ৯ ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টবর্ষে ভাতিকানে সাধু পিতরের চত্বরে বড়দিনের গোশালা প্রতিষ্ঠার সময় ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস উপরোক্ত বিষয়ে অনুধ্যান ব্যক্ত করেছেন। পবিত্র বাইবেল অনুসারে- "প্রভুর এক দূত যোসেফকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, ওঠ শিশুটি ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে মিশর-দেশে পালিয়ে যাও তুমি... আর সেই রাতেই শিশুটি ও তাঁর মাকে নিয়ে মিশর-দেশে রওনা হলেন" (*মথি ২:১৩ -২৩*)। মিশর দেশে শিশু যিশুর যাত্রাটি অনুধ্যান করছি আর ভাবছি পান্থশালার পশুদের মাঝে শীতল বিছানা ছেড়ে শিশু যিশুকে নিয়ে যোসেফ ও মা-মারীয়া হয়তো কোন এক ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এতে যোসেফ ও মা-মারীয়া নাজারেথ থেকে প্রায় ১৩০ কি.মি. পথ বেথলেহেম যাত্রার ধকল সামলে নিচ্ছেন। ইতোমধ্যে প্রাচ্যদেশের অনিহুদী তিনজন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতের চমকে দেয়া প্রণাম ও প্রণামী, অন্যদিকে স্বর্গ দূতের দর্শন ও পশু পালকদের ঝটিকা সফর, এসবের মধ্যে স্বর্গদূতের নির্দেশে আবারো জোরপূর্বক মিশর দেশে যাত্রার আহ্বান। সম্বল বলতে পণ্ডিতদের দেয়া উপহার যার বিনিময়ে কিছুদিন চলা যাবে, নেই শিশুর শীতবস্ত্র, যোসেফের জীবননির্বাহের যন্ত্রপাতিটুকুও নেয়ার সুযোগ জোটেনি। একটি পশুর পিঠে চড়ে কখনোসখনো পায়ে হেঁটে আবারো ১৩০ কি.মি. আঁকা-বাঁকা দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করতে হবে। ভাবছি মিশর দেশে শিশু যিশুর উদ্বাস্তু জীবনযাত্রা আর এযুগের অভিবাসী, শরণার্থী ও বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর উদ্বাস্তু জীবনযাপনে প্রতিনিয়ত বাড়ছে অমানবিক দুর্দশা ও প্রতিকূলতা। একজন সমাজচ্যুত ইহুদী নবসন্ধির মঙ্গলসমাচার রচয়িতা মথি মানবজাতীর মুক্তির যাত্রা (*মথি ২:১৩-২৩*) বর্ণনায় পুরাতন সন্ধির সাথে যে সংযোগ সেতু রচনা করেছেন তা যেন আজও ঘটে চলছে।

১) মোশীর যাত্রা ছিল জগতে অত্যাচার থেকে মানুষের মুক্তির যাত্রা (যাত্রাপুস্তক ১-২), অন্যদিকে শিশু যিশুর মিশর দেশে প্রবাস জীবন মানবজাতির আধ্যাত্মিক মুক্তির যাত্রা।

২) রাজা হেরোদের নিষ্ঠুরতা থেকে সুরক্ষার শিশু যিশুর উদ্বাস্তু জীবন, তেমনি ফারাও রাজার নির্মম নরবলি থেকে সুরক্ষার জন্য মোশী নলখাগড়া ঝোপে লুকায়িত ছিলেন, মিদিয়ানে ভয়ে পলাতক ছিলেন (যাত্রাপুস্তক ১-২)। মোশী এবং যিশু উভয়ে নিজের শোষক-শাসকদের হত্যা ষড়যন্ত্রের কঠিন বাস্তবতা থেকে নিজেদের মুক্ত করেছেন।

৩) হেরোদ কর্তৃক ছেলে শিশুদের হত্যা (*মথি ২:১৬-১৮*) এবং ফারাও কর্তৃক ছেলে শিশুদের হত্যার ঘটনা সমান্তরাল মিল খুঁজে পাওয়া যায় (*যাত্রাপুস্তক ১:১৫-২২*)। রাজা সমস্ত নবজাত শিশুদের হত্যা করেছেন সমাজকে শক্তিহীন ও নিজে বিপদমুক্ত হতে।

৪) যিশুর ইস্রায়লে প্রত্যাবর্তন (*মথি ২:১৯-২৩*) এবং নবজাতক মোশীর ফারাও রাজ প্রাসাদে সমুন্নত হওয়া (*যাত্রাপুস্তক ২:১-১০*) ও নির্বাসন শেষে মিশর রাজার মৃত্যুর পর ফিরে আসা (*যাত্রাপুস্তক ৩-৪*) একই নিগূঢ় রহস্যাবৃত্ত মানবজাতির মুক্তির তীর্থযাত্রা।

৫) "এবার তুমি ইস্রায়েল দেশে ফিরে যাও, কারণ শিশুটিকে যারা প্রাণে মারতে চাইছিল, তাদের এখন মৃত্যু হয়েছে" (*মথি ২:২০*) অন্যদিকে "এবার মিশরে ফিরে যাও, কেননা যারা তোমার প্রাণনাশের চেষ্টায় ছিল, সেই লোকেরা সকলে মারা গেছে" (*যাত্রাপুস্তক ৪:১৯*)। পুরাতন সন্ধিতে ঈশ্বর তাঁর মহাপরাক্রমশালী শক্তি দ্বারা প্রতিপক্ষকে নিঃশেষ করেছেন অন্যদিকে নবসন্ধিতে পিতা ঈশ্বরের বিপরীত স্বভাব, ঘাত-প্রতিঘাত অত্যাচার নির্যাতন ও মৃত্যু-আলিঙ্গণের মাধ্যমে তাঁর সন্তানদের মুক্তির পথ প্রসারিত করেছেন।

৬) যিশুরও জন্ম স্থান বেথলেহেম রেখে নাজারেথে বেড়ে উঠা, অনিহুদী আচার-কৃষ্টি-সংস্কৃতি গ্রহণ করা, অনিহুদী পণ্ডিতগণের তাঁর শ্রীচরণে প্রণত হওয়া, মিশরে উদ্বাস্তু জীবন এবং পিতার কাছে ফিরে যাবার আগে নির্দেশ "যাও, তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর" (*মথি ২৮:১৯*)। এসব মুক্তিকর্মের নিগূঢ় রহস্য হল সমস্ত কিছুই পিতা ঈশ্বরের অধিকারে (*সাম ২৪:১*), তাঁর মালিকানায় (*দ্বিতীয় বিবরণ ১০:১৪*), গোটা বিশ্বটা যে তাঁরই (*লেবিয় ২৫:২৩*)। তিনিই সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্ট বিশ্বজগৎ পরমপিতার প্রসারিত হস্তের দান আমাদের কাছে প্রেমের দ্বারা উদ্ভাসিত। এটা তাঁর সন্তানদের বসতবাটি, মানুষের সকল মৌলিক অধিকারের অন্যতম হল বেঁচে থাকার অধিকার, অভিবাসন অথবা বসতি স্থাপন একটি স্বাধীন ইচ্ছা।

খ) অভিবাসন বিষয়ক পোপ ফ্রান্সিসের কতিপয় পদক্ষেপ ও শিক্ষা

১) অভিবাসী ও শরণার্থী অধিদপ্তর: ভাতিকান শহরে অবস্থিত পোপ মহোদয়ের 'সমন্বিত মানব উন্নয়ন বিষয়ক পুণ্য সেবাবিভাগ' এর একটি স্বতন্ত্র 'অভিবাসী ও শরণার্থী অধিদপ্তর' রয়েছে যার সেবাকাজ পোপ ফ্রান্সিস সরাসরি তদারকি করেন এবং ঝুঁকিতে থাকা অভিবাসী, শরণার্থী ও বাস্তুচ্যুত ভাইবোনদের খোঁজখবর রাখেন।

২) বিশেষ প্রার্থনা ও সচেতনতা দিবস উদ্‌যাপন: 'সমন্বিত মানব উন্নয়ন বিষয়ক পুণ্য সেবা বিভাগ' এর উদ্যোগে ১৯১৪ খ্রিস্টবর্ষ থেকে প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাসের শেষ রবিবার দিন 'বিশ্ব অভিবাসী ও শরণার্থী দিবস' এবং ২০০৯ খ্রিস্টবর্ষে প্রতিষ্ঠিত মানবপাচার প্রতিরোধ বিষয়ক 'তালিথা কুম মুভমেন্ট' এর উদ্যোগে ফেব্রুয়ারি মাসের ৮ তারিখে 'মানব পাচার প্রতিরোধে প্রার্থনা ও সচেতনতা দিবস' উদ্‌যাপন করতে বিশ্ববাসীকে আহ্বান করে থাকে। পোপ মহোদয় এসব দিবসে তাৎপর্যপূর্ণ বাণী প্রকাশ করে বিশ্ববাসীকে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন। গত ২৪ সেপ্টেম্বর (রবিবার দিন), ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস এর আহ্বানে উদ্‌যাপিত হয়েছে '১০৯তম বিশ্ব অভিবাসী ও শরণার্থী দিবস' এবং মূলসুর গ্রহণ করা হয়েছে- 'অভিবাসন অথবা বসতি স্থাপন একটি স্বাধীন ইচ্ছা।'

৩) বিশ্বজনীনপত্র ও প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্র প্রকাশ: পোপ ফ্রান্সিস বিগত বছরগুলোতে বিশ্বজনীনপত্র 'লাউদাতো সি' (হোক তোমার প্রশংসা), 'ফ্রাতেল্লি তুত্তি' (ভ্রাতৃ-সকল), 'খ্রিস্টোস ভিভিত' (খ্রিস্ট জীবন্ত) এবং 'আমোরে লাতেসিয়া' (ভালোবাসার আনন্দ) সহ 'লাউদাতে দেউম' (ঈশ্বরের প্রশংসা) নামক প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্র প্রকাশ করেছেন। এসব দলিলসমূহে তিনি অভিবাসী, শরণার্থী, বাস্তুচ্যুত ও পাচারে শিকার জনগণের প্রতি তাঁর পালকীয় নির্দেশনা ব্যক্ত করেছেন।

৪) পালকীয় সেবাকাজে দিকনির্দেশনামূলক দলিল: 'অভিবাসী ও শরণার্থী অধিদপ্তর' ২০১৭ খ্রিস্টবর্ষে 'অভিবাসী সেবাবিষয়ক কর্মপরিকল্পনার ২০টি দিকনির্দেশনা (রাষ্ট্র পর্যায়)' ও 'অভিবাসী সেবাবিষয়ক পালকীয় কর্মপরিকল্পনার ২০টি দিকনির্দেশনা (মণ্ডলী পর্যায়)'; ২০১৮ খ্রিস্টবর্ষে 'মানব পাচার

প্রতিরোধবিষয়ক পালকীয় দিকনির্দেশনা' এবং ২০২০ খ্রিস্টবর্ষে 'অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর সেবাবিষয়ক পালকীয় দিকনির্দেশনা' ঘোষণা করেছে। এসব দলিল সকল বিশপ সম্মিলনী ও সেবাপ্রতিষ্ঠানসমূহকে কর্মসূচি গ্রহণ, জনমত সৃষ্টি ও আন্তর্জাতিক দলিল তৈরিতে অবদান রাখতে অনুপ্রাণিত করে থাকে। অভিবাসীদের পালকীয় সেবার ২০টি দিকনির্দেশনা- **স্বাগত জানানো, সুরক্ষা প্রদান, সংবর্ধিত করা ও সংযুক্ত করা** এই চারটি পর্যায়ে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। অভিবাসী ও শরণার্থীদের বিষয়ে পোপ মহোদয়ের অনুধ্যানসমূহ সর্বজনীন অনুপ্রেরণা প্রদান, অবস্থা উপলব্ধি, পদক্ষেপ গ্রহণ, মৌলিক শিক্ষা প্রকাশ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

৫) অভিবাসীদের জীবন উপলব্ধিঃ একটি আহ্বানঃ পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, ভয় এবং বিতরণ সংস্কৃতির কারণে যারা প্রত্যাখ্যান ও বাদ পরা জনগোষ্ঠী তারা আরো উন্নত জীবনের আশায় আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়। তিনি বলেছেন, আরো ভাল জীবন খুঁজে বেড়াচ্ছে যারা আমরা কীভাবে তাদের স্বাগত জানিয়ে, সুরক্ষা দিয়ে, সংবর্ধিত করে ও সংযুক্ত করে এ ধরিত্রীকে 'ঈশ্বরের নগরী' গড়ে তুলতে পারি তা অনুধাবন করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেছেন, অভিবাসী ও শরণার্থীরা আমাদের ভাই-বোন এবং এটি একটি সুযোগ যেখানে দূরদর্শিতার মাধ্যমে আমাদের আরো বেশি ন্যায়সঙ্গত সমাজ, বিশুদ্ধ গণতন্ত্র, আরও ঐক্যবদ্ধ দেশ, আরও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ বিশ্ব, এবং আরও সমদায়িত্ববোধ ও মঙ্গলসমাচার ভিত্তিক খ্রিস্টসমাজ গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

৬) বিতারন সংস্কৃতি বিস্তারঃ যুদ্ধ-সংঘাত, উন্নয়নের মেগা প্রকল্প, সামাজিক ও ধর্মীয় বিভেদ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং অলীক জীবনমান স্বপ্ন ইত্যাদির প্রভাবে অনেকে বিতারণ সংস্কৃতির কারণে উন্নত জীবনের আশায় আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়। পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, ভাবনার বিষয় কেউই প্রান্তিক নয়, কিন্তু বর্তমান বিশ্বে অভিজাত শ্রেণি ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে এবং বিতারিত জনগোষ্ঠী প্রতিনিয়তই নিষ্ঠুরতার স্বীকার হচ্ছে।

৭) আমাদের ভয় প্রভুর সাক্ষাৎ পেতে বাধা দেয় : আমাদের আচরণের কিছু কিছু লক্ষণ প্রতীয়মান করে চারিপাশের অন্যদের প্রতি, অচেনাদের প্রতি, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি, বিদেশীদের প্রতি আমাদের ভয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৮) ক্রমবর্ধমান এককবাদ ও বিশ্বব্যাপক ঔদাসীন্য মনোভাবঃ পোপ মহোদয় বলেছেন, অর্থনৈতিকভাবে উন্নত সমাজগুলি ক্রমবর্ধমান চরম এককবাদের (individualism) দিকে চালিত হওয়ার সাক্ষ্য বহন করছে যা 'সর্বাধিক সুখবাদ' (utilitarian) মানসিকতার সাথে মিলে মিডিয়ার বদৌলতে জোরদার হয়ে একটি 'বিশ্বব্যাপক ঔদাসীন্য' (globalization of indifference) মনোভাব লালিত হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে অভিবাসী, শরণার্থী, বাস্তুচ্যুত এবং পাচারের শিকার জনগোষ্ঠী বাদ পড়ার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

৯) খ্রিস্টীয় সাক্ষ্যদান চলমান রাখাঃ তিনি বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে যদি এমন অবস্থা অব্যাহত থাকে তবে যারা শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিকভাবে সুস্থ হিসেবে গ্রহণীয় মানদণ্ডের মধ্যে না পড়ে তারা প্রান্তিক এবং বিতারণ ঝুঁকিতে রয়েছে। এই কারণে অভিবাসী, শরণার্থী এবং অতি দুর্বল মানুষদের উপস্থিতি আমাদের খ্রিস্টীয় সাক্ষ্যদান এবং মানবতার মৌলিক দিক জাগ্রত করার আহ্বান জানাচ্ছে; যা উন্নত সমাজ দ্বারা উপেক্ষিত হতে পারে।

১০) কাউকে পেছনে রাখা যাবে নাঃ 'ব্যক্তিই' প্রধান তাই কাউকে বাদ দেয়া যাবে না। পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, পিছে পরাদের প্রথমে রাখাই একজন খ্রিস্টভক্তের প্রকৃত মূলমন্ত্র। তিনি বলেছেন,"মঙ্গলসমাচারের যুক্তি অনুযায়ী, সর্বশেষ ব্যক্তিরা প্রথমে আসবে এবং আমাদের অবশ্যই তাদের সেবায় মনোনিবেশ করা দরকার।"

গ) বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর জাতীয় পালকীয় কর্মশালার কিছু উপলব্ধি

বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর জাতীয় পালকীয় কর্মশালা-২০১৮ এর অনুপ্রেরণায় ৮ -১০ আগস্ট ২০১৯ খ্রিস্টবর্ষে 'অভিবাসী বিষয়ক জাতীয় পালকীয় কর্মশালা - ২০১৯' শিরোনামে অভিবাসী, শরণার্থী, অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ও পাচারে শিকার জনগোষ্ঠী বিষয়ক একটি কর্মশালা 'ন্যায় ও শান্তি বিষয়ক বিশপীয় কমিশন-সিবিসিবি' এর উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছে। কর্মশালায় মহামান্য কার্ডিনাল মহোদয়সহ শ্রদ্ধাভাজন আর্চবিশপ মহোদয়, বিশপগণ, পুরোহিত, ধর্মসংঘের প্রতিনিধি, যুবক-যুবতী, সেমিনারীয়ান, পেশাজীবী, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব এবং সমাজকর্মীগণ নিমন্ত্রিত ছিলেন। ভাটিকানের 'অভিবাসী ও শরণার্থী অধিদপ্তর' থেকে আগত প্রতিনিধির সহযোগিতায় কর্মশালাটি পরিচালিত হয়। সর্বমোট ৯৩জন অংশগ্রহণকারীর অনুধাবন ও মতামতের ভিত্তিতে অভিবাসী বিষয়ক কিছু উপলব্ধি ও করণীয় সম্পর্কিত সুপারিশ মাণ্ডলিক পালকীয় সেবাকাজকে গতিশীল করতে সহায়তা করছে।

১) আন্তর্জাতিক অভিবাসী ও শরণার্থীঃ জীবন-জীবিকার তাগিদে আশি-নব্বই এর দশকে অনেক খ্রিস্টভক্ত দিল্লী-বোম্বে, মালয়েশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কাজে যোগদান করে এখনো পর্যন্ত তা চলমান আছে। তাদের আয়ের পুরোটা দেশে পরিবারের জন্য পাঠিয়ে থাকে যা আমাদের সমাজের শিক্ষা, অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। অন্যদিকে নব্বই দশকের পরে কিছু মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ইউরোপ, আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়াসহ অনেক উন্নত দেশে অভিবাসী হিসেবে যাচ্ছে। যদিও অভিবাসীবিষয়ক খ্রিস্টসমাজের কোন তথ্য-উপাত্ত জানা নাই তথাপি অনুমান করা যায় অভিবাসীদের মধ্যে যুবক-যুবতীদের সংখ্যাই বেশি। ইতোমধ্যে কুতুপালং, উখিয়া, কক্সবাজারে অবস্থানরত মিয়ানমার সেনাবাহিনী কর্তৃক বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দুর্দশা ও তাদের সংগ্রাম ও বেঁচে থাকার লড়াই সম্পর্কে আমরা অবগত আছি। পূর্বে এবং বর্তমানে আসা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ১০ লাখ এবং প্রতি বছর বৃদ্ধির হার প্রায় ৩৩ হাজারের বেশি। তা ছাড়াও আমাদের দেশে পূর্বে বিহারী, কাচপুর ও অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেগু লোকজন পাকিস্তান ও ভারত থেকে এসে বসবাস করছে। অভিবাসী ও বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী তাদের আদিনিবাস ছেড়ে চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌছানোর যাত্রাপথে ও গন্তব্যে পৌছানোর পর অমানবিক দুর্দশা ও প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে থাকে।

২) অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অভিবাসী জনগোষ্ঠী যারা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন-বন্যা, নদীভাঙ্গন, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, জলবায়ু পরিবর্তন, আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ হ্রাস, মাটি ও পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং কৃষি উৎপাদন হ্রাসসহ বিভিন্ন কারণে তাদের পৈতৃক ভিটা ছেড়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হচ্ছে। তাছাড়া মানবসৃষ্ট দুর্যোগ যেমন প্রভাবশালীদের কর্তৃক বলপূর্বক ভূমি দখল, উন্নয়ন প্রকল্পে আদিবাসীদের উচ্ছেদকরণ, বিভাগীয় শহরে কর্মসংস্থানের কম সুযোগ, উচ্চ পড়াশুনার কম সুযোগ, নেশাগ্রস্থ হয়ে গৃহত্যাগ, উন্নত জীবনমানের জন্য শহরে আগমন করছে। অনেক অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত শ্রমিক জীবন-জীবিকার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে ঢাকা শহরের নিকটে নারায়ণগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, আশুলিয়া, সাভার, জিরানী, যাত্রাবাড়ি, সায়দাবাদ এবং গাজীপুর এলাকাসহ দেশেরে বিভিন্ন শহরের শিল্পাঞ্চলে বসবাস করছে।

৩) অভিবাসনের ঝুঁকিসমূহঃ অপরিকল্পিত ও অনিরাপদ অভিবাসন, কর্মজীবীদের দীর্ঘ কর্মঘন্টা, অসুস্থতায় ছুটি না পাওয়া, অন্যায্য মজুরী, কর্মজীবী বাবা-মায়ের সন্তানের সুরক্ষার অভাব, মাদকাসক্তি, চাকুরীতে অস্থিরতা, অদক্ষ শ্রমিক, সামাজিক বন্ধন ও শৃঙ্খলা দুর্বল, পারিবারিক বন্ধন দুর্বল, বিবাহ বিচ্ছেদ, মিশ্র বিবাহের কারণে আদিবাসী মেয়েরা ভূমি হারাচ্ছে, অভিবাসীদের সম্পর্কে কম

তথ্যভাণ্ডার, পালকীয় সেবাযত্ন কম, মহিলা ও কিশোর-কিশোরীরা ঝুঁকিপূর্ণ বসতি, বহু যুবক লুকায়িত, মানবাধিকর লঙ্ঘন, আইনী সাহায়তা বঞ্চিত, খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের ঘাটতি, কৃষ্টি-সংস্কৃতি থেকে শিকড়বিহীন হওয়া এবং এককবাদী হয়ে পড়ছে। এসব কিছু মিলিয়ে নতুন গন্তব্যে অভিবাসী ও অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের জীবনযাত্রা কঠিন হয়ে পড়ছে।

৪) সামাজের কিছু চলমান বাস্তবতা: যুবসমাজ চলমান কয়েকটি বৈশ্বিক ও স্থানীয় বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে- ক) চলমান সংঘাত ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ফলে উন্নয়ন বাঁধাপ্রাপ্ত হচ্ছে; খ) বিশ্বে ৭ কোটি শরণার্থী ও জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করা বিতাড়িত জনগোষ্ঠীর সাহায্য, সংহতি এবং সমস্যার টেকসই সমাধান দরকার; গ) প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ছড়িয়ে পড়া মিথ্যাচার ও গুজব সমাজের সংঘাতের বীজ বপন করছে; ঘ) আমাদের দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রক্রিয়ায় চলমান অস্থিরতা, জনমনে বিভিন্ন প্রশ্নের যথাযথ উত্তর মিলছে না; ঙ) এ ছাড়াও অনিরাপদ সড়ক, শহর অঞ্চলে দূষণ, নিয়ন্ত্রণহীন দ্রব্যমূল্য, শিশু নির্যাতন, অভ্যন্তরীণ অভিবাসী বৃদ্ধি, পাচারে শিকার মানুষদের সংখ্যা বেড়েই চলছে। এমন পরিস্থিতিতে যুবসমাজ উন্নত ও সুরক্ষিত জীবন-জীবিকার তাগিদে ছুটাছুটি করছে।

৫) স্থায়ী নিবাসী ও গ্রহণকারী জনগণের মনোভাব: বিপরীত দিকে অভিবাসীদের প্রতি স্থায়ী নিবাসী ও গ্রহণকারী জনগোষ্ঠী হিসেবে আমাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে ঘাটতি রয়েছে এবং প্রতিবেশি সুলভ আচরণ করতে এবং তাদের বিপদ-আপদে সহায়তার হাত বাড়াতে আমরা সংকোচবোধ করি।

ঘ) অভিবাসী, শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত জনসেবায় সাড়াদান

১) 'অভিবাসী বিষয়ক জাতীয় পালকীয় কর্মশালা- ২০১৯ নির্দেশনা অনুযায়ী সিবিসিবি'র পক্ষে ন্যায় ও শান্তি বিষয়ক বিশপীয় কমিশন একটি অঙ্গীকারপত্র প্রকাশ করেছে এবং প্রতিটি ধর্মপ্রদেশে অভিবাসী বিষয়ক ভাতিকানের নির্দেশনা অনুসরণ ও সেবাপ্রদান নির্দেশনা প্রদান করা হয়। আমরা অভিবাসী ও বাস্তুচ্যুতদের সমস্যা ও প্রয়োজনগুলো উপলব্ধি করব, প্রতিবেশি হিসেবে তাদের গ্রহণ করব, তাদের ভালোবাসব ও তাদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করব। যারা আমাদের পক্ষে অভিবাসী ও বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর যত্ন করছে সেসব সেবাকর্মীদের আধ্যাত্মিক ও মানসিক সেবা নেয়া মণ্ডলীর একটি পালকীয় দায়িত্ব। মণ্ডলী যদি সেবাকর্মীদের সঠিক যত্ন নেয় তবে তারাও অভিবাসীদের সঠিক যত্ন নিতে সক্ষম থাকবে। অভিবাসী, বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী ও তাদের যারা যত্ন করছে তাদের জন্য নিয়মিত প্রার্থনা ও ঐশ অনুগ্রহ চেয়ে পিতা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা প্রয়োজন।

২) পোপ মহোদয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাসের শেষ রবিবার দিন 'বিশ্ব অভিবাসী ও শরণার্থী দিবস' এবং ফেব্রুয়ারি মাসের ৮ তারিখে 'মানব পাচার প্রতিরোধে প্রার্থনা ও সচেতনতা দিবস' উদ্‌যাপন করতে পারি। পোপ মহোদয়ের বিশ্বজনীনপত্র, প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্র ও পালকীয় সেবাকাজে দিকনির্দেশনামূলক দলিলসমূহ (*খ অনুচ্ছেদ*) ব্যক্তিগত অথবা দলীয়ভাবে পাঠ, অনুধ্যান ও পত্রসমূহের শিক্ষা অন্যদের সাথে সহভাগিতা করতে পারি।

৩) বিগত ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষে ন্যায় ও শান্তি বিষয়ক বিশপীয় কমিশন- সিবিসিবি'র 'অভিবাসী সুরক্ষা দপ্তর' উদ্যোগে বিভিন্ন সময় নারায়ণগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, আশুলিয়া, সাভার, জিরানী, তেলেগু পরিচ্ছন্নকর্মী এবং গাজীপুর এলাকার অভিবাসী শ্রমিকদের অংশগ্রহণে কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করেছে। অংশগ্রহণকারীবৃন্দের উন্মুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে অভিবাসী শ্রমিকদের আধ্যাত্মিক, পারিবারিক, আর্থিক ও সমাজিক বাস্তবতা ও করণীয় বিষয়ে কতিপয় উপলব্ধি ও পরামর্শ অনুভাবন করা যায় যা অভিবাসী শ্রমিক ও পালকীয় সেবাদানকারীদের জন্য ভবিষ্যৎ নির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন- বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা যা মাদার তেরেজা সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ আরম্ভ করেছেন; পালকীয় কাজ গতিশীল করতে এলাকা বা ব্লকভিত্তিক এনিমেটর প্রস্তুত করা; আধ্যাত্মিক পালকীয় কাজ গতিশীল ও নিয়মিত করা, শ্রমিকদের ছুটি মোতাবেক পালকীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা; খ্রিস্টযাগ, শিশুদের ধর্মশিক্ষা ও পালকীয় কর্মসূচির জন্য নির্দিষ্ট স্থান বা গির্জা তৈরির ব্যবস্থা করা, শিশু ও রোগিদের সেবাযত্নের ব্যবস্থা করা, বেকার শ্রমিকদের সাময়িকভাবে সহযোগিতা করা, নতুন আগত নারী শ্রমিকদের সাময়িক আবাসন ব্যবস্থা করা এবং শ্রমিকদের জাতীয় সর্বজনীন পেনশন বিষয়ক, আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক ও পেশাভিত্তিক দক্ষতা বিষয়ক শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদিসহ আরো কিছু বিষয় আলোচনা করা হয়।

৪) যে সকল ডায়োসিস ও ধর্মপল্লী এলাকায় অভিবাসীদের আগমন ঘটছে সেখানে পালকীয় সেবা গতিশীল রাখা। সেবাকাজ বিস্তারের জন্য অভিবাসী ডেস্ক স্থাপন, পালকীয় সেবা কেন্দ্র স্থাপন, শিল্প নগরী বা অঞ্চলসমূহে খ্রিস্টযাগের ব্যবস্থা করা, বিশেষ সেবাকর্মী নিয়োগ, আইনী ও মানবাধিকার বিষয়ক সেবা বিস্তার করা, তথ্য সংগ্রহ করা, পাচারে শিকার জনগণকে সুরক্ষা দেয়া, কর্মজীবী যুবক-যুবতীদের জন্য হোস্টেল ব্যবস্থা করা, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও সেমিনারের ব্যবস্থা, কৃষিকাজে উৎসাহ প্রদান, দক্ষ শ্রমিক তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ, কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খ্রিস্টান ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সুবিধা প্রদান ও অভিবাসী জনগণদের মাণ্ডলিক জীবনে অংশগ্রহণের বিষয় ভাবতে হবে।

যুবক-যুবতীদের প্রতি কতিপয় সুপারিশ

৫) পিতা ঈশ্বর যুবক-যুবতীদের ওপর সর্বদা বিশেষ অনুগ্রহ দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। পবিত্র বাইবেলে পুরাতন নিয়মে যাকোবের কনিষ্ঠ সন্তান যোসেফ, যুবক গিদিয়ন, সামুয়েল, রুথ, সিরিয়ার নামানের ইহুদী যুব গৃহকর্মী সবাই যুব বয়সে পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে সেবাদায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। নতুন নিয়মে লুকের সুসমাচারে এক পিতার ছোট সন্তান ঝুঁকি নিয়ে কামনায় তাড়িত মানুষ হয়ে পিতার সান্নিধ্য ত্যাগ করে জীবনযাপন করেছে। তারপর কঠিন দুঃখ-লাঞ্ছনা অভিজ্ঞতা করে পিতার ভালোবাসায় ফিরে আসতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে *(১৫:১১-৩২)*। নতুর নিয়মে যুবতী মা মারীয়া সাহসিকতার সাথে স্বর্গদূতের সাথে বাক্যালাপ করে নিজের সম্মতি জানানোর সঙ্গে সঙ্গে পিতা ঈশ্বরের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। পোপ ফ্রান্সিস তাঁর "খ্রিস্ট জীবন্ত" (Christus Vivit) বিশ্বজনীন পত্রে উল্লেখ করেছেন যুবক-যুবতীরা তাদের তরুণ বয়সেই পিতা ঈশ্বরের ভালোবাসায় আছেন এবং তাঁর হৃদয় গভীরে স্থান করে নিয়েছেন। সাধু পল যুবকদের আরো বলেন,"তোমরা প্রবীণদের অনুগত হও! তোমরা সবাই বিনম্রতার বসন পরেই একে অন্যের সঙ্গে মেশো" (*১ পিতর ৫:৫*)। প্রতিটি যুবক-যুবতীই ইচ্ছা থাকলে নিজেকে খ্রিস্টীয় শিক্ষায় নিজেকে রূপান্তর করতে পারে।

৬) ঐশ অনুগ্রহে উদ্দীপিত অভিবাসী যুবক-যুবতীরা খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে জগতের মধ্যে খ্রিস্ট-শিষ্য হয়ে নিজেদের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে পারে। প্রত্যেকজন দীক্ষিত যুবক-যুবতী খ্রিস্ট প্রদত্ত ত্রিবিধ দায়িত্ব পালন করতে আহুত – **ক) যাজকীয়** - প্রার্থনা করা, পবিত্র বাইবেল পাঠ ও ধ্যান করা, সাক্রামেন্ত গ্রহণ করা; প্রতিটি কার্যক্রম যথাযথ পরিবেশে প্রার্থনা ও পবিত্র বাইবেল পাঠের মাধ্যমে আরম্ভ করা অপরিহার্য; **খ) রাজকীয়** - পরিবার, সমাজ, দল, সংঘ-সমিতি-ক্লাব, প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব দেয়া এবং **গ) প্রাবক্তিক** - সততা চর্চা ও সত্য প্রতিষ্ঠা করা। যুব সংগঠন শুধু ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কাজের জন্য নয়, বরং মানবিক গঠন, সামাজিক, ধর্মীয় ও মাণ্ডলিক কর্মসূচিও থাকা আবশ্যক। ঈশ্বরের অনুগ্রহে সংগঠনের

মাধ্যমে বিশ্বাসের সাক্ষ্য দান করার সুন্দর সুযোগ থাকে।

৭) সমদায়িত্ববোধ চেতনা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যুবক-যুবতীরা একত্রে অভিবাসীদের ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে। প্রযুক্তি ও যোগাযোগের সুবাদে বিশ্বের মানুষ দূরত্ব ও ফারাক থাকা সত্ত্বেও এক হয়ে আসছে। তেমনি অভিবাসী যুবক-যুবতীরা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সমমনা জোট সমূহের সাথে সংযুক্ত থেকে একসাথে চলমান বৈশ্বিক ও স্থানীয় অভিবাসীদের নিয়ে কাজ করতে পারলে সমাজ আরো উপকৃত হবে। পোপ ফ্রান্সিসের বিশ্বজনীন পত্রটি যুব তথা সবার জন্য আশার আলো জ্বেলেছে। তিনি বলেছেন, গভীর বিশ্বাসের দাবীসমূহ যুবক-যুবতীদের উপলব্ধি করতে হবে- ক) পিতা ঈশ্বর তোমাদের ভালোবাসেন; এর অর্থ যুবসমাজের মূল্য, তাৎপর্য, ও গুরুত্ব প্রকাশ করে; খ) খ্রিস্ট তোমাদের রক্ষা করেছেন; ভালোবেসে খ্রিস্ট সবাইকে রক্ষা করেছেন যা কোন জাগতিক মতবাদ করতে পারে না; গ) খ্রিস্ট জীবিত; তিনি শুধু দুই হাজার বছর পূর্বের কেউ নন বরং প্রতিজন যুবক-যুবতীদের জীবনে তিনি আজও প্রভাববিস্তারকারী এবং সক্রিয় আছেন; ঘ) পবিত্র আত্মা জীবনদান করেন; সকল যুবক-যুবতীদের পবিত্র আত্মার নিকট নিজেকে উন্মুক্ত করতে হবে, তিনিই একমাত্র তাদের অন্তরে মুক্তির আশা উজ্জীবিত রাখতে সক্ষম।

৮) নিজেদের জীবনের পরিপক্কতা অর্জনে পোপ ফ্রান্সিস যুবসমাজকে তিনটি দিকনির্দেশনা দিয়েছেন- প্রথমতঃ ভ্রাতৃত্বের পথ, অন্যদের মাঝে লুকানো সৌন্দর্য ও মর্যাদা উপলব্ধি করা; আফ্রিকার প্রবাদ স্মরণ করে বলেছেন- 'যদি তুমি দ্রুত যেতে চাও তবে একা যাও। তুমি যদি আরো বেশি দূরে যেতে চাও তবে একসাথে যাও।' দ্বিতীয়তঃ যুবক-যুবতীদের নিজেকে ছাড়িয়ে ও নিজের ক্ষুদ্রদল ছাড়িয়ে ভাবতে হবে; তৃতীয়তঃ সাহসী মিশনারী হওয়া; যুব বয়সেই সুসমাচারের সাক্ষী হওয়া কারণ প্রভু যিশু সকলকে খুঁজেন এবং সকলকে মিশনারী কাজে অংশ গ্রহণ করা দরকার।

৯) পোপ মহোদয় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বলেন যুবক-যুবতীদের উপযুক্ত পথ অনুসরণে সহায়তা প্রদান করতে হবে। স্মরণ করিয়ে দিতে হবে এবং শিক্ষা দিতে হবে- ক) ভালোবাসা বিহীন জীবন শুষ্ক বা আকর্ষণহীন জীবন; খ) ভবিষ্যতের উদ্বেগ, দুঃশ্চিন্তা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব; গ) পাওয়ার চেয়ে দেওয়াতে আনন্দ বেশি; ঘ) ভালোবাসা শুধুমাত্র কথায় নয়, কাজেও দেখাতে হয়।

১০) মণ্ডলীর যুব সেবাকাজে আরো কিছু সুপারিশ বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। ক) যুব গঠনের কৌশল- পোপ ফ্রান্সিস বিশ্বজনীন পত্রে দু'টি কৌশল বা দিক্ নির্দেশনা দিয়েছেন। প্রথমটি হল অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়া এবং দ্বিতীয়টি হল ক্রমাগত উৎকর্ষ সাধন প্রক্রিয়া। প্রথমতঃ অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেসকল অভিবাসী মণ্ডলী থেকে দূরত্বে অবস্থান করছে তাদের নিকট পৌঁছানো, তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা। দ্বিতীয়তঃ ক্রমাগত উৎকর্ষ সাধন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা। যারা ইতোমধ্যে মণ্ডলীর জীবনে সক্রিয় তাদের খ্রিস্টীয় শিক্ষা ও নৈতিকতার প্রতি গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করা, খ্রিস্টীয় জীবনের গভীরে প্রবেশে সহায়তা করা। খ) সিনোডাল প্রেরণা - একসাথে যাত্রা করা। অতি নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনার চেয়ে বরং যুবকদের ধ্যান-ধারণা শুনা, তাদের মতামতে স্বাগত জানানো ও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করা। যুবকদের হৃদয়ে প্রবেশ করা ও মণ্ডলীর হৃদয়ে তাদের স্থান গুরুত্বপূর্ণ তা উপলব্ধি করতে পবিত্র আত্মার উপর যুবকদের নির্ভরশীল হতে উদ্বুদ্ধ করা। গ) যুব পরামর্শদান পর্ষদ গঠন। বিগত যুবসিনডের প্রেরণা অনুযায়ী ভাতিকান গত ২৪ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টবর্ষে খ্রিস্টরাজার পর্ব দিবসে নতুনভাবে ২০ সদস্য বিশিষ্ট যুব পরামর্শদান পর্ষদ নিয়োগ করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মনোনীত তারা তিন বছর পোপ মহোদয়ের যুব দপ্তরে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। যুব সংগঠন ও নেতৃত্ব উন্নয়নে একটি সক্রিয় পরামর্শদান পর্ষদ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। ঘ) কাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যুবসেবা কার্যক্রম। কাথলিক স্কুল কলেজসমূহ যুবকার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন, যুবগঠন জোড়ালো ও প্রসারিত করতে পারে। যা পোপ ফ্রান্সিসের একটি অন্যতম আহ্বান। সকল ধর্মের যুবকদের জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ সত্যিকারের বাড়ি ও পরিবারের মতো পরিবেশ সৃষ্টি করতে তিনি আহ্বান জানান। পোপ মহোদয় বলেন, কাথলিক যুবক-যুবতীদের জন্য খ্রিস্টবাণী, পবিত্র খ্রিস্টযাগ, পুনর্মিলন সংস্কার, সাধু-সাধ্বীদের জীবনের গুরুত্ব স্কুল-কলেজকে কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

আমরা একই পিতা ঈশ্বরের সন্তান। আমাদের পৃথিবী একটাই। যা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। আর বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদেরই। স্থায়ী নিবাসী ও অভিবাসী সবাইকে নিয়েই আমাদের সমাজ। অনেকের জীবন পরিক্রমা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, পূর্বপুরুষরাও কোন না কোন সময় অভিবাসী ছিলেন, তারাও বিভিন্ন সময়ে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে এবং তা মোকাবেলা করে টিকে আছেন। আমাদের সম্মিলিত এই জীবনবোধ থেকেই অভিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে আরো যত্নশীল হতে পারব। আমাদের পূর্বপুরুষ আব্রাহামও পিতা ঈশ্বরের নির্দেশে মিশরে গমন করেছিলেন। নাজারেথের পবিত্র পরিবারের সাথে স্বয়ং যিশুখ্রিস্টও অভিবাসী হিসেবে যাত্রা করেছেন। ঐশবাণীতে আলোকিত হয়ে অভিবাসনের চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে নিবিড় সমন্বয় ও কার্যকরী সাড়াদানের ক্ষেত্রে আমরা পুণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিসের চারটি করণীয় নির্দেশনা অন্তরে রাখি-স্বাগত জানানো, সুরক্ষা দেয়া, সংবর্ধিত করা ও সংযুক্ত করা। আমাদের প্রতিদিনকার প্রার্থনায় দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত অভিবাসী, শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের স্মরণ করি।

(**সহায়ক সূত্রঃ** পোপ ফ্রান্সিসের বিশ্বজনীনপত্রসমূহ: 'লাউদাতো সি' (হোক তোমার প্রশংসা), 'ফ্রাতেল্লি তুত্তি' (ভ্রাতৃ-সকল), 'খ্রিস্টোস ভিভিত' (খ্রিস্ট জীবন্ত) এবং 'আমোরে লাতেসিয়া' (ভালবাসার আনন্দ) সহ 'লাউদাতে দেউম' (ঈশ্বরের প্রশংসা) নামক প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্র। সেমিনার ও কর্মশালাসমূহ: ন্যায় ও শান্তি বিষয়ক বিশপীয় কমিশন-সিবিসিবি।)

উল্লাস

উইলিয়াম রনি গমেজ

চারিদিকে প্রাণের উচ্ছ্বাস
পৌষ পার্বণ উৎসবে খুশীর মাতন
হিম কুয়াশার মাঝে বইছে
আগমনীর নতুন এক সুর
তবে কি ফিরে এসেছে
আনন্দ উল্লাসের প্রহর?
বাতাসে লেগেছে অচেনা ঘোর
আকাশে নতুন আলোর ঝলক
প্রকৃতিতে এসেছে সজীবতা
পাহাড়ের বুক চিঁড়ে ঝরণার কলতান!
তবে কি আবার ধ্বণিত হচ্ছে
ত্রাণকর্তার জয়গান?
রাখালেরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত
বিশ্বভূবন ভীষণ ভাবে বিস্মিত
পণ্ডিতেরা নব বারতায় মুখরিত
প্রতীক্ষার প্রহর শেষে প্রাপ্তির প্রেরণা
তবে কি খ্রিস্টরাজের আবির্ভাব
নশ্বর পৃথিবীতে
এ এক পরম পাওয়া
আমাদের ছোট্ট সবুজ কুটিরে !!

যুদ্ধ বিধ্বস্ত বিশ্ব ও বড়দিন ভাবনা

জের্ভাস মিন্টু রোজারিও

ইস্রায়েল ফিলিস্তিন ও ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের উত্তাপ আজ সমস্ত পৃথিবীতে। গ্রামের যে চাষী যুদ্ধের কথা হয়তো জানেই না তাকেও যুদ্ধের অজুহাতে উচ্চ মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে গিয়ে উপায়ান্তর না পেয়ে দীর্ঘশ্বাস গোপন করতে শিখতে হচ্ছে। গণ-সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এই যুগে বিশ্ব আজ উত্তাল, চাইলে বা না চাইলেও অনেক সংবাদ, ঘটনা আমাদের নজরে আসে আর সেটার অদৃশ্য প্রভাব আমাদের জীবনে পড়েই পড়ে। জগৎ শুরুর সময় থেকে, প্রতিদিন বেঁচে থাকতে, সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে আমরা সবাই কোন না কোন ভাবে যুদ্ধের ময়দানে আছি। যুদ্ধ আদতে ধ্বংস বৈ কিছু আনে না, তবে সে ধ্বংস যদি শয়তানের বা মন্দতার হয় তবে সে যুদ্ধ আকাঙ্ক্ষিত তবে সে যুদ্ধের যুদ্ধাস্ত্র হল ক্ষমা, ভালোবাসা, সহযোগিতা, সহভাগিতা, যার সবটাই আমরা যিশুর মধ্যে পাই, বড়দিন, যিশুর জন্ম জয়ন্তী, আমাদের সেই যুদ্ধের আহ্বান জানায়। এই যুদ্ধ-উত্তাল পৃথিবীতে বড়দিন সবার বিবেকে বিদ্যুৎপাত ঘটাক, যেন মানুষের জীবনে চেতনা আসে, তারা ঘুরে দাঁড়ায়, শান্তির সপক্ষে, যিশুর রাজত্বে। বিশ্বজগৎ জানুক যিশু, যিনি ঈশ্বর, যিনি শান্তিরাজ তিনি যুদ্ধের অবসান করে শান্তি দিতেই দেহধারণ করেছেন, ঈশ্বর হয়েও জন্ম নিয়েছেন ধূলার ধরায়, রক্ত পিপাসু শয়তানের রক্ত-তৃষ্ণা মিটাতে আপন রক্ত মূল্যেই ক্রয় করেছেন সবার মুক্তিপণ। জগতের প্রথাগত ধারণার বাইরে গিয়ে ক্ষমা ও ভালোবাসার এক সমাজ বিনির্মাণের শ্বাশত পথ দেখিয়েছেন ও সেই পথে চলতে সবাইকে আহ্বানও করছেন। বড়দিন সেই আহ্বান নবায়ন করতে - শুধু খ্রিস্টবিশ্বাসী নয় কিন্তু বিশ্বজগতে সবার কাছে চিরন্তন আলোকবর্তিকা।

যুদ্ধ চলছে, প্রচণ্ড যুদ্ধ। পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মের সর্বশেষ গ্রন্থ: প্রত্যাদেশ ১২: ৭-৯ পদে আমরা পড়ি, "এরপর হল কী, স্বর্গলোকে হঠাৎ একটা যুদ্ধ বেঁধে গেল, মিখায়েল ও তাঁর দূতবাহিনী সেই নাগদানবটার সঙ্গেই যুদ্ধ করতে লাগলেন। নাগ দানবটাও তার নিজের অপদূত বাহিনীকে নিয়ে যুদ্ধ করতে সুরু করল। শেষ পর্যন্ত নাগদানবটা কিন্তু জিততে পারল না, এমন কি স্বর্গে তাদের পা রাখার ঠাঁইটুকু পর্যন্ত রইল না। তখন সেখান থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হল সেই মহা নাগদানবটাকে, সেই যে আদিম সাপ যার নাম দিয়াবল বা শয়তান যে সারা জগতের মানুষদের প্রতারিত করে থাকে, সেই নাগদানবটাকে পৃথিবীতেই ছুড়েই ফেলে দেওয়া হল আর তার যত সাঙ্গোপাঙ্গ অপদূতকেও এই ভাবে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল"। স্বর্গের সেই যুদ্ধে জয় পরাজয় নির্ধারিত হয়েছে; কিন্তু এই পৃথিবীতে যুদ্ধ এখনো চলছে। শয়তান পরাজিত হয়েছে, কিন্তু লজ্জিত হয়নি। নিজের লজা ও শাস্তি'র সহভাগি করে নিতে, যারা শান্তিতে আছে বা থাকতে চায়, যারা ঈশ্বর ভীরু মানুষ তাদের প্রলোভিত করে তার দল ভুক্ত করার প্রাণান্ত চেষ্টা এদেন বাগানের মত এই পৃথিবীতে অক্লান্তভাবেই চালিয়ে যাচ্ছে। শয়তানের প্রেরণা - এদেন বাগানে সফলতা, আর আমাদের চেতনা আমাদের সর্বশেষ-শত্রু - মৃত্যু-বিজয়ী খ্রিস্টের শিক্ষা ও আদর্শ। ভাল আর কালো, আলো আর অন্ধকারের পার্থক্য আমরা সবাই বুঝি, যুদ্ধের বিভীষিকা আমরা সবাই জানি, কারণ প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করেই আমাদের বাঁচতে হয়। ভালকে হ্যাঁ, মন্দকে না বলতে হয়, সুযোগের অন্তরালে প্রলোভনের ফাঁদ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হয়, ভাল কিছু পাবার অভিলাষে অনেক অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, বিশ্বস্ত থাকতে হয়। যুদ্ধ চলে আমাদের প্রতিদিনকার জীবন আর জীবিকা আহরণে, যুদ্ধ চলে আমাদের আধ্যাত্মিক মুক্তির অন্বেষণে। এর বাইরে যে যুদ্ধকে আমরা যুদ্ধ বলি সেটা যেন শিল্পী'র মননের চিত্রিত রূপ, আমাদের মন ও মানষিকতার কদর্য বহিঃপ্রকাশ মাত্র। শিল্পী যেমন তার মননকে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলেন, যুদ্ধ তেমনি মানুষের নগ্ন মনের ভয়ংকর প্রকাশ। পৃথিবীটা ঈশ্বর শান্তিময় করেই সৃষ্টি করেছিলেন, শয়তান সেখানে অবিশ্বস্ততার বীজ বপন করেছে যার ফসল হচ্ছে এই যুদ্ধ।

যুদ্ধের জন্য দায়ী হল মূলত আমাদের মনোভাব, সেই সাথে আমাদের অহম ও ঘৃণার সংস্কৃতি, অযোগ্যতা ও অলসতা। অহম তখনই আমাদের গ্রাস করে যখন আমরা স্বার্থপর হয়ে নিজেকেও সব চেয়ে বড় ও যোগ্য ভাবি, অন্যকে অযোগ্য অকর্মন্য ভাবি, যারা প্রকৃত অর্থে ভাল মানুষ যাদের সাথে আমরা প্রতিযোগিতায় পারি না, বা অহমের কারণে সহযোগিতার জীবনে যেতে চাই না তাদের বিরুদ্ধে আমরা ঘৃণা ছড়াই, বেছে নেই ভিন্ন পথ, ঘৃণ্য পথ, পিছন পথে আলোর যাত্রিকে আঘাত করি। সেই অহম ও ঘৃণা আমাদের যুদ্ধের পথ দেখায়। আমর যখন অযোগ্য ও অলস হই তখন আমরা চাই অন্যকে বিভ্রান্ত করে অন্যায় সুযোগ নিতে। সেটা শয়তানেরও কাজ। ঈশ্বর মানুষকে তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ যদি তার এই পরিচয় ভুলে না যায়, তবে সে অসাধ্য সাধন করতে পারে। হাতির বিশাল দেহ কান দ্বারা ঢাকা, হাতি যদি দেখতে পেতো তার কত বড় দেহ তার শক্তি কত! তবে সে ভয়ংকর হয়ে উঠতো। আমরা মানুষ আমাদের সক্ষমতা নিয়ে সন্দীহান এবং একসাথে অলসও তাই আমরা পরিশ্রম না করে জল ঘোলা করে মাছ ধরতে চাই। আমরা শুধু অলসই নই, বোকাও, তা না হলে এই সত্যটা কি আমরা উপলব্ধি করতে পারতাম না, পারলে আমরা কি সেটা থেকে বেড়িয়ে আসতে চাইতাম না। সবচেয়ে ভয়ংকর সত্য হল, দিনশেষে আমরা ভুলে যাই ঝড় আসলে একা আসে না বা কারও একার উপরে আসে না, যুদ্ধ যখন হয় সেটা আমাদের সবাইকে আক্রান্ত করে, সেই ঘুর্ণিপাকে আমরা নিজেরাই নিজের কবর রচনা করি।

যুদ্ধ আসলে কি? যুদ্ধ হল ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া, মন্দের বিরুদ্ধে ভাল, ভালোর বিরুদ্ধে মন্দ। কেউ কাউকে স্থান দিতে চায় না, নিজের স্থান ধরে রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে, প্রতিরোধ গড়ে তোলে এ কথা সত্য, ছোট্ট একটা বালুকনার ব্যাপারেও সত্য। যুদ্ধ হয় ভাল আর মন্দের স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতির কারণে। ভাল যখন জানে সে ভাল; সে তার পথ ছাড়তে চায় না, অন্যদিকে ভাল যদি এগিয়ে চলে তবে মন্দকে কেউ ভালোবাসে না, চায় না, তাই মন্দ চায় ভাল না থাকুক, দূর হয়ে যাক। মন্দ যখন মন্দ জেনেও জোর প্রয়োগ করে যুদ্ধ তো তখনই বাঁধে। যুদ্ধ কি খারাপ? প্রকৃতিগতভাবে যুদ্ধ খারাপ, কারণ যুদ্ধ উপহার - ধ্বংস, মৃত্যু আর ঘৃণা যা আরো যুদ্ধের জন্ম দেয় যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম চলতেই থাকে। কিন্তু জীবন জীবিকা আর ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্যও আমরা যুদ্ধ করি, স্রোতের বিপরীতে চলি। কিন্তু সেটাকে আমরা যুদ্ধ বলি না, বলি সংগ্রাম, সাধু পলের ভাষায় শুভ সংগ্রাম।

যুদ্ধরত এই বিশ্বে বড়দিন উদ্‌যাপন বিশ্বের জন্য একটি বার্তা শুধু বিশ্বাসীদের জন্য নয় বরং

জগতের সকলেরই জন্য। যেহেতু জগৎ যিশুকে বিশ্বাসীদের মত করে জানে না তাই সেই দায়িত্ব পড়ে বিশ্বাসীদের উপর যেন জগৎ যিশুকে চিনতে পারে। বড়দিন এমনই একটি সুযোগ যখন আমরা যিশুর শিক্ষা ও আদর্শ আমাদের জীবন ও বড়দিন উদ্‌যাপনের মাধ্যমে বিশ্বের মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারি, সেক্ষেত্রে বড়দিনের প্রস্তুতি আর বড়দিন উদ্‌যাপনের প্রচলিত রীতি থেকে বেরিয়ে এসে যিশুর দেখানো পথ অতিক্রম করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। যিশু শান্তির যুবরাজ - প্রবক্তা ইসাইয়ার গ্রন্থে ১১ অধ্যায়ে যিশু যিনি প্রত্যাশিত মুক্তিদাতা সম্পর্কে বলা আছে, তিনি এক নতুন সৃষ্টি, প্রভুর আত্মা, প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির আত্মা, সুমন্ত্রণা ও পরাক্রমের আত্মা সুবিবেচনা আর প্রভু ভয়ের আত্মা তার উপর নিত্য অধিষ্ঠিত থাকবে। তিনি চেহারা দেখে বা জনশ্রুতি অনুসারে নয় কিন্তু ধর্মময়তায় বিচার করবেন; তিনি সততায় অত্যাচারিদের ও দীনহীনের পক্ষ নিবেন। এখানে মুক্তিদাতা সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তার প্রতি কথা সত্য। যিশু এই পৃথিবীতে থেকেছেন কখনো তলোয়ার বা কোন প্রকার যুদ্ধাস্ত্র হাতে তুলে নেননি, ঈশ্বর যেমন মুখের কথায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন যিশুও তেমনি তার কথা, শিক্ষা ও জীবন-আচার দিয়ে সেই একই দৃষ্টান্ত রেখেছেন। যিশুর কথা, শিক্ষা ও জীবন যাপন এত সাধারণ কিন্তু এত বেশি প্রভাববিস্তারকারী ছিল যে, বিশ্বজগৎ কেঁপে উঠেছিল, শুধু তাই নয় বিশ্বজগত আজও খ্রিস্টের আদর্শকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই, খ্রিস্টান জীবন বা আদর্শ নিয়ে মানুষের প্রশ্ন থাকতে পারে কিন্তু খ্রিস্টের শিক্ষা ও আদর্শই পারে জগতে শান্তিরাজ্য পরিণত করতে। যিশুকে তারা হত্যা করতে চেয়েছিল যেন তারা নিজেদের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করতে পারে কিন্তু খ্রিস্ট সবাইকে অবাক করে দিয়ে নিজেই শয়তানকে পরাজিত করে চিরকালীন শত্রু মৃত্যু বিজয়ী হয়েছেন, চিরতরে মৃত্যুকে নির্বাসনে পাঠিয়েছেন।

যিশুর জন্ম-স্মরণ উৎসব হল বড়দিন। যুদ্ধ বিধস্ত দেশ ও মানবতার কাছে বড়দিন যুদ্ধ নয় শান্তির বারতা নিয়ে আসে। যিশুই তো শান্তিরাজ; শান্তি দিতে তিনি ধূলার ধরায় নেমে এসেছেন। যারা তার কথা শোনে ও মেনে চলে তারা অনন্ত শান্তি'র অধিকারি হয়, কারণ যিশুই তাদের মুক্তিমূল্য পরিশোধ করতে এই পৃথিবীতে আগমন করেছেন এবং যুদ্ধ জয়ের পথ বাতলে দিয়েছেন। যারা যিশুর কথা শুনে ও মেনে চলে তারা শান্তি'র স্বপক্ষের লোক, তারা যুদ্ধ নয়, ক্ষমা, ভালোবাসা, সহযোগিতা, সহভাগিতার প্রবক্তা হয়ে বিশ্বব্যাপি আলো ছড়াচ্ছেন, খ্রিস্টের সেই আলোই তার জন্ম জয়ন্তীতে দেখতে পেয়েছিল সেই প্রাচ্য দেশীয় রাজা ও পণ্ডিতগণ। তারা যেমন সব ভুলে রাজাকে প্রণাম করতে, তাকে উপহার দিতে ছুটে এসেছিল বড়দিন আমাদের আহ্বান জানায় আমরা যেন সেই নবজ্যাতিতে আলোকিত হয়ে পথ চলি এবং বিশ্বকে আলোকিত করি।

আদিতে সবকিছু সুন্দর ছিল, ঈশ্বরের ভাষায় উত্তম। কিন্তু বাঁধ সাধলো অপদূত লুসিফার। বাংলায় একটা প্রচলিত প্রবাদ আছে, সুখে থাকতে ভুতে কিলায়। লুসিফারের হয়েছিল তাই। আমরা জানি, মানুষ হল ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট। সাধু পল ১ম করিন্থিয় ৬:৩ পদে বলেন, তোমরা কি জান না যে, পুণ্যজনেরা একদিন বিশ্ব জগতের বিচার করবেন"। প্রচলিত শিক্ষা থেকে জানি, মাটির সৃষ্ট মানুষ হয়ে ঐশজীব বা স্বর্গদূতদের বিচার মানুষ করবে, লুসিফার সেটা মেনে নিতে পারে নি, আদমকে সে প্রণাম করেনি; তাই সে ঈশ্বরের সেবা করতে অস্বীকার করে (পবিত্র কোর-আনে এই বর্ননা পাওয়া যায়)। তাই সে আদমকে প্রলোভিত করে, পাপে ফেলে মানুষের জীবনে মৃত্যু নিয়ে আসে। সেই প্রলোভনে শয়তান এখনো মানুষকে ফেলতে চায়। যিশু যে সত্যিকারের ঈশ্বরপুত্র সেটা জেনেও, শয়তান যিশুকেও প্রলোভিত করতে ছাড়েনি। শয়তান যিশুকে পাপে ফেলতে পারে নি। কিন্তু মানুষ, সাধারণ মানুষ বা যারা যিশুর আলোতে পথ চলে না তাদের সহজেই প্রলুব্ধ হয়ে যুদ্ধে প্রণোদনা দেয় যেন মানুষ কষ্ট পায় আর শয়তান তার থেকে মজা নিতে পারে। শয়তানের কাজ হল পরিণাম উল্লেখ না করে কোন কাজে নামিয়ে দেওয়া। পবিত্র বাইবেলে তাকে বুদ্ধিমান বলা হয়েছে যে, পরিণামের কথা ভেবে কোন কাজ শুরু করে। অন্যথায় সবাই বলবে, "দেখ, দেখ লোকটা গাথার কাজ সুরু করেছিল কিন্তু শেষ করতে পারেনি" (*লুক ১৪:৩০*)। আমরা যখন যুদ্ধের সংস্কৃতির মধ্যদিয়ে যাচ্ছি তখন আমাদের কি উচিৎ নয়, যিশুর আদর্শ নিয়ে যুদ্ধ করা, ক্ষমা ও ভালোবাসা চর্চা করা যেন রক্তক্ষরণ আমাদের দেহের না হয় কিন্তু হৃদয়ের পরির্বতন আসে?

যিশু কিন্তু এমনি এমনি পৃথিবীতে নেমে আসেননি। মানুষের উপরে ঈশ্বরের বিশ্বাস ছিল যে তারা মন্দতাকে জয় করে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হয়ে নতুন সৃষ্টি হয়ে উঠবে। কিন্তু সবাই সেটা পারেনি। আমাদের ঈশ্বর তো, ৯৯ ভাগ নয় ১০০ ভাগ চান, ঈশ্বর চান শতভাগ মানুষ পরিত্রাণ পাবে। শয়তানের সাথে যুদ্ধে, ছলনায় অনেকেই ভুলেছিল। তাই যিশু শুধু পৃথিবীতে নেমেই আসেন নি, সেই যুদ্ধ থামাতে এসেছেন, তাই তো তিনি রাজা হয়েও রাজপ্রসাদে নয়, দীনহীন বেশে জন্ম নিয়েছেন। নিজেকে নমিত করেছেন। আর আমাদের শিখিয়েছেন কি করে নম্র হয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনতে হয়। বড়দিন আমাদের সেই বার্তা ও আহ্বান জানায়।

আপাতঃদৃষ্টে আমরা দেখছি ইউক্রেন-রাশিয়া, ইস্রায়েল ফিলিস্তিন যুদ্ধ চলছে, যুদ্ধ চলছে আমাদের পাশের রাষ্ট্র মায়ানমারেও। যে যুদ্ধ আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার চেয়ে ভয়ানক যুদ্ধ চলছে আমাদের মনোজগতে; সম্মুখ যুদ্ধে যাবার, অস্ত্র ধরে যুদ্ধ করতে, মরতে বা মারতে সাহস হয়তো সবার নেই কিন্তু মনে মনে আমরা সবাই যুদ্ধ করছি বা যুদ্ধের পক্ষাবলম্বন করছি। যারা যুদ্ধাক্রান্ত বা যুদ্ধের ঘৃণা বয়ে বেড়ায় তারা কেউ শান্তিতে বাঁচে না আর তারা অন্যকেও শান্তিতে বাঁচতে দিতে চায় না। তারা শুধু সুযোগ খোঁজে শয়তানের দোসর হয়ে কখন যুদ্ধ বাঁধানো যায়। তাই যুদ্ধ মাত্রই অন্তহীন; যার পরিণাম শুধুই ধ্বংস আর ঘৃণা, যুদ্ধে উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্থ হয় তথাপি কেউ যুদ্ধের পথ পরিহার করতে চায় না। যিশুর জন্মোৎসব আমাদের আহ্বান জানায় যুদ্ধ বাদ দিয়ে এক শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। যিশু নিজের সমদ্ধে পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ করেন, "প্রভুর আত্মিক প্রেরণা আমার উপর নিত্য অধিষ্ঠিত, কারণ প্রভু আমাকে অভিষিক্ত করেছেন। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীনদরিদ্র্যদের কাছে মঙ্গলবার্তা ঘোষণা করতে, বন্দীর কাছে মুক্তি আর অন্ধের কাছে নবদৃষ্টি-লাভের কথা ঘোষণা করতে, পদদলিত মানুষকে মুক্ত করে দিতে এবং প্রভুর অনুগ্রহদানের বর্ষকাল ঘোষণা করতে (*লুক ৪: ১৮*)। আর যিশুতেই আমরা সেই আসল রাজাকে দেখি, যার কাছ থেকে কেউ খালি হাতে ফিরে যায় নি, পাপী সাধু, ধনী গরীব, ইহুদী-অনিহুদী সবাই যিশুর দয়া পেয়েছেন। যিশু ধিক্কার দিয়েছেন, সর্তক করেছেন, মন্দির থেকে ব্যাপারীদের তাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি সবই করেছেন কিন্তু কই যুদ্ধ তো করেননি। কিন্তু দেখুন সাধু পল, যে ছিল যুদ্ধবাজ যিশুকে পেয়ে কেমন সাধু মানুষ হয়ে উঠলেন। সাধু যোহনের মঙ্গল সমাচারে ১০: ১০ পদে যিশু বলেন, "আমি এসেছি মানুষ যেন জীবন পায়, পুরোপুরিভাবেই পায়"॥

মা-মারীয়ার বড়দিন

ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি'ক্রুশ

শুভ শুভদিন, শুভ বড়দিন, আজ যিশুর শুভ জন্মদিন, আজ আমাদের সকলের শুভ বড়দিন। প্রতি বছর ২৫ ডিসেম্বর মহাআড়ম্বরের সাথে আমরা প্রভু যিশুর জন্মদিন তথা বড়দিন উৎসব উদ্‌যাপন করি। বড়দিনে আমরা ঈশ্বরের ভালোবাসা উপলব্ধি করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আমরা আনন্দ উল্লাস করি। বড়দিন শুভ দিন, এই দিন আনন্দ করারই দিন। ঈশ্বরপুত্র স্বর্গ হতে এই ভূমিতলে নেমে এলেন। ঈশ্বর ও মানুষের মহামিলনের সন্ধিক্ষণে স্বর্গদূতবাহিনী গভীর উল্লাসে মেতে উঠেছিল। তারা এই শুভ সংবাদ প্রচার করার নিমিত্তে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্যলোকে নেমে এসেছিল। তারা বাদ্য-বাজনায়, বাঁশীর সুরে, খঞ্জনী বাজিয়ে সুউচ্চস্বরে ঈশ্বরের মহিমা গান করে, প্রভু যিশুর জন্ম সংবাদ ঘোষণা করে চলছে। দূতেরা গোটা মানবজাতিকে আহ্বান করে যেন সবাই এই আনন্দ সংবাদ পৃথিবীময় জানিয়ে দেয়। আজ, এই দিনে স্বর্গদূতদের সঙ্গে আমরা প্রভু যিশুর জন্মোৎসবে আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠি। জন্মদিনের শুভ সংবাদ বহন করে নিয়ে চলি একে অপরের কাছে। আজ এই সময়ে, প্রভু যিশুর জন্মকে কেন্দ্র করে বড়দিন উৎসবে আমরা মেতে ওঠি, আনন্দে উৎসবে স্বর্গ পৃথিবীকে এক করে তুলি। কিন্তু সত্যিকার অর্থে, যিশু যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, পৃথিবীর মানুষ তখন বুঝতে পারেনি যে জগতে ঈশ্বরপুত্রের আগমন ঘটেছে। জেনেছিল, বুঝেছিল, মাত্র অল্প কয়েকজন। আকাশে স্বর্গদূতেরা আর পৃথিবীতে, মাঠের রাখালেরা। রাখালেরা কি জানি কি বুঝেছিল! শিশু যিশুকে ঘিরে ছিল, শুধুমাত্র দুইজন মানুষ। যিশুর মা মারীয়া আর পিতা (পালক) যোসেফ। অবুঝ পশুর দল নির্ঘুম রাত্রি কাটিয়ে বড় বড় চোখে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। কি জানি কি উপলব্ধি ছিল তাদের মধ্যে, কিন্তু তারাও ত্রাণকর্তার জন্ম সময়ের সাক্ষী। পূর্ব দেশের পণ্ডিতেরা তখনও এসে পৌঁছেনি। হিম শীতের রাতে এই তো প্রথম বড়দিন। একেবারেই নিরিবিলি, নিভৃতে, শীতের গভীর রাতে।

জন্মদিন উদ্‌যাপন তো আর জন্মলগ্নে নয়, অথার্ৎ তখনই পালন করা হয় না। তার মানে কম করে হলেও আরো এক বছর অপেক্ষা করতে হয় তা উদ্‌যাপন করার জন্য। সেই অর্থে যিশুর জন্মবার্ষিকী পালন করতে শত শত বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। কারণ আমরা জানি না আসলেই মা-মারীয়া আর সাধু যোসেফ,

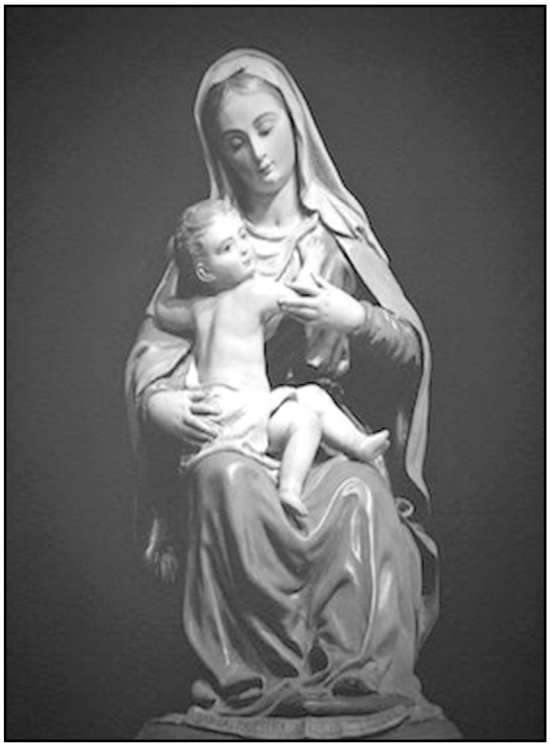

এখনকার পিতা-মাতাদের মত করে, শিশুর জন্ম দিন মনে রেখে, শিশুবেলা থেকেই কেক কেটে উদ্‌যাপন করেছিলেন কিনা। মনে হয় না করেছেন। কারণ, সেই রকম কোন তথ্যের কথা জানা যায়নি, আলোচনায়ও আসেনি। তবে এই শিশুর বিষয়, তাঁর জন্মের আগে থেকেই যে সকল কথা বলা হয়েছে, যে সব ভবিষ্যৎ বাণী ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে করে জন্মের আগে থেকেই তিনি আলোচনার কেন্দ্রে ছিলেন। আর তাই, যিশুর জন্ম থেকেই এই উৎসব স্বর্গ ও পৃথিবী সর্বত্রই উৎসব মুখরিত হয়ে উঠেছে। জাগতিকভাবে, সেই অর্থে যিশুর জন্মদিন বা প্রথম বড়দিন উদ্‌যাপন করা হয়নি বটে। কিন্তু মা-মারীয়া নিজেই সেই বড়দিন উদ্‌যাপন করেছেন, তার আপন ভুবনে। আর সেই বড়দিন শুরু হয় মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা, সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রস্তুতি আর তা বাস্তবায়নের চূড়ান্ত মুহূর্তে যখন মা-মারীযা 'হ্যাঁ' বলেছেন।

এটি অবশ্যই সত্য যে বড়দিন আমাদের জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহের মহাদান। তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে আমাদের জন্য দান করেছেন। ঈশ্বর তাঁর উপহার মা-মারীয়ার মধ্যস্থতায় মানব জাতিকে দিয়েছেন। আমরা যদি আবার অন্য কথায় বলি তাহলে এমনও বলা ভুল হয় না যে, মা-মারীয়া আমাদের মানবজাতির পক্ষ হয়ে ঈশ্বরের নিকট থেকে সেই উপহার গ্রহণ করেছেন, এবং তিনি আবার নিজেকে উপহার হিসাবে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করেছেন। নিজেকে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করে মারীয়া ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করেছেন। এবং একই সঙ্গে তিনি ঈশ্বরের দেওয়া উপহার মানব জাতির জন্য বহন করে নিয়ে এসেছেন। তিনি অদৃশ্য ঈশ্বরকে দেহ দান করে সদৃশ্য/দৃশ্যমান করেছেন। তার উদারতায় আমরা মানব-ঈশ্বরকে পেয়েছি, যিশুকে পেয়েছি। তাঁর উছিলায় আমরা ঈশ্বরকে আমাদের হাতের নাগালে পেয়েছি।

প্রথম বড়দিন! হ্যাঁ, প্রথম বড়দিনের মূলে রয়েছে মা-মারীয়া এবং তাঁর উচ্চারিত ছোট্ট একটি 'হ্যাঁ'। একটা মাত্র বর্ণ, একটা শব্দ, অথচ সম্পূর্ণ একটি বাক্য। শুধু সম্পূর্ণ একটি বাক্য নয়, একটি পরিপূর্ণ বার্তা। এই বাক্য এমনই শক্তিশালী যে, তা দ্বারা স্বয়ং ঈশ্বর ধূলার ধরায় ধরা দিলেন। বড়দিনের কেন্দ্রবিন্দু অবশ্যই শিশুযিশু। কিন্তু এর শুভ সুচনা মা-মারীয়ার সম্মতি 'হ্যাঁ' বলার মধ্যদিয়ে শুরু হয়েছে। তাই বলা যায়, বড়দিনের অনেক আগেই মা-মারীযার জীবনে বড়দিন শুরু হয়েছে। বড়দিনের অনেক আগেই তিনি তাঁর অন্তরে বড়দিন পালন করা শুরু করেছেন। অবশ্যই মা-মারীযার অন্তরে বড়দিন পালনের সঙ্গে আমাদের বর্তমান সময়ের বড়দিন পালন

তুলনা করা চলে না। সেই বড়দিন এখনকার মত সবার মধ্যে নয়, কিন্তু তাঁর নিজের মধ্যে নীরবে নিভৃতে ছিল। কিন্তু অন্তরের উৎফুল্লতা ছিল জাগরিত; আর সেই বড়দিনই প্রথম বড়দিন, একেবারেই আদি ও মৌলিক বড়দিন।

পৃথিবীর সকল জাতি, গোষ্ঠি, দেশ সকলেই আমরা প্রতি বছর ২৫ ডিসেম্বর মহাসমারোহে বড়দিন পালন করি। কিন্তু মা-মারীয়ার বড়দিন কি আসলে, শুধুই ২৫ ডিসেম্বর? ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় আনুষ্ঠানিক বড়দিন পালন করতে অনেক সময় লেগেছে। মোটামুটি যতটা নিশ্চিত হওয়া যায় যে, আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথমবার বড়দিন পালন করা হয় ৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে রোম নগরে। রোম সম্রাট কনস্টাইন খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর রোমে আনুষ্ঠানিকভাবে বড়দিন পালন করার প্রচলন শুরু হয়। পোপ ১ম জুলিয়াস ২৫ ডিসেম্বরকে যিশুর জন্মদিন পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং আহ্বান করেন যেন বিশ্বমণ্ডলী এই দিনকে যিশুর জন্মদিন হিসাবে পালন করে। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঐ বছরই অর্থাৎ ৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে ২৫ ডিসেম্বর যিশুর জন্মদিন তথা বড়দিন পালন করা শুরু হয়। তবে তখনও সারা পৃথিবীতে জাঁকজমক সহকারে বড়দিন পালন করা শুরু হয়নি। সেই বছর শুধু রোম নগরীতে এবং তারপর ধীরে ধীরে সমগ্র বিশ্বে বড়দিন পালন করা শুরু হয়। প্রকৃত পক্ষে ৯ম শতাব্দীর আগ পর্যন্ত বড়দিনের আমেজ ততটা জোরালো ছিল না। মূলত নবম শতাব্দী থেকেই বিশ্বব্যাপী আড়ম্বরের সাথে বড়দিন উৎসব পালন করতে শুরু করে। তাহলে দেখা যায় পুরোপুরিভাবে বড়দিন উৎসব প্রচলন করতে বেশ কয়েক শত বছর সময় লেগে গেছে।

মা-মারীয়ার বড়দিন! হ্যাঁ, মা-মারীয়ার বড়দিন উৎসব উদ্‌যাপন। আমরা যদি মা-মারীয়ার বড়দিন পালনের কথা বলি তাহলে বলতে হয় যে, মা-মারীয়াকে বড়দিন পালনের জন্য এমন করে শত শত বছর অপেক্ষা করতে হয়নি। যদিও যিশুর জন্ম এবং জন্মদিনই বড়দিন বা বড়দিন উদ্‌যাপনের কেন্দ্রবিন্দু, তবুও বলা যায় যে, খ্রিস্ট জন্মের আগেই মা-মারীয়া জন্মদিন পালন করতে শুরু করেন। জন্মের আগে জন্মদিন? অবাক বিষয়! অবাক তো বটেই। জন্মের আগে কিভাবে জন্ম দিন পালন করা সম্ভব? বড়দিন তো মূলত যিশুর জন্মদিন, ঈশ্বরের দেহধারণের দিন। ঈশ্বরের দেহ মারীয়ার গর্ভে তিল তিল করে গড়ে উঠছিল, তাঁর (যিশুর) জন্মেরও নয় মাস আগে থেকেই। আর মারীয়া প্রতি মুহূর্তেই তা উপলব্ধি করেছিলেন। সেই কারণেই শিশু যিশুর জন্মের আনন্দটা মা-মারীয়া আগেই উপলব্ধি করতে শুরু করেন। আমরা যদি আরো পিছনে ফিরে যাই, স্বর্গদূত গাব্রিয়েলের সঙ্গে মা মারীয়ার সাক্ষাৎ, তাদের কথোপকথন খেয়াল করি। স্বর্গদূত গাব্রিয়েল যখন তাকে অভিবাদন করেন এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্বকারী দূত ঈশ্বরের কথাগুলি মা-মারীয়াকে শুনিয়েছেন। মারীয়া গভীর মনোযোগের সঙ্গে অসম্ভব কথাগুলি শুনছিলেন। নিজের বাস্তবতা উপলব্ধি করছিলেন। বুদ্ধিমতি নারীর মত বাস্তবতার নিরিখে প্রশ্নও করেছেন। এক অনিশ্চিত, অনিরাপদ ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা! তারপরও ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেছেন। পুরোপুরি বিশ্বাস করে আত্মসমর্পণ করেছেন। এবং দুরু দুরু বুকে ভয় অনুসৃত কণ্ঠে বলেছেন, 'আমি প্রভুর দাসী, আপনি যা বলেছেন, আমার তাই হউক'। যে দিন, যে মুহূর্তে তিনি 'হ্যাঁ' বলেছেন, সেই দিনই তাঁর মধ্যে বড়দিন শুরু হয়েছে। তাই স্বর্গদূতের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন অর্থাৎ ২৫ মার্চই মা-মারীয়ার জীবনে প্রথম বড়দিন এসে যায়। মা-মারীয়া তার বড়দিনের আনন্দ প্রকাশের জন্য ঈশ্বরের বন্দনায় মুখর হয়েছেন, তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেয়ে উঠেছেন, "প্রাণ আমার পরমেশ্বরের মহিমা গায়..."। জ্ঞাতি বোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ; দুই বোনই ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করেছেন। এলিজাবেথের সঙ্গে সাক্ষাতে তার জীবনের অপার আনন্দের কথা সহভাগিতা করেছেন। এলিজাবেথের কথা- 'তোমার অভিবাদন যে-ই না আমার কানে এলো, ওমনি আনন্দে আমার গর্ভের শিশুটি নড়ে উঠল" এই কথাগুলিও মা-মারীয়ার অন্তরে বড়দিন উৎসবের দোলা দিয়ে গেছে। তিনি আবারও উপলব্ধি করলেন যে তাঁর গর্ভে ঈশ্বরপুত্র দেহ ধারণ করছেন, ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছেন। শুধু মা-মারীয়া নিজেই নয়, তার চার পাশে থাকা পবিত্র মানুষেরা তা উপলব্ধি করেছেন।

মা-মারীয়ার বড়দিন! প্রথম বড়দিন! কেমন ছিল তার প্রথম বড়দিনের অভিজ্ঞতা? এমন অনেক বিষয় আছে, অভিজ্ঞতা আছে, যা প্রকাশ করা যায়। অনেক করে বুঝিয়ে বললেও যথার্থভাবে বুঝিয়ে শেষ করা যায় না, অন্যকে তা উপলব্ধি করিয়ে দেওয়া যায় না। মা-মারীয়ার প্রথম বড়দিন পালনও এমনই এক জটিল ভালো লাগার অনুভূতি। এমনিতেই তো কোন নারী তার সন্তান গর্ভে ধারণের অভিজ্ঞতা এবং সন্তান জন্ম দানের উপলব্ধি বর্ণনা করে তা পরিপূর্ণভাবে ব্যক্ত করতে পারে না। আর মা-মারীয়া তো স্বয়ং ঈশ্বরকে গর্ভে ধারণ করেছেন। তাই এই আনন্দ, এই উপলব্ধি আরো কত গভীর, কত না ব্যাপক। এটা আমরা শুধু কল্পনা করতে পারবো। কিন্তু আমাদের কল্পনায়ও তা শেষ হবে না।

নাজারেথের পথে, বেথলেহেম নগরের এক গোশালায়, রাত্রি দ্বি-প্রহরে মা-মারীয়া যিশুকে জন্ম দান করেন। শিশুর জন্মের পর যিশুর দিকে তাকিয়ে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন, শিশুযিশুর কচি হাত, তুল তুলে নরম দেহ, আদরমাখা গাল, ফুটফুটে এক আলোকশিশু তাকে যেন ভাবিয়ে তুলছিল; তিনি এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, তিনি এর মা! একেবারে সাদামাটা সাধারণ পরিবেশ, গোয়াল ঘরে, যাবপাত্রে শোয়ানো এক দেবশিশু, তার চোখের সামনে; যাঁকে তিনি গর্ভে ধারণ করেছেন, তিনি তাঁকে নিজের কোলে নিয়ে স্পর্শ করছেন, আদর করছেন। এ শিশু স্বয়ং ঈশ্বর, তার নিজের ঈশ্বর, তার আপন সৃষ্টিকর্তা। এই অনুভূতি, এই উপলব্ধি, এই অভিজ্ঞতা, এই আনন্দ কি বলে বুঝানো যায়! এই তো মা-মারীয়ার বড়দিন। ২৫ ডিসেম্বর আমরা শিশু যিশুর মূর্তি স্পর্শ করে, চুম্বন করে, কত আনন্দ উপলব্ধি করি। আর মা মারীয়া তো স্বয়ং ঈশ্বরকে (শিশুযিশু, পুত্রঈশ্বর) বুকে জড়িয়ে রেখেছেন। তার আনন্দ কত গভীর, তার বড়দিন কত বেশি আবেগময়, কত বেশি বিস্ময়কর।

যিশুর জন্ম, শৈশব, কৈশোর যৌবন, প্রৈরিতিক কাজ, মৃত্যু, পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ এবং আরো অনেক অনেক বছর পর আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে বড়দিন পালন করতে শুরু করেছি। বলা যায় যে যিশুর মৃত্যুরও বহু বছর পর তার জন্ম উৎসব তথা বড়দিন উৎসব উদ্‌যাপন করা শুরু করা হয়। তাই বড়দিন শুধু পালন বা উৎসব নয়। বড়দিনের গভীর তাৎপর্য হৃদয়াঙ্গম করতে হবে। আসলে বড়দিন এক গভীর অনুভূতির বিষয়। সেই অনুভূতি ঈশ্বরকে আলিঙ্গন করার অনুভূতি। যা মা-মারীয়া করেছেন। প্রকৃত বড়দিনের অনুভূতি উপলব্ধি করতে হলে মা-মারীযার মতো আমাদেরও যিশুকে ধারণ করতে হবে। মা-মারীযার সঙ্গে, মা-মারীয়ার মত করে বড়দিন উৎসব করতে হবে। প্রকৃষ্ট বড়দিন উৎসবের নিগুঢ় দৃষ্টান্ত হলেন মা-মারীয়া॥

বড়দিনে মানব সত্তায় জীবনের দায়িত্ব ও স্বাধীনতা

ব্রাদার জেমস্ রিপন গমেজ সিএসসি

যিশুর জন্মদিন বড়দিনে খ্রিস্টান সমাজ আনন্দে মুখর হয়ে ওঠে। এদিন বিশ্ববাসীকে পাপ থেকে উদ্ধার করতে যিশুর আদর্শ তাদের প্রেরণা দেয়। তারা স্বপ্ন দেখে, যিশুর বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আগামীতে এক আনন্দময় ও পাপমুক্ত বিশ্ব গড়ে উঠবে। বড়দিন উদ্‌যাপনের আনন্দ যেন মানুষের মধ্যে সত্যিকার মানবতাকে জাগ্রত করে; মহামানব যিশু যে প্রেম, শান্তি ও সম্প্রীতির শিক্ষা প্রচার করেছেন, তার যথার্থ প্রতিফলন যেন সবার জীবনে ঘটে, তাহলেই বড়দিনের উৎসব সবার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। বড়দিন উপলক্ষে যে প্রেম, প্রীতি ও শান্তির বাণী প্রচার করা হয় তার মূলে রয়েছে মানবতা। কোন ধর্মই এই বোধ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বড়দিন মানুষকে শান্তি, প্রেম ও সম্প্রীতির শিক্ষা দেয়। দিনটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ প্রার্থনা করা হবে। দেশের সকল মানুষ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ায় ব্রতী হবে এই আশা বড়দিনে।

আজ শুভ বড়দিন। ঈশ্বর আমাদের জন্য ভালোবাসায় ব্যাকুল আর এর জন্যই তিনি আমাদের মাঝে নেমে এসেছেন। বড়দিনের এই আনন্দক্ষণে ঈশ্বরের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ আমাদের অন্তরে অনুভব করা খুবই দরকার। ঈশ্বরই ভালোবাসা, ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন, অনুভব করেন, গ্রহণ করেন, ডাকেন, সাহায্য করেন ও ক্ষমা করেন। তিনি চান আমারাও যেন দায়িত্বশীল ও স্বাধীনভাবে নিজেকে ও অপরকে অনুভব করি, গ্রহণ করি, ডাকি, সাহায্য করি ও ক্ষমা করি। বড়দিনে আমরা কিভাবে আরো দায়িত্বশীল ও স্বাধীন হয়ে ও ঈশ্বরের ভালোবাসা বুঝে নিজেকে এবং অন্যকে ভালোবাসতে পারি- আমার এই লেখার উদ্দেশ্য।

এক: মানুষ ঈশ্বরের আপন প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট জীব। আদি পুস্তকে ঈশ্বর বলেন, "এবার আমি মানুষকে আমার প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করবো। এই মানুষ, সমাজ সৃষ্ট জীবের উপর কর্তৃত্ব করবে"। তাই আমরা বলতে পারি মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও ঈশ্বরের ভালোবাসায় সমৃদ্ধ ও গুণান্বিত সৃষ্টি।

দুই: মানুষের মধ্যে পশুত্ব ও মনুষত্ব দু'টোই বিভাজিত থাকে। যত পরিমান মানুষ তার পশুত্ব অনুশীলন করবে ততটুকুই মনুষত্ব কমবে ও যতটুকু মনুষত্ব অনুশীলন করবে ততটুকু পরিমান তার পশুত্ব কমবে। মানুষের মধ্যে বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক দু'টো দিক সমপরিমাণ বিভাজিত থাকে। প্রতিটি মানুষের মধ্যে আত্মা বিদ্যমান থাকে আর তা সাহায্য করে প্রতিটি মানুষকে আধ্যাত্মিক হওয়ার জন্য। আধ্যাত্মিকতা যুক্ত থাকে মানুষের আত্মা ও শরীরের মধ্যে। আত্মা ও শরীরের কাজ হলো মানুষকে বৈষয়িক যত্ন এবং বৈষয়িক দিকগুলোর চাহিদা পূরণ করে ব্যক্তিকে যত্নে রাখা। আত্মা সর্বদা ব্যক্তিকে সাহায্য করে ঐশ্বব্যক্তি হওয়ার জন্য, এর ফলে ঐশ্বব্যক্তি ঐশ্ব প্রেমে নিমগ্ন থাকে।

তিন: প্রত্যেকজন ব্যক্তিই তার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের দিক থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র। প্রত্যেক মানুষই আলাদা ব্যক্তিত্বের অধিকারী, এমন কি তার নিজস্ব আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকেও স্বতন্ত্র। তার এই স্বতন্ত্র ও আলাদা ব্যক্তিত্বের উপর ভিত্তি করেই প্রত্যেক ব্যক্তি তার জীবনের আহ্বান খুঁজে নেয় বা আবিষ্কার করে ও ঈশ্বরের অনুসরণ করে।

চার: পুরুষ ও নারী এই দুইজন ব্যক্তিই স্বতন্ত্র ও আলাদা, কিন্তু তাদের মর্যাদা এক। জীবন যুদ্ধে ও ভালোবাসায় তারা এক ও সমান। ঈশ্বরের সৃষ্টি হিসেবে প্রত্যেক পুরুষ ও নারীদের একই অধিকার আছে। তারা হয়তো শারীরিক দিক থেকে আলাদা কিন্তু একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। নারী ও পুরুষ একসাথে একটা পূর্ণতা সৃষ্টি করে। এই পূর্ণতা শুধু শারীরিক বা মনোজাগতিক দিক দিয়ে নয় কিন্তু সত্ত্বার বা অস্তিত্বের প্রকৃতির দিক দিয়ে। পুরুষ ও নারীর সমন্বয়েই একজন ব্যক্তির মধ্যে পূর্ণ মনুষত্ব তৈরি হয় ও ব্যক্তি পূর্ণ বাস্তবতার রূপ গ্রহণ করে। তাদের মিলনেই ঈশ্বর যে শুধু তাঁর সহসৃষ্টি কাজে দায়িত্ব বা সংযুক্ত করেছে তা নয় বরং তাঁরা উভয়ই সৃষ্টির অংশীদার হন। সৃষ্টির ইতিহাসে প্রথম থেকেই নারী হলো পুরুষের প্রথম সাহায্যকারী এবং পুরুষ হলো নারীদের প্রথম সাহায্যকারী।

পাঁচ: সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোয় বা উচ্চ হীন-কামনা দ্বারা একজন মানুষ বা ব্যক্তির উচিৎ প্রভাবিত না হওয়া। জীবনের জন্য স্বাধীনতা, উন্মুক্ততা মানুষের অত্যাবশ্যকীয় হাতিয়ার যা দিয়ে মানুষ আত্মনিয়ন্ত্রিত হবে। তবে তা-হবে দায়িত্বশীল, স্বাধীন ও উন্মুক্ত। কোন কিছু হওয়া থেকে বা যে পথে মানুষ চলতে চায় তা বাঁধা দিতে নেই। প্রত্যেক মানুষেরই নিজেকে সাহায্য করা উচিৎ যা সে হতে চায়, যেভাবে চলতে চায় ও যেভাবে সে কাজ করতে চায়। তবে এগুলো করতে গিয়ে মানুষ বা ব্যক্তির যেন নিজের ও অন্যের ক্ষতির কারণ না হয়ে ওঠে।

ছয়: এটা মনে রাখা উচিৎ যে, মানুষ যা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তা তার করতেই হবে, তবে সেখানে থাকবে মানব কল্যাণ ও সৃষ্টির কল্যাণ, সত্য ও সুন্দরের উৎকর্ষতা সাধন। সেখানে অন্যায় অন্যায্যতা বা স্বার্থপরতার প্রভাব ও দাসত্বের মনোভাব থাকবে না।

সাত: মানুষ সামাজিক জীব। কোন মানুষই একা থাকতে পারে না। জন্ম থেকেই মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে সমাজে বসবাস করে আসছে। মানুষ সমাজের সৃষ্টিকর্তা। একে অন্যের সাথে বসবাস

করে, আদান প্রদান করে মানুষ তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করে সন্তুষ্ট হয়।

আট: একজন ব্যক্তির উচিৎ স্বাধীনতা অনুশীলন করার আগে আইন, নীতিমালা জানা, আয়ত্ত করা ও অনুশীলন করা। এই আইন, নীতিমালা আমাদের সাহায্য করে সর্বজনীন চরিত্রের অধিকারী হতে এবং এই নীতি আমাদের সাহায্য করে বুঝতে, জানতে, অনুশীলন করতে। সকল দায়িত্ব, অধিকার ও স্বাধীনতা ব্যবহার করার পূর্বে ব্যক্তির চিন্তা ও সমন্বয় করতে হয় প্রকৃতির সাথে ও সহভাই-বোনদের সাথে। প্রকৃতি ও সহভাই-বোনদের ক্ষতি করা ও বিরক্ত করা আমাদের শুধু মনের ও শারীরিক দিকে অসমতাই নিয়ে আসে না বরং ব্যক্তির ব্যক্তিজীবনে, তার পরিবারে, সমাজে ও পৃথিবীতে নিজস্বতায় টিকে থাকতে বাঁধা সৃষ্টি করে।

নয়: একজন বিকলাঙ্গ, মানুষেরও ভালোবাসা, দায়িত্ব ও অধিকার পাবার এবং অনুশীলন করার অধিকার আছে। একজন স্বাভাবিক মানুষ যে ভাবে তার দায়িত্ব ও অধিকারগুলো ভোগ করে, ঠিক একই ভাবে একজন বিকলাঙ্গ মানুষেরও সেভাবে স্বাধীনতা, পছন্দ, উন্মুক্ততা ভোগ করার অধিকার আছে। তবে বিকলাঙ্গদের স্বক্ষমতা ও অক্ষমতা তথা যেখানে যতটুকু দরকার ও অর্থপূর্ণ এই বিবেচনা মাথায় রেখে বিকলাঙ্গদের সাথে অবস্থান করা ও তাদের যত্ন নেওয়া আমাদের দায়িত্ব। খেয়াল রাখতে হবে বিকলাঙ্গ মানুষ যেন সমাজে সুস্থ আনন্দ ভোগ করে।

দশ: স্বভাবগত ভাবেই একজন মানুষ আবেগ অনুভূতিশীল, কৌতুহলী, কারণ জানতে আগ্রহী। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী। সে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে নিয়ে চিন্তা করতে পারে। আর এই জন্য সে সমস্ত জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিচার বিবেচনা ও আইন এর ক্ষেত্রে মানুষই ধারক ও বাহক। মানুষের মধ্যে সত্ত্বা আছে, বিবেকবোধ আছে। আর বিচার-বিবেচনা করার শক্তি, বিবেক-বোধ, আবেগ-অনুভূতি মানুষের মধ্যে বন্ধনের সৃষ্টি করে ও সমাজে একে অন্যের সাথে বাস করার জন্য তাগিদ যোগায়।

এগার: মানুষ ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন একটি জীব। সে যে বংশেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন তার ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সে তার জীবনের ভাগ্য বিধাতা হতে পারে। অন্যথায় কামারের ছেলে কামারই হতো বা জেলের ছেলে জেলেই হতো।

বার: সকল মানুষই সমান, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। সে যে ধরনের স্বাধীনতা, অধিকার ভোগ করবে, ঠিক সেভাবেই উচিৎ অন্যদের একই স্বাধীনতা, অধিকার ভোগ করার সুযোগ প্রদান করা। প্রকৃতির নিয়ম-কানুন হলো চিরস্থায়ী ও ঐশ্বরিক। প্রকৃতির নিয়ম যা মানুষকে আদেশ করে, তা যেন মানুষ সর্বদা পালন করে। একজন মানুষ যে অধিকার ও দায়িত্বগুলো পালন বা ভোগ করে, ঠিক একই ভাবে অন্যেরাও যেন তা ভোগ করতে পারে।

তের: প্রত্যেক মানুষই তার মনুষ্যত্ব, জীবন কার্যাবলী, তার সামর্থ ও শক্তি নিবেদন করে নিয়ন্ত্রিত হয় সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছে। সর্বসাধারণ ও সর্বোচ্চ ভালোর জন্য মানুষের উচিৎ বিবেক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া। কারণ বিবেক কখনো মানুষকে খারাপ বা ধ্বংসের দিকে ধাবিত করে না। বিবেক কখনো অন্যের অধিকার খর্ব করে না। প্রতিটি মানুষেরই কিছু মানবিক আধিকার আছে। এই অধিকারগুলো সর্বজন স্বীকৃত। এই অধিকারগুলোর মধ্যে সর্বসাধারণ অধিকার হলো- বেঁচে থাকার অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার।

চৌদ্দ: প্রকৃতিগত ভাবে সকল মানুষই ভালো। তবে প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু না কিছু দুর্বলতা আছে। প্রত্যেক মানুষেরই বিচার-বিবেচনা করার শক্তি আছে। আর এই বিচার-বিবেচনা খাটিয়ে মানুষ বেঁছে নেয় ভালো ও মন্দ, ঠিক বা বেঠিক, সত্য বা মিথ্যা, নৈতিকতা বা অনৈতিকতা। আর এগুলোর মধ্য দিয়েই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় নৈতিকতা। কোন কোন সময় ব্যক্তির ভুল সিদ্ধান্ত অতীত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। অন্যের সাহায্য পরিচালনা বা কাউন্সিলিং ব্যক্তিকে সাহায্য করতে পারে ব্যক্তির ভুল সিদ্ধান্ত ও অনৈতিক আচার আচরণ থেকে ওঠে আসার জন্য। এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে ব্যক্তি যদি নিজের এই অবস্থা থেকে ওঠে আসার জন্য প্রস্তুত থাকে। এখানে সবচেয়ে দরকার ব্যক্তির ব্যক্তিগত আত্মসচেতনতা বোধ।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, "ত্যাগের সাথে ভালোবাসা শব্দটির ভারি সম্পর্ক আছে"। ভালোবাসা ছাড়া ত্যাগ হয় না আবার ত্যাগ ছাড়া ভালোবাসা হয় না। ভালোবাসা সেই যার কোন প্রয়োজন নেই তবুও সে আমাদের জন্য সমস্তই ত্যাগ করে প্রতিনিয়তই আমাদের সাথে অনুভব করছেন। ঈশ্বর হলো ভালোবাসা। আর এই ভালোবাসার সাথে ভালোবাসার দ্বারাই যোগ হবে। এবারের বড়দিন আমাদের আমন্ত্রণ জানায় যেন আমারা আরো দায়িত্বশীল ও স্বাধীন হয়ে ঈশ্বরকে, নিজেকে ও আমার প্রতিবেশিকে অন্তরদৃষ্টি দিয়ে যেন অনুভব করতে পারি, গ্রহণ করতে পারি, সাহায্য করতে পারি, ক্ষমা করতে পারি। আসুন আমরা ভালোবাসার সাথে ভালোবাসার মধ্যদিয়ে নবজাতক খ্রিস্টের সাথে একাত্ব হই।

Bibliography:

1. Schechter, Solomon. Documents of Jewish Sectaries, vol. 1: Fragments of a Zadokite Work. Cambridge: Cambridge University Press, 1910.
2. Human Nature in Gregory of Nyssa, Johannes Zachhuber, Pages 246–256.
3. Ehrlich, Paul (2000). Human Natures: Genes, Cultures, and the Human Prospect. Washington: Island Press/ Shearwater Books.
4. Symons, Donald (1981). The Evolution of Human Sexuality. New York: Oxford University Press.
5. শান্তিনিকেতন, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৭-২১০ পৃষ্ঠা॥

বাণীর দেহধারণঃ বড়দিন উৎসব

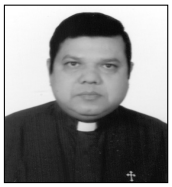

ফাদার দিলীপ এস কস্তা

মিলন ধ্যানে বড়দিনের চিন্তা

স্বভাবগত ভাবেই মানুষ উৎসব প্রিয়। মানুষের জীবনে উৎসব আসে নানাবিধ কারণে, সময়ে-অসময়ে। উৎসব আসে মানুষে-মানুষে মিলনের লক্ষ্যে, আনন্দের তরী বেয়ে, জীবন নবায়ন করতে এবং যাপিত জীবনের এক ঘেয়েমী দূর করতে। উৎসবের উপলক্ষ্য, সামাজিক, ধর্মীয়, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, দেশাত্মক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি। ধর্ম মানুষের জীবনের অপরিহার্য বাস্তবতা। ধর্মকে আশ্রয় করে উৎসব ও পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলোর বিভিন্ন উৎসব বা পর্ব রয়েছে যা ভক্ত বিশ্বাসীদের জীবন নবায়িত করতে সহায়তা দান করে। খ্রিস্টান ধর্মের প্রধান পর্ব বড়দিন ও পুনরুত্থান পর্ব। তবে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত ও আনন্দের উৎসব হলো বড়দিন। ঈশ্বর পুত্র যিশুখ্রিস্টের জন্ম দিন হলো বড়দিন এবং পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মে যিশু খ্রিস্টের জন্ম বিবরণী বর্ণনা ৪ টি মঙ্গলসমাচারে রয়েছে (*দ্রষ্টব্য মথি ১: ১৮; ২: ১-১২; মার্ক ১: ১-১১; লুক ২: ২৬-৪৫; ২: ১-২০; যোহন ১: ১-১৮*)। যিশুখ্রিস্ট যে মুক্তিদাতা ত্রাণকর্তা হিসাবে আগমন করবেন সেই ভবিষ্যৎ বাণীতে প্রবক্তা ইসাইয়া বলেন "ঐ দেখ, তোমার পরিত্রাতা আসছেন" (*ইসাইয়া ৬১:১১*)। তিনি আরো বলেন, "দেখ যুবতীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করবে তার নাম রাখবে ইম্মানুয়েল। ইম্মানুয়েল নামের অর্থই আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর। যে সন্তানের কথা বলা হয়েছে, তিনি হলেন আহাজ রাজার ছেলে হেজেকিয়া যিনি ধর্মরাজ বলে পরিচয় দিলেন। কিন্তু ইহুদি ঐতিহ্য সমর্থন করতে ভবিষ্যদ্বাণীটা আর এক রাজাতে, এমনকি মোশীহ রাজাতে পূর্ণতা লাভ করবে, আমরা জানি তিনি সেই প্রকৃত মশীহ রাজ যিশু যার দ্বারা ঈশ্বর 'সত্যি আমাদের সঙ্গে বাস করলেন" (*জুবিলী বাইবেল, পৃষ্ঠা, ১০৫৪*)। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় যিশুর আগমনে জগতে আনন্দের পূর্ণতা লাভ করেছে- "তাই তোমার আনন্দ আমার' পর তুমি এসেছ নীচে/আমার নইলে, ত্রিভূবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে"।

বর্তমানের বড়দিনের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় উৎসবে, অন্যদিকে বাহ্যিক অনুষ্ঠানাদি, সাজ-সজ্জা, কীর্তন-কনসার্ট, কেক-পিঠা, পানাহার-পার্টি, গান-কবিতাসহ নানাবিধ উৎসবের ঘনঘটা আয়োজন। প্রতিবছর বড়দিন কেন্দ্রিক প্রকাশনা প্রকাশিত হয় মহাসমারোহে। বড়দিন উদ্‌যাপনে ঘাটতি নেই কোথাও। তবে বড়দিনের আধ্যাত্মিক চেতনাটি বিশ্বাসী-ভক্তদের বড় করেই দেখতে হবে। বিশ্বাস-ভালোবাসা, ক্ষমা দেওয়া-নেওয়ায় বেড়ে ওঠার আহ্বানে বড়দিন। স্রষ্টা ও সৃষ্টির সাথে মিলিত হওয়াই হবে অর্থপূর্ণ বড়দিন, সার্থক ও সুন্দর বড়দিন।

পুরাতন নিয়মের মুক্তিদাতার ইঙ্গিত বার্তা

পবিত্র বাইবেলের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা হলেন ইসাইয়া। তিনি ৭৬২ খ্রিস্টপূর্বে তার প্রাবক্তিক বাণীতে বলেন, "ঐ দেখ, তোমার পরিত্রাতা আসেন" (*ইসাইয়া ৬১:১১*)। সেই পরিত্রাতা সততা, ন্যায্যতা ও ভালোবাসার পথ দেখাবেন। তিনি হয়ে উঠবেন মুক্তিদাতা, শান্তিরাজ, ধর্মরাজ ও অন্ধকার বিনাশী আলোক বর্তিকা। প্রবক্তা ইসাইয়ার ভাষায় "অন্ধকারে পথ চলছিলো যারা, সেই জাতির মানুষেরা দেখেছে এক মহান আলো; ছায়াছন্ন দেশে যারা বাস করছিলো, তাদের উপর ফুটে উঠেছে একটি আলো" (*ইসাইয়া ৯:১*)। মুক্তিদাতা খ্রিস্ট হয়ে ওঠবেন চলার পথের সাথী। প্রবক্তা ইসাইয়া আরো বলেন, "কেননা আমাদের জন্যে একটি শিশু জন্ম নিয়েছেন, একটি পুত্রকে আমাদের হাতে তুলেই দেয়া হয়েছে। তাঁর কাঁধের ওপর রাখা হয়েছে সবকিছুর আধিপত্য ভার। তাঁকে ডাকা হবে অনন্য পরিকল্পক, পরাক্রমী ঈশ্বর, শাশ্বত পিতা শান্তি রাজ এমনি সব নামে " (*ইসাইয়া ৯:৫*)। প্রবক্তা ইসাইয়া যিশুখ্রিস্টের আগমনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "তখন নেকড়ে বাঘ মেষশাবকের সঙ্গে বাস করবে, চিতা বাঘ শুয়ে থাকবে ছাগল ছানার পাশে। একটি ছোট্ট ছেলে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।...দুধের শিশু তখন কেউটে সাপের পথের উপর খেলা করবে" (*ইসাইয়া ১৬:৬-৮*)। তিনি ঈশ্বরপুত্র খ্রিস্টকে শান্তিরাজ হিসাবেই আখ্যায়িত করবেন। মানুষের জীবনে খ্রিস্টের মুক্তিকর্মের শুভ ফলের ঘোষণা দেন, "ভয় কর না, সাহস ধর! ওই দেখ, তোমার ঈশ্বর! তোমাদের প্রতি যত অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে..রক্ষা করতে নিজেই আসছেন তিনি। এবার খুলে যাবে অন্ধের চোখ, অবারিত হবে বধিরের কান। খোঁড়া মানুষ লাফিয়ে উঠবে... (*ইসাইয়া ৩৫:৪-৬*)। তিনি আরো বলেন, 'মেষপালক নিজেই এসে দু'হাতে তাঁর নিজের পালের যত্ন নিবে' (*ইসাইয়া ৪০:১১*)।

নতুন নিয়মে মুক্তিদাতা

সমগ্র মঙ্গলসমাচারে দেখানো হয়েছে আব্রাহাম, ইসাহাস ও যাকোবের ঈশ্বর, মোশীর ঈশ্বর ও এলিয়ের ঈশ্বর হলেন স্বয়ং যিশু খ্রিস্টেরই পিতা। পবিত্র নতুন নিয়মে মারীয়ার নিকট স্বর্গদূত গাব্রিয়েলের অভয়বাণীতে উচ্চারিত হয় "ভয় পেয়ো না, মারীয়া! তুমি পরমেশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেছ। শোন, গর্ভধারণ করে একটি পুত্রের জন্ম দিবে, তাঁর নাম রাখবে যিশু। তিনি মহান হয়ে উঠবেন, পরাৎপরের পুত্র বলে পরিচিত হবেন" (*লুক ১: ৩০-৩২*)। যিশুর আগমনের মধ্যদিয়ে সকল মানুষই তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা জানিয়েছিলো। তাদের মধ্যে প্রথমত স্বর্গদূত, দ্বিতীয়ত, রাখাল ও তৃতীয়ত তিন পণ্ডিত। তাই বিশ্বের সকল মানুষই শিশু যিশুকে ভক্তি-শ্রদ্ধা জানাতে আহূত। চারটি মঙ্গলসমাচারের মধ্যেই যিশুর জন্মকাহিনীর বিবরণ পাওয়া যায় (*মথি ১: ১৮; ২: ১-১২; মার্ক ১: ১-১১; লুক ২: ২৬-৪৫, ২: ১-২০*)। যোহন লিখিত মঙ্গলসমাচারে বাণীর দেহধারণের বিষয়টি বর্ণনা করা হয় (*দ্রষ্টব্য যোহন ১: ১-১৮*)। তবে সাধু লুকের লেখা মঙ্গলসমাচারে যিশুর জন্ম কাহিনী বিশদ আঙ্গিকে লেখা হয়। এটিকে বাংলায় 'বড়দিন' নামকরণের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, "মর্যাদার দিক থেকে এটি একটি বড়দিন। যিশু যেহেতু বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য ধর্ম ও দর্শন দিয়ে গেছেন, বিশ্বব্যাপী বিশাল অংশের মানুষ তার দেয়া ধর্ম ও দর্শনের অনুসারী। যিনি এতো বড় ধর্ম ও দর্শন দিলেন ২৫ ডিসেম্বর তার জন্মদিন। সে কারণেই এটিকে বড়দিন হিসেবে বিবেচনা করে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ"।

খ্রিস্টযাগ কেন্দ্রিক বড়দিন

শুরুর দিকে বড়দিন ছিল খ্রিস্টযাগ কেন্দ্রিক। বড়দিনের খ্রিস্টযাগের প্রথম লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় এথেরীয়ার (Etheria) ডাইরীতে। সেখানে লিখিত রয়েছে যে, মধ্য রাত্রিতে বেথলেহেম নামক স্থানে মিসাবলী উৎসর্গ করা হতো। খ্রিস্ট বেথলেহেমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এটাই মিসার মাধ্যমে স্মরণ করা হতো। এই রীতি খুব শ্রীঘ্রই রোমে ছড়িয়ে পড়ে এবং বড়দিন উৎসবকে কেন্দ্র করে তিনটি খ্রিস্টযাগ অর্পণের রীতি চালু প্রচলিত হয়। বড়দিনে তিনটি খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হতো এবং খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য হলো: প্রথমত: মধ্য রাতের খ্রিস্টযাগ যা শাশ্বত পিতার কোলে বাক্যের অনন্ত জন্মের স্মরণে। দ্বিতীয়ত: ভোরের খ্রিস্টযাগ যা মারীয়ার মাধমে মাংসের নম্রতায় পার্থিব জন্ম। তৃতীয়ত: বিশ্বাসীদের হৃদয়ে যিশুর জন্ম ও বিচার দিনে চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন। বড়দিনের উদ্‌যাপনের বহু পথ পাড়ি দিয়ে এখনো তিনটি খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। মধ্য রাতের খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে যিশুর জন্ম রহস্য ধ্যান করা হয়। বর্তমানে বড়দিনের প্রস্তুতিতে নভেনা, খ্রিস্টযাগ, ব্যক্তিগত ধ্যান-প্রার্থনা, পাপস্বীকার ইত্যাদিতে বড়দিনের বাহ্যিক প্রস্তুতি স্থান পায়। বাড়ীঘর, রাস্তা-ঘাট, গির্জা-বাসিলিকা সাজানো, নতুন নতুন পোশাক উপাসনার সঙ্গীত-কীর্তন, সাজ-পোশাক ইত্যাদি।

যিশুর জন্মের ত্রিমাত্রিক প্রকাশ

বেথলেহেমের গোশালার যিশুর জন্ম হয়। জগতের মানুষের কাছে এই সংবাদ হয়ে ওঠে আনন্দের মহা সংবাদ। তাঁর জন্ম রহস্যকে আমরা তিনটি ধাপে দেখতে পাই। যার মধ্যদিয়ে ঈশ্বর পুত্রের মহিমা পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়।

প্রথমত: দেবলোকের মহা সংকীর্তন ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে এক মিলন বন্ধন সৃষ্টি করে। দূত বাহিনীর মহা সংবাদটি হলো: "জয় উর্ধ্বলোকে পরমেশ্বরের জয়!/ইহলোকে নামুক শান্তি তার অনুগৃহীত মানবের অন্তরে"(*লুক ২:১৮*)।

দ্বিতীয়ত: মেষপাল, রাখাল, দীন-দরিদ্র মানুষ এবং ইহুদী সমাজে উপেক্ষিত শ্রেণীর মানুষ (*লুক ২:২০*) একসাথে পথ চলার আহ্বান পায়। তবে সর্বযুগেই রাখালেরা অবহেলিত ও দরিদ্র মানুষের প্রতীক।

তৃতীয়ত: প্রাচ্য দেশীয় তিনজন পণ্ডিতের (*মথি ২:১-১২*) কথা বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে। তবে পণ্ডিতদের নাম পাওয়া যায় না। প্রচলিত কথা ও ঐতিহ্য অনুসারে তিন পণ্ডিত হলেন, বালথাজার, কাস্পার ও মালখেয়র। প্রাচ্যদেশের তিনপণ্ডিত শিশু যিশুকে প্রণাম জানায় এবং উপহার (সোনা, ধূপ, ও গন্ধ নির্যাস) সামগ্রী দিয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তি জ্ঞাপন করতে এসেছিল। অনেকের মতে সম্ভবত পণ্ডিতগণ আরব দেশ থেকে বা মেসোপটেমিয়া থেকে এসেছিলেন।

বরেন্দ্রের আদিবাসী কৃষ্টিতে বড়দিন

বাংলাদেশে প্রায় অর্ধশত নৃ-জাতিগোষ্ঠী রয়েছে। এদের মধ্যে হাতে গোনা পাঁচ সাতটি নৃ-গোষ্ঠী খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। প্রতিটি নৃ-গোষ্ঠীরই নিজস্ব পরিচয়, ভাষা সংস্কৃতি ও ধর্ম রয়েছে। দীক্ষিত হওয়ার মধ্যদিয়ে খ্রিস্টের শিষ্য হয়েছে তবে ভাষা ও কৃষ্টির অনুশীলনের মধ্যদিয়ে উপাসনা ও উৎসবাদি উদ্‌যাপন করা হয়। বৃহত্তর দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের দীক্ষিত নৃ-জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে সাঁওতাল, মাহালি, ওরাও, মুণ্ডা, পাহাড়িয়া, মালো, মাহাতো ইত্যাদি। এ সকল নৃ-জনগোষ্ঠীর আদি নিবাস ভারতের ঝাড়খাণ্ড রাজ্যসহ অনেক স্থানে পিমে মিশনারীদের দ্বারা একশত বছর পূর্বে উত্তরবঙ্গে খ্রিস্টের বাণী প্রচারিত হয়েছ এবং বেশ কয়েকটি ধর্মপল্লীও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরে প্রথম ধর্মপ্রদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং বিশাল এলাকা জুড়ে বাণী প্রচারের কাজ অব্যাহত রাখে। দিনাজপুর ও রাজশাহী এলাকাটি বরেন্দ্রভূমি নামে পরিচিত। বর্তমানে পাবনা, রাজশাহী বগুড়া, জয়পুরহাট জেলা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ, ভারতের সম্পূর্ণ উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং অধিকাংশ মালদহ জেলা পূর্ণ করে। বিশাল এলাকাটি প্রায় ১০০০০ বর্গ কি.মি. যার বেশিরভাগই পুরাতন পলি সংবলিত।

বরেন্দ্রভূমি ছিল উষর উত্তপ্ত, গাছপালাহীন, মরু এলাকার মতো। বরেন্দ্রের অধিকাংশ এলাকায় এক মৌসুমে আবাদ করা হতো। গাছপালা বলতে তাল, বাবলা, কড়ই ইত্যাদি। বর্তমানে বরেন্দ্রভূমি সবুজের আল্পনায় ঢাকা। বিচিত্র রকমের গাছগাছালি, বছরব্যাপি শাকসবজি, অন্যান্য ফসল উৎপন্ন হয় বরন্দ্রে সেচ প্রকল্পের আশীর্বাদে। বরেন্দ্রর রুদ্র মূর্তি আজ মায়াবী, ফল-ফলাদি, সবুজের অরণ্যভূমি। বরেন্দ্রর গতরখাটা প্রকৃতির সাথে সংগ্রামী মানুষেরা আজ সুখে শান্তিতে জীবন-যাপন করছে। বাংলা পিডিয়ার পৌরাণিক কাহিণী বর্ণনায় বরেন্দ্র হলো "বর শব্দের অর্থ হলো আশীর্বাদ এবং ইন্দ্র শব্দের অর্থ দেবতার রাজা। অর্থাৎ ইন্দ্রের বর বা ইন্দ্রের আশীর্বাদ থেকে সাধারণভাবে বরেন্দ্র শব্দটির উৎপত্তি। এই কাহিনীর অনুসারীগণ বিশ্বাস করেন যে, বরেন্দ্রভূমি ইন্দ্রের পক্ষ থেকে আশীর্বাদ স্বরূপ। রামায়ণ ও মহাভারত গ্রন্থদ্বয়ে বরেন্দ্রভূমিকে পুন্ড্র নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পুন্ড্র নামকরণের পেছনেও রয়েছে পৌরানিক কাহিণী। মহাভারতের বর্ণনা অনুসারে, বলি রাজার পাঁচ সন্তানের মধ্যে একজনের নাম ছিল পুন্ড্র এবং তার নাম অনুসারে এই ভূমির নামকরণ করা হয়। খ্রিস্টপূর্ব ২১৩-২৩২ খ্রিস্টাব্দে শিলালিপির বর্ণনা থেকে জানা যায়, সম্রাট অশোকের শাসনামলে বরেন্দ্রভূমিকে তার আদি অধিবাসীদের নামে নামকরণ করা হতো যাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিল পারিংদাগন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পারিংদাংগন পরিবর্তিত হয়ে বারিন্দা নাম ধারণ করে এবং ভূমির নামও তাই হয়ে যায়"। এই লেখনীর মধ্যদিয়ে বরেন্দ্র অঞ্চলের সাঁওতাল আদিবাসী কৃষ্টিতে বড়দিন উদ্‌যাপনের কিছু দিক তুলে ধরা হলো:

- বরেন্দ্র আদিবাসীদের অধিকাংশের বাড়ি-ঘর মাটির দেওয়াল, ছন ও টিনের। লাল মাটির এই ঘরগুলো বিশাল আকৃতির এবং যথেষ্ট টেকসই। বড়দিনের পূর্বেই মাটির দেওয়ালগুলো সুন্দরভাবে লেপন করা হয় এবং বিভিন্ন রকমের চিত্র ও আল্পনা করা হয়। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের বাড়ী-ঘরগুলোতে যিশু খ্রিস্ট কেন্দ্রিক ছবি, গোশালা ও বিভিন্ন ধরনের শুভেচ্ছা বাণী লেখা হয়। বাড়িঘর, গ্রামের গির্জাঘর ও আঙ্গিনা পরিষ্কার করার সাথে সাথে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিও চলে ভক্তি ও বিশ্বাসের সাথে। ব্যক্তিগত পাপস্বীকার খ্রিস্টযাগ নভেনাসহ সামাজিক দ্বন্দ্ব, দলাদলির বিষয়গুলো মিটমাট করা হয়। বড়দিনের অর্থ ও তাৎপর্যকে বড় করে তোলা হয় গ্রাম ও মহল্লায় সকলে মিলে এক সাথে কাজ করার মাধ্যমে।
- বড়দিনের উপাসনা বা খ্রিস্টযাগে সবাই গুরুত্ব ও ভক্তির সাথে অংশগ্রহণ করে। সামর্থ অনুযায়ী খাবার দাবার ও নতুন পোশাক-আশাকের আয়োজন থাকে প্রতি পরিবারে। তেল পিঠা, চা-মুড়ি, গুড়, শুকরের মাংস ও নিজস্ব কৃষ্টিতে তৈরী পানীয় (হান্ডি) বড়দিনের অন্যতম আয়োজন। গ্রাম বা মহল্লায় মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গায় বড়দিনের বিশেষ কীর্তন (গাদোয়) ও নাচ গান লম্বা সময় নিয়ে করা হয়। ধর্মপল্লী চত্বরে বড়দিন কেন্দ্রিক খেলাধূলা ও যাত্রা নাটকেরও আয়োজন করা হয়। গ্রাম ও মহল্লায় এক সাথে বড়দিনের প্রীতি ভোজেরও আয়োজন করা হয়। বড়দিনে আশীর্বাদ দেওয়া নেওয়া (ডবো জোহার) প্রচলন একটি অতি পুরাতন প্রথা ও সামাজিক মূল্যবোধ। গ্রামের গির্জা ও বাড়িগুলো রঙ্গিন কাগজ, পাতা লতা, ফুল, বিভিন্ন চিহ্ন ও লেখার মধ্যদিয়ে সাজানো হয়।
- বড়দিনের উৎসব ও আনন্দ চলে সপ্তাহব্যাপী। বিশেষভাবে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা সাক্ষাত, আপ্যায়ন, উপহার প্রদান ও আশীর্বাদ বিনিময় গুরুত্বের সাথে করা হয়। আদিবাসী বিশ্বাসীগণ যিশুর জন্ম উৎসব উদ্‌যাপন করার সাথে সাথে নিজেদের জীবনকেও নবায়ন ও মূল্যায়ন করে। কোন কোন জায়গায় পহেলা জানুয়ারিতে ছোট বড়দিন হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয় আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যদিয়ে। বড়দিনকে সান্তালী ভাষায় 'মারাং দিন' এবং উরাও ভাষায় 'বাড়কা দিন' বলা হয়।

উপসংহার

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) ছিলেন একজন অখ্রিস্টান ব্যক্তি। তিনি প্রথম যিশু খ্রিস্টের জন্মদিনকে 'বড়দিন' হিসাবে আখ্যায়িত করেন। যদিও বড়দিনের দিন সময়ের পরিধিতে দশ ঘন্টা মাত্র। সময়ের সীমারেখায় বড়দিন বড় নয় বরং মহামানব খ্রিস্টযিশুর আগমনের মধ্যদিয়ে দিনটি তাৎপর্য মণ্ডিত ও মহান হয়ে উঠেছে। তাই এই উৎসবকে বড়দিন উৎসব বলা খুবই অর্থপূর্ণ। মহান কবি ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) 'খ্রিস্ট' নামক গ্রন্থের 'বড়দিন' প্রবন্ধে আত্মজিজ্ঞাসামূলক প্রশ্ন রেখেছেন যা বর্তমান বাস্তবতায় প্রযোজ্য: "আজ তাঁর জন্মদিন এ কথা বলব কি পঞ্জিকার তিথি মিলিয়ে? অন্তরে যে দিন ধরা পড়ে না সে দিনের উপলব্ধি কি কাল গণনায়? যেদিন সত্যের নামে ত্যাগ করেছি, যেদিন অকৃত্রিম প্রেমে মানুষকে ভাই বলতে পেরেছি, সেই দিনই পিতার পুত্র আমাদের জীবনে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই দিনই বড়দিন- যে তারিখেই আসুক"। যিশু খ্রিস্টের আগমন অতি-দীনহীনভাবে খড় ডেরাঘরে। এটি হলো বিনম্রতার চিহ্ন। এই বিনম্রতার গুণেই যিশু মহৎ হয়েছেন, বড় হয়েছেন। দীক্ষিত মানুষ হিসেবে আমরা প্রত্যেকেই যিশুর মত নম্র হওয়ার আহ্বান পাই বড়দিনের বাণীতে। তাই, আসুন আমাদের বিশ্বাস, ভালোবাসা, ক্ষমা তথা জীবন আচরণে নম্র হয়ে বড় হয়ে ওঠি। শুভ বড়দিন, কল্যাণময় দিন, মঙ্গলময় চেতনায় সম্মুখে যাত্রা॥

বড়দিনে আনন্দ ও পরিবর্তনের আহ্বান

এমরোজ গোমেজ

বছর ঘুরে আবার এল সেই প্রতিক্ষিত তিনটি বড়দিন। খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের জন্য বড়দিন এক আনন্দের ও মিলনের দিন। সারা বছর ব্যাপি প্রতিক্ষা করা হয় এ দিনটির আশায়। কত পরিকল্পনা করা হয়। বাড়ীতে যাব, শ্বশুর বাড়ি, নানার, মামার বাড়ি যাব, কিনা কাটার কত কি। জাগতিক প্রস্তুতির পাশাপাশি আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির জন্য মাতা মণ্ডলী থেকে আহ্বান আসে, আর মাতা মণ্ডলীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রায় সকল খ্রিস্টভক্তগণ কম বেশী প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। সারা বিশ্বের সকল খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ গুরুত্বের সাথে বড়দিন উদ্‌যাপন করে থাকে। যদিও দিনটি সময়ে বিশ্লেষণে ছোট কিন্তু সে বিষয় গুরুত্ব বিবেচনা না করে এ দিনটি যেহেতু খ্রিস্ট প্রভুর জন্মদিন তাই খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ ঘটা করে উদ্‌যাপন করে থাকে। কারণ এদিনটিতে খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের বিশ্বাস অনুসারে মুক্তিদাতা তথা ত্রাণকর্তা জন্মগ্রহণ করেছেন। মুক্তিকামী মানুষের দীর্ঘ অপেক্ষার পর ত্রাণকর্তার জন্ম হওয়ায় দিনটি খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের জন্য খুবই তাৎপর্যময়। বর্তমান বিশ্বের ভোগ বিলাসী জীবন যাপন, ক্ষুধা, অভাব অনটন, যুদ্ধ বিগ্রহ অশুভ প্রতিযোগিতার এক অশান্ত পৃথিবী সময় অতিক্রম করছে। তাই এক্ষণে বড়দিনের গুরুত্ব বিবেচনা একান্ত প্রয়োজন।

পুরাতন যুগে প্রবক্তাদের মুখ দিয়ে উচ্চারিত বিধাতার প্রতিশ্রুতি অনুসারে পাপী তাপী, বন্ধী মানুষকে মুক্ত করতে এজগতে খ্রিস্ট প্রভু জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। প্রাবক্তিক বাণী অনুসারে এটি বাস্তবায়নের দিন বিধায় বিশ্বের সকল খ্রিস্ট বিশ্বাসীগণ দিবসটি বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভির্যের সাথে পালন করে থাকে। যিশুর জীবন সকল মানুষের মুক্তির জন্য। যা তিনি তাঁর যাপিত জীবন যাপনে সকল মানুষের মুক্তির তরে কাজ করে গেছেন। যিশু ছিলেন সার্বজনীন সঙ্গত কারণেই খ্রিস্টমণ্ডলীর সকল সেবা কাজ সার্বজনীন। খ্রিস্ট বিশ্বাসীগণ সকল কাজে সার্বজনীনতা বজায় রেখে চলেছে। খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের বিশ্বাস সমাজে সকল মানুষ সর্ব শক্তিমান এক সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি। সকল মানুষেরই সেবার প্রয়োজন রয়েছে। সবাই ভাল থাকলে সমাজটাও ভাল থাকবে। শুধু একা ভাল থাকলেই সমাজ ভাল থাকতে পারে না। পরম বিধাতা মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের জন্য সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। বিনামূল্যে আমরা সব কিছু পাই, তাই মানুষ মানুষের ভাই। তাই ভাই মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্বও রয়েছে। সৃষ্টির সকল কিছুর সংরক্ষণের ও যত্ন নেয়ার দায়িত্ব আমাদের সকলের। এ দায়িত্ব পালন প্রতিটি মানুষের একান্ত কর্তব্য। মানুষ এ দায়িত্ব পালনে বার বার ব্যর্থ হচ্ছে। আর এর ফলে ঘটছে সকল অঘটন। তাই আজ এ অশান্ত সমাজ থেকে মুক্তি পেতে বার বার খ্রিস্ট যিশুর জন্ম একান্ত প্রয়োজন।

সাধারনত আমরা গঠন পাই পরিবারে। তাই আদর্শ সমাজ গঠনে পরিবারের অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। আর আমরা এ শিক্ষা পাই পবিত্র পরিবারের নিকট। যে পরিবারটি গঠিত হয়েছিল যিশু এবং তাঁর পিতা মাতার সমন্বয়ে ঐশরিক ভাবে। যে পরিবারে সকলে বাধ্যতা দিয়ে নম্রতার সাথে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। সমাজে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছেন। সত্য ও ন্যায্যতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি দিয়ে ন্যায় সমাজ বিনির্মাণে এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে গেছেন। এ দৃষ্টান্ত আমাদের অনুকরণ করা একান্ত প্রয়োজন।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে মানুষ হয়ে উঠেছে ভোগবাদী ও লোভী। ভোগ বিলাস ও স্বার্থপরতার কারণে আজ পৃথিবী অশান্ত হয়ে উঠেছে। মানুষ একা বড় হতে চায় আর এ মানসেই বেড়ে উঠছে। শুধু চাই আর চাই চাওয়া পাওয়ার শেষ নাই। তাই সমাজে সৃস্টি হচ্ছে উঁচু নিচু, ধনী গরীবের। কেউ বেশী পায় আবার কেউ পায় না। এ কারণেই সমাজে মানুষ স্বার্থপর আচরন করছে।

সমাজের এসমস্যা সমাধানের খ্রিস্ট প্রভুর জন্ম একান্ত প্রয়োজন। খ্রিস্ট প্রভুর পুনরোগমন হবেন ঠিক কিন্তু তিনি বার বার আসবেন না। তিনি প্রতি দিন প্রতি ক্ষণে জন্ম নিতে চান আমাদের মাঝে। তাই আমাদের এ প্রতিক্ষায় থাকতে হয়। বড়দিন শুধু বাহ্যিক দিক দিয়েই পালন করা হলে সঠিক হবে না। বড়দিনের উৎসব পালনের পূর্বে প্রস্তুতির একান্ত প্রয়োজন। তাই মাতা মণ্ডলী বড়দিন উৎসবে পূর্ব থেকে প্রস্তুতির জন্য সকল খ্রিস্ট ভক্তকে আহ্বান জানায়। নেয়া হয় বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান। এসময়ে নিজেকে মূল্যায়ণ করার জন্য থাকে অনেক ধ্যান প্রার্থনার ব্যবস্থা। তবে এতে সময় দেয়া ও অংশগ্রহণের মনমানসিকতা অনেকেরই নাই, নাই এর গুরুত্ব। বড়দিন শুধু কার্ড আদান প্রদান, সাজ সজ্জা, নতুন কাপড় পড়ার দিনই না। পরিবর্তনের দিন, নতুন হওয়ার দিন। তাই আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে প্রস্থুতি নিতে না পারলে দিবসটি পালনের তেমন কোন অর্থ হয় না।

কাজেই বড়দিন বাহ্যিক ভাবে আনন্দের দিন হিসাবে দেখা গেলেও এর গভীর অর্থ রয়েছে। মনে ধ্যানে ও আচরণে এ দিন সকল খ্রিস্ট ভক্তদের জন্য অনেক তাৎপর্যের বিষয়। বড়দিনের আসল আনন্দ উপলব্ধি করে ছিলাম ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের বড়দিনে। বছরটি ছিল আনন্দের কারণ সারা বছর ব্যাপি আমরা আতঙ্কে, অনিশ্চয়তায় ও অনাহারে অর্ধ আহারে দিন যাপন করে আসছিলাম এবং ৯ মাস দুঃখ কষ্ট ভোগ শেষে বছর সমাপ্তিতে ১৬ ডিসেম্বরে বিজয় হয়েছিল। আর সেই বিজয় ছিল সীমাহীন আনন্দের কারণ বছরটি ছিল যুদ্ধের, প্রতিদিনে শব্দ ছিল গোলা গুলির, সংবাদ ছিল মৃত্যুর, লুটপাট, অগ্নিকাণ্ডের, অপহরণ আর আতংকের ছিল, কখন আমরা আক্রমণের শিকার হব, আমরা অপেক্ষায় থাকতাম বাবা জ্যাঠার ফিরে আসার পথ চেয়ে। কারন জ্যাঠা ও বাবা যেতেন খাদ্যের সন্ধানে, তারা ফিরে আসবেন তো? খবরের একমাত্র ভরসা ছিল আকাশবাণী ও বিবিসির খবর। খবর শুনতে হত কম্বলের ভিতরে। ভয় ছিল ঘরে আশ্রিত বয়স্ক এক সনাতন ধর্মী নানিসম সনাতন ধর্মাবলম্বী বয়স্ক ব্যক্তিকে নিয়ে। এছাড়া আমার জ্যাঠার কাছে অনেক সনাতন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের আনাগোনা ছিল আমাদের ঘরে তাই। আর ১৬ ডিসেম্বর সকালে যখন শুনতে পারলাম দেশ স্বাধীন হয়েছে, বিজয়ের প্রথমে ভয় ভরা আনন্দ অবলোকন করলাম, আর যখন দুপুরে দেখলাম অনেক মানুষ রাস্তায় নেমেছে তখন আনন্দের আর সীমা ছিল না। আমরা রাস্তায় নেমে গেলাম আমাদের শ্লোগান ছিল জয় বংলা। ঐ বছরের বড়দিনের আনন্দের মত আনন্দ আর পাচ্ছি না।

বড়দিন আনন্দের, আর বড়দিনের প্রকৃত আনন্দ পেতে হলে কষ্ট ও ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন। তাই সকলের উচিৎ মাণ্ডলিক নির্দেশনা অনুসারে সঠিক প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে দিনটি পালন করা। শিশু যিশু আসেন আমাদের হৃদয়ে। প্রতি বছর বড়দিনে যিশু আমাদের জীবনে নতুন বারতা নিয়ে আসেন আর এবারতা ধ্যান করতে পারলেই বর্তমান ভোগ বিলাসী জীবন থেকে নিজেকে পরিবর্তন করা সম্ভব। যিশু এসেছেন বিনম্রতা বসনে সরলতা আবরনে ন্যায়ের বিধান রচনায় তাই বড়দিনের এর গভীর রহস্য অনুধ্যান ছাড়া যিশুর জন্মদিন পালন বাহ্যিক ছাড়া আর কিছুই না। যিশু এ জগতে এসেছিলেন সেবা করতে সেবার প্রত্যাশা করেননি কখনও। তাই প্রভু যিশুর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে পরিবর্তীত জীবন যাপনেই আমরা প্রকৃত অর্থে বড়দিন উদ্‌যাপন করতে পারি। আর এভাবে পরিবারকে এবং সমাজকে পরিবর্তন করতে পারি। খ্রিস্ট নিজের যাপিত জীবনে যে দৃষ্টান্তের সৃষ্টি করে গেছেন তার অনুসরণ বর্তমান জগতে বড্ড প্রয়োজন। অমাদের সমাজে এটি অনুশীলন করতে পারলেই আমাদের সমাজ তথা বিশ্বটাকে পরিবর্তনে ভুমিকা রাখতে পারব॥

বড়দিনে পিতামাতার ভাবনা

শিল্পী ক্রুশ

ভূমিকা : "পিতা ও মাতা" শব্দ দুটি বিশ্বের সকল সন্তানের নিকট অত্যন্ত মধুর। এই শব্দ দুটির মাঝে লুকিয়ে আছে পৃথিবীর সকল বাবা মায়ের মমতা অকৃত্রিম স্নেহ, আদর, নিঃশ্বাস ভালোবাসার সব সুখের কথা। চাওয়া পাওয়ার এই দুনিয়ায় বাবা মায়ের ভালোবাসার সঙ্গে অন্য কোন কিছুর তুলনা চলে না। নদীতে পানির গভীরতা পরিমাপ করা যায় কিন্তু পিতামাতার ভালোবাসার গভীরতা কখনও পরিমাপ করা যায় না। জন্মের প্রথমদিন হতে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সন্তানের প্রতি বাবা-মায়ের ভালোবাসার কোন পরিবর্তন হয় নাই। পৃথিবীতে একমাত্র বাবা মা-ই আছেন যারা নিঃস্বার্থ ভাবে সন্তানকে আজীবন আগলে রাখেন। তাই বাবা-মা হলেন সন্তানের সবচেয়ে আপনজন এবং বিশ্বস্ত বন্ধু। পৃথিবীতে যার বাবা মা নেই একমাত্র সেই ব্যক্তিই বুঝেন পিতামাতার অভাব এবং পিতামাতা না থাকার ব্যাথা কত কষ্টের।

একজন সন্তানের জীবনে পিতামাতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পিতামাতার সকল স্বপ্ন তাদের সন্তানকে ঘিরে আর সন্তানের জীবনে পিতামাতা হলেন শান্তির ছায়া। তাই বলা যায় সন্তান হলো পিতামাতার প্রাণ স্বরূপ। সন্তান ভূমিষ্টর পর পিতামাতাগণ তাদের সকল সুখের কথা ভুলে গিয়ে সন্তানকে নিয়ে সারাক্ষণ ভাবেন। সন্তানকে কোন খাবার খাওয়াবেন, কি ধরনের পোশাক পড়াবেন, কার সাথে মিশতে দিবেন, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াবেন, বড় হলে সন্তানকে কী বানাবেন ইত্যাদি নানা স্বপ্ন দেখেন। পিতামাতা যেহেতু সন্তানের সবচেয়ে আপন জন এবং সন্তান পিতামাতার আদরের ধন সুতরাং পিতামাতা অবশ্যই সন্তানকে নিয়ে এসব ভাবনা ভাববেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে একজন বাবা-মাকে এসবের পাশাপাশি বেশি গুরুত্ব দিতে হবে সুশিক্ষার উপর। অর্থাৎ সন্তনকে পারিবারিক, সামাজিক, মাণ্ডলিক, আধ্যাত্মিক, খ্রিস্টীয় আর্দশ ও নৈতিক মূল্যবোধ, আচার-আচরণ, কথাবার্তা কাজ কর্ম, চাল-চলন ইত্যাদি বিষয় গুরুত্বের সাথে শিক্ষা দিতে হবে। কারণ আজকের শিশুরাই আগামী দিনের উজ্জল ভবিষ্যৎ। পিতামাতা সন্তানদের শৈশবকাল হইতে যেরূপ শিক্ষা দিবেন এবং সন্তানের প্রতি যেরূপ দায়িত্ব পালন করবেন সন্তান ও বড় হয়ে পিতামাতার প্রতি ঠিক সেইরূপ কর্তব্য পালন করবে।

পৃথিবীতে খ্রিস্ট রাজার আগমন : "মুক্তিদাতা এলেন ধরায় মুক্তির বারতা নিয়ে, মুখরিত হলো বিশ্বভূবন সে শুভ বারতা পেয়ে।"

ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে দায়ূদ সন্তান যোসেফের স্ত্রী মারীয়ার গর্ভ হতে যিশু**খ্রিস্ট** জন্ম গ্রহণ করেছেন। সাধু যোসেফ এবং মা মারীয়া শিশুটির নাম রাখলেন যিশু। যিশু নামের অর্থ- "ভগবান পরিত্রাণ করেন"। ঈশ্বর যিশু খ্রিস্টকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্তি দিতে। যিশু জন্মগ্রহণ করেছেন অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে। বাবা যোসেফ ছিলেন পেশায় ছুতোর মিস্ত্রি ও ধার্মিক ব্যক্তি এবং যিশুর মা মারীয়া ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ ও ধার্মিকা নারী। মা মারীয়া ও সাধু যোসেফ শৈশব কাল হতেই যিশুকে পারিবারিক আদর্শ, নৈতিক মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক শিক্ষায় গড়ে তুলেছেন। যিশু তার বাবা-মায়ের প্রতি অত্যন্ত বাধ্য ছিলেন। বাবা-মাকে সব সময় কাজে সাহায্য করতেন। যিশু প্রতি বছর তার বাবা-মায়ের সাথে জেরুশালেম মন্দিরে নিস্তার পর্ব পালন করতে যেতেন। এছাড়া অভ্যাসমত তিনি মায়ের সাথে বিশ্রাম বারে সমাজগৃহে যেতেন এবং সেখানে মাস্ত্র পাঠ করতেন। পর্বোৎসবের শেষে তিনি বাড়ি না ফিরে শাস্ত্রগুরুদের সাথে মন্দিরে বসে শাস্ত্রের বাণী নিয়ে আলোচনা করতেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র বারো বছর। যিশু খ্রিস্ট শৈশব কাল হতেই বিভিন্ন রকম আশ্চর্য কাজ করতেন, জটিল রোগ হতে মানুষকে আরোগ্য দান করতেন, বাণী প্রচার করতেন, উপদেশ দিতে এবং মৃত্যব্যক্তিদের জীবন দান করতেন। এসব কাজের মধ্যদিয়ে তিনি দরিদ্র, নিপিরীত, নির্যাতিত মানুষের সেবা করেছেন। পক্ষান্তরে মানুষের নিকট হতে তিনি বিনিময়ে পেয়েছেন লাঞ্চনা, অপমান ও ঘৃণা। তিনি মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে আমাদের পাপের কারণে ক্রশের উপর যন্ত্রনা ভোগ করে মৃত্যবরণ করার মধ্যদিয়ে আমাদিগকে পাপ হতে মুক্তি দিয়েছেন।

যিশু খ্রিস্টের জন্মোৎসব: যিশু খ্রিস্ট ২৫ ডিসেম্বর বেথলেহেম নগরে ছোট জীর্ণ একটি গোশালায় জন্মগ্রহণ করেন। যিশু খ্রিস্টের জন্মের বারতা স্বর্গের দূত বাহিনী রাখালদের নিকট পৌঁছে দেয়। সংবাদ শোনে রাখালেরা যিশুকে দেখতে ছুটে যায়। পূর্বদেশের পণ্ডিতেরা দামী উপহার সামগ্রী নিয়ে যিশুকে দেখতে আসেন এবং যিশুকে নত হয়ে প্রণাম জানান। এদিকে হেরোদ রাজা পণ্ডিতদের নিকট হতে নব রাজার জন্মের সংবাদ শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন, তিনি কোন ভাবেই মানতে চাইলেন না তার রাজ্যে দ্বিতীয় কোন রাজার জন্ম হোক। তাই তিনি শিশুটিকে মেরে ফেলার জন্য বেথলেহেমে ও তার চারিদিকের অঞ্চলের দুই বছরের নিচের সকল শিশুকে মেরে ফেলার হুকুম দিলেন। কিন্তু ঈশ্বর শিশুটিকে রক্ষা করলেন কারণ তার মধ্যদিয়েই ঈশ্বর তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবেন। বিশ্বের সকল খ্রিস্টভক্তগণ যিশুর জন্ম দিনকে বড়দিন বলেন কারণ এই দিনটি খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের নিকট সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও আনন্দের উৎসব।

বড়দিনকে ঘিরে পিতামাতার ভাবনা :

"আজ এলো সে বড়দিন প্রাণে আজ বাজে বীন
রঙ্গীন স্বপ্ন উঠে জাগিয়া
ছন্দে ছন্দে উঠে মাতিয়া"।

যিশুর পিতামাতা যেমন যিশু খ্রিস্টকে নিয়ে খুব চিন্তা করতেন এবং নানা রকম ভাবনা ভাবতেন ঠিক তেমনি প্রতিটি পিতামাতাই তাদের সন্তানদের নিয়ে অনেক বেশি চিন্তা করেন ও ভাবেন। পরিবারে কোন উৎসব-অনুষ্ঠানের অয়োজন করা হলে পিতামাতা সবার আগে ভাবেন কিভাবে তাদের সন্তানদের মুখে হাসি ফুটাবেন কিংবা তাদের খুশি করবেন যেহেতু বড়দিন **খ্রিস্ট** ভক্তদের সবচেয়ে আনন্দের ও শ্রেষ্ঠ উৎসব সেহেতু বড়দিনকে ঘিরে ডিসেম্বর মাসব্যাপী **খ্রিস্টান** পরিবারগুলোতে চলে নানা আয়োজন। যেমন- বড়দিনে সন্তানদের কেমন পোশাক কিনে দিবেন, কি খাবেন, কোথায় বেড়াতে যাবেন, কিভাবে সাজবেন, কিভাবে বাড়ি সাজাবেন, কবে চালের গুড়ি কুটবেন, ইত্যাদি। তবে এই সবই হচ্ছে আমাদের বাহ্যিক প্রস্তুতি। প্রকৃত পক্ষে আমরা কি কখনও বড়দিনের আসল তাৎপর্য নিয়ে ভেবেছি? বড়দিনকে ঘিরে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি নিয়েছি? আমাদের কী ধরণের প্রস্তুতি নেওয়া উচিত? ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের ধ্যান করতে হবে এবং বড়দিনকে ঘিরে পরিবারে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। ঠিক যেমনটি যিশু খ্রিস্টকে নিয়ে তার বাবা ও মা ভাবতেন। খ্রিস্ট মণ্ডলীর মাতার মত আমাদের করণীয় কাজগুলো হবে যেহেতু ডিসেম্বর মাসে স্কুল পরীক্ষা শেষ হয়ে যায় বিধায় পড়ার চাপ থাকে না তাই পিতামাতা হিসেবে আমরা আগমন কালে প্রতিদিন ছেলেমেয়েদের খ্রিস্টযাগে যেতে উৎসাহিত করব, বড়দিন উপলক্ষে পাপস্বীকার করতে এবং বড়দিনের গানের ক্লাশে যেতে দিতে অনুপ্রাণিত করব, গির্জাঘর সাজানোর কাজে সহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ করব। বাড়িতে সকলে মিলে আলাপ-আলোচনা করে বড়দিনের কাজ করব, বাড়িতে বৃদ্ধ মানুষ থাকলে তাদের প্রতি আন্তরিক হবো। প্রতিবেশি গরিব-দুঃখীদের খাবার ও জামা কাপড় দান করব যেন তারাও বড়দিনের আনন্দ উপভোগ করতে পারে। এভাবে পরস্পরকে ভালোবাসা, দান ও সেবার মধ্যদিয়ে আমরা বড়দিনের জন্য আত্মিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করব।

উপসংহার :

" তুমি পাপীর তরে আজ এসেছ,
তুমি দুঃখীর তরে আজ এসেছ,
তুমি বন্দিকে আজ মুক্তি দিতে মোদের
জগতে এসেছ"।

যিশু খ্রিস্ট মানবরূপে, গরীববেশে গোয়ালঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি এ পৃথিবীতে এসেছেন মানুষকে পাপ হইতে পরিত্রাণ দিতে। তাই যিশুকে আমরা দেখতে পাই অসহায়, দুস্থ্য, পিড়ীত, নির্যাতিত, দরিদ্র মানুষের মাঝে। যিশুরমত আমাদেরও উচিত অসহায় মানুষের সেবা করা এবং মন পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে আত্মিকভাবে নিজেদের প্রস্তুত করে বড়দিনের মহোৎসবে অংশগ্রহণ করা॥

“বড়দিন হল প্রত্যাশা পূরণের দিন”

ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি

**“হবে তাঁর আগমন
‘‘আমরা অনুক্ষণ রয়েছি প্রত্যাশায়
মুক্তি প্রতীক্ষায়
হবে তাঁর আগমন।”**

আজ ২৫ ডিসেম্বর সারা বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে ক্রিসমাস বা বড়দিনের উৎসব। বড়দিন হল খ্রিস্টধর্মের বা খ্রিস্টবিশ্বাসীদের একটি অন্যতম উৎসব। যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষে পালিত বড়দিনের দিন এই উৎসব। এ উৎসব হল প্রত্যাশা পূরণের দিন বা প্রত্যাশা পূরণের উৎসব।

উৎসব হলো মানুষের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যে কোন উৎসব মানুষকে বাস্তব থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে দেয়। উৎসব যে ধরনেরই হোক না কেন প্রত্যেকটি উৎসবের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন প্রত্যেক উৎসবে মানুষ প্রতিদিনকার ব্যস্ততা দূরে সরিয়ে রেখে আনন্দে মেতে ওঠে। অন্য দিকে এ উৎসব হল প্রত্যাশা পূরণের দিন। যিশুর জন্ম হল এমন একটি উৎসব যা প্রত্যাশা পূরণের দিন বা উৎসব। যিশুর জন্মের প্রায় ৭৫০ বছর পূর্বে বিভিন্ন প্রবক্তাগণ প্রত্যাশার বাণী শুনিয়ে যিশুর আগমনের কথা প্রচার করেছেন। ‘‘ভয় করো না, কেনোন দেখ, আমি তোমাদের এমন মহা আনন্দের শুভ সংবাদ জানাচ্ছি, যে আনন্দ সমস্ত জানগণেরই হবে; আজ দাউদ নগরীতে তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন, তিনি সে খ্রিস্ট স্বয়ং প্রভু’’ (লুক ২: ১০-১১ পদ)। ‘‘যখন সময় পূর্ণ হ’ল পরমেশ্বর এ পৃথিবীতে পাঠালেন তাঁর আপন পুত্রকে। তিনি জন্ম নিলেন নারী গর্ভে, জন্ম নিলেন মোশীর বিধানের অধীন হয়ে। এমনি ঘটেছিল যাতে তিনি বিধানের অধীনে পড়ে থাকা যত মানুষের মুক্তি দিতে পারেন, যাতে আমরা হয়ে উঠতে পারি পরমেশ্বরের পুত্র’’ (*গালাতীয় ৪:৪-৫ পদ*)

সমগ্র বিশ্বজুড়ে, সকল শ্রেণি মানুষ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ভুলে একই দিনে একই সময়ে আনন্দে মেতে ওঠে। কারণ এ উৎসব তাদের প্রত্যাশা পূরণের দিন। বহু প্রতিক্ষার অবসানের দিন। খ্রিস্টান ধর্মের বড় উৎসব বড়দিন। প্রায় ৭৫০ বছরের অপেক্ষায় বা প্রতিক্ষা পূরণের দিন। প্রতিবছর ২৫ ডিসেম্বর বিশ্বজুড়ে এ দিনটি পালন করা হয়। প্রাচ্য দেশগুলিতে এই দিনটি বড়দিন নামে পরিচিত হলেও পাশ্চাত্যে এটি ক্রিসমাস নামে পরিচিত।

সাধারণভাবে খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ বিশ্বাস করে, এই দিনেই ঈশ্বরপুত্র যিশুখ্রিস্টের জন্ম হয়েছিল। এই উপলক্ষেই প্রতি বছর ২৫ ডিসেম্বর তারিখটিকে যিশুর জন্ম জয়ন্তী হিসাবে পালন করা হয়। আদিযুগের খ্রিস্টানদের বিশ্বাস যে, যিশু এক কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন এবং মানুষের মুক্তির জন্য নিজের প্রাণ ক্রুশে বিলিয়ে দিবেন। যিশুর জন্ম গ্রহণের মধ্যদিয়ে প্রবক্তাদের কথা বাস্তব হলো এবং বাস্তব হল মানুষের প্রত্যাশা এই দিনটিকে যিশুখ্রিস্টের পৃথিবীতে আগমনের দিন এবং প্রত্যশা পূরণের দিন হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে আবার অনেকে ২৫ ডিসেম্বর তারিখকে নিতান্তই একটি ঐতিহাসিক রোমান উৎসবের দিন বলে মনে করেন। ঐতিহাসিক গুরুত্ব যা হোক না কেন পৃথিবী জুড়ে এই দিনটিকে ছুটির দিন হিসেবে পালন করা হয় এবং খ্রিস্টবিশ্ববাসীগণ এই দিন থেকে শুরু করে ১২ দিন ব্যাপী ক্রিসমাসটাইড উৎসব পালন করে অনেক অনেক উৎসব ও আনন্দ।

২৫ ডিসেম্বর দিনটি বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে পরিচিত হবার পিছনে রয়েছে এ নামগুলির শব্দগত ব্যুৎপত্তি। সাধারণভাবে ইংরেজিতে ক্রিসমাস বা খ্রিস্টমাস শব্দটির উৎপত্তি খ্রিস্টের মাস শব্দবন্ধ থেকে। এখানে মাস বলতে অর্থ হিসেবে উৎসব বোঝানো হয়। অন্যদিকে বাংলায় এ দিনটিকে বড়দিন বলার কারণ হিসেবে আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধানে বলা হয়েছে ২৩ ডিসেম্বর তারিখ থেকে দিন ক্রমশ বড় এবং রাত ছোট হতে আরম্ভ করে। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের জনৈক অধ্যাপক বলেছিলেন মর্যাদার দিক থেকে বড় হওয়ার কারণে এ দিনটিকে বড়দিন বলা হয়ে থাকে।

বড়দিন উৎসবের প্রকৃত প্রাণ লুকিয়ে আছে সে উৎসবটির উদ্‌যাপনের মধ্যে বিশ্বজুড়ে ২৫ ডিসেম্বর তারিখে দিনটির ব্যাপক ভাবে উদ্‌যাপন বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় এদিন নানা অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে কোথাও মাহাসমারোহে পালন করা হয় যিশুর জন্মোৎসব, আবার কোথাও বা নানা জাকজমকপূর্ণ আয়োজন করা হয়। বিশ্বজুড়ে সকল গির্জাগুলিকে অতি সুন্দর সাজে সাজিয়ে তোলা হয়। কোথাও আবার আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মীয় পরিজন এর মধ্যে চলে উপহার দেওয়া নেওয়া। মানুষ এ দিনে যিশুখ্রিস্টের জন্ম দিবস উপলক্ষে কেক কাটে, ভোজের আয়োজন হয় পাশ্চাত্য বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় মানুষ এ দিনটির জন্য একবছর অপেক্ষায় থাকে। বড়দিন তাদের জন্য একটা মিলন মেলা, প্রত্যাশা পূরণের দিন বা উৎসবের দিন। ভারতীয় উপমহাদেশে পালিত হয়ে বড়দিনের একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র চরিত্র রয়েছে। সুদীর্ঘকাল ব্রিটিশ শাসনাধীন থাকার কারণে দেশের শহরাঞ্চলে বড়দিন পালন উপলক্ষে ব্রিটিশ আদব কায়দাগুলিই অধিক মাত্রায় প্রচলিত। ব্রিটিশদের এই দিনে এ দেশেও ফুটন্ত কেক খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। তাছাড়া জাতি ধর্ম ভুলে এ দিন মানুষ সেজেগুজে রাস্তায় বেরোয়। শহরাঞ্চলে রাস্তাগুলি সেজে ওঠে অভূতপূর্ব সব আলোকসজ্জায়। শহরতলী তো বটেই, মানুষ এই উদ্‌যাপন দেখার জন্য শহরে পাড়ি জমায়। বড়দিন হল সাধারণ মানুষের জন্য প্রত্যাশা পূরণের দিন যা তাদের সংস্কৃতির ছোয়াও লক্ষ্য করা যায়।

বড়দিনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে, স্যান্তাক্লজ এর নাম। ছোটদের কাছে উপহার পৌঁছে দেওয়ার প্রবাদ নিয়ে এ ব্যক্তিত্ব বড়দিন উদ্‌যাপনে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। শিশুরা অনেক প্রত্যাশা করে থাকে কবে বড়দিন আসবে, স্যান্তাক্লজ আসবে, কবে তারা পাবে তাদের প্রিয় উপহার চকলেট। অনেকের মতে স্যান্তাক্লজ নামটি ডাচ সিন্তাক্লাস নামে অশভ্রংশ যার সাধারণ অর্থ হলো সেন্ট নিকোলাস। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে তুরস্কের মীরার বিশপ সেন্ট নিকোলাস শিশুদেরকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন। তিনি প্রতিনিয়ত তার অঞ্চলের শিশুদের পোশাক-আশাক, পড়াশোনা এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতেন এবং যোগ্য শিশুদের পুরস্কার দিতেন। এয়োদশ শতাব্দীতে বিশপ সেন্ট নিকোলাস এর নাম নেদারল্যান্ডে পরিচিতি লাভ করে এবং দক্ষিণ ইউরোপে তার নামে উপহার আদান-প্রদানের ঐতিহ্য চালু হয়ে যায়। বর্তমানে স্যান্তাক্লজ এর ঐতিহ্যের এই জনপ্রিয়তার পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবদান সর্বাধিক। সান্তাক্লজ সরাবিশ্বের শিশুদের জন্য বড়দিনের সবচেয়ে আনন্দের উৎসব। শিশুরা যার জন্য দীর্ঘ একটি বছর অপেক্ষা করে থাকে অনেক অগ্রহ নিয়ে।

অন্য সকল উৎসবের মতই বড়দিন পালনেরত্ত একটি বিশেষ সামজিক গুরুত্ব রয়েছে। বিশ্বব্যাপী পালিত হওয়া এ উৎসবে সর্বস্তরের মানুষের যোগদানের ফলে মানুষে মানুষে সামাজিক বন্ধুত্ব দৃঢ় হয়। মানুষ তার

প্রতিদিনকার ব্যস্ততা ভুলে একদিন সমষ্টিগত এই আনন্দ উৎসবে অংশ নেওয়ার ফলে সমগ্র সমাজের সার্বিক মানসিক চরিত্রে নবশক্তি বিধান হয়। তাছাড়া জাতি ধর্ম, বর্ণ, উঁচু, নিচু সকল ভেদাভেদ ভুলে একটি আন্তর্জাতিক উৎসবে অংশ নেওয়ার ফলে সমাজে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়।

সামাজিক গুরুত্বের পাশাপাশি ক্রিসমাস বা বড়দিন উদ্‌যাপনের বিশেষ অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। বড়দিন পালনের উপর নির্ভর করে বিশ্বের অসংখ্য মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্ধারিত হয়। এই দিন উপলক্ষে পৃথিবীর সকল পাইকারি ও খুচরা বাজারে কেনাবেচার পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। মানুষ বড়দিন উপলক্ষে ঘর সাজানোর দ্রব্য উপহার সামগ্রী কেনে বলে এ সময়ের পূর্বে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং নতুন নতুন সামগ্রী বাজারে আসে। তাই দেখা যায় যে, বিভিন্ন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী সকলে অপেক্ষার দিন গুণে কবে, কখন বড়দিন আসবে এবং তাদের প্রত্যাশা পূরণ হবে।

বড়দিন বিশ্বজুড়ে আনন্দ উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে প্রকৃতই খুব বড় একটি দিন। ধর্মগতভাবে খ্রিস্টান ধর্মবিশ্বাসী মানুষের কাছে এ দিনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। কিন্তু বড়দিন উদ্‌যাপন শুধুমাত্র খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ভেদ ভুলে সকল মানুষ এ দিনটির উদ্‌যাপনে অংশগ্রহণ করে। সুদূর অতীতে যিশু খ্রিস্ট সকল মানুষের মধ্যে প্রেম ও ভালবাসার যে বাণী প্রচার করতে চেয়েছিলেন বড়দিন উদ্‌যাপনের মধ্যদিয়ে যিশুখ্রিস্টের সেই স্বপ্নই সার্থকভাবে রূপায়িত হয়। বড়দিন হল সকল স্তরের মানুষের প্রত্যাশা পূরণের দিন, যা প্রায় ৭৫০ বছর পূর্বে বিভিন্ন প্রবক্তাগণ ভবিষ্যৎ বাণীতে বলে গেছেন। যিশুখ্রিস্ট এ জগতে এসে বা জন্মগ্রহণ করে সত্য করেছেন প্রবক্তাদের বাণী এবং পূরণ করেছেন মানুষের প্রত্যাশা যিশু খ্রিস্ট সকল মানুষের জন্য এ জগতে এসেছেন মানুষের প্রত্যাশা পূরণের জন্য, মানুষের মুক্তির জন্য, মানুষের পাপময় জীবন থেকে নতুন জীবনে আনার জন্য। বড়দিন সকল মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ও উৎসবের দিন। বড়দিন সকলের জীবনে বয়ে আনুক শান্তি ও আনন্দ। বড়দিন হল মানব জাতির জন্য প্রত্যাশা ও প্রতিক্ষার অবসানের দিন বা উৎসব। সকলের প্রতি রইল বড়দিনের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। শুভ বড়দিন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ
পিতৃগনের সাঙ্গে "ঐশবাণীধ্যান" সাধু বেনেডিক্ট মঠ,মহেশ্বরপাশা খুলনা, ওয়েবসাইট ও ইন্টারনেট, বিশ্বসের মানুষ, লেখক জীন গসেলিন আরনল্ড, পবিত্র বাইবেল॥

যিশু নামের সার্থকতা তথা খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জীবনে খ্রিস্টীয় নামের গুরুত্ব

জে. আর. এ্যাগ্নেস

পবিত্র বাইবেলে সৃষ্টির প্রারম্ভ লগ্ন থেকে ঈশ্বর তাঁর প্রতিটি অমূল্য সৃষ্টির নামকরণ করেন। তিনি মনে করলেন প্রতিটি জিনিসের একটি আলাদা নাম থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আলোর নাম দিলেন 'দিন' অন্ধকারের নাম দিলেন 'রাত্রি'।

ঈশ্বর সব কিছু সৃষ্টির পর তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টি করলেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করে পুরুষের নাম দিলেন 'আদম' এবং নারীকে সৃষ্টি করে তার নাম দিলেন 'হবা'।

এইভাবে ঈশ্বর তাঁর প্রতিটি নিখুঁত সৃষ্টিকে একেকটি অসাধারণ নাম দিলেন যে নাম অর্থের স্বার্থকতা বহন করে। বাইবেলের পুরাতন নিয়মে গণনা পুস্তকে আরো দেখি বংশের পর বংশের পরিচয় বহন করে তাদের নামে।

এইভাবে পবিত্র বাইবেলে নতুন নিয়মে স্বর্গদূত সখরিয়কে দেখা দিয়ে বললেন ভয় করো না, তোমার স্ত্রী এলিজাবেথের একটি ছেলে হবে। তুমি তার নাম রাখবে যোহন।

গাব্রিয়েল দূত যোসেফের বাগদত্তা কুমারী মারীয়াকে দেখা দিয়ে বললেন ভয় পেয়ো না ঈশ্বর তোমার সহায় পবিত্র আত্মার প্রভাবে তোমার একটি পুত্র সন্তান হবে তাঁর নাম রাখবে যিশু। যার অর্থ হলো উদ্ধারকর্তা বা পরিত্রাতা। যিশুকে ইম্মানুয়েল ডাকা হয়। এই ইম্মানুয়েল শব্দের অর্থ হলো আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর। এই নামের মধ্যদিয়ে ঈশ্বর অনন্তকাল আমাদের সাথে আছেন ছিলেন এবং থাকবেন।

পিতা ঈশ্বর তাঁর পুত্রের জন্য যে নাম নির্ধারণ করে দিয়েছেন যিশুর অমূল্য জীবনের মধ্যদিয়ে সেই নামের স্বার্থকতা উপলব্ধি করতে পারি। যিশু স্বয়ং ঈশ্বর হয়েও পিতার ইচ্ছা পালন করার জন্যই মানব রূপে দেহ ধারণ করলেন। তিনি জগতের মানুষকে পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য তিন ঘন্টা ক্রুশীয় মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করে মৃত্যুবরণ করলেও মৃত্যু তাকে ধরে রাখতে পারেনি। তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন। তিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন।

গভীরভাবে উপলব্ধি করলে দেখি ঈশ্বর যা চেয়েছেন পুত্রের মধ্যদিয়ে তিনি তাই ঘটিয়েছেন। তিনি তাঁর পুত্রের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে মানুষকে পরিত্রাণ দিলেন এবং স্বর্গে যিশু ঈশ্বরের ডান পাশে সিংহাসনে বসলেন।

যদি বাইবেল অধ্যয়ন করি দেখব পুরাতন নিয়ম থেকে শুরু করে নতুন নিয়ম পর্যন্ত কতশত শক্তিশালী নাম বা ব্যক্তি আছেন যাদের সাথে ঈশ্বর সরাসরি কথা বলতেন, সম্পর্ক রাখতেন। ঈশ্বর এই নামগুলো কতনা বেশি ভালোবাসেন। বাইবেলের পুরাতন নিয়মে ডেভিড নামটি যদি দেখি যার অর্থ প্রিয়তম। তাঁর লেখা সামসংগীত পড়লে বুঝতে পারি তার সাথে ঈশ্বরের কত গভীর ও বন্ধুত্বপূর্ণ মধুর সম্পর্ক ছিল। শলোমন নামের অর্থ শান্তি যিনি জ্ঞানের প্রতীক। ঈশ্বর তাকে কত না মহিমান্বিত করেছেন। ডানিয়েলের নামটি যদি দেখি এই নামের অর্থ ঈশ্বর আমার বিচারক ডানিয়েলের সাথে ঈশ্বরের এমন সুন্দর সম্পর্ক ছিল তিনি যে বিষয়েই প্রার্থনা করতেন ঈশ্বর প্রতিটি প্রার্থনার উত্তর দিতেন। মোশি এলিয় যিহূশয় আরও অসংখ্য নাম আছে তুলে না ধরলেও সবাই জানি...

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বাইবেলীয় প্রতিটি নাম আশ্চর্য ও শক্তিশালী এবং প্রতিটি নাম আশীর্বাদের।

এতক্ষণ নাম নিয়ে এত কথা বলার মূল কারণ হলো ঈশ্বরের কাছে একটি সুন্দর ও অর্থপূর্ণ নামের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই আমি ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করি আমরা যারা যিশু খ্রিস্টের অনুসারী সবাইকে অবশ্যই মনে রাখা উচিত পরিবারে নতুন অতিথি এলে তার একটি সুন্দর অর্থপূর্ণ বাইবেল ভিত্তিক ডাক নাম দেয়া উচিত। খ্রিস্টান হিসেবে হ্যাঁ সবাই চেষ্টা করেন একটি ধর্মীয় বা বাইবেলের নাম রাখতে কিন্তু সেটা পিছনে পরে থাকা দ্বিতীয় নামটি যে নামটি কখনো তাকে ডাকা হয় না। এমন ধর্মীয় বা বাইবেলীয় নাম রেখে যদি সেই নামে ডাকা না হয় তাহলে কোনো মানে নেই। মনে রাখতে হবে সুন্দর অর্থপূর্ণ নামের মধ্যদিয়ে ঈশ্বর সেই ব্যক্তির জীবনকাল তথা পরিবারকে পর্যন্ত আশীর্বাদ করেন।

ব্রিটিশরা ভারত উপমহাদেশে উপনিবেশ স্থাপন কালে তারা নামের এই বিশেষত্ব খুব ভালো করে জানতো বলেই এই বিষয়টি এদেশের মানুষের কাছে গোপন করেছিল যেনো এই ভারতবর্ষের জাতিগোষ্ঠীর মানুষগুলো

ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়। তারা কখনো চায়নি এদেশের মানুষের সুন্দর অর্থপূর্ণ বাইবেলীয় একটি ডাক নাম হোক। সেই নামের স্বার্থকতায় একদিন তাদেরকে ছাপিয়ে যাক। সেই কারণেই নতুন শিশুর জন্ম হলেই তারা যাচ্ছেতাই একটি ডাক নাম লিখে পাঠাতো বা সুন্দর নামটি বিকৃত করে লিখে দিতো। এই ব্রিটিশ মিশনারিরাই শিক্ষা দিয়েছেন ধর্মীয় নাম হোক দ্বিতীয় নাম। সেই রেওয়াজ এখনো আমরা দেখি পিতা-মাতা শিশুদের নামের ক্ষেত্রে ভালো আশীর্বাদ পূর্ণ নামটি আবডালে রেখে অর্থহীন একটি ডাক নাম দিতে।

আমি আমার পরিবারের দিকে তাকালেই দেখি নামের নমুনা। আমার বাবার নাম ছিল ভিনসেন্ট (সেন্ট ভিনসেন্ট এর নাম) কিন্তু আমার বাবার জীবন কালে লোকে বিছান্তি নামে চিনতো বা ডাকতো। এই বিছান্তি নামের নেই কোনো সৌন্দর্য নেই কোনো মানে। আমার বাবা একজন ধর্মপ্রাণ সাধু মানুষের নাম পেয়েও সারা জীবনে তাকে কেউ এই নামে ডাকেনি। তাই সুন্দর নাম থাকলেও যদি কেউ তাকে সেই সুন্দর নামটি না ডাকে তবে তা ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ছত্রাক মরীচিকা ধরা বস্তুর মতোই মনে হতে পারে। সেখানে কোনো আশীর্বাদ নেই।

সবচেয়ে বড় পরিতাপের বিষয় হচ্ছে ঈশ্বর যেহেতু সুন্দর অর্থপূর্ণ নাম ভালোবাসেন সেই সুন্দর অর্থপূর্ণ ধর্মীয় বাইবেল ভিত্তিক নাম অনুসারে মানুষ ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদের কারণ হয় সেজন্য শয়তান এখানে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। শয়তান কখনো ভালো সুন্দর বাইবেলীয় নাম পছন্দ করে না। বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে ওয়েষ্টার্ণ পৃথিবীতে তাকালে দেখবো যারা বাইবেলীয় নামের অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন সেই তাদেরই প্রজন্ম এখন বাইবেলীয় নাম ধারণ করলেও সেই নামটি কেটেকুটে ছোট্ট ও সংক্ষিপ্ত করে ফেলছে। যাদের নাম ছিল যোসেফ তারা এখন লিখে যো, ডানিয়েল লিখে ডেন ইত্যাদি।

বর্তমান নাম ফ্যাশন যুগে তাকালে দেখা যায় আধুনিক পিতা-মাতাগণ সন্তানের জন্ম হলেই একটি অর্থহীন ফ্যাশনএ্যাবল নাম সিলেকশনে যেনো প্রতিযোগিতা করেন। আর শিশুর জন্য বাইবেলীয় কোনো নাম ধারণ করলেও সেই নামটি নামের চাপে আজীবন ঢাকা পরে থাকে। আর সেজন্যই খ্রিস্টীয় সমাজে খ্রিস্টীয় মনোভাবাপন্ন মানুষের দেখা পাওয়া যায় না বা গড়ে উঠে না।

একটু লক্ষ্য করে দেখুন পরিবারে যদি কারো বাইবেলীয় নাম থাকে এবং সেই নামে সবাই তাকে ডাকে তার চালচলন কথাবার্তা কেমন ও অন্য একটি সাধারণ নামের ব্যক্তির চালচলন কথাবার্তা কত ভিন্ন?

এখানে আমি একটা বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে চাই ভুল নাম বা অসুন্দর অর্থহীন মানুষের জীবনে কতটা প্রভাব ফেলে.. আমার এক কলিগ ছিল তার হাজবেণ্ডের নাম ছিল দুখু কারণ সে ছোটবেলা থেকেই মা-বাবা হারা একটি সন্তান ছিল বলে সকলে তাকে আদর করে দুঃখু নামেই ডাকত। কিন্তু তার একটি সুন্দর নাম ছিল আসিফ যে নামে কেউ কখনো ডাকতো না।

সকলেই তাকে দুঃখু বলে ডাকতে ডাকতে তার মন-মানসিকতায় সব সময় দুঃখে ভারাক্রান্ত থাকতো। সে কখনো নিজেকে সুখী ভাবতে পারেনি। চতুর্দিক থেকে দুঃখগুলো তার কাছে এসে যেনো তার গলা আটকে ধরতো। এত দুঃখের মধ্যে সে কখনোই আনন্দ খুঁজে পেত না। তাই একদিন সকালবেলা সব দুঃখের অবসান ঘটিয়ে ফ্যানের সাথে গলায় ফাঁসি দিয়ে মরতে যাচ্ছিল। স্ত্রী বিষয়টি বুঝতে পেরে দ্রুত দৌড়ে এসে তার পা উঁচু করে ধরল এবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে অবশেষে তাকে বাঁচানো গেল এবং পরের দিন সেই কলিগ অফিসে এসে সেইসব ঘটনা অনেক কান্না বিজড়িত কণ্ঠে সবাইকে বললো।

আমি মনে মনে চিন্তা করলাম নিশ্চয়ই ওই ভাইয়ের এই দুঃখু নামটাই তার জীবনের সর্বনাশ ডেকে নিয়ে এসেছে। আমি দিদিকে বললাম দিদি দাদার কি আরো কোন নাম আছে? দিদি বলল তার আরো একটা সুন্দর নাম আছে আসিফ কিন্তু কেউ তাকে সেই নামে ডাকে না। ইসলাম ধর্মে আসিফ নামের অর্থ হলো আল্লাহর শক্তিশালী প্রেমিক, তরবারি। আমি দিদিকে বললাম আজ থেকে দাদার নাম হবে আসিফ আর কখনো তাকে দুঃখু নামে ডাকা হবে না। সেদিন থেকে দাদার নামটা পাল্টে গেল। সবাই তাকে আসিফ বলে ডাকে। এখন তাদের পরিবারে অনেক শান্তি আনন্দ ভালোবাসা এবং সে পরিবারের ঈশ্বরের অনেক আশীর্বাদ নেমে এসেছে।

পৃথিবীতে সকল ধর্মেই ধর্মীয় নামের গুরুত্ব আছে। প্রত্যেকেরই চেষ্টা করা উচিত ধর্মীয় নামগুলো তাদের ডাক নাম হিসেবে রাখা।

আমরা যিশু খ্রিস্টের অনুসারী হিসেবে আমাদের সন্তানদের কত সুন্দর সুন্দর আশীর্বাদের নাম বাদ দিয়ে যেমন তেমন নাম নির্ধারণ করে দিই। কিন্তু এটা কখনোই আশীর্বাদ বয়ে আনতে পারে না। সেইজন্য সন্তান বড় হলে প্রায়ই শুনি তাদের নাম নিয়ে নিজের সাথে দ্বন্দ তৈরি হয়।

সকল খ্রিস্ট ধর্মের পিতা মাতা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো সন্তানের জন্ম হলে একটি সঠিক সুন্দর ও অর্থপূর্ণ বাইবেলীয় নাম ডাক নাম হিসেবে রাখা উচিত যাতে খ্রিস্ট মণ্ডলীতে খ্রিস্টীয় মনোভাবাপন্ন সন্তানের জন্ম হয় এবং একদিন তারা এই দেশ ও পৃথিবীতে খ্রিস্টীয় আদর্শ তথা যিশু খ্রিস্টের শান্তি ও আনন্দ সবার মাঝে বিলিয়ে দিতে পারে॥

একটি পবিত্র গোশালা

মালা চিরান

বহু যুগ ধরে এই নশ্বর পৃথিবীতে
শীতের কুয়াশায়
বেথলেহেমর একটি পবিত্র গোশালা
সেখানে মহান
শিশু রাজা যিশু জন্ম নিল মাতা
মেরীর কোলে,
স্বর্গীয় আলোয় ভরে উঠেছিল
পবিত্র গোশালাটি।
আমরা মানব জাতি ধন্য, শিশু রাজা যিশুর
জন্মের জন্য।
আমরা পৃথিবীতে জীবন নিয়ে
খুবই ব্যস্ত থাকি
আমরা পাপী, সর্বদাই পাপ পথে চলি।
শুধু শুধুই আমরা মনের হিংস, অহংকার
নিয়ে ডুবে আছি।
ধনী, গরীব আমরা সবাই এই নশ্বর
পৃথিবীতে বসবাস করি,
গরীব, দুঃখী যারা তারা গ্রামে, সমাজে,
পরিবারে অবহেলার মানুষ হয়ে দাঁড়ায়।
ধনীরা গাড়ী-বাড়ী ধন সম্পদ টাকা নিয়ে
অহংকার করে।
এই নশ্বর পৃথিবীতে সবাই আমরা পাপী
তাইতো স্বর্গদূতেরা পৃথিবীতে এসে
মহান রাজা যিশুর জন্ম সংবাদ দিল,
রাখাল, পণ্ডিতদের কাছে, তাইতো আজ
পাপী মানব জাতি খুঁজে পেল
পরিত্রাণের পথ।
বনের পাখি, পর্বতমালা সাগর নদী
মুখরিত হল
যিশু জন্মের জয়ধ্বনি সারা বিশ্বে
জাগরিত আজি
তাইতো মানব জাতি মনের আনন্দে যিশুর
জন্মের গুণকীর্তন করতে করতে
পবিত্র গোশালে সবাই মিলে যায় চলে
শিশু যিশু রাজাকে ভক্তি ভরে
প্রণাম জানাতে।

ক্রোড়ে ক্রোড়ে শিশু যিশু

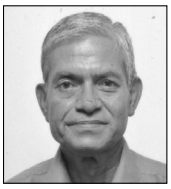

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি

ভূমিকা: বনেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃ ক্রোড়ে। এ প্রবাদটি খুবই প্রচলিত। মাতৃগর্ভে শিশু ভ্রুন হতে যেসবে সঞ্চারিত লগ্ন থেকে মায়ের সঙ্গে নিবির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নিজ রক্ত, মাংস দিয়ে তিলে তিলে গড়ে তোলা শিশুটি মায়ের যে কত কাছের ও আপন সত্তা বা অস্তিত্বের ফসল তা মায়েরাই উপলব্ধি করতে পারেন। নাড়ীর সাথে নারীর বন্ধন, স্নেহ মায়া মমতা, ভালোবাসা আর আদর সোহাগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শিশুটি প্রত্যাশা আর উজ্জ্বল ভবিষ্যতে মাতা পিতার গর্বের ফসল হয়ে উঠবে এটাই বাস্তবতা। প্রভু যিশুখ্রিস্ট মানব দেহ ধারণ করে মানবীয় ও ঐশরিক স্বভাবে আমাদেরই একজন হয়ে বেড়ে ওঠেছেন। নাজারেথের যিশু মারীয়া ও যোসেফ পরিবার আমাদের পরিবারগুলোর আদর্শ এবং পরিবার তুমি পরিবার হও, এ নীতিতে বিশ্বাসী। শিশুকে ঘিরে আদর্শ পরিবার গঠন। সেই শিশু বেশিরভাগ সময় বিছানায় নিদ্রাগত থাকে আর কচি দেহটি অনবরত নাড়া চাড়া করে তার সুবিধা অসুবিধাগুলো কান্নার মাধ্যমে ব্যক্ত করে। এর ফলে সবচেয়ে কাছে উপবিষ্ট মাকে ইঙ্গিত করে ক্রোড়ে অবস্থানের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই ক্রোড়ে বা কোলে ওঠার ঘটনা বলি আর অবস্থানের কথা বলি, এ নিয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে উপস্থাপন করছি ক্রোড়ে ক্রোড়ে শিশু যিশুর অবস্থানের গল্প ।

ধন্যা মারীয়া: ঈশ্বরের দূত গাব্রিয়েল মারীয়াকে বললেন,'আনন্দিতা হও' হে অনুগৃহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন। এই কথায় তিনি অধিক বিচলিত হলেন ও ভাবতে লাগলেন এমন অভিবাদনের অর্থ কী! কিন্তু দূত তাঁকে বললেন, 'ভয় করো না' মারীয়া; তুমি তো ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহই পেয়েছ। দেখ, গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করবে ও তাঁর নাম রাখবে যিশু। তিনি মহান হবেন, ও পরাৎপরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন এবং প্রভু ঈশ্বর তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন তাঁকে দান করবেন, তিনি যাকোবকূলের উপর চিরকাল রাজত্ব করবেন, ও তাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন (*লুক: ১:২৮-৩৩*)। মা-মারীয়াকে বলা হয় 'ভালোবাসার রাণী' যে ভালোবাসা শুধুমাত্র নিজ সন্তানকে কোলে তুলে নিয়েছে বলেই নয়; তিনি সর্বজাতির মানুষের জন্য নিজ জীবনকে বিসর্জন দিয়েছেন। যার জীবনে সপ্তশোক অক্টোপাসের মত ঘিরে রেখেছিল। আবার ঈশ্বরের ভালোবাসা ও মহা অনুভবতায় স্বর্গে উন্নীত হয়েছেন পিতা ঈশ্বরের এবং পুত্র যিশুর মাঝখানে। স্বগৌরবই যার প্রাপ্ত পুরস্কার। স্বর্গের ও মর্তের রাণী হয়ে উঠতে সকলের জন্য সেবার আকর হতে পেরেছেন। স্মরণ কর প্রার্থনাটি হলো একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ - হে করুণাময়ী কুমারী মারীয়া, কেহ তোমাকে ডাকিয়া... ঈশ্বর পুত্রের মাতা, তুমি আমারও মাতা, তোমার অযোগ্য সন্তানের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিও না কিন্তু কৃপা করিয়া আমার প্রার্থনাটি গ্রহণ করিয়া তাহা পূরণ কর। - আমেন। মাতৃ স্নেহ, ভালোবাসা দিয়ে মারীয়া নিজ পুত্রকে গড়ে তুলেছেন পিতারই পরিকল্পনায়। মিশরদেশে, নাজারেথে শুধু কোলেই নয়, সার্বিক যত্নে শিশু যিশুকে গঠন দিয়েছেন। জন্মলগ্ন এবং পরবর্তীতে মৃত যিশুকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে মায়ের ক্রোড়ে স্থাপন করা হয়েছে। আনন্দ - বেদনা মাখা কষ্ট সহ্য করে মাতা মারীয়া যিশুকে ঈশ্বরের হাতে তুলে দিতে পেরেছেন এ যে কত ত্যাগ ও ভালোবাসার প্রকাশ যা পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

জেরুসালেম মন্দিরে সিমেয়োনের ক্রোড়ে শিশু যিশু : যে ব্যক্তি মুক্তিদাতা প্রভু যিশুর সাক্ষাৎ না পাওয়ার পূর্বে মৃত্যু হবে না এমন প্রত্যাশার পূর্ণতা পেয়েছে মন্দিরে যখন শিশু যিশুকে কোলে নিতে পেরেছিলেন। সাধু লুক এভাবে উপস্থাপন করেছেন - সে সময়ে জেরুসালেমে সিমেয়োন নামে একজন ছিলেন, যিনি ধার্মিক ও ভক্তপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন; তিনি ইস্রায়েলের মুক্তির প্রতীক্ষায় থাকতেন ও পবিত্র আত্মা তাঁর উপর ছিলেন। তাঁকে একথা জানিয়েছিলেন যে, প্রভুর সেই খ্রিস্টকে না দেখা পর্যন্ত তিনি মৃত্যু দেখবেন না। সেই আত্মার আবেশে তিনি মন্দিরে এলেন এবং যিশুর পিতা মাতা যখন বিধানের নিয়ম বিধি সম্পাদন করার জন্য শিশুটিকে ভিতরে নিয়ে আসছিলেন, তখন তিনি তাকে কোলে নিলেন, ও ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করে বলে উঠলেন:

"হে প্রভু, তোমার কথামত
এখন তোমার এই দাসকে শান্তিতে
বিদায় দাও;
কারণ আমার চোখ দেখেছে তোমার

সেই পরিত্রাণ
যা তুমি প্রস্তুত করেছ সকল জাতির সামনে:
ঐশপ্রকাশে বিজাতীয়দের উদ্বুদ্ধ
করার আলো
ও তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের
গৌরব।” (*লুক: ২:২৫-৩২*)

সাধু যোসেফের ক্রোড়ে শিশু যিশু: শিশু যিশুর পিতৃ পরিচয় বলতে গেলে যোসেফ অজ্ঞই ছিলেন। এবং সে শিশুটির পালক পিতা হয়ে তাঁর প্রতি ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা, আদর সোহাগ, সেবা যত্ন, ভরণ-পোষণ সবই যে তাকেই করতে হবে তেমন নির্দেশনা যোসেফ দূত থেকেই ঘোষণার পরে বুঝতে পারলেন। অতএব ঈশ্বর যখন তাকে বেছে নিয়ে এমন দায়িত্ব-কর্তব্য নৈতিকতার সাথে পালন করতে হবে; এটি মনে স্থির করে সন্দেহবিহীনভাবে ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ হয়ে পালনের দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। মারীয়ার গর্ভের শিশুটিকে রক্ষা, মারীয়ার সংকোচ, ভয় ভীতি, অস্থিরতা, সমাজের দৃষ্টিতে মারীয়া কলঙ্কিত যাতে না হয় এসব যোসেফ চিন্তা করেই মারীয়ার গর্ভের শিশুসহ বেথলেহেমের উদ্দেশে গমন করলেন। কথিত আছে, ত্রিশ কিলোমিটার দীর্ঘ পথ, শীতকালে, বরফ ও তুষারে ঢাকা পিচ্ছিল পথ, পাহাড় পর্বত, বনজঙ্গল উপেক্ষা করে গাধার পিঠে চড়িয়ে যোসেফের গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হওয়া আমাদের জন্য দুশ্চিন্তারই বিষয়। কারণ দুর্গম রাস্তা, অন্ধকারাচ্ছন্ন অজানা পথে যাত্রীবেশে চলাচল অসম্ভব বলেই আমাদের মনে হয়। কিন্তু যোসেফের কতটুকু সাহস, দৃঢ় মনোবল এবং মা-শিশুকে রক্ষা করার যে ব্রত তিনি মনের মধ্যে পুষে রেখেছেন, তা বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত তিনি ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত এবং অসম্ভব বলে মেনে নিতে পারেননি এবং ঈশ্বরের নির্দেশ ও আদেশ হিসেবে মেনে নিয়ে সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করে দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান ছিলেন।

যিশুর পরিত্রাণ কার্য শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর উপর ন্যস্ত কর্তব্য কাজ সম্পন্ন করতে যোসেফ নিজের জীবন উপেক্ষা করে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। আমরা জানি, প্রত্যেক মানব শিশু জন্মের পর অসহায় থাকে। শিশুর মা-ও নিরুপায় থাকেন। তাদের উভয়কে রক্ষণাবেক্ষণ, সেবা যত্ন করতে শুধু মা-ই নন, তাঁর পিতার সংস্পর্শও প্রয়োজন। মায়ের পরশ শিশু সব সময় পাওয়ার অধিকার রাখে। সাথে সাথে পিতার। শিশু যিশু বাবার পরশ থেকে বঞ্চিত হননি। কারণ শিশুর প্রতি পিতা মাতার ভালোবাসা আন্তরিকতা শর্ত ও স্বার্থের উর্ধ্বে। যোসেফের কোলে শিশু যিশু। শিল্পী তার নিপুণ হাতের স্পর্শে তৈরী করেছেন প্রতিকৃতি বা নমুনা। খ্রিস্ট বিশ্বাসী ঐশজনগণ পারিবারিক, সামাজিক জীবনে যে বাস্তবতায় শিশুদের নিয়ে বসবাস করেন, সেখানে আমরা যে চিত্র দেখতে পাই কখনো মায়ের কোলে আবার কখনো বাবার কোলে ঘরের বাইরে বেড়াতে যায়। শিশু যেন উপলব্ধি করতে পারে সে পিতা মাতার উভয়ের পরশ ও ভালোবাসায় বেড়ে উঠছে।

যিশু বার বছর বয়সে নিজেই হেঁটে জেরুসালেমে তীর্থে যোগ দিয়েছিলেন মা-বাবার সঙ্গে। কিন্তু তাদের নজর ছিল বালক যিশুর নিরাপদ যাত্রার দিকে। সাধু লুক উল্লেখ করেছেন যিশু আবার নাজারথে ফিরে এসেছেন মা বাবার সঙ্গে। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ, আশীর্বাদ যিশুর প্রতি ছিল অপরিসীম। যিশু মা বাবার বাধ্য হয়ে রইলেন আর ঈশ্বর ও মানুষের ভালোবাসায় জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে বৃদ্ধি পেতে লাগলেন (*লুক: ২:৩৯ - ৫২*)।

সাধু খ্রিস্টফারের কাঁধে শিশু যিশু:

অফফেরো নামে শক্তিশালী একব্যক্তি দীর্ঘদিন যাবৎ প্রতিক্ষায় ছিলেন এমন একজন শক্তিশালী রাজার যাকে তিনি কাঁধে বহন করবেন এবং তার সেবক হবেন। তার অদ্ভুত খেয়াল কার্যকর হল এভাবে; ঘুরতে ঘুরতে অফফেরো একটি অতিশয় খরস্রোতা নদীতে এসে পড়েন, সেখানে দেখতে পান একজন ধার্মিক সন্ন্যাসীর, ঐ সন্ন্যাসী ওখান থেকে পথিকদের নিরাপদ জায়গা দিয়ে নদী পার হতে সাহায্য করতেন। তিনি অফফেরোকে বলে দিলেন যে, আমাদের প্রভু যিশু হলেন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা। তাই না শুনে অফফেরো ঐ নদীর পাড়েই থেকে গেলেন আর ঐ রাজার সেবা করার জন্য পথিকদের কাঁধে করে নদী পার করতে লাগলেন। একদিন একটি ছোট ছেলে এলো নদী পার হতে। অফফেরো তাকে কাঁধে নিয়ে নদীতে নামলেন। কিন্তু একি! নদীর জল ফুলে উঠতে লাগলো। অফফেরো যতোই এগুচ্ছে, কাঁধে বালকটিকে ততো ভারী মনে হচ্ছে। এক সময় অফফেরো বলে উঠলেন, এ ছেলে তুমি কতো ভারী? মনে হচ্ছে যেন সারা পৃথিবীটাকেই কাঁধে তুলে নিয়েছি। বালকটি হেসে বললো, তুমি পৃথিবীর চেয়েও আরও বেশি কাঁধে নিয়েছো, তুমি কাঁধে নিয়েছো যে পৃথিবী সৃষ্টি করেছে তাকেই। এ বলে বালকটি তাঁর হাত জলে ডুবিয়ে অফফেরোকে বাপ্তিস্ম দিলো। তারপর থেকেই ঐ শক্তিশালী মানুষটির নাম হলো খ্রিস্টফার বা খ্রিস্টকে বহনকারী।

পাদুয়ার সাধু আন্তনীর ক্রোড়ে শিশু যিশু:

শিশু যিশুর প্রতি সাধু আন্তনীর কি পরিমাণ ভক্তি ছিল তা বলে শেষ করা যাবে না। তাঁর ভক্তি আর বিশ্বাসই অলৌকিক সাধক হিসেবে পরিচিতি লাভে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। সাধু আন্তনীর যিশুর প্রতি ভক্তির পুরস্কার স্বরূপ শিশু যিশু সাধু আন্তনীর সঙ্গে এসে দেখা দিতেন ও আলাপ করতেন। সাধু আন্তনীর জীবনকালে পাদুয়াতে তিসো বলে একজন সম্ভ্রান্ত লোক বাস করতেন। ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে তিসো সাধুকে তাঁর বাড়িতে কয়েকদিন বিশ্রাম করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। আন্তনী আনন্দের সাথে তা গ্রহণ করেন। একদিন রাত্রিবেলা সে আন্তনীর ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি দেখতে পেলেন এক স্বর্গীয় শিশু, আন্তনীর সামনে খোলা মঙ্গলসমাচারে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর গলা জড়িয়ে ধরেছেন এবং আন্তনী পরম তৃপ্তির হাসি হাসছেন। এক স্বর্গীয় আলোর বন্যা শিশুটিকে ঘিরে রেখেছে। তিসো এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে আনন্দের আতিশয্যে ও স্বর্গীয় উল্লাসে মত্ত হয়ে গেলেন। শিল্পী তার মাধুর্য মাখানো কর্ম দক্ষতা ও আত্মিক প্রেরণায় সাধু আন্তনীর ক্রোড়ে শিশু যিশুকে রেখেছেন। অপূর্ব ভক্তির নিদর্শন ও প্রতিকৃতি সমগ্র বিশ্বে আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাধু আন্তনী ঐশরিক গুণাবলীর মধ্যে নিরাময়সহ বহু অলৌকিক কার্য সাধন করেছেন। কিন্তু বিশেষ গুণ হিসেবে ভক্তি-বিশ্বাস নিয়ে সাধু আন্তনীর কাছে হারানো জিনিস প্রাপ্তির সাহায্য প্রার্থনা করলে কেউ কখনো বিফল হয়নি। এমনটি জীবনদশায় যতগুলো আশ্চর্য কাজ করেছেন, মৃত্যুর পর তার দ্বিগুণ হয়েছে। সাধু আন্তনী সবার জন্য। তাই আমাদের প্রার্থনা: হে সাধু আন্তনী, আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর।

উপসংহার: কোলে কোলে সব শিশু বড় হবার স্বপ্ন দেখে। ঘটনাও হয় তাই। স্নেহ-ভালবাসার পরশ যারা বেশি দিতে পারে, শিশুরা তাদের স্পর্শই বেশি পেতে চায় এবং তাদের কোলে ঝাপিয়ে পড়ে। শিশু যিশুর ক্ষেত্রে মাতা - মণ্ডলীতে বিশ্বাসের ও ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ এমনটি ঘটেছে। মা মারীয়া, মন্দিরে সিমেয়োন, সাধু যোসেফ, সাধু খ্রিস্টফার এবং সাধু আন্তনীর ক্রোড়ে অবস্থান আমাদের মনে প্রশান্তি ও বিশ্বাসের যাত্রায় সুখের পরশ ছুঁয়ে যায়। যুগে যুগে ঈশ্বর এমন কীর্তি সাধন করেছেন যে, ভক্তির মণিকোঠায় চির স্মৃতির দৃশ্যমান চিহ্ন ভক্তপ্রাণ মানুষের হৃদয়ে সদা জাগ্রত থাকবে॥

প্রবাসের মাটিতে বাঙালির বড়দিন আনন্দ

বিপুল এলিট গনছালভেস

রতন ও কাকন এখন মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা। বিয়ের পর দীর্ঘ ষোলো বছরে আর বাংলাদেশে যাওয়া হয়নি। পনেরো আর তেরো বছরের ছেলেকে নিয়ে দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশে গেলেন বড়দিন উদ্‌যাপন করার জন্য। ছেলেকে বলে নিয়ে গেলেন গ্রামের বাড়িতে বড়দিনের মজাই আলাদা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে কীর্তন করা, পিঠা খাওয়া, গুরুজনদের কাছ থেকে আশীর্বাদ নেওয়া অন্যরকম আনন্দ হয়। বাবা-মার কথা শুনে ছেলেরাও খুব উদগ্রীব যে বাংলাদেশে গিয়ে প্রথমবারের মতো গ্রামের মাটিতে বড়দিন উদ্‌যাপন করবে। বাংলাদেশে গিয়ে গির্জার আলোকসজ্জা দেখে ভালোই লাগলো, কিন্তু কীর্তনে গিয়ে তাদের আনন্দটা যেন ম্লান হয়ে যাচ্ছে। সময় মত কীর্তন শুরু হয়নি তার ওপর একুশ বছরের কম ছেলেরা মদ খেয়ে মাতলামি করছে। ছেলেরা কিছুটা হতাশ হয়ে বাবা মাকে বললেন, বিদেশই ভালো কারণ ওখানে আমরা বাবা-মা ভাই-বোন সবাই এক সঙ্গে কীর্তন করি আর পুরো ডিসেম্বর মাসে আমরা কীর্তন গেয়ে আনন্দ করি। আর দেখো সবার বাড়িতে মদ থাকে কিন্তু ২১ বছর না হলে আমরা মদ ছুঁয়েও দেখি না। রতন ও কাকনও বুঝতে পারলেন দীর্ঘ ষোলো বছরে গ্রামের বাস্তবতা অনেক পাল্টে গেছে কিন্তু প্রবাসে গিয়েও আমরা ভুলে যাইনি শিকড়। আমরা এখনো গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী বড়দিনের কৃষ্টি সংস্কৃতি এই প্রবাসে ধরে রাখার চেষ্টা করছি। অথচ আধুনিকতার নামে গ্রাম বাংলার এত সমৃদ্ধময় ঐতিহ্য কেমন পাল্টে যাচ্ছে।

নিজের মাতৃভূমির মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে জীবন-জীবিকা ও উন্নত জীবনের সন্ধানে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রবাসী হয়ে অভিবাসী গ্রহণের চেষ্টা করি। এশিয়া ইউরোপের প্রতিটি দেশেই বাঙালিদের বসবাস। তবে সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে উত্তর আমেরিকায় স্থায়ী হওয়ার প্রবণতা একটু বেশি। আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে লক্ষাধিক বাঙালির বসবাস। এই প্রবাসে বহু সংস্কৃতির মাঝে আমাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পারিবারিক ধর্মীয় চেতনাকে ধরে রাখার প্রয়াসে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন সংগঠন আছে। প্রবাসভূমে সংগঠনগুলি বাংলা সংস্কৃতি ধারণ লালন পালনে বিরাট অবদান রেখে যাচ্ছেন। উল্লেখ্য দূর প্রবাসে বাংলাদেশী খ্রিস্টভক্তদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়।

ধর্ম যার যার উৎসব সবার এই প্রবণতা নিয়েই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই মিলেমিশে প্রবাসের মাটিতেও বাঙালিরা বাংলা কৃষ্টি সংস্কৃতি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্র। প্রবাসে বিভিন্ন সংগঠনে বিভাজিত হলেও নিজস্বতা ও জাতিসত্ত্বার আলোকে আগামী প্রজন্মকে গড়ে তোলার দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে বীরদর্পে এগিয়ে চলছে বাঙালি জাতি। নিজস্ব ঢং নিয়ে সারা পৃথিবীতেই বড়দিনের আনন্দ উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। বহুজাতির সাথে বাঙালিও মেতে ওঠে এইদিনটি পালনের জন্য। প্রবাসে বিশেষভাবে ক্রিসমাস ট্রী, রাস্তাঘাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো রঙিন আলোর বন্যায় প্লাবিত হয়। আত্মীয় পরিজন, অতিথি, নিমন্ত্রণ কার্ডবিনিময়, নানারকম খাবার পিঠাপুলি ও কেকের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ কীর্তন হয় কয়েকদিন কিন্তু প্রবাসে মাসব্যাপী সংগঠনগুলো বাড়ি বাড়ি কীর্তনের মাধ্যমে যিশুর জন্মবারতা পৌঁছে দেয়। আর স্থানীয় সংঘ-সমিতি, অ্যাসোসিয়েশন সমূহ আয়োজন করে বিশেষ প্রীতিভোজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। আমেরিকার তুষার আর প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করেও বাঙালিরা বড়দিনের আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠে। প্রতিটি উৎসবই বাঙালির প্রাণের উৎসব সে উৎসব যে ধর্মেরই হোক না কেন। বাংলার জাতীয় উৎসবগুলো যেমন মিলেমিশে পালন করে, তেমনি ধর্মীয় উৎসবগুলোও পালন করে এক হয়ে। প্রবাসে এসেও এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। উৎসবের নামে বাঙলিরা বাঙ্গালীদের খুঁজে বের করেন।

২০০৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে আমি বিদেশে অর্থাৎ বিভিন্ন দেশে বড়দিন উদ্‌যাপন করছি। আমি নিজেও উপলব্ধি করেছি যে, প্রবাসে বাংলাদেশীরা সবচেয়ে বেশি আনন্দ পায় বাংলায় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করে। ২৫ ডিসেম্বর সকালে গির্জায় গিয়ে সবার সঙ্গে দেখা হওয়া হইচই এক অপার আনন্দ অনুভূতি। প্রতিটি খ্রিস্টযাগে পর বাঙালির মিলন বন্ধনে যেন প্রবাসভূমে এক টুকরো বাংলাদেশ হয়ে ওঠে। এ অপার আনন্দ তুলনাহীন। সংগঠনগুলি বাংলায় ঢঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এর মধ্যে সান্তাক্লজের আগমনের মাধ্যমে শুরু হয় বাঙালির বড়দিনের অনন্য আয়োজনটি। এরপর শিশুদের নিয়ে খেলা, ফ্যামিলি গেইম শো, ক্রিসমাস ক্যারল, পারস্পরিক সম্মীলন, কেক কাটা শেষে সাংস্কৃতির পরিবেশনা ও নৈশভোজের মাধ্যমে শেষ হয় বড়দিন উৎসব।

তবে হ্যাঁ, প্রবাসে বেড়ে উঠা ছেলে মেয়েরা যেভাবে বাংলায় কীর্তন করে তা বাংলা সংস্কৃতির জন্য আশাপ্রদ দিক। প্রবাসে জন্ম নেওয়া ছেলে মেয়েদের মুখে কীর্তন শুনলে বড়দিনের আনন্দ আরো দ্বিগুণ হয়ে যায়। আমেরিকায় বাঙালি খ্রিস্টানরা যেভাবে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বজায় রেখে বড়দিন উদ্‌যাপন করে পৃথিবীর অন্য দেশেও সেভাবেই উদ্‌যাপিত হয়। তাই আশা করা যায় যে আমাদের বাঙালি খ্রিস্টীয় ধর্মাচারের এই ধারা এ প্রবাসে সমৃদ্ধময় হচ্ছে ।

আমেরিকাতে এবং ইউরোপে বড়দিনের উপহার প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বড় ছোট সবাই সবাইকে উপহার দেওয়ার চেষ্টা করে। সামর্থের কারণে সবাই হয়তো উপহার প্রদান করে এ প্রবাসে আনন্দ পায়। আমার জানা মতে সারা বছর না পারলেও বড়দিনে সবাই মাতৃভূমিতেও কিছু উপহার পাঠাতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। যাই হোক না কেন বড়দিন মানেই হৃদয়ে ধারণ করে মহামিলনের আনন্দ। বড়দিনের আয়োজনে বাংলা গান, নাচ, সঙ্গে বাঙালি খ্রিস্টানদের ঐতিহ্যবাহী কীর্তন এ প্রবাসকে করে তুলে আনন্দময়।

বাঙলির উৎসব মানেই নানা ধরনের পিঠা তৈরি। ছোটবেলায় দেখতাম বড়দিনের আগের দিন রাতে মা, দিদিমা, মাসী মা সহ পাড়ায় মায়ের বান্ধবীরা সবাই মিলে পিঠা তৈরি করতেন। আমরাও ছোট ছোট হাতে পিঠা বানানোর চেষ্টা করতাম। এ প্রবাসেও বড়দিনকে ঘিরে সবাই পিঠা বানাতে চেষ্টা করে। প্রবাসে বাঙালির পিঠা খাওয়ার মজাই আলাদা। বাহারি পিঠা দেখেই মন আনন্দে ভরে উঠে।

নতুন সাজ পোশাকের সরূপ দেশে-বিদেশে একই রকম। কঠিন অভিবাসনের জীবন জীবিকা সামলিয়ে এ প্রবাসে সবাই সত্যিকারের বড়দিনের আনন্দকে ধরে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। তবে বড়দিনকে ঘিরে হৃদয়-এর প্রস্তুতির উপরই নির্ভর করে আনন্দ। মনুষ্যত্ব আর নায্যতায় বর্ণিল হউক বড়দিন দেশে কিংবা বিদেশে। যিশু খ্রিস্টের জন্মের আনন্দই হউক চির সত্যময়। সবাইকে শুভ বড়দিন॥

বড়দিন ও পুনর্মিলন

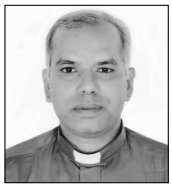

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

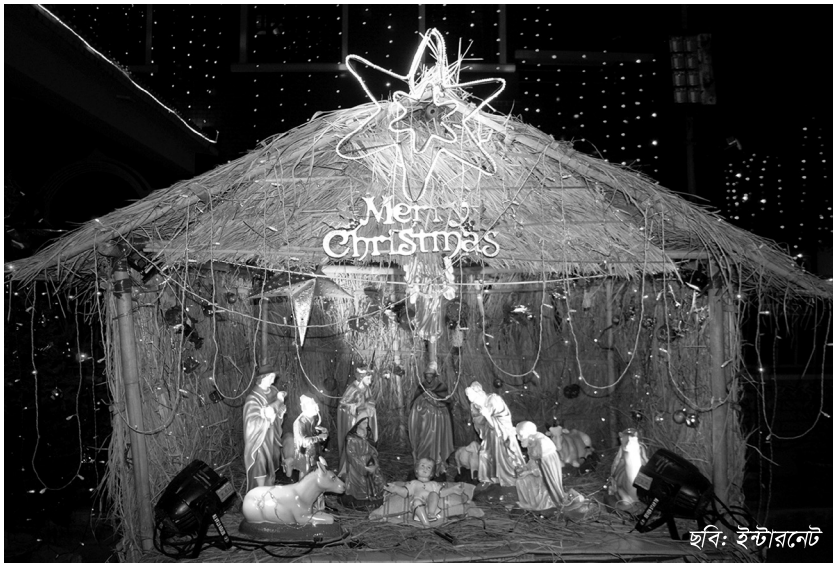

ছবি: ইন্টারনেট

বড়দিন ঈশ্বরের ভালোবাসাপূর্ণ প্রকাশিত হল জগতের মাঝে, মানব সমাজে সৃষ্টি মাঝে। তিনি তাঁর ভালোবাসার প্রকাশ ঘটালেন আপন পুত্র দানের মধ্যদিয়ে। "ঈশ্বর এই জগতকে এতোই ভালোবাসেন যে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে দিলেন, যেন সেই পুত্রের ওপর যে, কেউ বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় বরং অনন্ত জীবন লাভ করে" *(যোহন ৩:১৬)*। যিশু খ্রিস্টের (বাণী) মানব দেহধারণের মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের ও মানুষের সঙ্গে মানুষের পুনর্মিলন সাধিত হয়েছে। "আদিতে বাণী ছিলেন, বাণী ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন আর সেই বাণী ঈশ্বর ছিলেন। সেই বাণী আদিতে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন" (*যোহন ১:১-২*)। কালের পূর্ণতায় "বাণী মানুষের রূপ ধারণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বসবাস করতে লাগলেন। পিতা ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র হিসাবে তাঁর যে মহিমা, সেই মহিমা আমরা দেখেছি। সে বাণী অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ ছিলেন" (*যোহন ১:১৪*)। শাস্ত্রের এই বাণীই (খ্রিস্ট) জগতে প্রবেশ করেছে ও আমাদের সঙ্গে মিলন ঘটিয়েছে। বাণীর (যিশু) মানব দেহধারণই বড়দিন। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের পুনর্মিলনই মানব জাতির মুক্তি তথা পরিত্রাণ ও শান্তি। বড়দিন ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক পুনর্মিলনের উৎসব।

বিচ্ছিন্নতা ও পুনর্মিলন:- আমরা মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি হয়েছি (*দ্রঃ আদি. ১:২৬*)। আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রাণবায়ু দেওয়া হয়েছে, ফলে আমরা (মানুষ) সজীব প্রাণী হয়ে উঠেছি (*দ্রঃ আদি ২:৭*)। আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহে ধন্য হয়েছি ও ঐশ সন্তানের মর্যাদা লাভ করেছি। আমরা আমাদের সেই ঐশ মর্যাদা ও অধিকার ধরে রাখতে পারি নাই। আমরা ঈশ্বরের আবাধ্য হয়ে পাপ করে তাঁর সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন করেছি (*দ্রঃ আদি. ৩:১-৬*)। আমরা পাপ করে মর্যাদা হারিয়েছি। ঈশ্বর তাঁর সাথে আমাদের পুনর্মিলন ঘটাতে তাঁর একমাত্র পুত্র যিশুকে আমাদের জন্য প্রেরণ করেছেন।

"প্রাচীনকালে ঈশ্বর ভাববাদীদের মাধ্যমে বহুবার নানাভাবে আমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। এখন এই শেষের দিনগুলোতে ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কথা বললেন এক পুত্রেই, যার দ্বারা সমগ্র জগত সৃষ্টি করেছেন। তাঁর পুত্রকেই সবকিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন" (*হিব্রু: ১:১-২*)। আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হই ও ফিরে পাই হারানো মর্যাদা ও অধিকার। ঈশ্বর এই সকল কার্য তাঁর পুত্র যিশুখ্রিস্টের মধ্যদিয়েই সাধন করেছেন। "সমস্ত কিছুই ঈশ্বর থেকে এসেছে, যিনি খ্রিস্টের মাধ্যমে নিজের সাথে পুনর্মিলিত করেছেন এবং অন্যদের তাঁর সঙ্গে আবার মিলন করিয়ে দেওয়ার কাজ আমাদের দিয়েছেন" (*২য় করিন্থীয় ৫:১৮*)। পরস্পরের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও মর্যাদা রক্ষা আমাদের দায়িত্ব। ঈশ্বর (বাণী) ও জগতের এই মিলন সাধন বাণীর দেহধারণের উৎসব বড়দিন। কেননা; "ঈশ্বর তাঁর সমস্ত পূর্ণতায় খ্রিস্টে বাস করে খুশী হয়েছিলেন। আর খ্রিস্টের ক্রুশের উপর পতিত রক্তের দ্বারা শান্তি স্থাপন করে কি স্বর্গের, কি মর্তের সব কিছু খ্রিস্টের মাধ্যমে তাঁর কাছে পুনরায় ফিরিয়ে এনেছিলেন" (*কলসীয় ১:১৯-২০*)। ঈশ্বরের এই মিলন সাধনকারী কার্য শুরু হয়েছে জগতে যিশুর জন্মক্ষণে।

বাণী দেহধারণ ও পুনর্মিলন:- যিশুর (বাণী) মানব দেহধারণ ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা। "ঈশ্বর আমার প্রভু, তোমাদের একটা চিহ্ন দেখাবেন; ঐ যুবতী কন্যাটি গর্ভবতী হবে এবং দেখ সে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেবে। তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানুয়েল" (*ইসাইয়া ৭:১৪*)। ঈশ্বরের এই প্রতিশ্রুতির এই পূর্ণতা পায় কুমারী কন্যা মারীয়ার কাছে স্বর্গদূত গাব্রিয়েলেকে প্রেরণের মধ্যদিয়ে। "গাব্রিয়েল মারীয়ার কাছে এসে বললেন, 'তোমার মঙ্গল হোক। প্রভু তোমার প্রতি মুখ তুলে চেয়েছেন, তিনি তোমার সঙ্গে আছেন'। ... স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, ' মারীয়া তুমি ভয় পেও না, কারন ঈশ্বর তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। শোন! তুমি গর্ভবতী হবে আর তোমার এক পুত্র সন্তান হবে। তুমি তাঁর নাম রাখবে যিশু" (*লুক ১:২৮;৩০-৩১*)। কালের পূর্ণতা জগতে দেহধারী বাণী (যিশু) প্রবেশ করেছেন ও সমস্ত সৃষ্টির সাথে পুনর্মিলন ঘটিয়েছেন।

"আমাদের জন্য এক শিশু জন্ম নিয়েছেন। এক পুত্রকে আমদের জন্য দেওয়া হয়েছে। তাঁর কাঁধে রয়েছে আধিপত্য ভার। তাঁর নাম রাখা হল আশ্চার্য মন্ত্রণাদাতা, শক্তিশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তির রাজপুত্র" (*ইসাইয়া ৯:৬*)। বিশ্ব জগৎ প্রত্যক্ষ করল

ঈশ্বরের মহিমা ও মহানুভবতা। সমগ্র বিশ্বসৃষ্টি ঈশ্বরের ভালোবাসা ও অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়েছে। "সেই বাণী অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ ছিলেন। আমরা সকলেই তাঁর থেকে অনুগ্রহের ওপর অনুগ্রহ পেয়েছি" (*যোহন ১:১৬*)। যিশুর জন্মে জগৎ আনন্দিত হয়; যে আনন্দে মতোয়ারা স্বর্গ ও মর্ত। "স্বর্গে ঈশ্বরের মহিমা, পৃথিবীতে তাঁর প্রীতির পাত্র মনুষ্যদের মধ্যে শান্তি" (*লুক ২:১৪*)। যিশুর জন্ম জগতে সকল প্রকৃতি (উন্মুক্ত পরিবেশ, পশু), ধনী (পণ্ডিত), দরিদ্র (রাখাল) প্রত্যেকের সঙ্গে মিলন/পুনর্মিলন ঘটেছে। বড়দিনে ঘোষিত হয় (Proclamation) আমাদের মুক্তি/পরিত্রাণ (Salvation); যে পরিত্রাণ আমাদের নিয়ে যায় আনন্দের উৎসবে পুনর্মিলিত (Reconciliation) হতে।

পুনর্মিলন, শান্তি ও বাস্তবতা:- পুনর্মিলন হল, হারিয়ে যাওয়া সম্পর্ক পুনরুদ্ধার। সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার ফলেই শান্তি বিনষ্ট হয়েছে। শান্তিতে বাস করতে হলে আমাদের সম্পর্ক ঠিক করতে হয়। পারস্পরিক পুনর্মিলন একান্তভাবে দরকার। ঈশ্বর জগতের সাথে পুনর্মিলনের জন্য তাঁর পুত্র, যিনি শান্তির রাজপুত্রকে (*দ্রঃ ইসাইয়া ৯:৬*) প্রেরণ করতে চান অন্ধকারাচ্ছন্ন জাতিকে আলো দেখাতে (*দ্রঃ ইসাইয়া ৯:২*)। তাঁরই জন্মক্ষণে স্বর্গদূতেরা গাইল "স্বর্গে ঈশ্বরের মহিমা, পৃথিবীতে তাঁর প্রীতির পাত্র মনুষ্যদের মধ্যে শান্তি" (*লুক ২:১৪*)। এখানে ঘোষিত হল পরিত্রাণ যা মানুষের সাথে ঈশ্বরের পুনর্মিলন ঘটায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়। শান্তি পৃথিবীতে ও মানবের অন্তরে। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিটি দেশ, প্রতিটি দেশের শান্তির জন্য প্রতিটি এলাকা, সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি জীবনের শান্তি প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার। "ধন্য তারা যারা শান্তি স্থাপনের জন্য কাজ করে, কারণ তারা ঈশ্বরের সন্তানরূপে পরিচিত হবে" (*মথি ৫:৯*)। সমাজ, পরিবার তথা ব্যক্তির জীবনে শান্তির জন্য দরকার পুনর্মিলন।

পুনর্মিলন (ঈশ্বর, সৃষ্টি, অন্যদের ও নিজ) সাথে খুবই জরুরী "সমস্ত সৃষ্টি ব্যথায় আর্তনাদ করছে" (*রোমীয় ৮:২২*)। সৃষ্টির বিপর্যয় ও মানুষের মধ্য হাহাকার। জলবায়ু পরিবর্তন, দূষণ (জল, বায়ু, শব্দ ও মাটি), যুদ্ধ, মহামারী, রাজনৈতিক অস্থিরতা, ক্ষমতার অপব্যবহার, অসম প্রতিযোগিতা, অভিবাসন, পারিবারিক কলহ ও বিচ্ছিন্নতা নিত্য দিনের সঙ্গী। সৃষ্টির সৌন্দর্য ও মানব মর্যাদা বিনষ্ট ও পদদলিত হচ্ছে। বড়দিনে, খ্রিস্টপ্রভু জগতে প্রবেশ করেছেন ও মন পরিবর্তনের আহ্বান জানাচ্ছেন; "সময় এসে গেছে, ঈশ্বরের রাজ্য খুব কাছে। তোমরা পাপের পথ থেকে মন ফেরাও এবং ঈশ্বরের সুসমাচারে বিশ্বাস কর" (*মার্ক ১:১৫*)। দেহধারী বাণীর (যিশু) আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজ পাপ অপরাধ স্বীকার, মন পরিবর্তন করে ঈশ্বর (আধ্যাত্মিক) ও পরস্পরের (বাহ্যিক/আচার আচরণ) সঙ্গে মিলনই আমাকে/আমাদের শান্তি দিতে পারে।

সুতরাং "গোটা বিশ্ব নয়, আমরাও যারা পবিত্র আত্মাকে উদ্ধারের জন্য প্রথম ফলরূপে পেয়েছি, আমাদের দেহের মুক্তিলাভের প্রতীক্ষায় অন্তরে আর্তনাদ করছি" (*রোমীয় ৮:২৩*)। বড়দিন (যিশুর জন্মদিন) পরিবর্তন ও পুনর্মিলনে আনন্দের দিন, শান্তিতে জীবন যাপনের সাধনা। আমরা বড়দিনে ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেয়েছি। "সেই অনুগ্রহ আমাদের শিক্ষা দেয়, যেন আমরা ঈশ্বরবিহীন জীবন যাপন না করি ও জগতের কামনা বাসনা অগ্রাহ্য করে এই বর্তমান জগতে আত্মনিয়ন্ত্রিত, ন্যায়পরায়ণ এবং ধার্মিকভাবে জীবন যাপন করি" (*তীত ২:১২*)। ঈশ্বর-ভিরুতা, সচেতনতা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতাই আমাদের পুনর্মিলিত করে।

উপসংহার:- বড়দিন সম্মিলিত আনন্দোৎসব। ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলনের উৎসব! "যখন আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের দয়া ও মনুষ্যপ্রীতি প্রকাশিত হল, তখন তিনি তাঁর দয়ার গুণে আমাদের রক্ষা করলেন। ঈশ্বরের কাছে যোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ার জন্য, ভাল কাজ করেছিলাম বলে নয়" (*তীত ৩:৪-৫ক*)। যুগলক্ষণ দেখা ও তা উপলব্ধি করে প্রভুর বাণীকে পাথেয় করে আমরা এগিয়ে চলি খ্রিস্ট প্রভুকে বরণ করতে। কেননা, তিনি (যিশু) পুনর্মিলন ঘটিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। স্বয়ং খ্রিস্ট ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলনের পথ। "আমিই পথ, আমিই সত্য ও জীবন। পিতার কাছে যাবার আমিই একমাত্র পথ" (*যোহন ১৪:৬*)। খ্রিস্টের মানব জন্ম (বড়দিন), আমাদের জীবনে নতুন করে ধরা দিক। পুনর্মিলনের আনন্দে জাগরিত হোক মানব জীবন। সবার সম্মিলিত সক্রিয় অংশগ্রহণে গড়ে তুলি মিলন-সমাজ॥

শিশির ভেজা নয়ন

সিস্টার শিবলী পিউরীফিকেশন এমপিডিএ

শীতের ঘন কালো দীঘল রাত্রি,
এক ঝাঁক ঘুম নিয়ে,
ঘুমের পাড়াপাড়ের মাঝি, ডেকে যায়
নিশিথ রাতের সাথী, নির্ঘুম
মাঠের রাখালের দলকে।

রাত জাগা ক্লান্ত রাখালেরা
ঘুমের রাজ্যের নিমন্ত্রণে সাড়া না দিয়ে,
কাঁপে সদা শীতে থর থর।
সম্মুখে জ্বলে কাঠের অগ্নিদাহ,
মনের কোণে বহে তুষার প্রবাহ।
আগুনের তাপে উষ্ণ হানি হয়
জীর্ণ তনুর মাটির কুটির।

ঘুমের প্রলোভনে মোদে আসে আঁখি
মনের কোণে জেগে থাকো।
তবুও মেষ পাহাড়ায় নির্জন ক্ষণে,
পাহাড়ের ধারে শীতের কামড় খেয়ে
ঊষার প্রহর গুনে, কাটে অঘুম রাতি।

শিশির ঝরে মাথার পরে,
শিশির ঝরে নয়নে ভাবে,
ছেড়ে পরিবার পরিজনে
পেটের দায়ে এসেছে ছুটে,
মেষ নিয়ে দূর পাহাড়ের তৃণে।

নিরব নিস্তব্দ রাত্রি যাপনে,
শোনে কারো সুমধুর সংগীত কলতানে
নয়নের তন্দ্রা যায় কাটি।
শিশির ঝরা নয়নের দৃষ্টি মেলে
তাকিয়ে দেখে, একদল দেবদূত
তাহাদের নয়ন সম্মুখে
গাহিছে আনন্দ জয়গীতি।

দেবদূতগণ বলিছে গানের তানে,
তোমাদের মুক্তি তরে, জন্মেছেন
এক ত্রাণপতি
বেথলেহেমের গোয়াল ঘরে।
গিয়ে দেখ যাবপাত্র আলো করে
আছেন শুনে জ্যোতির্ময়
ভাববাণী পূর্ণ করে।

শুনে দূত মুখে শুভ বাণী,
কাটে ঘুমের রেশ
শিশির ভেজা নয়নের কোণে।
মেষপাল যা ছিল সনে,
নিয়ে সকলি অমনি ছুটে চলে
বেথলেহেম পানে।

গিয়ে দেখে মাতা মেরীর কোলে
শান্তিরাজ আছেন শুয়ে
শান্তি তরীতে ভেসে।
মুক্তিদাতার চরণে প্রমাণ জানিয়ে
রাখালের দল, দিল মেষ উপহার তাঁরে।

নয়নের শিশির, মনের ঘুম
সবই গেল একসাথে টুটে।
গোয়াল ঘরের ভাঙ্গা চালের ফাঁকে,
মুক্ত আকাশে উজ্জ্বল তারকা হাসে
সবার মনের আনন্দ দেখে॥

‘বড়দিনকে ঘিরে সামাজিক লোকাচার: অতীত ও বর্তমান বাস্তবতা’

যোয়াকিম মান্না বালা

শুরুর কথা: আবহমান কাল থেকেই বাংলাদেশ বৈচিত্রতায় পরিপূর্ণ একটি দেশ। এদেশের প্রতিটি পরতে লুকিয়ে রয়েছে নানা বৈচিত্রতা। বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে এসব বৈচিত্রতা ফুটে ওঠে আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদে, আচার-আচরণে, নানা রকম খাদ্য-পানীয়, সাজসজ্জায়। বাংলার বুকে এরকমই একটি মিলন উৎসব হলো খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের বড়দিন উৎসব। বড়দিন খ্রিস্টধর্ম বিশ্বাসীদের পালিত সবচেয়ে বড় ও আনন্দের উৎসব।

ভারতীয় উপমহাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের আগমন ও তাদের প্রচারকাল থেকেই এদেশে বড়দিন উৎসব পালিত হয়ে আসছে। পর্তুগীজ মিশনারীগণ এবং পরবর্তীতে ইংরেজ মিশনারীদের দ্বারা এদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে। আবার আমাদের চেতনায়, পরিচর্যায় ও অনুশীলনে রয়েছে প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি। তাই বড়দিন উৎসবকে ঘিরে নানা প্রস্তুতি ও উদ্‌যাপিত অনুষ্ঠানমালায় দেশীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতির পাশাপাশি এসকল মিশনারীদের পালিত বিভিন্ন আচার-কৃষ্টিও বেশ স্পষ্টভাবেই ফুটে ওঠে।

বর্তমান বাস্তবতায় মানুষ জীবিকার টানে নিজের পরিমন্ডল/অবস্থান ছাড়িয়ে গ্রাম থেকে শহরে কিংবা বিদেশে পারি জমাচ্ছে। বড়দিন উৎসবকে কেন্দ্র করে পারিবারিক মিলন মেলায় অংশ নিতে ছড়িয়ে পড়া পরিবারের এ সকল সদস্যরা এসময় পরিবারে এসে যুক্ত হয়। সেখানকার পালিত নানা রকম আড়ম্বর ও বর্ণিল আয়োজন তারা পরিবারের বিভিন্ন আয়োজনে যুক্ত করে। এভাবেই বড়দিন উৎসবকে কেন্দ্র করে এদেশের এলাকা/অঞ্চল ভেদে সামাজিক আয়োজনের বিভিন্নতা রয়েছে। তাই নির্দিধায় বলা যায় যে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বড়দিন হচ্ছে এমন একটি পর্বোৎসব, যেখানে দেশী-বিদেশী সংস্কৃতির মিশ্রণ রয়েছে।

বড়দিনের পূর্ব প্রস্তুতি: বড়দিনের আগে বছরের শেষভাগে এসে প্রতিটি স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হত। স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের তাই আনন্দের সীমা থাকতো না। বিভিন্ন বাড়িতে বাড়িতে চলত নানা রকমের প্রস্তুতি। প্রত্যেক বাড়ির আঙ্গিনা, ঘরের বেড়া, উঠান লেপা-পোছা, বাড়ির আশে-পাশে চলত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান। মাটির ঘরের পিড়া/ ডোয়া (অঞ্চল ভেদে নামের ভিন্নতা আছে) চুন দিয়ে ফুল তোলা, নানা রঙ্গের আল্পনার কাজে মা- কাকীমা- জ্যাঠীমা সবাই ব্যস্ত সময় পার করত। ঘরে ঘরে আঁতপ চালের গুড়ি প্রস্তুত করার ধুম পড়ে যেত। বিকালে উঠানে বসে চলত নানা রকমের পিঠা তৈরীর প্রস্তুতি। রাত জেগে চলত হরেক রকমের পিঠা তৈরীর কাজ। কীর্তনের দল ছাড়াও বিভিন্ন দল বাড়িতে এলে তাই দিয়েই চলত আপ্যায়ন। বাড়ির শিশু-যুবরা মিলে আটা/ময়দা দিয়ে আঠা তৈরী করে রঙ্গিন কাগজ দিয়ে শিকল, বিভিন্ন ডিজাইনের ঝালড় তৈরী করে ঘরের সাজসজ্জা করত। বাঁশ কেটে বড় বড় তারা তৈরী করে তার মধ্যে হেরিকেনের আলো দেয়া হত। নিজ হাতে খড়-কুটো দিয়ে অতি সাধারণভাবে তৈরী করত গোশালা। কালের প্রবাহে আধুনিকার ছোয়ায় এসব এখন অনেকটাই সেকেলে হয়ে গেছে। বিভিন্ন দোকানের রকমারি ক্রিসমাস কেক, সাজসজ্জার জন্য নানা রকমের চাকচিক্য উপকরণের সহজলভ্যতা, নানা রকমের কৃত্রিম ক্রিসমাস-ট্রি এবং তা সাজানোর জন্য চোখ ধাঁধানো উপকরণ, বিভিন্ন ডিজাইন ও রঙয়ের তারা, আলোকসজ্জা ইত্যাদি বাহ্যিকতা এখন চোখে পরার মত। কিন্তু বড়দিনের প্রস্তুতিতে সকলের সেই সম্মিলিত প্রচেষ্টা আমাদের মাঝ থেকে যেন হারিয়ে গেছে।

বড়দিনকে ঘিরে প্রথমেই যে বিষয়টি মাথায় আসে, সেটি হচ্ছে বড়দিনের মধ্যরাতের উপাসনা। কনকনে শীতের আমেজে মধ্যরাতের উপাসনায় যোগদান করার মধ্যদিয়ে বড়দিন উৎসবের যাত্রা শুরু। গির্জার গুরুগম্ভীর ঘন্টাধ্বনী, হারমোনিয়াম, তবলা, খোল, করতাল, মন্দিরার শব্দে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দিয়ে প্রভু যিশুর আগমনী গানে কণ্ঠ মেলানোর এক আনন্দানুভূতি। মধ্যরাতের উপাসনায় যোগদানের উদ্দেশে গ্রামের মানুষ ৬ থেকে ১০ কিলোমিটারেরও বেশি পথ পাঁয়ে হেটে পারি দিত। উপসনার ভাবগাম্ভির্য্যতা বজায় রেখে ভক্তিপূর্ণভাবে আনন্দের সাথে উপসনায় অংশগ্রহণ করত। বিভিন্ন পারিপার্শিক কারণে মধ্যরাতের উপাসনা হয় এখন সন্ধ্যাবেলায়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আগের সেই শীতের আমেজও এখন অনেকটা হালকা হয়ে এসেছে। যুগের সাথে সাথে উপাসনার গানের দলে বাদ্যযন্ত্রের বিভিন্নতা বৃদ্ধি পেয়েছে,; যা উপাসনা সঙ্গীতকে করে তুলেছে আরও মোহময়ী। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে দুর-দুরান্ত থেকে মানুষ সহজেই আসতে পারছে। কিন্তু এতোকিছুর পরেও উপাসনার গানে যেন আগের সেই প্রাণ নেই। যানবাহনের সহজলভ্যতার কারণে শারিরিক পরিশ্রম কমেছে কিন্তু অংশগ্রহণে আগের সেই ভক্তিভাব নেই। উপসনায় ভক্তিপূর্ণ অংশগ্রহণের থেকে নিজেকে নিয়েই যেন বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ছি।

বড়দিনের সময় উপহার আদান-প্রদানের ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। বছরের এই সময়টির জন্যে সকলেই অপেক্ষা করতো নতুন কাপড়/জুতো পাবে বলে। মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্যদের নতুন পোশাক, জুতা, প্রসাধনীর চাহিদা পুরণ করতে উপার্জনক্ষম ব্যক্তিটির আপ্রাণ প্রচেষ্টা ছিল লক্ষ্য করার মতো। কনকনে শীতকে অগ্রাহ্য করে পরিপাটিভাবে নতুন জুতা, কাপড় পড়ে দলে দলে উপাসনায় যোগদান করত। কেউ একটি নতুন কাপড় অথবা জুতো পেলেই আনন্দের সীমা থাকতো না। কালের প্রবাহে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন অনেকেই একটির বিপরীতে কয়েকগুণ বেশি করে কিনতে পারে। কিন্তু আগেরকার সেই একটি জামা/জুতো পাওয়ার আনন্দ যেন হারিয়ে গেছে। রুচির পরিবর্তনের কারণে পরিপাটি পোশাকের পরিবর্তে নিজেকে জাহির করার প্রবণতাও কখনো কখনো লক্ষ্য করা যায়।

উপাসনার শুরুতে/শেষে অঞ্চলভেদে যাত্রাপালা, নাটক, গীতি-নৃত্য-নাট্য, কীর্তন প্রতিযোগিতা ইত্যাদি মঞ্চস্থ হতো যা ভোর বেলা পর্যন্ত চলত। উপাসনা শেষে বড়দের আশীর্বাদ চুম্বন, পদধূলি গ্রহণ, কোলাকুলি- সে যেন এক মহামিলন। বড়রা ছোটদেরকে স্নেহ করতো এবং ছোটরাও বড়দেরকে সম্মান করত। বড়দিন ছিল যেন একটা শ্রদ্ধাপূর্ণ পরিবেশের, আর্শীবাদ দেওয়া-নেওয়ার বিষয়। ছোটরা বড়দেরকে প্রণাম জানাবে যার বিনিময়ে হাতে কিছু প্রণামী অর্থ লাভ করবে। এর প্রস্তুতি স্বরূপ বড়রাও আগে থেকেই টাকা খুচরো করে প্রস্তুতি নিয়ে রাখত। বর্তমান বাস্তবতায় ২৪ তারিখ রাতের খ্রিস্টযাগ শেষে তেমন কোন আয়োজন আজ আর চোখে পড়ে না। আনুষ্ঠানিকতা বেড়েছে কিন্তু আন্তরিকতায় ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে।

বড়দিনকে ঘিরে যে সমস্ত সামাজিক লোকাচার রয়েছে, কীর্তন গান তার মধ্যে অন্যতম। মুক্তিদাতা শিশু যিশুর আগমনের আনন্দবার্তা নেচে-গেয়ে মানুষের মাঝে প্রচারের এ এক অনন্য দৃষ্টান্ত। বড়দিনের কীর্তন মানেই আলাদা আমেজ। বড়দিনের রাতের উপাসনা শেষ করে গ্রামে ফিরে গ্রামের কীর্তন দল প্রতিটি বাড়িতে নেচে-গেয়ে যিশুর জন্মের বারতা প্রচার করত। প্রত্যেক বাড়িতে মানুষ এই আগমনী গান শোনার জন্য অপেক্ষা করত। পরবর্তী সময়ে বড়দিনের পূর্বেই বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে কীর্তনদল আগমনী কীর্তন পরিবেশন করত। সময়ের সাথে সাথে এক্ষেত্রেও এসেছে পরিবর্তন। কোথাও কোথাও নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই যিশুর আগমনীবার্তা/কীর্তনগান পরিবেশিত হচ্ছে। ১৫/২০ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে কীর্তন গানের পরিবর্তে ট্রাক/গাড়িতে করে আধুনিক শব্দযন্ত্রের সাহায্যে চলে স্ট্রিট ক্যারল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বড়দিনের ছুটিতে যাওয়ার কারণে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই পালিত হচ্ছে প্রি-ক্রিসমাস; যা বড়দিনের প্রকৃত আনন্দকে কিছুটা হলেও ম্লান করে দিচ্ছে।

বড় দিন মিলনের দিন: বড়দিন ধনী-গরীব ভেদাভেদ ভুলে ভালবাসার দিন। তাই সমাজের পক্ষ থেকে অঞ্চল ভেদে প্রীতি ভোজের আয়োজন করার রেওয়াজ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দীর্ঘদিনের। কোন কোন ধর্মপল্লীতে বড়দিনে (২৫ ডিসেম্বর) ভেদাভেদ ভুলে একসাথে দুপুরের খাবারের আয়োজন করার প্রথা এখনো চালু রয়েছে। যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী চাল, ডাল, মাছ, মাংস ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য সহভাগিতা করার এ এক অনন্য দৃষ্টান্ত। সামাজিক প্রীতি ভোজ ছাড়াও পরিবারের/গোষ্ঠির সকলে মিলেও এমন আয়োজন চলত। তবে বর্তমান বাস্তবতায় মিলনের একতায় এমনটা আয়োজন করা এখন অনেক চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠেছে।

বড়দিনের নতুন জামা-কাপড় পড়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বড়দের প্রণাম করত। বিভিন্ন অঞ্চলে বড়রাও তাদের সুবিধামত সময়ে একসাথে সমাজ/ওয়ার্ডের প্রতিটি বাড়ি পরিদর্শন করত। পারস্পরিক আদান প্রদানে বড়দিন হয়ে উঠত সম্প্রীতির অনন্য দৃষ্টান্ত। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও অনেক সময় এতে অংশগ্রহণ করত। বাড়িতে প্রস্তুত করা হরেক রকম পিঠা-পায়েস দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করা হত। বর্তমানে সময়ের অভাবে সকল বাড়ির পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট বাড়িতে সমাজের সকলের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত হয়ে প্রথাটি কোন রকমে টিকে রয়েছে। ছোট শিশুরা এখন অন্যের বাড়ি পরিদর্শণের পরিবর্তে বাইরে ঘুরতে যেতে বেশি পছন্দ করে। আর্থিক অবস্থার উন্নতির সাথে সাথে কোথাও কোথাও পরিবারসহ অন্যত্র এমনকি দেশের বাইরেও বড়দিনে ছুটি উপভোগ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

বড়দিন আনন্দের দিন। মুক্তিদাতা যিশুর মানব বেশে এই ধরায় আগমনের দিন। তাই এই দিনকে ঘিরে বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে নানা আয়োজন। বছরের শেষ দিকে হওয়ায় নতুন বছরকে বরণ করা পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী চলে নানা আয়োজন। বড়দিনকে ঘিরে ধর্মপল্লী, গ্রাম/সমাজে আয়োজন করা হয় আনন্দ মেলা, সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা (চিত্রাঙ্কন, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ইত্যাদি), বিবাহিত অবিবাহিত প্রীতি ফুটবল ম্যাচ, শিশু মেলা এবং আরও রকমারি আয়োজন। সকল মানুষ এতে আনন্দের সাথে অংশগ্রহণ করত। ধর্মপল্লী/গ্রামের/সমাজের যুব সংগঠনগুলো তাদের প্রকাশনা, কির্তন ও বিভিন্ন আয়োজনের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে ব্যস্ত সময় করত। গির্জাবাড়ি সাজানোর জন্য নিজেদের বাড়িঘর ফেলে এসে ধর্মপল্লীতেই বেশিরভাগ সময় ব্যয় করত। পিতা-মাতাদেরও এতে সম্মতি ছিল। আগের তুলনায় এসকল কার্যক্রমও এখন গুটি কয়েকজনের মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হওয়ায় বিভিন্ন কার্যক্রমগুলোও বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। সম্মিলিত মিলনের আনন্দগুলো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হচ্ছে। আর তাই মাঝে মাঝে এই মন গেয়ে উঠে "আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম....."।

আমার এই লেখনি কাউকে ব্যক্তিগতভাবে নির্দিষ্ট করে আঘাত দেওয়ার উদ্দেশে নয়। 'মুক্তির বারতা নিয়ে, আশার বাণী নিয়ে' সকলের জীবনেই বড়দিন আসুক আনন্দের শিহরণ নিয়ে। বড়দিন সত্যিকার অর্থেই হয়ে উঠুক সম্প্রীতির, মিলনের ও আনন্দের দিন। শুভ বড়দিন॥

ভাদুনে প্লট বিক্রয়

ঢাকার অদূরে পুবাইল থানাধীন ভাদুন খ্রিস্টান অধ্যুষিত গ্রামে (এ.জি মিশন ও ক্যাথলিক চার্চ এর মধ্যবর্তী) বাউণ্ডারি করা ২.৫০ কাঠা ও ৮.০০ কাঠার দুটি প্লট।

যোগাযোগ

লিয়ন কোড়াইয়া : ০১৮১৩৩৯২৯৩১
যোসেফ লরেন্স : ০১৭৩০৫৮৯২২৭

৯ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত পারুল ডরোথি গমেজ

স্বামী : প্রয়াত খ্রীষ্টফার গমেজ
জন্ম : ১৬ মার্চ, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
পারুল ভিলা, ৩০/১ পূর্ব রাজাবাজার
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

প্রিয় মা, তুমি আমাদের মাঝে নেই এ কথা যেন বিশ্বাস করতে আজও কষ্ট হয়। তোমার প্রতিটা কাজ, তোমার স্পর্শ আমাদের আজও ঘিরে রেখেছে। আমাদের মা ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ, স্নেহশীল, কর্তব্যনিষ্ঠা, সাহায্যকারিণী, ঈশ্বর নির্ভরশীলা নারী। মানুষের দুঃখ-কষ্ট অনুভব করে, নিরবে-নিভৃতে থেকে তিনি অন্যকে সাধ্যমত সহযোগীতা করেছেন। তার শুভানুধ্যায়ীরা এখনো আমাদের মাকে স্মরণ করেন।

আমাদের মা মিসেস পারুল ডরোথি গমেজ ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৪ প্রভুর কোলে আশ্রয় নেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

মা, দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল ৯টি বছর তোমাকে ছাড়া। সর্বদা মনে হয় আমাদের কাছেই আছো। আমাদের বিশ্বাস, তুমি স্বর্গীয় পিতার আশ্রয়ে পরম শান্তিতে আছো এবং আমাদের আশীর্বাদ করছো।

তোমার আত্মার শান্তি কামনায়

ছেলে ও ছেলে-বৌ : বাবু মার্কুজ গমেজ-মার্সিয়া মিলি গমেজ
মেয়ে ও মেয়ে-জামাই : আলো, জ্যোৎস্না-অজিত, উজ্জলা-তপন
নাতি : অভিষেক ইম্মানুয়েল সি গমেজ
নাতনী ও নাত-জামাই : ডায়না-মার্টিন, বৃষ্টি-ডেভিড, রাত্রি, স্বপ্ন, সৃষ্টি, বিস্ময়, স্পর্শ
পুতি : কাব্য, অনিক ও আনন্দ

তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম, তুমি রবে নীরবে ...

প্রয়াত রবার্ট গমেজ (আদি)
জন্ম: ১৬ জানুয়ারি, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ
গোল্লা ধর্মপল্লী, ঢাকা
মৃত্যু: ২৯ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
নিউজার্সি, ইউএসএ

প্রয়াত এলিজাবেথ শেফালী গমেজ
জন্ম: ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ
গোল্লা ধর্মপল্লী, ঢাকা
মৃত্যু: ২৯ অক্টোবর, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ
নিউজার্সি, ইউএসএ

মাকে হারিয়েছি বেশ বেলা হলো। ২৭টি বছর পার হয়ে গেলেও মা আমাদের পরিবারের সকলের হৃদয় মাঝে গেঁথে আছে। মা'র মৃত্যুর পর বাবাই ছিল আমাদের বাবা ও মা সেই স্থানে থেকে বাবা আমাদের গোটা পরিবারটাকে নদীর মাঝে পাল তোলা নৌকার মত সামনে বয়ে এনেছেন। গত ২৯ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে বাবা কিডনী রোগে আক্রান্ত হয়ে না ফেরার দেশে চলে যান। ঈশ্বর তার আত্মার চির শান্তি দান করুন।

বাবা কলেজ পাশ করার পর পরই ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তানে US Consulate - এ কর্মজীবন শুরু করেন, অতঃপর বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর US Embassy ও ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনের পর US State Department - এ সব মিলিয়ে ৪২ বছরের দীর্ঘ সময় চাকুরীর পর অবসর গ্রহণ করেন।

কর্মজীবনের পাশাপাশি তিনি সোসাইটি অফ সেন্ট ভিনসেন্ট ডি'পলের (দরিদ্রদের সেবা সংস্থা) বাংলাদেশের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে থেকে দরিদ্রদের সেবা দিয়েছেন।

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র আমেরিকার প্রতিনিধি হয়ে এক নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছেন। অবসর গ্রহণ করার পর থেকেই বাবা স্থানীয় ধর্মপল্লী সেন্ট এলোশিয়াস চার্চে প্রতিনিয়ত খ্রিস্টযাগে অংশ নিয়েছেন এবং পুরোহিতদের সাহায্য করেছেন। বাবার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আমাদের গোটা পরিবারকে সুষ্ঠু দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। বাবা/দাদু আমরা সবাই তোমাকে জানাই অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

সবাইকে শুভ বড়দিন ও নববর্ষের শুভেচ্ছা।।

ফাদার স্ট্যানলী, জেমস-সুইটি, জেভিয়ার-তুলি, অলড্রিন-ন্যান্সি, জুয়েল-লতা, মাইকেল-মনি, নোয়েল-চৈতী।
নাতী ও নাতীন : মোহনা, সৌরভ, খ্রীষ্টফার, এ্যান্ড্রিয়া, জোয়ানা, যোনাথন, এইডেন, এ্যান্টনী ও ব্র্যান্ডন গমেজ (আদি)।

New Jersey, USA

বিবাহিত জীবনের সুবর্ণ জয়ন্তী

এন্ড্রু কার্বাট ও মনিকা পূর্ণিমা গমেজ

নতুন দুঃখনীর বাড়ী, হাসনাবাদ

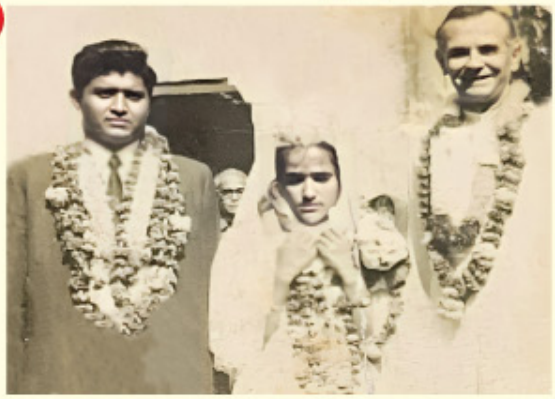

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, ফাদার ওয়াল্টার মেহালিক বিবাহ সাক্রামেন্ত প্রদান করেন।
১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, ফাদার জ্যোতি ও ফাদার আলবিন গমেজ বিবাহের ২৫তম জুবিলী নবায়ন করেন।
বিবাহিত জীবনের সুবর্ণ জয়ন্তীর নবায়ন হবে ফাদার স্ট্যান্‌লী গমেজ (আদি) কর্তৃক ফাতিমা, পর্তুগালে।
প্রভু, আমাদের বিবাহিত জীবনের ৫০টি বছরের সকল কৃপা ও আশীর্বাদের জন্য তোমাকে জানাই অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

সকলের প্রতি রইল শুভ বড়দিন ও আসন্ন নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

সন্তানগণ : শ্যামলী-নির্মল, সুইটি-জেম্‌স (আদি), রোমেল, শিউলী-রনি
নাতী-নাতীন : মোহনা, ইভান্স, খ্রীষ্টফার, চার্লস, স্বর্ণা, ছ্যাবিও ও হ্যারী।

Andrew Karbart Gomes
30 Romaine Ave, Apt 1
Jersey City, New Jersey - 07306
USA

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি রইল শুভ বড়দিন ও নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

জেম্‌স ও সুইটি গমেজ (আদি)

সন্তানগণ : এলিজাবেথ মনিকা গমেজ মোহনা
ও
খ্রীষ্টফার নিকোলাস গমেজ

143 Hobart Avenue
Bayonne, New Jersey - 07002
USA
আদির বাড়ী
ছোট গোল্লা, গোল্লা ধর্মপল্লী।

হৃদয়ে তোমরা অমর

প্রয়াত যোসেফ রোজারিও
জন্ম : ৪ মার্চ, ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : দরীর বাড়ি, মোলাশীকান্দা, ঢাকা

প্রয়াত শিশিলিয়া রোজারিও
জন্ম : ৫ মার্চ, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৭ মার্চ, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : দরীর বাড়ি, মোলাশীকান্দা, ঢাকা

প্রয়াত বেনজামিন রোজারিও
জন্ম : ১৯ জুলাই, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : দরীর বাড়ি, মোলাশীকান্দা, ঢাকা
মৃত্যু : ২০ ডিসেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : বেওন, নিউ জার্সি, ইউএসএ

প্রয়াত ইউফ্রেজী রেনু রোজারিও
জন্ম : ২৯ আগস্ট, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৪ আগস্ট, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : দরীর বাড়ি, মোলাশীকান্দা, ঢাকা

কালের আবর্তে দেখতে দেখতে ৯টি বছর পেড়িয়ে গেল তোমরা আমাদের ছেড়ে হারিয়ে গেলে সেই অনন্তের অসীম নীলিমায়। কিন্তু তোমাদের অনিন্দ সুন্দর সদাহাস্য মুখগুলো অফুরন্ত ভালোবাসা, কতশত সুখময় স্মৃতি, তোমাদের জীবন আদর্শ আমাদের হৃদয়ে চির অম্লান থেকে তোমাদের শূন্যতা ও অভাবকে একটি পুরোপুরি সম্পূর্ণতা দিয়ে ভরে রেখেছে এবং অনুপ্রাণিত করছে অকুতোভয়ে জীবন পথে চলতে এ অবর্ণনীয় এক সুখময় বেদনার অনুভূতি।

তোমরা তো আমাদের হৃদয়াকাশে তারা হয়ে নিত্য দ্বীপ্তিমান। তোমাদের কি ভোলা যায়?

আমরা বিশ্বাস করি ও প্রার্থনা করি যে তোমরা ঈশ্বরের বাগানে সেরা ফুল হয়ে তার একান্ত সান্নিধ্যে পরম আনন্দে আছ। আমাদের জন্য প্রার্থনা ও আশীর্বাদ কর যেন আমরা তোমাদের আদর্শে সর্বদা মিলে-মিশে আগামী দিনগুলো অতিবাহিত করে জীবন শেষে তোমাদের সাথে ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তোমাদের আত্মার চির শান্তি কামনা করি।

শোকার্ত পরিবারবর্গ
শান্তিভবন
বেওন, নিউ জার্সি, আমেরিকা।

প্রয়াত পিটার গমেজ
জন্ম : ২ ডিসেম্বর, ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : কাজীর বাড়ি, বক্সনগর, ঢাকা
মৃত্যু : ৬ এপ্রিল, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : জার্সি সিটি, নিউ জার্সি, ইউএসএ

প্রয়াত আইরিন গমেজ
জন্ম : ৭ জুলাই, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৩ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

Until We Meet Again, Irene and Peter Gomes

Those special memories of you
will always bring a smile
If only we could have you back
for just a little while
Then we could sit and talk again
just like we used to do do
you always meant so very much
and always will do too
The fact that you're no longer here
will always cause us pain
but you're forever in our hearts
until we meet again

With love,
Veronica, Manuel, Elizabeth, Teresa
and Christopher

যখন আবার হবে দেখা

তোমাদের সেই বিশেষ স্মৃতিগুলো
সর্বদা নিয়ে আসবে আনন্দ বয়ে
যদি পেতাম তোমাদেরকে কাছে
শুধু ক্ষণিকের তরে
তখন বসে আবারও গল্পগুজব করতাম
যেমন করতাম ঠিক আগের মত।
তোমরা যে সর্বদা ছিলে আমাদের কাছে
অনেক প্রিয় এবং থাকবেও তাই
প্রকৃতপক্ষে তোমরা যে আমাদের কাছে আর নেই
এটা ভেবে আমাদেরকে অনেক কষ্ট দেয়
কিন্তু তোমরা তো আছ সর্বদা আমাদের সাথে
যে পর্যন্ত না আবার দেখা হবে।

তোমাদেরই সন্তানেরা
ভেরোনিকা (শোভা), ম্যানুয়েল (বাবুল), এলিজাবেথ (সন্ধ্যা)
তেরেজা (জ্যোৎস্না) ও খ্রীষ্টফার (টিলু)

স্মৃতিতে তুমি অমর

আন্তনী জীবন গমেজ
জন্ম : ২৮ মার্চ, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৬ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিগত ১৬ জানুয়ারি রোজ শনিবার ২০২১ খ্রিস্টাব্দে, আন্তনী জীবন গমেজ, এক স্নেহাশীষ পিতা, দাদু এবং এক প্রিয় মামা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর।
আন্তনী গমেজের জন্ম হয় ২৮ মার্চ, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের পাবনা জেলায়। তিনি ছিলেন লাজারেস ও লুসি গমেজের পাঁচ সন্তানদের মধ্যে চতুর্থ। তিনি এলিজাবেথ লিওনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ৫ জানুয়ারি, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে। ঈশ্বর তাদেরকে দুইজন মেয়ে-জেইন লুসি এবং জুন আইরিন এবং একজন ছেলে-কেনেথ লাজারেস দিয়ে আশীর্বাদ করেন।
আন্তনী সৌদি আরবে কয়েক বছর কাজ করেন। পরে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ৮ অক্টোবর অভিবাসন নিয়ে সপরিবারে আমেরিকায় চলে আসেন এবং অঙ্গরাজ্য নিউ জার্সির, জার্সি সিটিতে আজীবন বসবাস করেন। তিনি আরামাক কোম্পানীতে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত কাজ করেন।
বড়দিনের সময় তিনি তার বিশিষ্ট কেক বানাতে এবং সেগুলো পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে বিলাতে খুব ভালবাসতেন। বাংলাদেশের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের দেখতে যেতে খুব পছন্দ করতেন এবং তাতে প্রচুর আনন্দ পেতেন।
আন্তনী ছিলেন একজন কর্মঠ, স্নেহশীল, সৎ, সাধারণ ও স্বল্পভাষী মানুষ কিন্তু স্বপ্ন ও প্রেমে ভরপুর। তিনি ছিলেন একজন স্নেহশীল পিতা ও আদর্শ স্বামী। তিনি এমন একটি শূন্যতা সৃষ্টি করে গেছেন যা কোনদিন পূরণীয় নয়।
আন্তনী গমেজ রেখে গেছেন তার স্ত্রী, তিন সন্তান, জামাতা, নাতি, ভাগ্নে-ভাগ্নি। আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যেন তাকে অনন্ত শান্তি দান করেন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
স্ত্রী : এলিজাবেথ গমেজ, মেয়ে : জেইন লুসি গমেজ, মেয়ে ও জামাতা : জুন আইরিন ও মহম্মদ আহমেদ
ছেলে : কেনেথ লাজারাস, নাতি : মার্চ

In Loving Memory of Anthony Jibon Gomes

প্রয়াত রোজবানার্ড গমেজ
জন্ম : ১ জানুয়ারি, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৩ জুলাই, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

Anthony Jibon Gomes, a loving father, grandfather and a beloved uncle, passed away on Saturday, January 16, 2021, at the age of 69.
Anthony was born on March 28, 1951, in the district of Pabna, Bangladesh. He was the fourth of late Lazarus and Lucy Gomes' five children. He married Elizabeth Leona on January 5, 1979. They raised two daughters- Jane Lucy and June Irene and a son - Kenneth Lazarus.
He worked in Saudi Arabia for several years. He then immigrated to the United States of America on October 8, 1988 and settled in Jersey City, New Jersey. He worked at Aramark till his retirement.
Anthony loved baking his signature cakes during Christmas and share them with the family, relatives and friends. He enjoyed visiting family and friends in Bangladesh and it filled him with great joy.
Anthony was very hardworking, loving, honest, simple and a man of few words but filled with dreams and love. He was a loving father and an ideal husband. He cared for the less fortunate and often donated. He has left a void that can never be filled.
Anthony is survived by his wife, three children, son-in-law, grandson, in-laws, nieces and nephews, his sister and hosts of friends.
May God grant Anthony eternal peace and happiness.

With love,
Elizabeth, Jane, June, Kenneth, Ahmed and Mars

"আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। যে আমার উপর বিশ্বাস করে,
সে মরলেও জীবিত হবে"। (যোহন ১১: ২৫)

বাবা: সিরিল ডি রোজারিও
জন্ম : ৩ মার্চ, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: ধনুন, নাগরী মিশন
মৃত্যু : ১০ এপ্রিল, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
নিউইয়র্ক, আমেরিকা

মা: মারীয়া রোজারিও
জন্ম : ৭ আগস্ট, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : তিরিয়া, নাগরী মিশন
মৃত্যু : ১ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
নিউইয়র্ক, আমেরিকা

স্মৃতিতে তোমরা অম্লান

পরম শ্রদ্ধেয় বাবা মা,

তোমরা দু'জনেই আমাদেরকে ছেড়ে স্বর্গে চলে গেছ - দিন, মাস, বছর যতই সময় পাড় হচ্ছে, ততই যেন তোমাদের ভালোবাসা, আদর, যত্ন, বকুনি, স্পর্শ আরো বেশি করে অনুভব করছি। স্বর্গ থেকে তোমরা আশীর্বাদ করো, যেন তোমার সকল সন্তান, নাতি নাতনী, গ্রেট নাতি-নাতনী তোমাদের আদর্শকে ধরে রেখে চলতে পারে, তোমাদের মতো করে সরলতায় জীবনযাপন করতে পারে এবং তোমাদের নাতি-নাতনীদেরকে যেন খ্রিস্টীয় আদর্শে গড়ে তুলতে পারে।

আশীর্বাদপ্রার্থী -

সমর-বীনা, স্বপন-শীলা, সুবাস-বীথিকা, সুধীর-রীমা এবং চিত্রা-কল্যাণ

আসন্ন বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী এর পাঠক-পাঠিকাসহ সকলকে
জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

- কারিতাস অর্থ "দয়ার কাজ" বা "সর্বজনীন ভালোবাসা"।
- কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার আলোকে কারিতাস বাংলাদেশ এমন একটি সমাজ বিনির্মানের স্বপ্ন লালন করে, যে সমাজ মুক্তি ও ন্যায্যতা, শান্তি ও ক্ষমাশীলতার মূল্যবোধসমূহকে ধারণ করে এবং সবাই মিলে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে মিলন সমাজে বসবাস করে।
- কারিতাস বাংলাদেশ মানুষের সহযোগী হতে চায়; বিশেষতঃ সেইসব মানুষের-যারা সমাজে গরীব ও প্রান্তিক জীবনাবস্থায় আছে। সবার প্রতি সম-মর্যাদার দ্বারা কারিতাস এমন একটি সমন্বিত উন্নয়ন অর্জন করতে প্রয়াসী যার লক্ষ্য হলো: মানব-মর্যাদা নিয়ে মানুষ সত্যিকার মানুষের মতো জীবন যাপন করবে এবং অপরকে দায়িত্বশীলতার সাথে সেবা করবে।
- জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কারিতাস সকল মানুষের সাথে কাজ করে।

কারিতাস বাংলাদেশ
২ আউটার সার্কুলার রোড
শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭

George Gomes

Date of birth: 14 January, 1940
Date of death: 14 June, 2023

George Gomes is a distinguished man who lived best of his life as a beloved husband, father, brother and friend.

George Gomes left behind his wife, three children four grandchildren who are missing him everyday. He will never be forgotten from everyone's life. He will be remembered as sweet, humble and generous man. with love.

Wife: Kolpona Gomes
Children: Tripti Rozario, Topoti Gomes, Kollol Gomes,
Grandchildren: Alexander Rozario, Jane Rozario, Allen Gomes, Ankita Gomes.

Jumon Pramanik

বিশ্বে শান্তির রাজকুমারের জন্মোৎসব। শৈশবের ঠাকুরদা-মা-মাসি-বাবা, জ্যাঠামশাই ও গুরুজনদের পুণ্যস্মৃতি। ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়। পল্লী মায়ের ছেলে। কত অজানারে জানাইলে বিধাতা। কত ঘরে দিলে ঠাঁই। দিন শেষে তবু মন শুধু ঘুরে ধান সিঁড়িটির তীরে। এই বাংলায়।

সবাইকে পুণ্যময় বড়দিন ও নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

মায়া আনজুস গোমেজ
পিটার কর্নেলিয়াস গোমেজ।

বড়দিনের আনন্দবার্তা ও এর তাৎপর্য

ড. সিস্টার মেরী হেনরীয়েটা এসএমআরএ

যখনই ডিসেম্বর মাস শুরু হলো তখনই মনে হলো যেন সব আনন্দ বড়দিনকেই ঘিরে। কিন্তু আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে বড়দিন আসলে কি, এর সত্যিকারের অর্থ কোথায়? অনেক লোকের কাছে বড়দিন একটি দুঃখের সময় কারণ তাদের যথেষ্ট সামর্থ্য নেই ছেলেমেয়ে, পরিবার পরিজন ও বন্ধুবান্ধবকে উপহার দেয়ার জন্য। আবার অনেকের মন ভারাক্রান্ত থাকে যাদের প্রিয়জনেরা তাদের কাছ থেকে অনেক দূরে থাকে এবং বড়দিনে বাড়ীতে আসার সুযোগ নেই। হ্যাঁ এরপরও বাস্তবিক অর্থে বড়দিন এক মহা আনন্দের সময়। ঈশ্বরের মহান ভালোবাসা আমাদের জীবনে উপলব্ধির এক মহা সময়। আমরা বড়দিনে যিশুখ্রিস্টের জন্মদিনের উৎসব করি যাকে স্বর্গীয় পিতা আমাদের জন্য এক মহাদান হিসেবে দিয়েছেন। যিশুর জন্ম সত্যিই আমাদের জন্য এক মহা আনন্দের সংবাদ নিয়ে আসে। পূর্ব দেশের ৩ জন পণ্ডিত, রাখালেরা এবং স্বর্গদূতগণ সবাই আনন্দে আত্মহারা মহান যিশুখ্রিস্টের জন্মে, কারণ তারা সবাই জানতেন এই শিশু সাধারণ কোন শিশু নয়। ইনি হচ্ছেন মহান রাজাধিরাজ ত্রাণকর্তা প্রভু এবং আমাদের সবার জন্যও তা গভীর আনন্দের বিষয়।

তাহলে বড়দিন হচ্ছে এমনই একটি সুন্দর সময় যে সময়ে আমরা উৎসব করি শিশু যিশুর , আমাদের জন্য যাকে অমূল্য 'উপহার' হিসেবে স্বর্গীয় পিতা দান করেছেন। তাই যিশুখ্রিস্টের জন্মোৎসব যা আমরা এই সময়ে পালন করি তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যিশুখ্রিস্ট যিনি ঈশ্বরের পুত্র, মানবজাতির পরিত্রাতা, রাজাদের রাজা, শান্তিরাজ এবং আমাদের পরিত্রাণ ও আনন্দ, তার জন্মোৎসবের এ মহতী লগ্ন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় তার জীবনাদর্শ ও শিক্ষার বিষয়। আর এখানেই আমরা অনুসন্ধান করি বড়দিনের আনন্দ বার্তা ও এর গভীর অর্থ এবং খ্রিস্টীয় জীবনে এর মঙ্গল প্রভাব।

"স্বর্গদূত রাখালদের বললেন, তোমরা ভয় পেয়ো না আমি এক মহা আনন্দের সংবাদ নিয়ে এসেছি" *(লুক ২:১০-১১)* দাউদ নগরে তোমাদের জন্য যোসেফ ও মারীয়ার কোলে এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন, তিনিই যিশুখ্রিস্ট" দূতের কথায় রাখালেরা তখনই বেথলেহেমে ত্রাণকর্তা যিশুকে দেখতে গেলো। সেখানে গিয়ে তারা যাবপাত্রে শোয়ানো সেই শিশুকে দেখতে পেয়ে তাকে প্রণাম জানালো। ফিরে এসে রাখালেরা যা দেখেছে এবং দূতের দর্শন সবই মনের আনন্দে সবার কাছে প্রচার করতে লাগলো এটিই হলো বড়দিনের আনন্দবার্তা অর্থাৎ বিশ্বপতি রাজাধিরাজের এ ধরাতে জন্ম হলো মানুষ রূপে ও দীনবেশে। রাখালেরা যখন ত্রাণকর্তার জন্ম সংবাদ নিয়ে এলো তখন তাদের মনে ছিল এক গভীর আনন্দ যা সত্যিই বর্ণনাতীত। আজ আমরাও রাখালদের মত আমাদের হৃদয়ে এক গভীর আনন্দ নিয়ে উদ্‌যাপন করছি আমাদের ত্রাণকর্তার শুভ জন্মদিনটি। এখন প্রশ্ন হলো যিনি রাজাধিরাজ পরম প্রভু দীনবেশে এ কঠিন ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ পৃথিবীতে কেন তার আগমন?

এর একমাত্র উত্তর হলো : স্বর্গীয় পিতার মহা পরিকল্পনা এবং আমাদের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালোবাসার চরম ও মূর্ত প্রকাশ। ঈশ্বর যিশুকে পাঠালেন যেন একদিন তিনি বড় হয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন এবং সবার জন্য হয়ে উঠেন সত্য, ভালোবাসা, আনন্দ ও আশার একমাত্র উৎস। কারণ যিশুকে ছাড়া আমরা যে পাপের অন্ধকারে বাস করতে থাকবো। সুতরাং বলতে পারি, বড়দিন মানে হলো খ্রিস্ট যার মধ্যদিয়ে প্রকাশিত হলো ঐশ্ব ভালোবাসা *(যোহন ৩:১৬-১৭)* পিতা ঈশ্বর আমাদের এত ভালোবাসলেন যে তাঁর একমাত্র পুত্রকে আমাদের জন্য পৃথিবীতে দান করলেন যেন আমরা লাভ করি অনন্ত জীবন। আর সেজন্য বড়দিন হচ্ছে সীমাহীন ভালোবাসার অবিশ্বাস্য দানের উৎসব উদ্‌যাপন। তাই বড়দিনের সত্যিকার গল্প হচ্ছে-যিশুখ্রিস্ট যিনি আমাদের জন্য মানুষ হলেন সেই সত্য গল্প। এ প্রেক্ষিতে মনে প্রশ্ন জাগে ঃ ঈশ্বর কেন এমনটি ঘটালেন? কারণ তিনি আমাদের অনেক ভালোবাসেন। কেন পিতা ঈশ্বর আমাদের এত ভালোবাসলেন? কারণ তিনি নিজেই ভালোবাসা *(১যোহন ৪ঃ৮)*।

আর সেই ভালোবাসায় স্নাত হয়ে আমরা যিশু খ্রিস্টের জন্মোৎসবে পরস্পরকে আনন্দের উপহার দেই। গোশালাতে তাকে আরাধনা করি। তার আশীর্বাদ নেই এবং দরিদ্র, বঞ্চিত মানুষকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাই। এ প্রেক্ষাপটে বড়দিনের আসল অর্থ হচ্ছে ভালোবাসা। অর্থাৎ বড়দিনের আনন্দবার্তা হচ্ছে পিতা ঈশ্বরের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। পরমপিতা ভালবাসার উপহার যিশুখ্রিস্টকে আমাদের জন্য দিয়েছেন। বিনামূল্যে যখন আমরা এই ভালোবাসার দান "যিশুখ্রিস্টকে" গ্রহণ করি তখন আমরাও এই খ্রিস্টীয় জীবনে 'ভালোবাসা' হয়ে আনন্দচিত্তে খ্রিস্টের সাক্ষ্য বহন করতে প্রয়াসী হই।

বড়দিনের আনন্দবার্তা অর্থাৎ যিশুখ্রিস্টের জন্মসংবাদ আমাদের কাছে জানিয়ে দেয় বড়দিনের অতীব সত্য এবং স্বর্গীয় অর্থ। আর এ অন্তর্নিহিত অর্থ আমাদের প্রত্যেকের জন্য মহা আনন্দের যা আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনকে জড়িয়ে রেখেছে স্বর্গদূত রাখালদের কাছে যিশুর জন্মসংবাদ দেওয়ার মধ্যদিয়ে এবং জন্মের 'আনন্দকে' খ্রিস্টীয় জীবনে প্রচার ও প্রকাশ করার দ্বার উন্মোচন করেছেন। কারণ স্বর্গদূত বলেছেন,"তোমরা ভয় পেয়ো না, আমি তোমাদের জন্য এক মহা আনন্দ বার্তা নিয়ে এসেছি" *(লুক ২:১০)*। তাঁর জন্মের গৌরবময় বার্তা বা মঙ্গলসমাচার আমাদের চিন্তায় গতিময়তা ও নতুনত্ব দান করে। তিনি আমাদের জন্য জন্ম নিলেন, আমাদের মাঝে বাস করলেন এবং আমাদের জন্য মরলেন। এর বিনিময়ে আমরা তাকে কি দিতে পারি? যিনি রাজাধিরাজ প্রভু, স্বর্গ হতে যার আগমন তার সামনে কি উপহার নিয়ে দাঁড়াব কারণ আমরা যে অতি দীন, ক্ষুদ্রতম।

আমরা অতি দীন হলেও তিনি আমাদের জন্য আনন্দ হয়ে জন্ম নিলেন আর তাই তাকে ঘিরেই এ বড়দিনে আমাদের সব আনন্দ। আমাদের প্রত্যেকের বড়দিনের আনন্দের বিশেষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। যখন জীবনে সবকিছু ঠিকমত চলে তখন আমরা আনন্দে থাকি, সবকিছু ভাল লাগে কিন্তু যখন পরিস্থিতি প্রতিকূলে চলে যায় তখন মনের আনন্দও শেষ হয়ে যায়। এই আনন্দ সেইভাবে নয় এবং সেই আনন্দও নয়। এই আনন্দ হচ্ছে ঈশ্বর

হতে এবং এই আনন্দের উৎস হচ্ছে ঈশ্বর আমাদের জন্য যে মহান কাজ করেছেন তার ভালোবাসার চরম প্রকাশ তাঁর পুত্রকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে। তাই বড়দিনের দিন মা মারীয়া, সাধু যোসেফ ও রাখালগণ যে আনন্দের অভিজ্ঞতা পেয়েছিলেন, সেই আনন্দের অভিজ্ঞতা আমাদের ও করতে হয়। যিশুর জন্মে পরিবেশ পরিস্থিতি তেমন অনুকূলে ছিল না। মা মারীয়া, সাধু যোসেফ বাড়ী থেকে অনেক দূরে ছিলেন- সেখানে তারা কোন স্থান পাননি, যিশুকে জন্ম দেবার জন্য। তারপরও তাদের দু'জনের অন্তরে গভীর আনন্দ ছিল যে যিশুর জন্ম পৃথিবীর ইতিহাসে অবিস্মরণীয় এবং তিনি মহান রাজাধিরাজ, ঈশ্বর থেকে তিনি জাত এবং মানবের পরিত্রাণের জন্য তার আগমন। এই আনন্দ যদি আমাদের সবার মধ্যে থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা স্বর্গদূতদের মত ঈশ্বরের মহিমা ও প্রশংসা করব এবং অন্তরে শান্তি নিয়ে খ্রিস্টীয় জীবনে এগিয়ে যেতে পারব যা আমাদের উপলব্ধিকে গভীর করে এবং আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলে (James Boice,2014).

টমাস মনসন বলেন, আমাদের বড়দিন উৎসব হতে হয় এবং হওয়া উচিত ভালোবাসা, আনন্দ ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসার অনুধ্যান ও তার মূর্ত প্রকাশ। "পাওয়া নয় দেওয়া" এটিতেই বড়দিনের মাহাত্ম ও অর্ন্তনিহিত অর্থ পূর্ণরূপে পরিস্ফূট। আমরা বড়দিনে অভাবী ভাইবোনদের প্রতি দয়ালু হই, বঞ্চিত মানুষের পাশে ভালোবাসা নিয়ে দাঁড়াই। আমাদের হৃদয় বিগলিত হয় অন্যের মঙ্গল সাধনে। আমরা শত্রুকে ক্ষমা করার সাহস পাই, উপকারী বন্ধুদের স্মরণ করি। বড়দিনের আনন্দ ও আধ্যাত্মিক শক্তি আমাদের আত্মার জানালা খুলে দেয়, আমাদের আলোকিত করে এবং আমাদের আত্মার প্রকৃত চিত্র আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়। আমরা তখন অন্তরাত্মায় দেখতে পাই পৃথিবীর ব্যস্ততম জীবন এবং মানুষের প্রকৃত আবস্থা যা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে তাদের প্রতি যত্নশীল হতে।

তাই বড়দিনের আনন্দ বার্তার সত্যিকার ও আসল অর্থ আমাদের জীবনে যদি স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে চাই তাহলে আমাদের একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞান হোক আর্তমানবতার সেবায় আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনকে আনন্দচিত্তে নিবেদন করা। তবেই তো যিশু খ্রিস্টের পৃথিবীতে আসা স্বার্থক হবে এবং বড়দিনের প্রকৃত অর্থ ও গভীর আনন্দের বাস্তব প্রতিফলন ঘটবে খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসাবে আমাদের প্রত্যেকের দৈনিক জীবন যাপনে ও সেবাকাজে। এমনিভাবে বড়দিনের আনন্দ বার্তা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে সার্থক ও বাস্তব হয়ে উঠুক।

তথ্যসূত্র:

Article:

1. The Real and True meaning of Christmas by Martha Noebel, Retrieved on September 21,2014
2. The Joy of Christmas by Dr. James Boice, Retrieved on 22 September,2014
3. The Real Joy of Christmas by Thomas S. Monson, Retrieved on 24 September,2014
4. Tillich, Paul. Systematic Theology Volume 2: Existence and the Christ. (Chicago: University of Chicago Press, 1957), page 166.

Book:

The Holy Bible: The New Testament

তোমাদেরই স্মরণে

পৃথিবীতে সব কিছু শেষ হয়, বসন্ত গান মুকুলিত প্রাণ ক্ষনকাল রয়,
তারপর স্মৃতিটুকু ব্যথাময়।

প্রয়াত জেরাল্ড হিপু গমেজ
জন্ম: ৭ জুন, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৩ জুলাই ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত মারীয়া মায়া গমেজ
জন্ম: ৩১ জানুয়ারি ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৬ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত পিউস গমেজ ও প্রয়াত রমনা প্রীতি গমেজ

জন্ম: ২০ জুলাই ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৩ জানুয়ারি ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ

জন্ম: ১৭ ডিসেম্বর ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রভু যিশুর জন্মোৎসবে তাঁর চরণে এই নিবেদন রাখি তিনি যেন তোমাদের আত্মার চিরশান্তি প্রদান করেন

পরিবারের পক্ষে
এলেন, এলিথিয়া, এঞ্জেলা, এনথিয়া, ক্যাথি ও পিউস এলড্রিন

মহান মুক্তিদাতা প্রভু যিশুর আবির্ভাব

এরশাদ আল মামুন

২৫ ডিসেম্বর খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের জন্য সুন্দর জীবন গড়ার একটি মহা পবিত্র,তাৎপর্যপূর্ণ ও মহিমান্বিত দিন, কারণ এইদিন একজন মহামানবের জন্মদিন। আর এই মহামানব হলেন প্রভু যিশু খ্রিস্ট। যার পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ সম্বন্ধে ভাববাদীরা শত শত বছর পূর্বে ভাববাণী করেছিলেন। কালের পূর্ণতায় সেই সকল ভাববাণী পূর্ণতা লাভ করেছে আর তাই প্রভু যিশু খ্রিস্টের জন্ম দিনকেই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা দিনটি বড়দিন বলেই আনন্দ উল্লাস আর ধর্মীয় ভাবগাম্ভির্যের মধ্যেই দিনটি পালন করেন। এই দিনটি সবার কাছে পুণ্যময় বড়দিন বলেই পরিচিত।

খ্রিস্ট ধর্মের প্রবর্তক যিশু খ্রিস্টের জন্ম হয় অলৌকিকভাবে। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস মতে, যিশু খ্রিস্ট পৃথিবীতে মানুষের রূপ ধরে জন্মগ্রহণ করেন এই পৃথিবীর সকল পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে, মানুষে মানুষে বন্ধনকে আরও সুসংহত করতই যেন তার আবির্ভাব। তাঁর এই তাৎপর্যপূর্ণ আগমনের তিথি স্মরণ করে তাঁর অনুসারীরা বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে জাঁকজমকের মধ্যদিয়ে সাড়া বিশ্বে এই শুভ বড়দিন উৎসব পালন করে থাকে। পুণ্যময় বড়দিন যা খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব তা বলা বাহুল্য। তাদের কাছে এই দিনটির ধর্মীয় তাৎপর্য ও গুরুত্ব অসামান্য। আধুনিক বিশ্বে বছরের অন্য যেকোনো দিন ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক এমনকি রাজনৈতিকভাবেও এতটা তাৎপর্যপূর্ণ নয়। আর তাই বড়দিন উৎসব নিয়ে বিপুল এই আগ্রহ এখন শুধুমাত্র আর খ্রিস্টানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সব ধর্মে বর্ণের মানুষের কাছে তাই এর আবেদন ক্রমেই উর্ধ্বমুখী।

আমি যদি বর্তমান সময়ে আমাদের নবাবগঞ্জ উপজেলার বক্সনগর সাধু আন্তনির গ্রীজার এলাকার খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের 'বড়দিন উৎসব'-এর দিকে তাকাই তাহলে দেখা যায় তাদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে প্রতিবছর বড়দিন উৎসবটি আরও আড়ম্বরপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এখন বড়দিন আর কেবল 'ক্রিসমাস ট্রি' সাজানোর মধ্যে থেমে নেই। এতে যোগ হয়েছে আলোকসজ্জা, শুভেচ্ছাকার্ড বিনিময়, উপহার দেওয়া-নেওয়া, চকলেট আদান-প্রদান, ঘুরতে যাওয়া, বড়দিনের পিঠা বানান, কেক কাটা ও মিলন ভোজ-সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় উচ্চাসনে থাকা প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়। বড়দিনের আনন্দকে এ সব আয়োজন, আচার অনুষ্ঠান বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয় সত্যি। জীবন হয় আনন্দময়।

সময়ের দিক থেকে ২৫ ডিসেম্বর দিনটি সবচেয়ে ছোট দিন এবং ২১ জুন সবচেয়ে বড়দিন। ২৫ ডিসেম্বর দিনটিকে বড়দিন বলা হয় এই কারণে, যারা যিশুকে ত্রাণকর্তা মুক্তিদাতা বলে বিশ্বাস করে, হৃদয়ে ধারণ করে এবং প্রভু বলে মুখে স্বীকার করে, তাদের কাছেই যিশুর জন্মদিন বলে বিবেচিত বলেই এই দিনটি বড় দিন কারণ এর মহিমা বা গৌরব অনেক গভীরতা বুঝে যিনি প্রভু যিশুর কাছে আসে এবং, সে বিনষ্ট না হয়ে যেন অনন্ত জীবন পায়। আনন্দের হলেও এ দিনটির গভীরে দুঃখ লুকিয়ে ছিল।

খ্রিস্ট ভক্তদের পাপের জীবন হতে মুক্তির জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন-তিনি জানেন সমস্ত মানব জাতির পরিবর্তে প্রভু যিশুকে মৃত্যু-বরণ করতে হবে। দিনের পর দিন রাতের পর রাত তাকে দুঃখ-কষ্টের মধ্যদিয়ে চলতে হবে। তাই পিতার চোখে জল। কিন্তু খ্রিস্টসম্প্রদায় আনন্দিত। যা সবার পক্ষে সম্ভব ছিল না, এমন কি বহু ভাববাদী, ঈশ্বরের লোক ঈশ্বরের পক্ষে কাজ করেও এ অসাধ্য সাধন করতে পারেন নি, তা প্রভু যিশু এ জন্মের মধ্যদিয়ে শুরু করেছিলেন।

তিনি জন্মেছিলেন বলেই মানুষ আর মৃত্যুভয় করেনা, তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন বলেই তার অনুসারীরা আনন্দ করে। কারণ তারা বিশ্বাস করে তারা স্বর্গের সন্তান। তিনি আরো বলেন সকলের উচিত বড়দিনের তাৎপর্য অনুধাবন করা। বড়দিনের তাৎপর্য বুঝতে হলে কিছু বিষয় অনুসরন করতে হবে। যেমন-বড়দিন ত্যাগের বিষয় শিক্ষা দেয়। প্রভু যিশু স্বর্গে পরম সুখ, শান্তি ত্যাগ করে, মানব বেশ ধারণ করে পৃথিবীতে এসে গোয়াল ঘরে যাবপাত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। সকল দুঃখ, কষ্ট, যাতনা-তাড়না, এমনকি ক্রুশীয় মৃত্যু বরণ করে, নিজের জীবন পাপী মানুষের পরিত্রাণের জন্য উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টীয়ান জীবন ত্যাগের জীবন, ভোগের জীবন নয়।

-বড়দিন সকলকে প্রেমের বিষয় শিক্ষা দেয়। -মানুষের কোন ধর্ম কর্মের ফল নয়, প্রার্থনার বা কোন যাচ্নার ফল নয়। ঈশ্বর স্ব-ইচ্ছায় তাদের পরিত্রাণের জন্য, নিজ প্রিয়পুত্রকে দান করলেন। মানুষের উচিত ঈশ্বরের প্রেমের প্রতি সারা দেওয়া। প্রকৃত প্রেম স্বর্গ থেকে আসে কারন বড়দিন সকলের শান্তি, আনন্দ দান করে। যাহারা পাপের জীবন ত্যাগ করে খ্রিস্টকে মুক্তিদাতা ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করেন তখনই তাহারা পরিত্রাণের আনন্দ উপলব্ধি করে এবং তখনই-বড়দিন সকলকে পরিত্রাণের নিশ্চয়তা দেয়। পাপের মাঝে পড়ে মানুষ যখন হাবুডুবু খাচ্ছিল, মুক্তি লাভের কোন পথই ছিলনা, তখন প্রভু যিশু জন্ম গ্রহণের মধ্যদিয়ে মানুষ পরিত্রাণের পথের সন্ধান পেয়ে ছিলেন। বিশেষভাবে প্রভু যিশু সকলের পাপের শাস্তি নিজের স্কন্ধে নিয়ে ক্রুশীয় মৃত্যু বরণ করলেন। কবর প্রাপ্ত হলেন, ৩দিন পরে মৃত্যুকে জয় করে কবর থেকে পুনরুত্থিত হলেন। প্রায়শ্চিত্ত সাধনের মধ্যদিয়ে মানুষের জন্য পরিত্রাণের সুযোগ করে দিলেন। যেন সিকলে পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভ করে। এ জগতে অনেক ধর্ম প্রবর্তক, অনেক ভাববাদী, মহাপুরুষ এসেছেন, যারা মানুষের মুক্তির বাণী প্রচার করেছেন, কিন্তু কেউ বলতে পারেন নাই আমার কাছে এস, আমি তোমাদের মুক্তি দেব, সকল পাপ ক্ষমা করে পরিত্রাণ দেব। কেবল মাত্র প্রভু যিশুই মানুষের পাপ ক্ষমা করেছেন এবং পরিত্রাণ দিতে চেয়েছেন। আসুন আমরা বড়দিনের তাৎপর্য অনুধাবন করি। ত্যাগের জীবন, প্রেমের জীবন, আনন্দ ও শান্তির জীবন-যাপন করি এবং খ্রিস্টকে জীবনে গ্রহণ করে, হৃদয়ে ধারণ ও মুখে প্রভু বলে স্বীকার করে পরিত্রাণের নিশ্চয়তা লাভ করি। তা হলেই আমাদের জীবনে বড়দিন সার্থক হয়ে উঠবে॥

মুক্তিযুদ্ধে খ্রিস্টান সমাজ

সুনীল পেরেরা

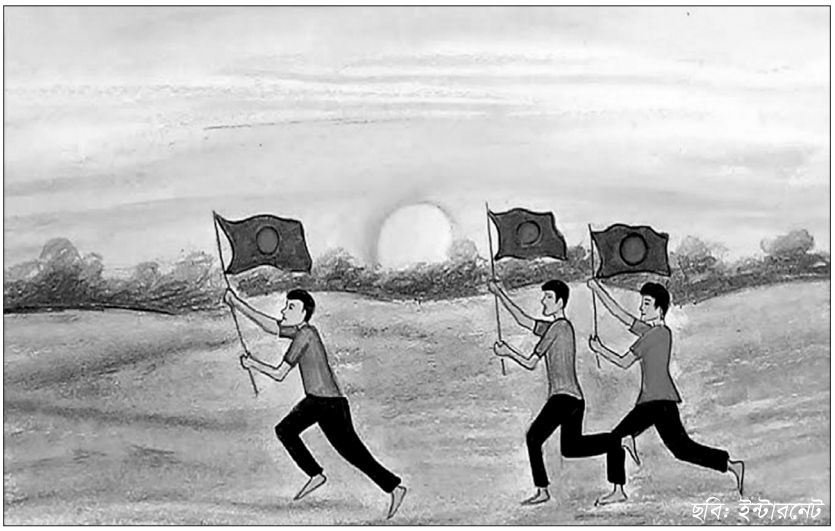

বাংলাদেশের অভুদ্যয় ঘটেছিল কালজয়ী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায়। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, বাষট্টির ছয়দফা ধ্রুবতারা। ধাপে ধাপে গড়ে ওঠেছে বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ, স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীনতার স্বপ্নসৌধ। পিছিয়ে থাকা, নির্যাতিত, বঞ্চিত মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা চিরন্তন। বাঙালির মুক্তি চেয়েছিল। ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তানে বাঙালির টান ছিলনা। হাজার মাইল দূরবর্তী সমাজের সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক, সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক কোন বন্ধন ছিল না কখনো। বিশ্বসভ্যতায় ধর্মীয় বন্ধন সবচেয়ে ঠুন্‌কো। এই বন্ধনে বাঙালি বাঁধা পড়েনি।

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ছয় দফাকে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী সর্বনাশের গন্ধ পেয়েছি। ওরা বলেছিল, এটা পাকিস্তান ভাঙ্গার হীন ষড়যন্ত্র। তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য নেতাদের জেলে পুড়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারতে চেয়েছিল পাক সামরিক জান্তা। পৃথিবীতে কিছু মানুষ থাকেন যারা ইতিহাসে উদ্বুদ্ধ হন, কেউ আছেন যারা ইতিহাসের অংশ হয়ে যান। আর এমন সামান্য কয়েকজন আছেন, যারা নিজেরাই ইতিহাসের স্রষ্টা হয়ে যান। শেখ মুজিবুর রহমান এই শেষোক্ত পর্যায়েরই মানুষ। তাকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছে ইতিহাস, সৃষ্টি হয়েছে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের একটি বিশাল জাতির জন্মগাঁথা। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে কখনো তার আত্মপরিচয়ের সন্ধান ছিল না। কখনো তার আত্ম পরিচয়ের ইতিহাসও ছিল না।

দীর্ঘ সংগ্রাম, আন্দোলনের পর ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ, এর ফলেই বাঙালির স্বাধীকার আন্দোলন আরও বেগবান হতে থাকে। পাকিস্তানী সামরিক জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তরে কালক্ষেপন ও গড়িমসি করায় পূর্ব পাকিস্তান ফুঁসে ওঠে। তারপর ১৯৭১ এর ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ১৯ মিনিটের এক যাদুকরী ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে স্বপ্নে বিভোর করেছিলেন মুক্তির সংগ্রামে। মূলত ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ ভাষণ আপামর বাঙালি জাতিকে মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্দীপনা যোগিয়েছে। ভাষার দাবীতে যে আন্দোলন ২৩ বছর আগে শুরু হয়েছিল, তা স্বাধীনতার দাবীতে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে। সেদিন থেকেই বাংলার ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলে। একটি শ্লোগানই সবার মুখে উচ্চারিত হতে থাকে "বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।" এরপর অনেক রহস্য, নাটকীয়তা, ষড়যন্ত্র আর কুটিলতা। ২৫ দিনের অসহযোগ আন্দোলন, ২৬০ দিনের মুক্তিযুদ্ধ, লাখ লাখ মানুষের আত্মত্যাগ আর এক সাগর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা এসেছিল।

৭ মার্চের ভাষণের পর অনেকেই হয়তো ভেবেছিল বাঁশের লাঠি দিয়েই দেশ স্বাধীন করা যাবে। ব্যাপারটা ২৫ মার্চের কালরাতে পাকিস্তানী হানাদারদের হীন আক্রমনের পর উপলব্ধি হয়েছে যে, স্বাধীনতা বিনা রক্তপাতে আসবেনা। তবে ৭ মার্চে বাঁশের লাঠি হাতে যে প্রেরণা পেয়েছে পরবর্তীত অস্ত্র তুলে নিতে কোন দ্বিধা করেনি কেউ। এই একটি ভাষণে প্রতিটি বাঙালিকে রূপান্তরিত করেছিল বীরের জাতিতে। এই ভাষণ আর "জয় বাংলা" শ্লোগান শুধু রাজনৈতিক দলিলই নয়, জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয়ের একটি সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছিল। একধ্বনি, এক দাবী, এক দফা, বাংলার স্বাধীনতা।

এরপর নয় মাস ধরে চলে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। প্রায় এক কোটি শরণার্থী সহায় সম্বল হারিয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। আমাদের মুক্তিযোদ্ধার বীর বিক্রমে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারত আক্রমন করে। ফলে ৬ ডিসেম্বর ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় এবং যুদ্ধ শুরু করে।

বাংলাদেশেকে স্বাধীন করার প্রস্তুতি বঙ্গবন্ধু অনেক আগেই নিয়েছিলেন এবং সমগ্র জাতিকে অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। জন্মের পর থেকেই পাকিস্তান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শাসিত হয়েছে সেনা নায়কদের দ্বারা। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বার বার প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও সামরিক অভুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। সে কারণেই গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা এদেশের মানুষের মনে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী সামরিক জান্তা বাংলাদেশকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত রাখার জন্য নৃশংসতম গণহত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণ, নির্যাতন ও জনপদ ধ্বংসসহ যাবতীয় যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। অথচ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় রয়েছে অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি এবং ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ। ফলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রায় প্রতিটি বাঙালি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কেউ অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছে, কেউবা সেবা, সাহায্য, সহযোগিতা দিয়েছে।

নয় মাস যুদ্ধের পর বর্বর পাকবাহিনী ৯০ হাজারেরেও বেশি নৃশংস সেনাবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহিনীর যৌথ কমান্ডের নিকট পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে বাংলার মাটিতে। ৬ জানুয়ারি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন বঙ্গবন্ধু। পরে লন্ডন, ভারত হয়ে। ভারতবাসীকে ও ভারত সরকারকে কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ জানিয়ে ১০ জানুয়ারি স্বদেশে পত্যাবর্তন করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম গুণ ছিল অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী চেতনা শুধু নয় এবং মানুষকে আপন করে নেবার অসাধারণ ক্ষমতা। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল এদেশের জনগণ, বিশেষ কোন দল বা গোষ্ঠী নয়। এদেশের সাম্প্রদায়িকতার শিকড় উপড়ে ফেলে অসাম্প্রদায়িক জাতিগঠন ছিল তার লড়াই ও সংগ্রামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে এটা ছিল খুবই প্রয়োজন।

মুক্তিযুদ্ধে খ্রিস্টানদের অবদান

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে সারা বাংলার বুকে বর্বর পাক বাহিনীর নৃশংস ধ্বংসযজ্ঞ যখন চলছিল, সে সময় অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় যথেষ্ট নিরাপদ অবস্থানে ছিল খ্রিস্টান সম্প্রদায়। তারপরেও নিজস্ব জন্মভূমির প্রতি দেশ প্রেম, স্বজাতির প্রতি গভীর মমত্ববোধে উজ্জীবিত হয়ে তারাও অস্ত্র হাতে মুক্তি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। যুদ্ধের শুরুতেই দিনাজপুরের জর্জ বাহিনী গড়ে ওঠেছিল। এ ছাড়াও কোম্পানী কমান্ডার, প্লাটুন কমান্ডার ও গ্রুপ কমান্ডার সহ চার হাজারেরও অধিক মুক্তিযোদ্ধা সমুখ সমরে অস্ত্রহাতে যুদ্ধ করেছে। অনেকেই আহত হয়েছে এবং বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ হারিয়েছেন। বিদেশীসহ চারজন ধর্মীয় নেতা এদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রাণোৎসর্গ করেছেন। তাদের মধ্যে ফাদার উইলিয়াম ইভান্স সিএসসি, ফাদার মারিও ভেরোনেসি, ফাদার লুকাস মারান্ডি এবং সিস্টার এম্মানুয়েল। এ সময় খ্রিস্টান চার্চ ও প্রতিষ্ঠানগুলো হয়ে ওঠেছিল শরণার্থীদের নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র। হাজার হাজার সহায় সম্বলহীন মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল লঙ্গরখানা। ফাদার, সিস্টার ও সাধারণ ভক্তগণ শরণার্থীদের আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ, সেবা দিয়েছেন দিনের পর দিন। নাগরী, জলছত্র, বক্সনগর, রুহিয়া, আন্ধারকোঠা, মারিয়ামপুর, বনপাড়া, রাঙ্গামাটিয়া, বানিয়ারচর, তুমিলিয়া প্রভৃতি মিশনগুলোতে হাজার হাজার মানুষকে সেবাদান করেছে খ্রিস্টান সম্প্রদায়।

মুক্তিযুদ্ধের অমর সৈনিক সুর সম্রাট সমর দাস। তিনি ছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গীত বিভাগের প্রধান পরিচালক। তার সুরারোপিত কালজয়ী গানগুলো সে সময় ছিল যুদ্ধের প্রাণ আর বিজয়ের অনুপ্রেরণা। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত "আমার সোনার বাংলা" গানটির প্রথম দশ লইনের সুর বিন্যাসের দায়িত্বপ্রাপ্ত হলে মূল গানটি লন্ডন থেকে সামরিক ব্রাশব্রান্ডে রেকর্ড করেন তিনি। বাংলাদেশের প্রবাদপ্রতিম বন্ধু জর্জ হ্যারিসন ও পণ্ডিত রবি শঙ্করের 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' এ যুক্ত হলেন শিল্পী বব ডিলান, রিভো স্টার, বিলি প্রিস্টন, লিয়ন রাসেল প্রমুখ। চল্লিশ হাজার লোকের সামনে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের মানুষের দুর্দশার কথা তুলে ধরলেন। নিউইয়র্ক শহরে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংগৃহীত ২, ৩৪, ৪১৮, ৫০ ইউএস ডলার দান করা হয় মুক্তিযুদ্ধে।

যুদ্ধের নয় মাস আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলী রমনার আর্চবিশপ ভবনেই ছিলেন। শত বিপদের মাঝেও তিনি ছিলেন ধ্রুবতারার ন্যায় সমুজ্জ্বল প্রতিটি খ্রিস্টভক্তের আশা-ভরসার কেন্দ্রস্থল। এখানে অবস্থান করেই তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন যেন প্রতিটি মিশনকেন্দ্রে শরণার্থীদের আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র ও সেবা প্রদান করা হয়। ফলে ফাদার, সিস্টার সম্প্রদায় এবং খ্রিস্টভক্তগণ, সবাই সে নির্দেশ পালন করেছেন নিজেদের অনিরাপদ অবস্থায়ও। নিজেও বিশ্বাস করতেন এ দেশ শত্রুমুক্ত হযে স্বাধীন হবেই। মুক্তিযুদ্ধে নাগরীর ফাদার গেডার্ট ও ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা খুলনার ফাদার মারিনো রিগন যিনি সে সময় বানিয়ারচর মিশনে ছিলেন, নটরডেম কলেজের অকুতোভয় ফাদার উইলিয়াম টিম সিএসসি, ময়মনসিংহের ফাদার (জলছত্র মিশনে কর্মরত) ইউজিন হোমরিক সিএসসি সহ আর কত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির স্বহৃদয় সহায়তা ছিল। মানবপ্রেমে কত সাধারণ মানুষ অসহায় মানুষদের সেবা ও সান্ত্বনা দিয়েছেন। বাংলাদেশের জনসংখ্যার অনুপাতে খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা মোট জনগোষ্ঠীর মাত্র ০.০৩ শতাংশ অর্থাৎ ০.০৩%।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মাদার তেরেজার ভূমিকা ছিল অনন্য। যুদ্ধের সময় পার্শ্ববর্তী শিবিরগুলিতে বাংলাদেশের কোটি কোটি বিপন্ন মানুষকে নিরলস ভাবে সেবাদানে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। যুদ্ধ শেষে ২২ ডিসেম্বর শরণার্থী শিবিরে বীরাঙ্গণা মা ও যুদ্ধশিশুদের নিয়ে কার্যক্রম শুরু করেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধু ও আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলীর আমন্ত্রণে মাদার তেরেজা যুদ্ধাহত মা ও যুদ্ধশিশুদের পুণর্বাসণের কাজ শুরু করেন। যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মা বোনেরা নির্যাতিত ও ধর্ষিত হয়। যুদ্ধের পর এসব নারীদের তিনি পুণর্বাসন করেন এবং যুদ্ধ শিশুদের দত্তক দানে সহায়তা করেন। যুদ্ধ শেষে কারিতাস, আরডিআরএস, সিসিডিবি সহ আরও সেবা সংস্থাগুলো দেশ গঠণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং আজও করে যাচ্ছে।

২০২১ খ্রিস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে নেত্রী দেশমাতা শেখ হাসিনার হাতে হাত রেখে আমরাও যেন যার যার অবস্থানে থেকে দেশ গঠনে সমবর্তী হই, গড়ে তুলি সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ। যে দেশ আমার আপনার সবা। জয় বাংলা॥

তথ্যসূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, অর্জন

ভালোবাসা ও সেবা কাজে কারিতাস বাংলাদেশ

কারিতাস ইনফরমেশন ডেস্ক: কারিতাস বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উন্নয়ন ও সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জানুয়ারি Christian Organization for Relief and Rehabilitation (CORR) নামে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন আইন ১৮৬০ এ নিবন্ধিত হয়। সংস্থাটি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে কারিতাস বাংলাদেশ নামধারণ করে এবং পরবর্তীতে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাংলাদেশ এর অধীনে নিবন্ধন লাভ করে।

আলোকিত শিশু প্রকল্প আয়োজিত শিশু সমাবেশ ও ইফতার অনুষ্ঠানে মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, সিএসসি, কারিতাসের পরিচালকবৃন্দ ও প্রকল্পের কর্মীদের সাথে শিশুরা।

কারিতাসের ছয়টি অগ্রাধিকার হচ্ছে ১) বিপন্ন-জনগোষ্ঠীসমূহের জন্য সমাজকল্যাণ; ২) প্রতিবেশগত সংরক্ষণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা; ৩) শিক্ষা এবং শিশু উন্নয়ন; ৪) পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যশিক্ষা; ৫) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা; ৬) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়ন। কারিতাস বাংলাদেশ বর্তমানে এর ছয়টি অগ্রাধিকারের আওতায় ৯১টি প্রকল্প ও তিনটি ট্রাস্টের মাধ্যমে নানামুখি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প নিম্নরূপ:

আলোকিত শিশু প্রকল্প: সুবিধাবঞ্চিত শিশুর স্বপ্ন জয়ের সারথি

বাংলাদেশের শহরগুলোতে এখন অন্যতম প্রধান একটি সমস্যা হল দিন দিন সুবিধাবঞ্চিত শিশুর সংখ্যা বেড়ে যাওয়া। নূন্যতম মৌলিক সুবিধা ছাড়া বিভিন্ন শহরের উন্মুক্ত রাস্তাঘাটে বসবাসকারী শিশুরা চরম দারিদ্র্য, অপুষ্টি, রোগে আক্রান্ত, নিরক্ষরতা ও সহিংসতাসহ নানা বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। এই সকল সমস্যা সমাধানে দেশের বিভিন্ন শহরের সুবিধাবঞ্চিত ও বিপদাপন্ন শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং পাশাপাশি সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে কারিতাস ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে ড্রিম প্রকল্প শুরু করে। পরবর্তীতে এ প্রকল্পের কার্যক্রম আরও প্রসারিত হয় এবং ২০২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে আলোকিত শিশু নামে এর যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে এ প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত শিশুর জন্য কারিতাস বাংলাদেশের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো - সমন্বিত উদ্যোগ ও সুরক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত অথবা ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা যা তাদের জীবনমানে পরিবর্তন আনবে। প্রকল্পটি বর্তমানে বাংলাদেশের ঢাকা, ময়মনসিংহ ও রাজশাহী বিভাগে চলমান আছে। ঢাকা জেলার মোহাম্মদপুর, গাবতলী, আরামবাগ, বাবুবাজারসহ (বারাকার অধীনে) মোট ১৫টি ওয়ার্ডে, ময়মনসিংহ জেলা সদরসহ ৬টি ওয়ার্ডে এবং রাজশাহী জেলায় ৬টি ওয়ার্ডের ১৫টি বস্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

আলোকিত শিশু প্রকল্পের সেবা কার্যক্রমসমূহ : প্রকল্পের আওতায় ছয়টি দিবাকালীন আশ্রয়কেন্দ্র (ড্রপ-ইন সেন্টার-ডিআইসি), দুটি দিবাকালীন বনাম রাত্রিকালীন আশ্রয়কেন্দ্র (ডিআইসি কাম নাইট শেল্টার) এবং দুইটি রাত্রিকালীন আশ্রয়কেন্দ্রের (নাইট শেল্টার) মাধ্যমে ৪৯৫ জন শিশুকে নিরাপদ আশ্রয়সেবা প্রদানসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, মাঠ পর্যায়ে শিশুদল, শিশু সুরক্ষা কমিটি (সিপিসি) ও অভিভাবকদল গঠনের মাধ্যমে ৪,৫৪৪ জন শিশু ও তাদের পরিবারের দোড়গোড়ায় নিম্নে বর্ণিত সেবাসমূহ প্রদান করা হচ্ছে-

- **দিবা এবং রাত্রিকালীন আশ্রয়কেন্দ্রের কার্যক্রম:** দিবা ও রাত্রিকালীন আশ্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিদিন অন্তত ৪৯৩ জন সুবিধাবঞ্চিত মেয়ে ও ছেলে শিশুকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। দিবাকালীন আশ্রয়কেন্দ্রে শিশুরা সকাল আটটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত এবং রাত্রিকালীন আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদে রাত্রিযাপন করতে পারে। এসকল কেন্দ্রে নিয়মিত রুটিন অনুযায়ী শিশুদের খাদ্য সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা, পরিষ্কার-পরিছন্ন থাকার সুবিধা, শিক্ষাগত/সচেতনতামূলক পাঠ, মৌলিক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বিনোদনমূলক সুবিধা ইত্যাদি সেবা গ্রহণ করে। এসকল সেবাসমূহ শিশুদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করছে এবং পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করছে।
- **চিকিৎসা সেবা:** দিনের অধিকাংশ সময়ে পথে-ঘাটে অবস্থান এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে না জানার কারণে শিশুরা নানা ধরণের রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এ সকল শিশুদের সুস্থতা বিধানে প্রকল্প থেকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক সেশন পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া, শিশুদের ভলান্টারি কাউন্সেলিং টেস্টিং (ভিসিটি) করা হয় এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।
- **শিক্ষা প্রদান:** শিশুদের জীবনমানে টেকসই ও স্থায়ী পরিবর্তন আনতে হলে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রকল্পের আওতায় শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি ফি, পোশাক, বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়। শিশুরা নির্দিষ্ট সময়ে ক্লাশে যোগদান করে এবং ক্লাশ শেষে আশ্রয়কেন্দ্রে ফিরে আসে। পাশাপাশি প্রকল্পের কর্মীরা শিশুদের পড়াশোনায় সহায়তা করে তাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে চলমান রাখার চেষ্টা করে।
- **কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি:** আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি যাদের বয়স ১৬ বছরের উর্ধ্বে এমন শিশুদের আগ্রহ যাচাই করে তাদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এ প্রশিক্ষণ শেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে

যোগাযোগ করে শিশুদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।

- **শিশুদের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা ও জীবন দক্ষতা বিষয়ক পাঠ প্রদানঃ** শিশুদের সঠিক মনোসামাজিক বিকাশ ও বৃদ্ধির জন্য দিবা এবং রাত্রিকালীন আশ্রয়কেন্দ্রে খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় শিশুরা কবিতা, গান, নাচ শেখে এবং পাশাপাশি বিভিন্ন খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। এছাড়া, প্রকল্পের কর্মীরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করেন। এছাড়া, শিশুদের ধর্মীয় মূল্যবোধ, নৈতিক শিক্ষা প্রদান এবং সর্বোপরি একজন ভালো মানুষের গুণাবলি অর্জনের জন্য দিবাকালীন আশ্রয়কেন্দ্র ও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষামূলক সেশন পরিচালনা করা হয়। এতে শিশুরা জীবনের ভাল-মন্দ দিক বুঝতে পারে যা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হয়।
- **মাঠ পর্যায়ে শিশু ও অভিভাবকদল গঠন এবং সচেতনতা বৃদ্ধিঃ** কর্মএলাকায় শিশুদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিশুদের নিয়ে দল গঠন করা হয়েছে। এসব দলের অন্তর্ভুক্ত শিশুদের নিয়ে দ্বি-মাসিক বৈঠক আয়োজন করা হয়। সভায় শিশুদের শিশু অধিকার, পারিবারিক বন্ধনের গুরুত্ব, শিক্ষা/বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, মানসিক স্বাস্থ্য, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক এবং শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে শিক্ষামূলক সেশন পরিচালনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে অভিভাবকদের নিয়ে দল গঠন করা হয় এবং তাদের নিয়ে নিয়মিত সভা করে সন্তানকে সঠিকভাবে লালন-পালনের উপায়সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এর ফলে অভিভাবকগণ নিজেরা সচেতন হচ্ছেন এবং সমাজের অন্যদের সচেতন হতে সহায়তা করছেন।

মানব জীবনের প্রথম পর্যায় হলো শৈশব। আর শৈশব হলো মানব জীবনের অন্যতম অধ্যায়। একটি দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে দেশের শিশুদের উপর। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য অনেক শিশু জীবনের মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে কারিতাস বাংলাদেশ আলোকিত শিশু প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মৌলিক চাহিদা পূরণসহ অধিকার আদায়ে কাজ করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, অনেক শিশু তাদের অধিকার ও করণীয় সম্পর্কে জানতে পারছে। অনেক শিশুর

চুক্তি স্বাক্ষরকালে উইনরক ইন্টারন্যাশনাল ও কারিতাস বাংলাদেশ-এর পরিচালক ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

নিত্যদিনের মৌলিক চাহিদা পূরণ হচ্ছে। আবার অনেকেই তাদের বহমান জীবন ত্যাগ করে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণের স্বপ্ন দেখছে কেউবা জীবনমান পরিবর্তন করে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে চেষ্টা করছে।

আশ্বাসঃপাচারের শিকার হওয়া নারী ও পুরুষদের জন্য প্রকল্প, ধাপ-২

বাংলাদেশে সুইজারল্যান্ডের দূতাবাস উইনরক ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে আশ্বাস (পর্যায়-২) প্রকল্পে অর্থায়ন করে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো যেসব নারী ও পুরুষ পাচার থেকে রক্ষা পেয়েছেন তারা তাদের মর্যাদা ও সুস্থতা ফিরে পাবেন এবং স্বাবলম্বী হবেন–তা নিশ্চিত করা। আশ্বাস প্রকল্পটি খুলনা জেলার ১০টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পের সময়কাল ডিসেম্বর ০১, ২০২৩ থেকে ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০২৭। মোট ১০ জন কর্মী প্রকল্পের পরিকল্পিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পাচার থেকে ফিরে আসা অন্যান্য সামাজিক পরিষেবার সাথে মনোঃসামাজিক কাউন্সেলিং সহায়তা প্রদান করা হবে এবং দক্ষতা-উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হলে তাদের মজুরিভিত্তিক বা স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। প্রকল্পটি বৃত্তিমূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করবে এবং উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের সাথে সংযোগের মাধ্যমে তাদের চাহিদা এবং আগ্রহ মেটাতে উদ্যোক্তা তৈরী করা হবে। প্রত্যাবর্তনকারী অভিবাসীদের টেকসই পুনঃএকত্রীকরণের জন্য পরিষেবা প্রদানকারী, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সংযোগ স্থাপন করবে।

প্রধান প্রধান কার্যক্রম

পাচার থেকে ফিরে আসা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য -

- মনোঃসামাজিক কাউন্সেলিং এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবাসহ সামগ্রিক যত্ন প্রদান করা।
- নতুন বা ভাল কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- আর্থিক সহায়তা দেওয়া এবং বাজারের যোগসূত্র বৃদ্ধি করা।
- উন্নত সামাজিক সুরক্ষা এবং আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- টেকসই পুনঃএকত্রীকরণকে সমর্থন করার জন্য পাবলিক এবং বেসরকারি খাতের স্টেকহোল্ডারগণের নীতি/প্রক্রিয়াগুলোকে প্রভাবিত করা।
- কমিউনিটিতে মানব পাচার প্রতিরোধ এবং পাচার থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের জন্য পুনর্মিলন পরিষেবা সম্পর্কে সচেতন এবং প্রশিক্ষিত করা।

প্রকল্পের অংশীদার/স্টেকহোল্ডারঃ পাচার থেকে ফিরে আসা এবং প্রত্যাবর্তনকারী অভিবাসী ব্যক্তি এবং তাদের পরিবার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, স্বাস্থ্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুব অধিদপ্তর, বেসরকারি সেক্টর, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার, ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের সদস্য, ইত্যাদি।

প্রকল্পের বাজেটঃ টাকা ৩০,৯৯৩,৮৮০/- (তিন কোটি নয় লক্ষ তিরানব্বই হাজার আটশত আশি) টাকা।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

কারিতাস বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সেক্টরের মাধ্যমে বিগত বৎসরে ২১৭,১৩০ পরিবারের ১,০১৬,৯৭০ জনের নিকট (পুরুষ ৪৯৯,১২০ এবং নারী ৫১৭,৮৫০) দুর্যোগে সচেতনতা বিষয়ক বিভিন্ন বার্তা,

জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় সেবা সরাসরিভাবে পৌঁছানো হয়। এছাড়াও সরাসরি সেবা গ্রহীতাগণ তাদের সহযোগি, প্রতিবেশি, আত্মীয়স্বজনদের মাধ্যমে অর্থাৎ পরোক্ষভাবে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের কাছে মানবিক সহায়তা সহভাগিতা ও বিভিন্ন সচেতনতামূলক বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন।

কারিতাসের আটটি অঞ্চলের মাধ্যমে একটি সিটি কর্পোরেশনসহ ১২টি জেলার ৩২ উপজেলার ৪৬ ইউনিয়নের অসহায়, দরিদ্র, প্রান্তিক ও বিপদাপন্ন মানুষের জীবনমান উন্নয়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ২০টি দাতা সংস্থার নিকট থেকে মোট ৫৯৭,৮০৫,৮৩৩ টাকা তহবিল বা অনুদান গ্রহণ করা হয়।

দুর্যোগে জরুরি সাড়াদান ও পুনর্বাসন কার্যক্রম

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সেক্টরের আওতায় মোট তিন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা - দেশের উত্তর ও উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় বন্যা, ঘূর্ণিঝড় মোখা ও ভূমিধ্বস এ আক্রান্ত সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন পরিবারকে জরুরি সাড়াদান ও পুনর্বাসন প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বমোট ৭১,৪২৯,০৭৭ টাকা পরিমাণ তহবিল সংগ্রহে ভূমিকা রাখে। মোট আটটি দাতা সংস্থার নিকট থেকে এসব তহবিল অনুদান হিসেবে সংগৃহীত হয়।

জরুরি সহায়তা প্রদান প্রকল্পগুলো ছয়টি অঞ্চলের তিনটি মিউনিসিপ্যালিটিসহ ১৩টি জেলার ১৮টি উপজেলার ২৭টি ইউনিয়নের ১২,৭৪০ পরিবারের মাঝে চার হাজার হতে সাড়ে চার হাজার টাকা করে শর্তহীন নগদ অর্থ, পুনর্বাসন কার্যক্রম, স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জাম, জরুরি খাদ্য সহায়তা, অবকাঠামো উন্নয়ন, অবকাঠামো মেরামত, ঘর নির্মাণ, কাজের বিনিময়ে অর্থ, গৃহ নির্মাণের সামগ্রী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ (ডিআরআর) কার্যক্রম - দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ কার্যক্রমের অধীনে ৪৮১,৬৩২,৭২১ টাকা বাজেটের ১০টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এর মাধ্যমে ৮৩,৯১৯ পরিবারে ৩৮১,০৫৫ মানুষের (পুরুষ ১৮৬,৭১৮ নারী ১৯৮,৩৩৭) বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এর মধ্যে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্তি (ডিআইডিআরএম) এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস প্রকল্প নামক দুটি প্রকল্পের কার্যক্রম অতি সম্প্রতি শুরু হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি ডিআরআর প্রকল্পসমূহের জন্য কারিতাস পরিবারের নিয়মিত বন্ধু তিনটি দাতা সংস্থা (কারিতাস জার্মানি, সিকোর্স কাথলিক-কারিতাস ফ্রান্স, সিআরএস) ও ইনস্টিটিউশনাল দাতা সংস্থা ইউএসএআইডি এর সাথে এ সেক্টরের নিয়মিত যোগাযোগ ও ভাল সম্পর্ক অব্যাহত থাকায় এবছরও তহবিল পাওয়া গেছে। ডিআরআর এর মাধ্যমে বহুমূখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত, গবাদি প্রাণির টিকা দান, আয় বর্ধনমূলক সহায়তা, পানিয় জলের জন্য নলকূপ স্থাপন, রাস্তা মেরামত, ঘর নির্মাণ ও ঘর মেরামত, সচেতনতামূলক মহড়া, বিভিন্ন ধরনের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা, সমন্বয় সভা, দিবস উদ্‌যাপন, দুর্যোগ প্রস্তুতি কার্যক্রম পরিচালনা, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সেবা প্রদান চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ জীবিকা নির্বাহের কাজে সম্পৃক্ত ও সর্বাধিক উপেক্ষিত মৎসজীবিদের জন্য স্থানীয় উপকরণ দিয়ে জীবন রক্ষাকারী বলয় (লাইফ বয়া) উদ্ভাবন করা হয় এবং সাত হাজার মৎসজীবির নিকট তার বিতরণ করা হয়। এ উদ্ভাবন জাতীয় জীবনের জন্য অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য উপহার।

বল প্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের জন্য জরুরি সাড়াদান কর্মসূচি কার্যক্রম-

এ কর্মসূচির আওতায় মোট ৪৪,৭৪৪,০৩৫ টাকা আর্থিক মূল্যমানের কাজ সম্পাদন করা হয়। এই অর্থ দিয়ে কক্সবাজার জেলার, কক্সবাজার সদর, উখিয়া ও চকরিয়া এই তিনটি উপজেলার আওতাধীন ১২টি ক্যাম্পে (ক্যাম্প-১ই, ১ ডব্লিউ, ৩, ৪, ৪ বর্ধিত, ক্যাম্প-৫, ৮ ডব্লিউ, ক্যাম্প-১৩, ১৯, ১৭, ২০ এবং ২০ বর্ধিত) কাজ হয়। এ কর্মসূচির কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ১০টি দাতা সংস্থা হতে তহবিল নিয়ে মোট ১১০,৫৫০ পরিবারের ৫২৭,৩২৪ (পুরুষ ২৫৮,৩৮৯ এবং নারী ২৬৮,৯৩৫) জন বল প্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের জন্য ঘর নির্মাণ, ঘর মেরামত, শিশু বান্ধব কেন্দ্র, শিক্ষা সহায়তা, সোলার লাইট, জীবিকায়ন, পয়ঃনিষ্কাশন, নারী ও শিশু সুরক্ষা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পয়ঃনিষ্কাশন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- নগর এলাকার আপদ, দুর্যোগ ও সম্ভাব্য ঝুঁকি বিশ্লেষণ করে নিরাপদ নগরায়নের সম্ভাব্যতা যাচাই, পরিবার ও সমাজ পর্যায়ের বন্যা প্রস্তুতি প্রকল্প (এফসিএফপিপি-২) এবং পরিবার ও সমাজ পর্যায়ের ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি প্রকল্প (এফসিসিপিপি-২)-এর সফল মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। এ কার্যক্রমগুলো দুর্যোগ কার্যক্রমে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা ফার্ম বা প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেন এবং কার্যক্রমগুলো অব্যাহত রাখতে ভূমিকা রাখেন।
- কারিতাস বাংলাদেশ অর্ধশতাব্দীরও অধিক সময়ব্যাপী দুর্যোগে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা, নদীভাঙ্গন, বজ্রপাত, অগ্নিকাণ্ড, ভূমিধ্বস, প্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার সাথে সংগ্রামে টিকে থাকার উপায়, কৌশল ও সহনশীলতা বৃদ্ধিতে কার্যকরী অবদান রাখে। বিগত বছরে এই বিরল অর্জনসমূহ ধারাবাহিকভাবে স্টাডি করা হয় এবং সকলের নিকট একটি শিক্ষণীয় দলিল হিসেবে প্রকাশ করা হয়।
- স্থানীয় নেতৃত্বকে সঠিক পথ প্রদর্শন (অলরাইট) প্রকল্পের মাধ্যমে বিপদাপন্ন নারী ও শিশু সুরক্ষা নির্দেশিকা, তথ্য সুরক্ষা নীতিমালা এবং আশ্রয় ও আবাসন (শেল্টার সেটেলমেন্ট) কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়। যা কারিতাসের স্বচ্ছ ও জবাদিহিতামূলক

কারিতাসের সহায়তায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ঘর পুনঃনির্মাণ

কাজ নিশ্চিত করার জন্য দিগন্ত সৃষ্টিকারী উদ্যোগ হিসেবে গণ্য।

জলবায়ু পরিবর্তন, আধুনিক দাসত্ব ও তা নির্মূলে কারিতাস বাংলাদেশের উদ্যোগ

দাসপ্রথা! পৃথিবীর অন্ধকারাচ্ছন্ন ও কলঙ্কিত এক অধ্যায়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দাসত্ব বিলোপ করতে বিশ্বব্যাপী এই প্রথা ও দাস ব্যবসা নিষিদ্ধকরণের উপর কনভেনশন গৃহীত হয়। তবে আজও দাস প্রথা রয়ে গেছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে। আধুনিক দাসত্বকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে শোষণের উদ্দেশে বলপ্রয়োগ, জবরদস্তি, দুর্বলতার অপব্যবহার, প্রতারণা বা অন্যান্য উপায়ে শিশু, নারী বা পুরুষকে নিয়োগ, আন্দোলন, আশ্রয় বা গ্রহণ করা। সর্বশেষ বৈশ্বিক দাসত্ব সূচকে বিশ্বের ১৬০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৫৬তম এবং এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ২৭ টি দেশের মধ্যে ৯ম। বাংলাদেশের প্রায় ১২ লক্ষ মানুষ (প্রতি হাজারে ৭.১ জন) আধুনিক দাসত্বের শিকলে আবদ্ধ। বাংলাদেশে আধুনিক দাসত্বের প্রচলিত কিছু ধরন হলো মানব পাচার, ঋণ দাসত্ব, জোরপূর্বক শ্রম শোষণ, যৌন শোষণ ইত্যাদি।

ভৌগোলিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এই ব-দ্বীপটি প্রতিনিয়ত সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনের মতো জলবায়ু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে টিকে আছে। এই চ্যালেঞ্জগুলো দেশের আর্থ-সামাজিক দিকসমূহকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা অঞ্চলগুলোতে আধুনিক দাসত্বের মত সমস্যাগুলোকে আরও তীব্রতর করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যে সকল ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রকটভাবে পড়ছে সেগুলো হলো-

জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভাব: জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের উপকূলবর্তী দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে কৃষি ও মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের জীবিকার জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করেছে। লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং আবাদি জমিগুলো বন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। যা তাদেরকে শোষণ ও বাধ্যতামূলক শ্রমের দিকে পরিচালিত করছে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত স্থানান্তর ও অভিবাসন: ঘূর্ণিঝড় এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রভাবে অনেক মানুষ এলাকা থেকে স্থানান্তর হতে বাধ্য হচ্ছে। জলবায়ু-প্ররোচিত অভিবাসন মানব পাচার এবং জোরপূর্বক শ্রমের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে, বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিরা শোষণের সহজ লক্ষ্য হয়ে উঠছে।

দারিদ্র্য বৃদ্ধি: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অর্থনৈতিক সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। লোকেরা জীবিকার তাগিদে কোন বাছ-বিচার ছাড়াই যে কোন পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে এবং আধুনিক দাসত্ব বরণ করছে।

শিশু শ্রম: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকটের ফলে শিশুশ্রমের ঝুঁকি বাড়ছে। পরিবার বাধ্য হয়ে শিশুদের বিভিন্ন বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ঠেলে দিচ্ছে।

সুদীর্ঘ পথচলায় কারিতাস বাংলাদেশ দেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে কাজ করে চলেছে। আধুনিক দাসত্ব নির্মূলেও ভিন্ন ভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের সুন্দরবন অঞ্চলে, দাতা সংস্থা ক্যাফোডের আর্থিক সহায়তায় যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব নটিংহ্যাম এর নেতৃত্বে কারিতাস বাংলাদেশ একটি গবেষণা কার্যক্রমে অংশ নেয়। গবেষণায় জলবায়ু পরিবর্তনকেই উক্ত এলাকার মূল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং এলাকার চাহিদা ও গবেষণার সুপারিশের ভিত্তিতে সমস্যাগুলোকে সমাধানের উদ্দেশে বাংলাদেশ ও ভারতের সুন্দরবন অঞ্চলের জলবায়ু প্ররোচিত অভিবাসন ও আধুনিক দাসত্ব বিষয়ে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়।

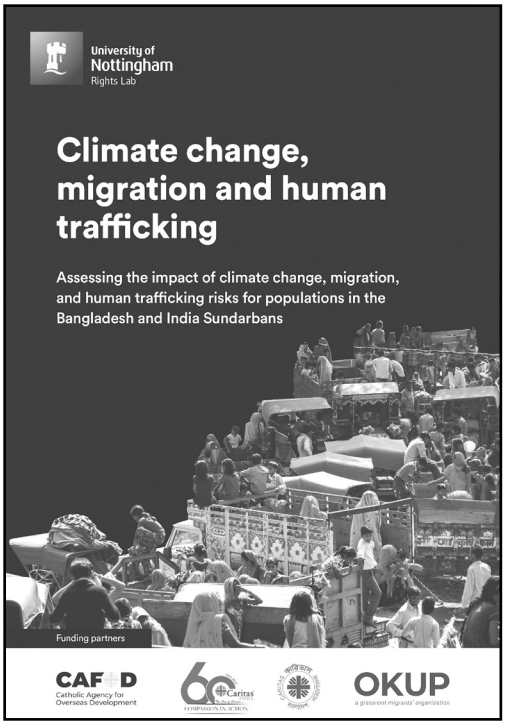

ক্যাফোডের অর্থায়নে যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব নটিং-হ্যাম এর নেতৃত্বে কারিতাস বাংলাদেশ পরিচালিত গবেষণা প্রতিবেদন।

বিশ্বের বৃহত্তর ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের মনোহরণকারী সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু এর সৌন্দর্য নিয়ে লুকিয়ে থাকা সমস্যাগুলো বেশিরভাগক্ষেত্রেই আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলায় সুন্দরবনের কোল ঘেঁষা এই জনপদের মানুষেরা অর্থনৈতিক সংকট, কর্মসংস্থানের অভাব, মিঠা পানির তীব্র সংকট ও প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলা করে জীবনধারণ করে। জলবায়ু পরিবর্তন এই সংকটকে আরো ঘনীভূত করে তুলেছে। ফলে জীবন ও জীবিকার তাগিদে মানুষকে তাদের এলাকা ছেড়ে দূর-দূরান্তে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকাণ্ডে (ইট ভাটার শ্রমিক, শুঁটকি মাছ প্রস্তুতকারক, ইত্যাদি) জড়িত হতে হচ্ছে। মানব পাচার ও ঋণের দাসত্বের সহজ শিকার এই মানুষগুলোর জন্য সিআইএমএমএস নামক প্রকল্পটির মাধ্যমে কারিতাস সচেতনতা বৃদ্ধির বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। তার মধ্যে রয়েছে দিবস উদ্‌যাপন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি। এছাড়া শিক্ষা-দক্ষতায় যোজন যোজন পিছিয়ে থাকা এই মানুষগুলো কারিতাসের উদ্যোগে বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পেরেছে। এছাড়া বিকল্প জীবিকায়নের জন্য পেয়েছে আর্থিক সহায়তা। দুস্থ ও অসহায় এই জনগোষ্ঠীকে সরকারী সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে প্রকল্পের সহায়তায়। আর ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে পুনর্গঠিত মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটিগুলো (সিটিসি) মানবপাচার প্রতিরোধে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করছে।

কারিতাস বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল মূলত ১৯৭০ এর প্রলংকারী ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তা দানের মধ্যদিয়ে। দুর্যোগের মধ্যদিয়ে জন্ম হলেও পরবর্তীতে কারিতাস সামাজিক উন্নয়নে এর কর্মক্ষেত্র বিস্তার করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কার্যক্রম পরিচালনা করে সকলকে নিঃস্বার্থভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও এই সংস্থা মানুষের যা প্রয়োজন সেই সেবা নিয়ে তাদের দুয়ারে হাজির হবে। **মহান খ্রিস্টের জন্মোৎসব উপলক্ষে কারিতাস বাংলাদেশ সকলকে জানাচ্ছে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা!**

ধন্য বাসিল মরো'র স্বর্গলাভের সার্ধশত বর্ষপূর্তি

২০ জানুয়ারি, ২০২৩–৭ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষটি পবিত্র ক্রুশ সংঘের জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ এবং আধ্যাত্মিকভাবে তীর্থযাত্রার একটি বর্ষ। এই বর্ষটি পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ধন্য বাসিল মরো'র স্বর্গলাভের সার্ধশত বর্ষপূর্তি। এ বর্ষের শুভারম্ভ হয়েছে ২০ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ধন্য মরো'র স্বর্গলাভের দিনে আর সমাপ্তি হবে ৭ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে 'যিশুর পবিত্র হৃদয়' পর্বোৎসবে। ধন্য বাসিল মরো ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন আর ২০ জানুয়ারি, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে স্বর্গধামে চলে যান। আর তাঁরই স্মরণে ১৫০ বছর বা সার্ধশত বর্ষপূর্তি পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে পবিত্র ক্রুশ সংঘ। ধন্য বাসিল মরো ছিলেন ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তি যিনি একজন আদর্শ নেতা, শিক্ষক, উদ্যোগী, উদ্যমী, সংগঠক, প্রেরণকর্মে সাহসী, ত্যাগী ও ক্রুশভক্ত হিসেবে সবার কাছে পরিচিত।

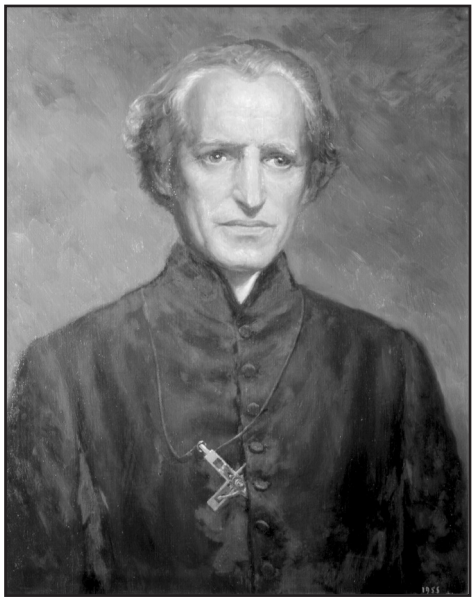

এই বর্ষ পালনের উদ্দেশ্য

১। ধন্য বাসিল মরো'র সন্তান হিসেবে তাঁকে আরো গভীরভাবে জানা, ভালোবাসা, তাঁর জীবনাদর্শ নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করা এবং সবার কাছে তাঁর জীবনাদর্শ তুলে ধরা।

২। ধন্য বাসিল মরো'র মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলী নিজেদের অনুশীলন।

৩। পবিত্র ক্রুশ সংঘের সেবাকাজ যেন বিস্তার লাভ করে।

৪। যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবনে আহ্বান বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা ও কাজ করা।

৫। ধন্য মরো যেন খুব শীঘ্রই সাধু শ্রেণিভুক্ত হতে পারেন সে জন্য প্রার্থনা করা এবং তাঁকে লোকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

বর্ষপালনে নানা কার্যক্রম

১। বিগত ২১ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিকভাবে সারাবিশ্বের পবিত্র ক্রুশ সম্প্রদায়ের সকল সদস্য-সদস্যাগণ ৪০ ঘন্টা ব্যাপী পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা করেছেন এবং অনলাইনে যুক্ত হয়ে প্রার্থনা করেছেন।

২। বাংলাদেশে পবিত্র ক্রুশ সংঘের আয়োজনে ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে তেজগাঁও গির্জায় খ্রিস্টভক্তদের উপস্থিতিতে ধন্য মরো'র স্বর্গলাভের সার্ধশত বর্ষপূর্তি শুভারম্ভ হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে হলিক্রস কলেজের অধ্যক্ষ সিস্টার শিখা গমেজ, নারিন্দা পবিত্র ক্রুশ প্রার্থীগৃহের পরিচালক ব্রাদার রিপন গমেজ এবং নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি ফাদার চার্লী গর্ডন ধন্য মরো'র স্বপ্ন-দর্শন, আধ্যাত্মিকতা, নেতৃত্বের গুণাবলী নিয়ে সহভাগিতা করেছেন। এ অনুষ্ঠানে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেছেন চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি। এছাড়াও পবিত্র ক্রুশ সংঘের তিন শাখার (ফাদার-ব্রাদার-সিস্টার) প্রধানগণ বক্তব্য রেখেছেন।

৩। এই বর্ষ উপলক্ষে একটি প্রার্থনা কার্ড ছাপা হয়েছে এবং সকল গৃহে বিরতন করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত প্রার্থনা প্রত্যেক গৃহেই করা হচ্ছে।

৪। পবিত্র ক্রুশ সংঘের নির্ধারিত পর্ব; সাধু যোসেফের পর্ব, সপ্তশোকের রাণী মা মারীয়ার পর্ব ও যিশু হৃদয়ের পর্ব ও সাধু আন্দ্রে ব্যাসেটের পর্বসমূহ পালনের সময় ধন্য মরো'র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৫। এই বর্ষ পালন উপলক্ষে পোষ্টার ও স্মরণীকা প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৬। বর্ষ উদ্বোধনের সময় ডকুমেন্টারী ফিল্ম নির্মাণ করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে।

এই বর্ষে প্রার্থনার উদ্দেশ্য

১। পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ধন্য মরো যেন খুব শীঘ্রই সাধু শ্রেণিভুক্ত হতে পারেন এবং তাঁর মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের গৌরব প্রশংসা যেন প্রকাশিত হয়।

২। যাজকীয় জীবন ও সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদার জীবনে যেন আহ্বান বৃদ্ধি পায়। যুবক-যুবতী যেন যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবনে সাড়া দিতে পারে।

৩। ধন্য মরো'র আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা যেন নতুন দেশে নতুন মিশন শুরু করতে পারি।

৪। আমরা যেন আশার মানুষ হতে পারি এবং আমরা যেন সেই আশা মানুষের কাছে বহন করে নিয়ে যেতে পারি।

ফাদার গৌরব জি. পাথাং, সিএসসি
সমন্বয়কারী ধন্য মরো'র সার্ধশত বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন কমিটি॥

ধন্য বাসিল মরো'র স্বর্গলাভের সার্ধশত বর্ষপূর্তি

সংঘ প্রদেশপালের বাণী

"স্বর্গের দরজা খুবই নিচু, আর সেখানে নম্রারাই শুধু প্রবেশ করতে পারে" (সাধ্বী এলিজাবেথ এন, স্টেন)

অনাবিল আনন্দভরা অন্তরে আমরা উদ্‌যাপন করছি আমাদের সংঘপিতা ধন্য ফাদার বাসিল আন্তনী মেরী মরো'র স্বর্গগমনের স্বার্ধশত বছরের জয়ন্তী উৎসব, যিনি মণ্ডলীর নক্ষত্ররাজির মধ্যে অন্যতম একজন, যারা যুগের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়ে মাণ্ডলীক ইতিহাসের গতিধারায় পরিবর্তন আনয়ন করেছেন। নিজ সাধিত কীর্তি বা যোগ্যতাগুণে নয় বরং পবিত্র ক্রুশ সংঘকে ঈশ্বরের পরিকল্পিত কাজ বলে বিবেচনা করে তা ঐক্যবদ্ধ রাখতে গিয়ে যে কষ্টভোগ তিনি করেছেন তা ভাষায় বর্ণনাতীত। পবিত্র ক্রুশের উপর তাঁর এই গভীর বিশ্বাস ও প্রত্যাশাই তাঁকে শত যন্ত্রণার মধ্যেও ঈশ্বরের পরিকল্পনার কছে প্রেমপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে সহায়তা করেছে, যার ফলশ্রুতিতে তাঁরই স্বপ্নাদর্শ বাস্তবায়নে বটবৃক্ষের ন্যায় আজ শোভিত হয়েছে মণ্ডলীতে বিশ্বাসের শিক্ষকদের নবজাগরণের এই অদম্য যাত্রা। ক্রুশীয় আধ্যাত্মিকতায় গ্রথিত পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রেরণকার্যের প্রতি তাঁর নিরঙ্কুশ দায়িত্ববোধ ও ত্যাগস্বীকারকে ঈশ্বর স্বর্গীয় আভায় বিভূষিত করেছেন যেন আমরা বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর এই স্বপ্নাদর্শ বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাই সেই শাশ্বত জীবনলাভের প্রত্যাশায়।

পুণ্যবান মানুষের মৃত্যুতে তাদের আদর্শ নিঃশেষিত হয় না বরং তা বয়ে আনে নবচেতনা ও ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় সিক্ত করে বিশ্বাসীভক্তের হৃদয়। মঙ্গলসমাচারে খ্রিস্ট বলেন, "মানুষের সামনে তোমাদের আলো তেমনি উজ্জ্বল হয়ে জ্বলুক, যাতে তোমাদের সৎকর্ম দেখে সকলে তোমাদের স্বর্গনিবাসী পিতার বন্দনায় মুখর হয়ে উঠে" *(মথি ৫ : ১৬)*। তাই মণ্ডলীর সংকটলগ্নে তিনি যেমন প্রজ্জ্বলিত তারকার ন্যায় বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ সকলকে আলোকিত করেছেন ঠিক তেমনি পবিত্র ক্রুশ সংঘের মধ্যস্থতায় আমাদের এই উৎসর্গীকৃত জীবন মানবপরিবারের জন্য দানস্বরূপ ও মিলনসমাজের প্রতিরূপ, যা নিজেকে রিক্ত করা ভালোবাসার আহ্বানে সংঘপিতার ভাবাদর্শে জীবন যাপিত করতে আমাদের সর্বদা উৎসাহিত করে।

আজ সমগ্র পবিত্র ক্রুশ সংঘ ও মাতামণ্ডলী এক বিশ্বস্ত ও বিনীত সেবকের জন্য প্রভু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে যিনি ঐশপ্রেরণায় এই সংঘ স্থাপন, বিশ্বস্তভাবে সাক্রামেন্তীয় সেবা ও শিক্ষাদান এবং নম্রভাবে সংঘের দায়িত্ব পালন করেছেন, এমনকি সংঘের প্রয়োজনে সর্বোচ্চ প্রশাসকের দায়িত্ব ছেড়ে দিতেও দ্বিধা করেন নি। তাঁর নম্রতা এবং ঐশ তত্ত্বাবধানের প্রতি দৃঢ় আস্থা তাঁকে করে তুলেছে অনন্য, আমাদের সামনে এক অনুকরণীয় আদর্শ যেন আমরা পার্থিব সম্মান ও প্রভাবপ্রতিপত্তির মায়াজালে নিজেকে আবদ্ধ না করি বরং খ্রিস্টের ক্রুশীয় ত্যাগের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে পৃথিবীকে স্বর্গীয় আবাসে রূপান্তরিত করতে ব্রতী হই।

পবিত্র ক্রুশ যাজক সমাজের পক্ষে আমি জুবিলীর এই মহতীলগ্নে সংঘের সকল সদস্য ও সদস্যাকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সংঘপিতার আদর্শ আমাদের সম্মুখে খ্রিস্টীয় প্রেরণকর্মের আলোকবর্তিকা হিসেবে পথপ্রদর্শন করবে, এবং সর্বাবস্থায় ঐশ তত্ত্বাবধানে বিশ্বাস রাখতে সহায়ক হবে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করি।

খ্রিস্টেতে,
ফাদার জর্জ কমল রোজারিও সিএসসি
সংঘ প্রদেশপাল,
যিশু হৃদয় সংঘ প্রদেশ,
রামপুরা, ঢাকা, বাংলাদেশ।

ধন্য বাসিল মরো'র স্বর্গলাভের সার্ধশত বর্ষপূর্তি
সংঘ প্রদেশপালের বাণী

আনন্দিত মনে আমরা স্মরণ ও উদ্‌যাপন করছি পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ধন্য বাসিল আন্তনী মেরী মরোর স্বর্গ লাভের সার্ধশত বছরের জয়ন্তী উৎসব, যার হাত ধরে খ্রিস্ট মণ্ডলী লাভ করেছিল বাণী প্রচারের এক নতুন মাধ্যম ও আশা। যিনি নিজে হয়ে উঠলেন বিশ্বাস ও ভালোবাসার এক দীপ্ত সাক্ষ্য। নিজের অন্তরে লাভ করলেন এক ঐশ অনুপ্রেরণা ও উদ্দ্যেম, যা দ্বারা তিনি গড়ে তুললেন এক মহাপরিবার, পরিবারের ভিত্তি হিসেবে বেছে নিলেন নাজারেথের পবিত্র পরিবার যা হয়ে ওঠল সকলের কাছে সেবা ও ভালোবাসার একমূর্ত আদর্শ। বাসিল মরো সর্বদা মনে করতেন এ পরিবার যেন স্বয়ং ঈশ্বরের আপন হাতের কাজ, যা ঈশ্বর নিজেই যত্ন নিবেন ও বৃদ্ধি সাধন ঘটাবেন। তিনি ছিলেন ঐশ বিশ্বাসে বিশ্বাসী এক ব্যক্তি। তিনি ছিলেন একজন কৃচ্ছ্রতাসাধনকারী ও আত্মত্যাগী ব্যাক্তি এবং নিজে সর্বদা ত্যাগস্বীকারের মাধ্যমে অন্যের মঙ্গল সাধন করতেন। মানব মঙ্গল সাধনের জন্য তিনি সহ্য করলেন শত অপমান ও তিরস্কার, যা তার মনোবলকে বাড়িয়ে দিল শতগুন । তাঁর জীবন ও কর্ম আদর্শ আমাদের অনুপ্রাণিত করে তাঁর ন্যায় মানব কল্যাণে কাজ করার মাধ্যমে ঈশ্বর প্রদত্ত মহান কর্মদায়িত্ব সম্পাদন করতে ।

"কেউ যদি আমার শিষ্য হতে চায়, তবে সে আত্মত্যাগ করুক এবং নিজের ক্রুশ কাঁধে তুলে নিয়ে আমাকে অনুসরণ করুক।" *(মথি ১৬:২৫)* প্রভু যিশু খ্রিস্টের এই বাণীটি ধন্য ফাদার মরো তাঁর নিজ জীবনে গভীর ভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন । যার বহিঃপ্রকাশ ফুটে উঠে তাঁর জীবনাচরণে। প্রভু যিশু খ্রিস্টের শিক্ষা, প্রচার এমনকি জীবনাচরণের সঙ্গে সাদৃশ্য ও লক্ষ্যণীয় ধন্য ফাদার মরোর জীবন। জীবনের সকল ধরনের ক্রুশকে তিনি গ্রহন করেছেন এবং যথাযথ ভাবে তা বহনও করেছেন । পবিত্র ক্রুশের সেই মহিমা তাঁর জীবনে প্রস্ফুটিত হয়েছে যা তাঁকে দান করেছে এক মহান ব্যক্তি হওয়ার সম্মান।

ধন্য মরো পবিত্র ক্রুশ সংঘের মধ্যদিয়ে মানব কল্যাণে মহৎ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। যার ফলশ্রুতিতে পবিত্র ক্রুশ সংঘের সদস্য - সদস্যারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সেবা দান করে যাচ্ছেন যার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম, কারণ বাংলাদেশ খ্রিস্ট মণ্ডলীর ভিত্তি স্থাপন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখে যাচ্ছে পবিত্র ক্রুশ সংঘ। ধন্য ফাদার মরোর ঐকান্তিক ইচ্ছা ও ত্যাগের ফলেই পবিত্র ক্রুশ সংঘের আগমন ঘটে এই বাংলায়। ধন্য মরো সকল চ্যলেঞ্জকে মোকাবেলা করে বাংলাদেশে প্রৈরিতিক কাজ পরিচালনা করেছেন। আমরা তাঁর স্বর্গ যাত্রার সার্ধশত বছর উদ্‌যাপন করছি যা পবিত্র ক্রুশ সংঘ ও খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্য এক মহা আশীর্বাদের দিন। খ্রিস্টের প্রকৃত শিষ্য হওয়ার অবিরাম যাত্রায় ধন্য মরোর জীবনাচরণ আমাদের সকলের জন্যই প্রেরণার বাণী।

পবিত্র ক্রুশ ব্রাদার সমাজের পক্ষে আমি জুবিলীর এই আনন্দঘন সময়ে সংঘের সকল সদস্য-সদস্যাদের জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ধন্য ফাদার মরোর কর্ম ও আধ্যাত্মিকতা হয়ে ওঠুক আমাদের জীবনের ভিত্তি ও অনুপ্রেরণার উৎস। আজকের দিনে ধন্য বাসিল আন্তনী মেরী মরো আমাদের প্রচুর আশীর্বাদ দান করুন ।

খ্রিস্টেতে,

ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও সিএসসি

সংঘ প্রদেশপাল,

সাধু যোসেফ সংঘ প্রদেশ,

মোহম্মদপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

ধন্য বাসিল মরো'র স্বর্গলাভের সার্ধশত বর্ষপূর্তি

এলাকা সমন্বয়কারীর বাণী

পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা, পুণ্য পুরুষ, ধন্য ফাদার বাসিল আন্তনী মেরী মরো'র **স্বর্গলাভের সার্ধশত বর্ষপূর্তি** (১৮৭৩-২০২৩) অর্থাৎ ১৫০ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রত্যেক জনের জীবন আহ্বানের জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করি এবং ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্য ফাদার মরো --- ঈশ্বরের মনোনীত এবং অনুগ্রহ লাভকারী একজন ব্যক্তি, যাজক, পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা, শিক্ষক, সমাজ সংগঠক, ক্যারেজম্যাটিক লিডার, সংঘের জন্য চরম ত্যাগ এবং যিনি, ***Ave Crux, spes unica*, "Hail the Cross, our only hope"** নিয়েছিলেন সংঘের ক্যারিজম হিসাবে। সংঘের ভ্রাতা-ভগিনীদের সেই ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

গ্যারি ম্যাকোইন ধন্য ফাদার মরো সম্পর্কে লিখেছেন, "বাসিল আন্তনী মেরী মরো ছিলেন এমন বিরল ব্যক্তিদের মধ্যে একজন, যারা ইতিহাসের গতিধারায় পরিবর্তন সাধন করেন্"। নিজে সম্পর্কে ধন্য ফাদার মরো বলেন, **"I have been but a simple tool that the Lord will soon break that others more worthy may be substituted."**

এ অংশের মধ্যদিয়ে আমরা উপলব্ধি করি যে ফাদার মরোর সত্যিকারের স্বপ্ন কী ছিল? পবিত্র ক্রুশ সংঘ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তার গভীর স্বপ্নের বাস্তবে রূপদান। সংঘের সন্তানদের জন্য অপরিসীম ভালোবাসা, মঙ্গলসমাচারের সুমন্ত্রণায় তাদের জীবন গঠনদান, ভবিষ্যতের যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব তৈরি। ফাদার মরো'র ছিল গভীর আধ্যাত্মিকতা, ধ্যান-সাধনা, ঝুঁকি নেবার এক অদম্য সাহস, দৃঢ় মনোবল এবং নম্র অন্তর। তিনি ছিলেন বিনম্র গুরু, প্রার্থনাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, ঈশ্বরভক্ত মানুষ, ঈশ্বরের ইচ্ছাপালনে নিবেদিত মানুষ, ঐশপ্রেমে ভরপুর মানুষ। ফাদার মরো পবিত্র ক্রুশ সংঘের শুধু একজন যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী হননি, তিনি জীবনভর তার সকল শক্তি নিয়োগ করেছেন একটিমাত্র উদ্দেশ্যে- আর তা হলো ঐশরাজ্য বিস্তারের জন্য আত্মনিবেদন করা। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ তার কর্মযজ্ঞে স্থান পেত এবং সমাদৃত ছিল।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ঐশরাজ্য বিস্তারের জন্য তিনি সংঘের শুরুর বছরগুলোতে বেঙ্গলে প্রেরণকর্মী পাঠিয়েছিলেন, এ উপমহাদেশে মিশন খুলেছেন। ধন্য ফাদার মরো বহু বছর আগেই *"তার তাবু প্রসারিত করেছিলেন"* যেন বহু মানুষ পবিত্র ক্রুশের ভ্রাতা ও ভগিনীদের মধ্যদিয়ে ঐশরাজ্যের আস্বাদন লাভ করে, ঐশকৃপা লাভ করতে পারে। সেইসব নিবেদিতপ্রাণ মিশনারীদের কঠোর সাধনা, ত্যাগ, বাণীপ্রচার এবং কর্মবিস্তারের জন্যই আজ আমাদের অস্তিত্ব এবং আমরা যা কিছু পেয়েছি উত্তরাধিকার সূত্রে।

আমরা সংঘের ভাই-বোনেরা ইতিহাসে পড়েছি ধন্য ফাদার মরোর জীবন ছিল কত চ্যালেঞ্জপূর্ণ, হতাশাগ্রস্ত, বেদনায় জর্জরিত এবং সংঘের অনেক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করেছেন। **But he never gave up.** সংঘকে সন্তানসুলভ ভালোবাসা দিয়ে আগলে রেখেছিলেন এই জন্য, যেন পবিত্র ক্রুশ সংঘ তার শাখা-প্রশাখা প্রসারিত করে সত্যি সত্যি "মাইটি ট্রি" হয়ে উঠতে পারে।

পবিত্র ক্রুশ ভাই-বোনেরা ২০ জানুয়ারি ২০২৩, ধন্য ফাদার বাসিল মরো'র **স্বর্গলাভের সার্ধশত বর্ষপূর্তি** থেকে আগামী ৭ জুন ২০২৪ পর্যন্ত সময়কালে প্রতিষ্ঠাতার জীবনী নিয়ে ধ্যান, সাধনা, বিভিন্ন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত করবেন। প্রতিটি পরিবারে, গ্রামে, মিশনে যেন ধন্য ফাদার মরোকে নিয়ে যাওয়া যায়। অনেক মানুষ যেন তার সম্পর্কে জানতে পারে, তার কাছে বিশেষ কৃপা যাচনা করে উপকৃত হয়। ধন্যশ্রেণী ভুক্ত থেকে তিনি যেন শীঘ্রই সাধু শ্রেণীভুক্ত হতে পারেন। ধন্য বাসিল মরো, আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর।

সিস্টার ভায়োলেট রড্রিকস্ সিএসসি
এলাকা সমন্বয়কারী, এরিয়া অব এশিয়া
হলি ক্রস সিস্টারস্।

ধন্য ফাদার মরোর আধ্যাত্মিকতা

ব্রাদার ষ্টিফেন বিনয় গমেজ সিএসসি

ভূমিকা

যিশু খ্রিস্টের জীবনের এক বা একাধিক বিষয়, বৈশিষ্ট্য বা শিক্ষার উপর জোরারোপ (Emphasis) করাকেই আধ্যাত্মিকতা বলা হয়। মানুষের অন্তর এক এক রকম এবং এক এক জন ভক্ত যিশু খ্রিস্টের জীবনের বা শিক্ষার এক এক বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকেন। পবিত্র আত্মাই ভক্তজনগণকে তাদের নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব, অভিজ্ঞতা ও প্রকৃতি অনুযায়ী খ্রিস্টের এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যের বা শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ জাগিয়ে দেন এবং এই ভাবে ভক্তগণ খ্রিস্টকে অনুসরণ করে থাকেন।

আধ্যাত্মিকতা শুধু তাত্ত্বিক বিষয় নয়, তা বাস্তবও বটে। আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ করার জন্য মাধ্যম প্রয়োজন। যেমন আরাধ্য সংস্কারের আরাধনা, ধ্যান, রোজারীমালা প্রার্থনা, যিশুমন্ত্র, ক্রুশের পথ ইত্যাদির মাধ্যমে ভক্তজনগণ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করে থাকেন। বিভিন্ন সাধু-সাধ্বীগণ তাদের আধ্যাত্মিকতায় যিশু খ্রিস্টের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যেমন সাধু পল আকৃষ্ট হয়েছিলেন পুনরুত্থিত খ্রিস্টের প্রতি। আসিসির সাধু ফ্রান্সিস খ্রিস্টের দরিদ্রতা এবং কিভাবে তিনি খ্রিস্টের মত দরিদ্র হবেন সে বিষয়ে জোর দিয়েছেন। লয়োলার সাধু ইগ্নাসিয়াস তাঁর আধ্যাত্মিকতায় নেতা বা পরিচালক খ্রিস্টের প্রতি আমরা পরিপূর্ণ আনুগত্য ও বিশ্বস্ত থাকবো সে বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সাধ্বী মার্গারেট মেরির অন্তরে দাগ কেটেছে খ্রিস্ট সবাইকে কত ভালোবেসেছেন কিন্তু প্রতিদানে মানুষ তাকে ভালোবাসেনি। ধন্য ফাদার বাসিল আন্তনি মেরি মরো তাঁর আধ্যাত্মিকতায় যে সকল বিষয় সমূহের উপর জোর দিয়েছেন তা আলোকপাত করতে প্রয়াসী।

প্রথম অংশ

ঐক্যবন্ধন (Unity)

ফাদার মরোর নিকট খ্রিস্টীয় জীবন যাপন এবং তার প্রতিষ্ঠিত পবিত্র ক্রুশ মিলন-সমাজের তিনটা শাখার মধ্যে ঐক্য স্থাপনের অর্থ একই ছিল। তার মতে এই ঐক্য-বন্ধন হলো খ্রিস্টের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার মাধ্যমে পবিত্র ত্রিত্বের সঙ্গে একাত্ম হওয়া।

পবিত্র ক্রুশ পরিবার

প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক পরিবার (The Natural Family)

বর্তমানে যৌথ পরিবার বড় একটা চোখে পড়ে না। যৌথ পরিবারকে আধুনিক সমাজের চোখে সেকেলে বলে মনে হয়। যৌথ পরিবার পিতা-মাতা, ভাই-বোন, ঠাকুরমা-ঠাকুরদাদা, কাকা-কাকীমা, কাকাত ভাই-বোন এবং আরো অন্যান্য আত্মীয় পরিজনদের নিয়ে গঠিত হয়। যত সেকেলেই ভাবা হোক না কেন, যৌথ পরিবারই মৌলিক সমাজ যা রক্তের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। আমরা জানি যে ঐশ কৃপা সর্বদা স্বাভাবিক বিষয়ের উপর দৃঢ়ভাবে নির্ভরশীল। স্বাভাবিক পরিবারের সদস্য সদস্যাদের মধ্যেই শক্তিশালী ঐক্যবন্ধন বিদ্যমান। ফাদার মরোর পরিবার ছিল বৃহৎ পরিবার। তাঁরা ছিলেন ১৮ জন ভাইবোন। তাঁদের মধ্যে ফাদার মরোর স্থান নবম। ফাদার মরো হয়তোবা ফরাসী দেশের গ্রামের তৎকালীন বড় বড় পরিবার বিশেষ ভাবে তার নিজের পরিবার হতেই এই ঐক্যবন্ধনের ধারণাটি পেয়েছিলেন।

তিনি বলেন: সুতরাং এই ধারণাটার দ্বারা অনুপ্রাণিত হও যা আমাদের অনুধাবন করতে সাহায্য করে যে পবিত্র ক্রুশের সালভাটরিষ্ট, যোসেফাইষ্ট ও মারিয়ানাইষ্টগণ একই পরিবারের সভ্য-সভ্যা হয়ে, একই সাধারণ অনুভূতি ও আগ্রহের মনোভাব নিয়ে; একই কর্তৃপক্ষের অধীনে একত্র হয়েছেন- জাগতিক বিষয়াদির ব্যাপার না হলেও অন্তত আধ্যাত্মিক বিষয়ে *(সার্বজনীন পত্র ১১, প্রষ্ঠা ৩৮-৩৯)*।

ফাদার মরো তাঁর প্রতিষ্ঠিত পবিত্র ক্রুশ পরিবারে ঐক্যবন্ধন বাস্তবায়িত হওয়ার উদ্দেশে প্রার্থনা করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, তাহলে প্রার্থনা কর যেন ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিশেষভাবে ঈশ্বরের পবিত্র ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়। এটাই আমার প্রার্থনার মুখ্য উদ্দেশ্য, যদিও আমি আমার প্রিয় পবিত্র ক্রুশ পরিবার যার আধ্যাত্মিক পিতা আমি হয়েছি, তাকে কখনো ভুলিনি। পৃথিবীতে এমন কিছু কী আছে, যা আমি পবিত্র ক্রুশ পরিবার অপেক্ষা অধিক ভালোবাসি? আমার দিবা-রাত্রীর সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যাকুলতা, উৎকণ্ঠা সবই তো পবিত্র ক্রুশ পরিবারকে ঘিরে *(সার্বজনীন পত্র ১১, পৃষ্ঠা ৮৬)*

ফাদার মরো তাঁর লেখার মধ্যে বার বার "পবিত্র ক্রুশ পরিবার" কথাটি উল্লেখ করেছেন। যেমন- ২ নম্বর সার্বজনীন পত্রের ১৬৮, ১৭২, ২০১ ও ৩৬০ পৃষ্ঠায়।

পবিত্র পরিবার (The Holy Family)

ফাদার মরোর অনুগ্রহ দান ছিল এমন তিনটা সমাজ (Society) প্রতিষ্ঠা করা যার সভ্য-সভ্যাগণ একই পরিবারে মিলন বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে-গড়ে তুলবে একটা মিলন-সমাজ। এমন কোন পরিবার কি আছে যার মধ্যে বিদ্যমান ঐক্যবন্ধন রয়েছে? ফাদার মরো, যিশু, মারীয়া ও যোসেফ'র মধ্যে বিদ্যমান জাগতিক ঐক্যবন্ধন উপলব্ধি করে সেই একই বন্ধন তার প্রতিষ্ঠিত পবিত্র ক্রুশ পরিবারের জন্য প্রত্যাশা করেছিলেন। আর এই ঐক্য বন্ধনের অর্থ হলো "এক মন, এক প্রাণ"-ভাব। পবিত্র ক্রুশ পরিবারের সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক নেই, তাই তারা আক্ষরিক অর্থে পরিবার গঠন করতে পারেন না, তা ফাদার মরো জানতেন। তিনি সদস্যাদের সম্পর্কের মৌলিক ভিত্তি রক্তের বন্ধন নয়; বরং ঈশ্বরের জীবন যা তাদের সবার মধ্যে ছিল। সদস্য-সদস্যাদের এক মন, এক প্রাণ ভাবই পবিত্র ক্রুশ পরিবার এমনই এক পরিবার হবে, যার জল রূপ ঐশরিক জীবন হবে রক্তের চেয়েও ঘন।

ফাদার মরো সংঘ প্রতিষ্ঠাকালীন দু'টো সর্বজনীন পত্রে পবিত্র ক্রুশ সন্ন্যাস সংঘ সম্বন্ধে তার পরিকল্পনা ব্যক্ত করেছেন। এই পরিকল্পনা ছিল তিনটি গৃহ (House) নির্মাণ করা যা উৎসর্গীকৃত থাকবে যথাক্রমে যিশু, মারীয়া ও যোসেফের পবিত্র হৃদয়ের নিকট। এ তিনটি সমাজ যদিও পৃথক পৃথক অনুশাসনের অধীনে বসবাস করবে, তারা থাকবে পবিত্র পরিবারের আদর্শে ঐক্যবদ্ধ। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, খ্রিস্টতে আমার প্রিয় পুত্রগণ, নম্রতা, বাধ্যতা ও সেবা অনুশীলনের মাধ্যমে আমাদের শুধু সাধু হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। *(সার্বজনীন পত্র ১, পৃষ্ঠা ১৯)*

পবিত্র পরিবারের ঐক্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি আরও বলেন: পবিত্র পরিবারে যিশু, মারীয়া ও যোসেফের মধ্যে পদ মর্যাদার ভিন্নতা থাকা সত্বেও তাদের চিন্তা-চেতনার ঐক্য এবং আচরণের সাদৃশ্য ছিল। আমাদের মিলন-সমাজ হল পবিত্র পরিবারের একটা বাস্তব অনুকরণ। *(সার্বজনীন পত্র ১, পৃষ্ঠা ৮৩)*

পবিত্র ত্রিত্ব (The Trinity)

যাতে তারা এক হয়

ফাদার মরো পবিত্র ক্রুশ পরিবারের সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে যে ঐক্য স্থাপনের জন্য জোরারোপ করেছেন তা পবিত্র পরিবারে বিদ্যমান ঐক্য অনুকরণ অপেক্ষাও গভীরতর। পবিত্র পরিবারেই যে সর্বাপেক্ষা গভীর ঐক্য বন্ধন রয়েছে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার মধ্যে। আর এই ঐক্য বন্ধনই তিনি পবিত্র ক্রুশ পরিবারে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন। এর মধ্যদিয়ে তিনি শুধু খ্রিস্ট ধর্মের মূল তত্ত্বেই প্রবেশ করেন নি, বরং একই সময়ে এই রহস্যের চরম শিখরে পৌছেন। পবিত্র ত্রিত্ব হলো খ্রিস্ট ধর্মের মৌলিক বিষয় এবং পবিত্র ত্রিত্বের মধ্যে বিদ্যমান ঐক্য হল পবিত্র ত্রিত্বের তিন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান একাত্মতা (Onenss) যার দ্বারা ত্রিত্বের তিন ব্যক্তি এক ও অভিন্ন। আমাদেরকে তিনি ত্রিত্ব হতে বলেন। হওয়ার মাধ্যমে মানুষকে রহস্যটা বুঝাতে বলেন।

ফাদার মরো ত্রৈত্বিক ঐক্য (Trinitarian Unity) শুধু অনুকরণের জন্যই প্রস্তাব রাখেন না, বরং প্রস্তাব রাখেন প্রকৃত পক্ষেই ত্রিত্বে ঐক্যবদ্ধ হতে। খ্রিস্ট ভক্তগণ ত্রৈত্বিক ঐক্য অনুকরণ করবে না, বরং তারা হয়ে উঠবে ত্রৈত্বিক ঐক্যবন্ধন। ফাদার মরো আমাদের রুপক সত্যের দিকে নিয়ে জান- যা হল খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত একজন ব্যক্তির পবিত্র ত্রিত্বে অবস্থান। (In Christ) কারণ তিনি খ্রিস্টে অবস্থান করেন। ফাদার মরো REGLES এর ৩৩ পৃষ্ঠায় লিখেন: এই রূপ ঐক্যের মনোভাব যা মণ্ডলীতে বিদ্যমান স্বর্গীয় গুরু (খ্রিস্ট) আমাদের সংঘের মধ্যেও দেখতে চান। কারণ তিনি এ নির্দেশগুলোর মাধ্যমেই তার পিতার কাছে এই বলে প্রার্থনা করেন "তারাও যেন তেমন আমাদেরই মধ্যে থাকে, তেমন এক হয়েই থাকে, যাতে জগত এই কথা বিশ্বাস করতে পারে যে সত্যিই তুমি আমাকে প্রেরণ করেছ।" (REGLES, P,.33)

খ্রিস্টেতে একাত্ম হওয়া এবং খ্রিস্টের মধ্যদিয়ে পবিত্র ত্রিত্বের মিলন পবিত্র ক্রুশ পরিবারের জন্য শুধু উপযোগীই নয়; বরং মৌলিক খ্রিস্টীয় তত্ত্ব যা খ্রিস্টীয় মৌলিক বিষয়। ফাদার মরোর আধ্যাত্মিকতা হল মূলত খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতা।

অতিন্দ্রীয় দেহ (The Mystical Body) "আমরা এক রুটি আমরা এক শরীর" সাধু যোহনের মঙ্গলসমাচারের ১৭ অধ্যায়ের ১১, ২১, ২২- ২৩ পদে খ্রিস্ট প্রভু তার শিষ্যদের মধ্যে ত্রৈত্বিক ঐক্য বন্ধনের (Trinitarian Unity) কথা বলেছেন। এ অধ্যায়ের শেষের দিকে তিনি প্রার্থনা করেছেন এই ঐক্য স্থাপন কি ভাবে খ্রিস্টভক্তদের মধ্যেও সম্ভব হতে পারে। খ্রিস্টভক্তগণ আসলে খ্রিস্টের মধ্য দিয়েই ত্রিত্বের জীবনে প্রবেশ করেন। লেখা আছে যে, "যাতে তারা এক হয়, যেমন আমরা দু'জনেই এক-তাদের মধ্যে আমি আর আমার মধ্যে তুমি- যাতে তারা সম্পূর্ণই এক হয়।" খ্রিস্টভক্তগণের পবিত্র ত্রিত্বের মধ্যে বিদ্যমান ঐক্য আছে (Have) শুধু তাই নয় বরং তারা ঐক্যের মধ্যে (In) স্থিত। তাই তাদেরকে একজন ঐশ ব্যক্তিতে অর্থাৎ খ্রিস্টতে থাকতে হবে যিনি স্বয়ং ত্রিত্বে বিদ্যমান।

অতিন্দ্রীয় দেহের অংশ হিসাবে একজন খ্রিস্টভক্ত খ্রিস্টতে বিদ্যমান। তিনি খ্রিস্টেতে দীক্ষিত হওয়ার মাধ্যমে খ্রিস্টেতে প্রবেশ করেন। সুতরাং খ্রিস্টও তার মধ্যে বিদ্যমান। যিশু বলেন, "তাদের মধ্যে আমি।" খ্রিস্ট প্রভুও তার পিতার সঙ্গে এক "আমার মধ্যে তুমি।" এই বিষয়টাই ফাদার মরো নিম্নের অনুচ্ছেদে বলেছেন: খ্রিস্টের অনুভূতি ও কার্যপদ্ধতিকে তোমার নিজের আত্মা ও কার্যপদ্ধতির মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হতে দাও, কারণ এর মানেই "নতুন মানুষকে পরিধান করা।" আমার কথার প্রমাণ দেওয়ার জন্য রয়েছেন সাধু পল, কারণ তিনি লিখেছেন, "প্রভু যিশু খ্রিস্টকে পরিধান কর।"

ফাদার মরো কার্মেলাইট নভিস্‌দের প্রতি তার উপদেশে বলেন, "... তোমাদের নব্যালয়ে, তোমাদের সারা জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত খ্রিস্টের চিন্ত-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বাণী এবং তার কার্যাবলীগুলোকে আত্মস্থ করে তারই সদৃশ্য হওয়া।" যাতে তোমরাও মহান প্রেরিত পলের মত বলতে পার "এই যে আমি এখন বেঁচে আছি, সে তো আমি নই, কিন্তু স্বয়ং খ্রিস্টই আমাতে বেঁচে আছেন।

নিজেদেরকে তোমাদের ঐশরিক আদর্শের সঙ্গে এমন ভাবে অভিন্ন হতে হবে, যাতে মনে হবে যে তোমরা শুধু তার বিশ্বস্ত প্রতিচ্ছবি নও, বরং কোন না কোন ভাবে তোমরা অপর খ্রিস্টে পরিণত হয়েছ। খ্রিস্টের সেই প্রার্থনা পূরণের মাধ্যমে যা তিনি পিতাকে অনুরোধ করে বলেছিলেন, "পিতা, তুমি যেমন আমার মধ্যেই আছো আর আমি রয়েছি তোমারই মধ্যে, তারাও যেন আমাদেরই মধ্যে থাকে, তেমনই এক হয়েই থাকে।" *(ধন্য ফাদার মরোর উপদেশঃ পৃষ্ঠা ১৪৪-১৪৫)*

ফাদার মরো এই উপদেশ বাণী রেখে ছিলেন কার্মেলাইট নব্যাদের উদ্দেশে। এই উপদেশ তিনি পবিত্র ক্রুশ সদস্য-সদস্যাদের জন্য দেননি। এ হতে প্রমাণিত হয় যে ফাদার মরোর আধ্যাত্মিকতা খ্রিস্টীয় মৌলিক আধ্যাত্মিকতা, যা সকলের জন্যই প্রযোজ্য।

দ্রাক্ষালতা ও শাখা প্রশাখা

খ্রিস্ট প্রভু তাঁর সঙ্গে তার অনুসারীদের মিলন বা একাত্মতা বুঝানোর জন্য দ্রাক্ষালতা ও শাখা প্রশাখার উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। *(যোহন ১৫ঃ১-৬)* এই দ্রাক্ষালতা ও শাখা প্রশাখার উদাহরণটি ফাদার মরোর অতি প্রিয় ছিল। তার বাবা ছিলেন দ্রাক্ষারসের ব্যবসায়ী। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তিনি তার গ্রামীণ অভিজ্ঞতা হতেই এই দ্রাক্ষালতা ও শাখা প্রশাখার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তার জন্য দ্রাক্ষালতা হল শাখা-প্রশাখা, পাতা ও ফুলের জন্য জীবনের উৎস। তিনি এই বাস্তবতার মধ্যে খ্রিস্টধর্মের মূল বিষয় প্রত্যক্ষ করেছেন যা হল : খ্রিস্টের সঙ্গে মিলনের মধ্যে আসে ত্রিত্বের জীবন। 'গাছের সঙ্গে যে শাখাকে সংযুক্ত করা হয়েছে, তা গাছের কান্ড হতে প্রবাহিত প্রাণ রস গ্রহণ করেই বেঁচে থাকে'।

ফাদার মরো খ্রিস্ট প্রসাদ গ্রহণের মাধ্যমে খ্রিস্টের সঙ্গে একাত্মতা বা মিলন সম্বন্ধে ধর্মশিক্ষা দিতে গিয়ে বলেছেন: ...যেহেতু তিনি (যিশু) নিজেই বলেছেন: "আমি যেমন তোমাদের মধ্যে রয়েছি, তেমনি তোমরাও আমারই মধ্যে থাক। দ্রাক্ষালতার সঙ্গে যুক্ত না থাকলে তোমরাও ফলশালী হতে পার না। আমি হলাম দ্রাক্ষালতা, আর তোমরা হলে শাখা প্রশাখা *(যোহন ১৫ঃ ৪-৫)*" "পিতা" তুমি যেমন আমার মধ্যেই আছ, আর আমি রয়েছি তোমারই মধ্যে তারাও যেন তেমনি আমাদেরই মধ্যে থাকে, তেমনি এক হয়েই থাকে... *(যোহন ১৭ঃ ২১)*" (ফাদার মরোর ধর্মশিক্ষা ৮৪ পৃষ্ঠা)

উপরোক্ত অনুচ্ছেদও কার্মেলাইট নব্যাদের প্রদত্ত ফাদার মরোর উপদেশ লক্ষ্য করা যায় যে তার আধ্যাত্মিকতার মূল বিষয় হলো: খ্রিস্টেতে এক হওয়া; এবং খ্রিস্টের সঙ্গে এক হওয়ার মধ্যেদিয়ে পবিত্র ত্রিত্ব পরমেশ্বরের সঙ্গে এক হওয়া।

ফাদার মরো দ্রাক্ষালতা ও শাখা প্রশাখার দৃষ্টান্তটি পবিত্র ক্রুশ সংঘের জন্য ব্যবহার করেন। তার মতে মণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত পবিত্র ক্রুশ সংঘ একটা ক্ষুদ্র মণ্ডলী। মণ্ডলী অর্থ যেমন শাখা প্রশাখা রূপ ভক্তজনের সঙ্গে দ্রাক্ষালতারূপ খ্রিস্টের সঙ্গে ঐক্য স্থাপন, পবিত্র ক্রুশ সংঘের অর্থও দ্রাক্ষালতা ও শাখা-প্রশাখার মধ্যে সেই একই ঐক্য স্থাপন। ফাদারের মতে পবিত্র ক্রুশ সংঘ মণ্ডলীর প্রতিমূর্তি নয়, বরং ক্ষুদ্র পরিসরে খ্রিস্টভক্ত ও খ্রিস্টের মধ্যে (Organic) অঙ্গ সংক্রান্ত মিলন বন্ধন। ফাদার মরো তার ধ্যানে লিখেছেনঃ ... দ্রাক্ষালতার শাখাগুলো যেমন লতা হতে রস গ্রহণ করে বেঁচে থাকে এবং মূল দ্রাক্ষালতার সঙ্গে এক হয়ে একটি দ্রাক্ষালতা গঠন করে, ... ঠিক তেমনি খ্রিস্টভক্তগণও জীবন লাভ করবে খ্রিস্টের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে। *(ধন্য ফাদার মরোর ধ্যান, পৃষ্ঠা ২৬৬)*

খ্রিস্টের দেহ

দ্রাক্ষালতা ও শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে ঐক্য সম্বন্ধে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সাধু পল খ্রিস্ট দেহের দৃষ্টান্তের মধ্যে দিয়ে একই বিষয়ে শিক্ষা দেন। ঐক্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ফাদার মরো এই দুটো দৃষ্টান্তই ব্যবহার করেন। তিনি বলেন: একমাত্র খ্রিস্টের সঙ্গে মিলনের মাধ্যমেই খ্রিস্টভক্তের জীবন বেঁচে থাকে। ... এই মিলন স্থাপিত হয়েছে দীক্ষাস্নানের মধ্যদিয়ে যার মাধ্যমে তিনি তোমাদের স্বর্গীয় মস্তকের (খ্রিস্টের) সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। মাথা হতে শরীর আলাদা হলে কি হবে? মাথা ছাড়া শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গের জীবন নেই ...। সুতরাং খ্রিস্টের জীবন প্রবাহিত হয় মস্তক রূপ খ্রিস্ট যিশু হতে যার সঙ্গে আমরা সংযুক্ত হয়েছি আমাদের দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে।

পবিত্র ক্রুশ সংঘের সদস্য-সদস্যাগণ নিজেদেরকে খ্রিস্ট দেহের অঙ্গ প্রতঙ্গ বলে গণ্য করা আবশ্যক। এ বিষয়ে ফাদার মরো বলেন: একটা বিষয়ে আমি বিশেষভাবে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সাধু পলের দৃষ্টান্ত- "একই দেহের অনেক অঙ্গ-প্রতঙ্গ" তোমাদেরও ব্যবহার করা অবশ্যক। সহ সন্ন্যাসব্রতী ও ব্রতিনীদের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক হওয়া উচিত একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গের বিদ্যমান সম্পর্কের মতই। *(ফাদার মরোর সার্বজনীন পত্র ২, পৃষ্ঠা ৩৯৩)*

প্রৈরিতিক খ্রিস্টমণ্ডলী

ফাদার মরোর মতে পবিত্র ক্রুশ সন্ন্যাস সংঘ হল একটা ক্ষুদ্র মণ্ডলী। এই ধারণাটা যে শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তা হল: প্রতিটি ধর্মপ্রদেশ একটা ক্ষুদ্র মণ্ডলী বলে গণ্য করা হয়। এটা আমরা করিন্থীয়দের প্রতি সাধু পলের প্রথম পত্রের মাধ্যমে প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পদে দেখতে পাই। এখানে রয়েছে "পরমেশ্বরের করিন্থীয় ভক্তমণ্ডলী তোমাদেরই কাছে *(১করি ১:২)*।" ধর্মপ্রদেশ হল ভক্তজনগণ ও খ্রিস্টের সরাসরি প্রতিনিধির বা বিশপের সমন্বয়ে। বর্তমানে এই স্থানীয় মণ্ডলী আরও জোরদার করার জন্য বিশেষভাবে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

ফাদার মরো নিশ্চয়ই স্থনীয় মণ্ডলীর এই ধারণা অর্থাৎ ধর্মপ্রদেশের আসল প্রকৃতি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। তিনি জানতেন যে পবিত্র ক্রুশ সংঘ কোন ধর্মপ্রদেশ নয় বরং কয়েকটি ধর্ম সমাজের (Religious Communities) একটা দল (Group)। এই মিলন-সমাজ (Associatation) হল মণ্ডলীর মধ্যে একটা মণ্ডলী যখন এর মহা সংঘ প্রধান ও অন্যান্য পরিচালকগণ খ্রিস্টের দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন। ফাদার ছিলেন একজন মণ্ডলীর মানুষ (Man of the Chruch)। প্রৈরিতিক মণ্ডলীর মধ্যে বিদ্যমান ঐক্য ফাদারকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাই বৎসরের পর বৎসর তিনি তার সন্ন্যাসব্রতী ও ব্রতিনীদের নির্দেশ দিয়েছেন তাদের মধ্যেও যেন সেই একই ঐক্য অবশ্যই থাকে। তিনি বলেন: ... যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমাদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে তাতে সফলকাম হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম আমাদের অবশ্যই সেবাকর্মে একান্তভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে- অর্থাৎ "এক মন এক প্রাণ" হতে হবে, কারণ তোমরা জান যে, "একতাই বল" এবং "রাজ্য বিভক্ত হয়ে যায় যখন তার লোকজন এক সঙ্গে না থাকে।" *(প্রেরিত ৮:৩২; ফিলিপ্পীয় ২:২) (ফাদার মরোর সার্বজনীন পত্র ১, পৃষ্ঠা ২)*

মারীয়া খ্রিস্টদেহের মা

মা মারীয়ার প্রতি ফাদার মরোর ভক্তি শুধু ব্যক্তিমূলকই ছিল না; বরং তা ছিল ঐশতাত্ত্বিক। তিনি মারীয়াকে শুধু ভক্তি প্রদর্শন করেই ক্ষান্ত হননি, কিন্তু মারীয়া যে প্রধানত ঐশ জীবনের মধ্যস্থতাকারী অর্থাৎ খ্রিস্ট যিশুর মা এই বাস্তবতা অনুধাবন করেছেন। ক্রুশের তলায় দাঁড়িয়ে ফাদার মরো শুধু মারীয়ার সঙ্গে কান্নায় অংশগ্রহণ করেননি; বরং মারীয়া প্রধানত সেখানে কি করেছেন এ বিষয় নিয়ে তিনি ধ্যান করেছেন। তিনি ক্রুশের তলায় শুধু মারীয়ার দুঃখ নিয়েই থেমে থাকেন নি। তিনি প্রশ্ন করেন কেন মারীয়া ক্রুশের তলায় দাঁড়িয়ে আছেন? পুণ্য শুক্রবার তার ধ্যানে তিনি লিখেন: "হে পুণ্যময়ী মা জননী, কেউ কি কখনো তোমার মর্মবেদনার (Compassion) গভীরতা ও ব্যাপকতা উপলব্ধি করতে পারবে? *(ধ্যান, পৃষ্ঠা ১৫৪)*

মর্মবেদনা শব্দের অর্থ হতেই প্রতীয়মান হয় যে মারীয়া খ্রিস্টের যাতনা ভোগের অংশী হয়েছেন। যিশু যে উদ্দেশে যন্ত্রণাভোগ বরেছেন। তাই মারীয়া সহ-পরিত্রাণদায়িনী। খ্রিস্ট জননীর অশ্রু বৃথা যাবার নয়। ফাদার মরো তার ধ্যান শেষ করেন মারীয়ার নিকট এই প্রার্থনা রেখে: "তোমার সঙ্গে আমাকেও কাঁদতে দাও এবং আমার পরিত্রাতা যিশুর যন্ত্রণাভোগের ফল সংগ্রহ করতে দাও।"

মারীয়া খ্রিস্টমণ্ডলীর মা

ক্রুশের উপর মৃত্যু পথযাত্রী প্রভু যিশু মারীয়াকে তার শিষ্য যোহনের কাছে মা হিসেবে দিয়ে গেলেন এই কথা বলে, "নারী এই দেখ তোমার পুত্র।" *(Section ৫৮, পৃষ্ঠা ১৮২-৮২)*

আমি নই, খ্রিস্টের জীবিত আছেন

ফাদার মরো তাঁর প্রতিষ্ঠিত পবিত্র ক্রুশ পরিবারের জন্য কোন ধরণের ঐক্য প্রত্যাশা করেছেন তা আমার পূর্ববর্তী অংশে দেখেছি। সংঘবদ্ধ জীবন সম্বন্ধে তার চিন্তাধারা বা ধারণাও আমরা কিছুটা উপলব্ধি করতে পারছি। কিন্ত এই ঐক্য বাস্তবায়নের জন্য পবিত্র ক্রুশ পরিবারের প্রত্যেক সদস্য-সদস্যাকে খ্রিস্টেতে ও খ্রিস্টের মত জীবন যাপন করতে হবে। ফাদার মরো একান্তভাবে আশা করেছেন যে পবিত্র ক্রুশ পরিবারের সকল সভ্য--সভ্যা ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনাবদ্ধ হবে। এই অংশে আমরা দেখবো কি ভাবে সভ্য-সভ্যাগণ খ্রিস্টেতে এক এবং খ্রিস্টের মাধ্যমে কিভাবে তারা ত্রিত্ব পরমেশ্বরের সঙ্গে এক হতে পারেন। খ্রিস্ট আমাদের মধ্যে ও আমাদের দ্বারা জীবিত আছেন।

দ্বিতীয় অংশ

খ্রিস্টের বেঁচে থাকা আবশ্যক

সাধু পলকে খ্রিস্টের অতিন্দ্রীয় দেহ এত আকর্ষণ করেছে কারণ খ্রিস্টের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতে বুঝতে পেরেছিলেন যে খ্রিস্ট তার মণ্ডলী অর্থাৎ ভক্ত জনগণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ। দামাস্কের পথে পলের প্রতি যিশুর বাণী হতেই এটা প্রতীয়মান হয়। "শৌল, শৌল, তুমি কেন আমাকে নির্যাতন করছ?" এ হতে বুঝা যায় খ্রিস্ট তার মণ্ডলী তথা তার ভক্তজন হতে বিচ্ছিন্ন নয়।

ফাদার মরো বলেন: তোমরা নতুন মানুষ যিশু খ্রিস্টকে পরিধান করবে। খ্রিস্টের অনুভূতি ও কাজ করার পদ্ধতিকে তোমাদের আভ্যন্তরীণ চিন্তা-ভাবনা ও বাহ্যিক কার্যপদ্ধতি যাচাই করতে দেওয়া একান্ত আবশ্যক। তাই সাধু পল লিখেছেন "যিশু খ্রিস্টকে পরিধান কর।"

পুত্রের আত্মা

ঈশ্বরের দত্তক পুত্রের মত জীবন যাপন করতে হলে আমাদের পুত্র ঈশ্বরের জীবন অর্থাৎ পবিত্র আত্মাকে লাভ করা আবশ্যক। ফাদার মরো গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন যে পবিত্র আত্মাই পুত্র ঈশ্বরের জীবনের মূল উৎস। তিনি বলেন: ঈশ্বরের আত্মা যেমন খ্রিস্ট যিশুর জন্য প্রধান, আত্মা ও সকল কার্যকলাপের চালিকা-শক্তি ছিলেন তোমাদের তেমনি হতে হবে। সাধু পল বলেন, "যে সব মানুষ ঐশ আত্মার প্রেরণাতেই চালিত তারাই পরমেশ্বরের পুত্র।" *(রোমীয় ৮ঃ১৪) (পবিত্র ক্রুশ সন্ন্যাস-সংঘের অনুশীলনী পৃষ্ঠা ১৯৯)*

যেহেতু তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, তোমাদের পুত্রের আত্মা দ্বারা পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। ফাদার মরো তার এক নম্বর সার্বজনীন পত্রে বলেন যে- আমরা খ্রিস্টের সঙ্গে এক দেহ গঠন করি এবং একই আত্মা হতে জীবন পাই। *(ফাদার মরোর সার্বজনীন পত্র ১, পৃষ্ঠা ৪২)*

প্রার্থনার দ্বারা একাত্ম হওয়া

যে দু'টো শক্তি আমাদের খ্রিস্টীয় জীবন দান করে তা হ'ল পবিত্র আত্মা ও পবিত্র খ্রিস্টযাগ। তৃতীয় মাধ্যমটা হলো প্রার্থনা যা ঈশ্বর মানুষের মিলন স্থান। সালপিসিয়ানেদের সঙ্গে থাকার সময় ফাদার মরো প্রার্থনার যে কলা কৌশল শিক্ষা করেছিলেন তা হল খ্রিস্টের জীবন নিজের মধ্যে ধারণ করা। এর জন্য রয়েছে তিনটা ধাপ যেমন আরাধনা করা, মিলনাবদ্ধ হওয়া ও সহভাগিতা করা। তিনি তার ধ্যানে লিখেছেন, "ঐশ সন্তানকে আরাধনা করা, মিলনাবদ্ধ হওয়া ও সহভাগিতা করা। তিনি তার ধ্যানে লিখেছেন, "ঐশ সন্তানকে আরাধনা কর।" *(ফাদার মরোর ধ্যান ১০১ পৃষ্ঠা)*

তার অনুশীলনীতে তিনি লিখেন, "আমাদের প্রভু, যিনি একান্ত ভাবে তোমার প্রভু হতে ইচ্ছা করেন, তার আরাধনা কর।" *(পবিত্র ক্রুশ সন্ন্যাস-সংঘের অনুশীলনী ১১৫ পৃষ্ঠা)*

মিলন

মিলনের ব্যাপারে তিনি তার ধ্যানে লিখেন যে, "যে চিন্তা-ভাবনা খ্রিস্টকে পরিচালনা করছে, তাতে তুমি প্রবেশ কর।" *(ধ্যান পৃষ্ঠা ৫৯)*

"তোমার মধ্যে যিশুর চিন্তা-ভাবনা অনুভূতি জাগিয়ে তোলার জন্য তোমার প্রভু খ্রিস্টের হৃদয়ে নিজেকে ডুবিয়ে দাও।" *(ফাদার মরো ধ্যান পৃষ্ঠা ১৬)*

ধ্যান সম্বন্ধে তিনি বলেনঃ ... ধ্যান এমনই এক উচ্চস্তরের প্রার্থনা যার মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ের সঙ্গ কথা বলেন এবং আমাদের হৃদয়ও কোন শব্দ উচ্চারণ না করে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলে। ধ্যান না করে কোনদিনই কেউ উত্তর ব্রতধারী-ধারিণী হতে পারেনা। *(ফাদার মরোর সার্বজনীন পত্র ৯৬, ২য়, ৭৪)*

ফাদার মরোর মতে প্রার্থনা এমন একটা অবস্থা যখন ঈশ্বর আমার হৃদয়ের সঙ্গে কথা বলে। অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যেকার সংলাপই হল প্রার্থনা। পবিত্র ক্রুশ মিলন-সমাজের জন্য পূজনীয় ফাদার মরোর আদর্শ "তুমি যেমন আমার মধ্যে আছ আর আমি রয়েছি তোমারই মধ্যে, তারাও যেন তেমনি আমাদেরই মধ্যে থাকে, তেমনি এক হয়েই থাকে।"

ফাদার মরোর আধ্যাত্মিকতা হল খ্রিস্টেতে এক হওয়া এবং খ্রিস্টের মধ্যে ত্রিত্ব পরমেশ্বরের সঙ্গে এক হওয়া। এই ঐক্যের অর্থ হল যিশু খ্রিস্ট অর্থাৎ মানুষ-ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের মিলন। এই মিলনের উদ্দেশ্য মানুষ যেন খ্রিস্টের অর্থাৎ মানুষ ঈশ্বরের অর্থাৎ খ্রিস্টের জীবন পেতে পারে।

তৃতীয় অংশ

ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ

প্রভু যিশু তার পিতা ঈশ্বরকে ভালোবাসেন। এই ভালবাসার অর্থ হল পিতার ইচ্ছার সঙ্গে যিশুর ইচ্ছার মিলন। হিব্রুদের প্রতি পত্রে লিখা হয়েছে "ওগো পরমেশ্বর তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে, এই তো এসেছি আমি।" *(হিব্রু ১০ঃ৭)*

সুতরাং খ্রিস্টের সঙ্গে ও একে অপরের সঙ্গে ঐক্য স্থাপনের অর্থ হল ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের ইচ্ছার ঐক্য স্থাপন। অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ। যেমন প্রভু যিশু গেৎসেমানী বাগানে বলেছিলেন, "পিতা, আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

ফাদার মরো সাধু যোসেফের মিশরে যাত্রা ও সেখানে হতে ফিরে আসার ঘটনা ধ্যান করে ঈশ্বরের নিকট সাধু যোসেফের আত্মসমর্পণের তত্ত্বটি আমাদের শিক্ষা দেন। *(মথি ২ঃ১৩)*

"তারা চলে যাওয়ার পর প্রভুর এক দূত যোসেফকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেনঃ "ওঠ! শিশুটি ও তার মাকে নিয়ে মিশর দেশে পালিয়ে যাও তুমি, আর আমি আর কিছু না বলা পর্যন্ত সেখানেই থাক। কারণ হেরোদ খোঁজ করতে শুরু করবে।" যোসেফ তখন উঠলেন আর সেই রাতেই শিশুটি ও তার মাকে সঙ্গে নিয়ে মিশর দেশে রওনা হলেন। হেরোদের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেখানেই রয়ে গেলেন।" *(মথি ২ঃ ১৩-১৫)*

মিশরে যাওয়ার জন্য যোসেফের প্রতি যে আদেশ এসেছিল তা পালন না করার জন্য যোসেফ কিন্তু কোন প্রতিবাদই করেন নি। এই দুর্গম যাত্রা করা হতে নিজেকে বিরত রাখার জন্য তিনি বিভিন্ন অজুহাত দেখাতে পারতেন। কিন্তু না, তিনি তা করেন নি। হেরোদ যিশুকে হত্যা করতে চায়। যোসেফ ভাবতে পারতেন যে যিশু তো ঈশ্বর-মানুষ। তিনি নিজেকে বাঁচাতে পারতেন না? তারপর, মিশর দেশে সেখানে যোসেফের জানাশুনা কেউ নেই সেখানে যেতে হবে কেন? পূর্ব দেশীয় পণ্ডিতদের দেশেও তো হতে পারতো? কেন মা ও শিশুকে এত দূরের রাস্তায় এই বিপদের মধ্যে ফেলা? এই সকল প্রশ্ন যোসেফের মনে জাগেনি দূতের কাছে সংবাদ পাওয়ার সঙ্গেই তিনি রওনা দিয়েছিলেন। লিখা আছে, "যোসেফ তখন উঠলেন আর সেই রাতেই শিশুটি ও তার মাকে সঙ্গে নিয়ে মিশর দেশে রওনা হলেন।" *(মথি ২ঃ১৪)*

তাই ফাদার মরো বলেন, "যারা ভবিষ্যৎ নিয়ে সর্বক্ষণ বিচলিত তোমাদের জন্য এটা কত বড়ই একটা শিক্ষা।"

ফাদার মরো বলেন, তোমাকে কোথায় যেতে হবে ঈশ্বর যতদিন তা প্রকাশ না করেন ততদিন

তুমি সেখানেই থাক যেখানে তোমাকেই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ফাদার মরো বলেন এই শিক্ষা আমরা পাই এই কথা হতে "আর আমি কিছু না বলা পর্যন্ত সেখানেই থাক।" *(মথি ২ঃ১৩)* এখানে হতে পারে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে একমাত্র ঈশ্বরের অধিকার আছে তুমি যেখানে আছ সেখানে তোমাকে রাখতে ও তোমাকে অন্যত্র পরিবর্তন করতে। *(মথি ২ঃ১৯-২৩)*

যোসেফ দূতের আদেশ পেয়ে মিশর দেশ হতে ইস্রায়েল দেশে চলে এলেন। দূত তাকে ইস্রায়েল দেশের কোথায় যেতে হবে তা নির্দিষ্ট করে দেননি। তাই তিনি যিশুকে নাজারেথে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে সেখানেই তিনি যিশুকে সহজে বড় করে তুলতে পারবেন ও তাকে হারাবার ভয় সেখানে নেই। (ফাদার মরোর ধ্যান)

পাপ ব্যতীত আমাদের জীবনে আর সব কিছুই ঘটে ঈশ্বরের ইচ্ছায়। আমাদের যা করণীয় তা হল ঈশ্বরকে ভালোবাসা অর্থাৎ তার ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছা মিলিয়ে নেওয়া। আত্মসমর্পণ করণ।

ডিভাইন প্রভিডেন্স : ঈশ্বর

ফাদার মরো তার ১ নম্বর সার্বজনীন পত্রের ৩৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন কষ্টদায়ক পরীক্ষার মধ্যেও ঈশ্বরের উপর অথবা মহান আহ্বানে **তোমাদের** বিশ্বস্ততার উপর আমরা বিশ্বাস হারাই নি। ডিভাইন প্রভিডেন্স কথাটি তিনি বার বার তার লেখায় ব্যবহার করেছেন।

পবিত্র ক্রুশ সংঘ ও ঈশ্বর (ডিভাইন প্রভিডেন্স)

ফাদার মরো মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে পবিত্র ক্রুশ সংঘ নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কাজ। তাই পবিত্র ক্রুশ সঙ্গের অন্য নাম তিনি বলতেন "ঈশ্বরের কাজ"। তিনি তার ২ নম্বর সার্বজনীন পত্রে লিখেছেন " একমাত্র ঈশ্বরই এই সন্ন্যাস সংঘের প্রতিষ্ঠাতা"। তিনি দুঃখ কষ্ট ও আনন্দময় ঘটনা সমূহের মধ্যেই ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রত্যক্ষ করতেন। ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যদিয়ে ঈশ্বর যে আমাদের কাছে কথা বলেন তা ফাদার মরো বিশ্বাস করতেন।

ক্রুশ

ঈশ্বরের মহানুভবতার (Providence) কথা বলতে গেলেই ক্রুশের কথা এসে যায়। যিশু ক্রুশ বহন করে এর উপর মৃত্যুবরণ করেছেন তা শুধু তার জন্য নয় বরং আমরা যদি খ্রিস্টেতে রূপান্তরিত বা অপর খ্রিস্ট হতে চাই ক্রুশ আমাদের প্রত্যেক জনের জন্য অতি প্রয়োজন।

ফাদার মরো ক্রুশকে "জীবন দায়ী" বলে আখ্যা দিয়েছেন। এই ক্রুশ হল যাতনাভোগ "সংস্কারীয়" রূপের অন্তরালে লুকায়িত জীবনের উৎস। আমরা কষ্টভোগ করবো বা ক্রুশ কাঁধে তুলে নেব যাতে আমার আমিত্ব হ্রাস পায় ও খ্রিস্ট আমাতে বৃদ্ধি পায়। নিচের অনুচ্ছেদে আমরা দেখতে পাবো যে ভাল ঘটনা ও মন্দ ঘটনার মিশ্রনে ঈশ্বরের কাজ করার পদ্ধতি ফাদার মরোকে কত প্রভাবিত করেছে।

খ্রিস্টেতে আমার পুত্র-কন্যাগণ, যদিও এসব কিছু ঘটেছে, ঈশ্বর এ জগৎ সব কিছু এমন কোমল ভাবে পরিচালনা করবেন যেন মন্দ ও ভাল মিলিয়ে একটা সমন্বয় ঘটাতে পারেন আমরা যেন নিরাশা ও অহঙ্কারের বেড়াজালে আটকে না পড়ি এ জন্য তিনি আমাদের এমন অবস্থায় পড়তে দেন যা দাড়িপাল্লার ন্যায় আমাদের একবার নিচে নামায় ও একবার উপরে তুলে। *(ফাদার মরোর সার্বজনীন পত্র ১, পৃষ্ঠা ১৩১-৩২)*

"... রেভারেন্ট ফাদার ও শ্রদ্ধেয় ব্রাদারগণ সর্বপ্রথমেই আমাদের সবাইকে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর ন্যায্যতা খুঁজতে হবে এবং ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। সে জন্য আমি একান্তভাবে অনুরোধ করি যেন তোমার আহ্বান জীবনের নবায়ন কর। দরিদ্রতা, কৌমার্যও বাধ্যতার ব্রত সমূহের আলোকে নিজেকে সঁপে দেওয়া ও তার ইচ্ছা আবিষ্কার করা কতই না মধুর। *(ফাদার মরোর সার্বজনীন পত্র ২, পৃষ্ঠা ২৭৩)*

সাধু যোসেফ

সাধু যোসেফের প্রতি ফাদার মরোর ভক্তি শুধু ঈশ্বরের কাছে পূর্ণ আত্মদান সম্পর্কে ফাদার মরোর শিক্ষার আলোকেই বুঝা যাবে। পবিত্র ক্রুশের জন্য সাধু যোসেফ সম্পূর্ণ আত্মদানকারী হিসেবে শুধু আদর্শই নয় বরং খ্রিস্টের সঙ্গে ঐক্য স্থাপনে যা ফাদার মরো তার সঙ্গে আশা করেছিলেন তারও একজন আদর্শ।

উপসংহার

ফাদার মরো ছিলেন বাস্তবধর্মী। তার মতে খ্রিস্ট ধর্মের অতিন্দ্রীয় দেহতত্ত্ব (Doctrine of the Mystical Body) খ্রিস্টীয় জীবনের মৌলিক বিষয়। তাই তিনি শুধু খ্রিস্ট দেহের আলোকেই খ্রিস্টান জীবনের কথা চিন্তা করতে পারেন। তার প্রতিষ্ঠিত পবিত্র ক্রুশ সন্ন্যাস সংঘ অর্থাৎ 'মিলন সমাজ' (সিস্টার-ব্রাদার-ফাদার) 'একটা ক্ষুদ্র মণ্ডলী'। (মণ্ডলীর মধ্য মণ্ডলী) সুতরাং খ্রিস্টদেহকে বাদ দিয়ে এই মিলন সমাজও কল্পনা করা সম্ভব নয়।

ফাদার মরো পবিত্র ক্রুশ সংঘের ব্রাদার, ফাদার ও সিস্টারদের সমন্বয়ে যে মিলন-সমাজের (Association) কথা চিন্তা করেছিলেন তা খ্রিস্টদেহেরই মত। ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের থাকার কথা ছিল একই সংঘ প্রধানের অধীনে, যিনি থাকবেন খ্রিস্টের আসনে। আমরা জানি মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ তা অনুমোদন করেন নি। সিস্টারদের ভিন্ন সংঘ-প্রধানের অধীনে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। ফাদার মরো এই মিলন-সমাজের জন্য যে ঐক্য প্রত্যাশা করেছেন তার উৎস হল খ্রিস্টের অতিন্দ্রীয় দেহের প্রতি তার প্রগাঢ় বিশ্বাস। ফাদার মরোর স্বপ্ন অনুযায়ী পবিত্র ক্রুশ পরিবার হল খ্রিস্টের সেই দেহ।

ধন্য ফাদার বাসিল আন্তনী মেরি মরোর আধ্যাত্মিকতা হল প্রার্থনাপূর্ণ মিলন সমাজের সভ্য-সভ্যা হিসেবে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ত্রৈত্বিক ঐক্য স্থাপন করে এবং ঈশ্বরের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ও আস্থা রেখে যে কোন ক্রুশ বহন বা কষ্ট ভোগ করতে সদাসর্বদা প্রস্তুত থাকা। তিনি তাঁর সন্ন্যাস সংঘের সভ্য-সভ্যাদের মূলত খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতায় বৃদ্ধি পেতে নির্দেশ দান করেন। তিনি তাঁর আধ্যাত্মিকতায় গুরুত্ব দিয়েছেন শোকময়ী মারীয়া ও সাধু যোসেফের প্রতি প্রদর্শন।

মণ্ডলীতে পবিত্র ক্রুশ সন্ন্যাস সংঘের ভূমিকা হল পবিত্র ত্রিত্বের পরিবার মণ্ডলী, যার জীবন পবিত্র আত্মা, তাতে অবস্থান করা। পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রত্যেক শাখার সদস্য-সদস্যাগণকে খ্রিস্টের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পবিত্র আত্মার সহায়তায় পিতার দত্তক সন্তান হিসেবে বসবাস করা। ধন্য ফাদার মরোর আধ্যাত্মিকতা অনুশীলনে বর্তমান এই বিভেদ-বিচ্ছেদ ও সংঘাতপূর্ণ পৃথিবীতে প্রার্থনাময় পরিবার ও সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব, যেখানে বিরাজ করবে মিলন-বন্ধন ও ত্রৈত্বিক ঐক্য, যার সদস্য-সদস্যাগণ যে কোন দুঃখ-কষ্ট ও সংকট মোকাবিলা করে তুলতে সক্ষম হবেন। সুতরাং বলতে হয় যে ধন্য ফাদার মরোর আধ্যাত্মিকতা খুবই বাস্তবধর্মী ও যুগোপযোগী ও অনুকরনীয়।

... এসো ঈশ্বরের নিকট সর্বদা কৃপা চেয়ে প্রার্থনা করি, যেন আমরা পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা অনুযায়ী অনুভব করতে, বিচার করতে, কথা বলতে ও কাজ করতে পারি।

(*ফাদার মরোর সার্বজনিন পত্র ২:পৃষ্ঠা ১৯৯*)

Wulstan Mork, O.S.B. Gi wjwLZ Moreau spirituality বইয়ের অনুকরণে রচিত।

ধন্য বাসিল আন্তনী মেরী মরো'র গুণাবলী

ব্রাদার রিপন জেমস গমেজ সিএসসি

ধন্য বাসিল মরো জন্মগ্রহণ করেন ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি, যখন ফরাসী বিপ্লব চলছিল। পরিবারে ১৪ জন ভাই-বোন এর মধ্যে ফাদার মরো ছিলেন নবম। তার জন্ম হয়েছিল ফ্রান্সে অবস্থিত এক দরিদ্র পরিবারে। তাঁর পরিবার ছিল ধার্মিক। পরিবারে ১৪ জন ভাই-বোনদের মধ্যে ধন্য বাসিল আন্তনী মেরী মরো (১৭৯৯–১৮৭৩) ছিলেন নবম। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি সালপিসিয়ান অর্ডার (Sulpician Order) দ্বারা পরিচালিত ল্যা-মা-সেন্ট ভিনসেন্ট মেজর সেমিনারিতে প্রবেশ করেন। এই সেমিনারীর গঠন ও আধ্যাত্মিকতা তার জীবনের আধ্যাত্মিকতাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। ফাদার মরো মাত্র ২২ বছর বয়সে, ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে ১২ আগস্ট, যাজকীয় অভিষেক লাভ করেন।

মণ্ডলীর ইতিহাসে নজির-বিহীন সাহসের পরিচয় দিয়ে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে ১ মার্চ মৌলিক চুক্তির "Fundamental Pact of Union" মাধ্যমে সাধু যোসেফের ব্রাদার সংঘ ও সাহায্যকারী পুরোহিত সংঘ দু'টিকে একত্রিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। (ল্যা-মার ধর্মপ্রদেশের পবিত্র ক্রুশ একটি শহরতলির জায়গায় নাম) এই গ্রামের নামানুসারেই সংঘের নামকরণ করা হয় পবিত্র ক্রুশ সংঘ। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে সিস্টারদের সংঘের অপর শাখাটির সৃষ্টি হয়। পুরোহিত, ব্রাদার ও সিস্টারদের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত এই সংঘটিকে ফাদার মরো দেখতে চেয়েছিলেন, *"এমন এক শক্তি হিসেবে যার দ্বারা গোটা জগতটাই আলোড়িত, নিয়ন্ত্রিত ও পবিত্রীকৃত হয়ে উঠবে।"* ফাদার মরোর সকল প্রৈরিতিক কাজ নিয়ে অনুধ্যান করলে দেখা যায় যে- তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল- ফরাসী বিপ্লবের দ্বারা ফ্রান্সে যে ক্ষতি সাধন হয়েছিল (আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় , শিক্ষা, নৈতিকতা ও আর্থিক) সেই অবস্থা থেকে উর্দ্ধে আসা। পবিত্র ক্রুশ পরিবারের একাগ্র প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে ফাদার মরোকে পূজনীয় (Venerable) হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স দেশে পবিত্র ক্রুশ সম্প্রদায়ের জন্মস্থানে এক বিশেষ খ্রিস্টযাগ উদ্‌যাপন করার মাধ্যমে তাকে ধন্য বলে ঘোষণা করা হয়। নিম্নে এই পবিত্র মানুষটির কিছু গুণাবলি আলোকপাত করা হল।

অবিচলতা: ঈশ্বরের পথে আহ্বানে বৃদ্ধি লাভের পথে স্পষ্টতই বাসিল মরো ছিলেন এক অবিচল মানুষ। ঐশ-অনুগ্রহের প্রতি অবিচল আস্থার জন্য তিনি তাঁর জীবনের বড় বড় পরীক্ষা-প্রলোভন, হতাশ-নিরাশা জয় করতে পেরেছেন। এমন কি পবিত্র ক্রুশ সম্প্রদায়ে তার ভাইদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে এবং অবশেষে লে-ম্যানসের পবিত্র ক্রুশ সম্প্রদায়ের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি হয়ে যাওয়ার সময়ও তিনি ছিলেন সদা অবিচল। তিনি সবসময়ই চূড়ান্ত বিশ্বাসের সাথে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত থাকতেন যা সবসময় তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। "হে আমার ঈশ্বর, আমি বিশ্বাস করি যে তোমার গৌরবার্থের জন্য হলেও তোমার এই সম্প্রদায় সর্বদা রক্ষা পাবে।"- বাসিল মরো

দুঃসময়ের বন্ধু: ফাদার মরো ছিলেন দুঃসময়ের বন্ধু। তাঁর ছোট বেলায় অনেকবার এই দিকটির বেশ কয়েকটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি নিজের জীবনে ঈশ্বরের উপস্থিতি, ভালোবাসা ও ব্রতীয় জীবনে ঈশ্বরের ডাক গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। পুরোহিত হওয়া এবং একটি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তার মধ্যে দুর্দান্ত সাহসিকতা এবং দায়িত্বশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভালোবাসায় ও কৃতজ্ঞতায় ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন যা তিনি তার এক উপদেশে বলেছিলেন "তিনিই (যিশু) আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও হৃদয়ের ভালোবাসা। আমি শুধু বাঁচতে চাই তাঁর জন্য এবং আমার শ্বাস-প্রশ্বাস শুধু তাঁরই গৌরবের জন্য।"

নিরলস পরিশ্রমী: বাসিল মরো ছিলেন নিরলস পরিশ্রমী এক ব্যক্তি। সেবার দায়বদ্ধতায় তিনি বেঁচে ছিলেন এবং জীবনভর সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। সময়ের প্রয়োজনে তিনি একাগ্রচিত্তে ভবিষ্যত রূপান্তর করার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি প্রভুর প্রতি ছিলেন সক্রিয় এবং স্বতঃস্ফূর্ত। মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রেরিত কর্মীদের উপর ধ্যান করার সময় তিনি লিখেছিলেন- "আজ তুমি যদি দ্রাক্ষাক্ষেত্রের যত্ন নেয়ার জন্য প্রভুর কণ্ঠস্বর শোন- তোমার হৃদয় আর পাষাণ করে রেখো না বরং সেখানে যাও।"

ঈশ্বরকে সহযোগিতা: বাসিল মরোর সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল ঈশ্বরকে সহযোগিতা করা। তিনি ঈশ্বরের আহ্বানে অবিচল ছিলেন। অল্প বয়স্ক পুরোহিত হিসেবে খুবই সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন। সারা জীবন তিনি একজন সাধুর মত জীবন যাপন করেছেন। পবিত্র ক্রুশ সম্প্রদায়ের বিধি-বিধানে তিনি লিখেছিলেন, "প্রত্যেকজন ঈশ্বরের আশীর্বাদে সর্বোত্তম শক্তি দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাবে যতোক্ষণ না ঈশ্বরের ভলোবাসা দ্বারা তার পুরো হৃদয়-মন পরিপূর্ণ হয়।"

আধ্যাত্মিক মানুষ ও শিক্ষাবিদ: বাসিল মরো ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক মানুষ ও আদর্শ শিক্ষাবিদ। তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল, নম্র, ঐশ অনুগ্রহের প্রতি বিশ্বাসী ও ক্ষমাশীল। অতীতের সকল দোষ-ত্রুটি ভুলে অন্যকে ক্ষমা করা ছিল ফাদার মরোর জন্য খুবই সহজ কাজ। যিশু যেমন তার শিষ্যদের সুন্দর করে শিখাতেন তেমনটি ফাদার মরোও সংঘের ভাইদের নম্রতার সাথে সংশোধন দিতেন ও বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। অন্যদের প্রতি তাঁর নিজের পরামর্শ ছিল, "তাড়াহুড়া করার চেয়ে বুদ্ধিমত্তার সাথে ন্যায্য কার্য বিলম্ব হলেও ভাল।"

মিশনারী কাজে উদ্যমী: বাসিল মরো মিশনারী কাজের প্রতি অনেক উদ্যমী ছিলেন। "আমি আমার এই ৭৩ বছর বয়সেও উপলব্ধি করি যে আসন্ন প্রায়শ্চিত্তকালে মঙ্গলবাণী প্রচার করতে সক্ষম।" এই উক্তিটি ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ১৯ নভেম্বর তিনি লিখেছিলেন। যদিও প্রায়শ্চিত্তকাল আসার পূর্বেই তিনি অনন্তধামে চলে গিয়েছিলেন।

মণ্ডলীর প্রয়োজনের প্রতি সচেতন: বাসিল মরো তৎকালীন সময়ে মণ্ডলীর নানা অভাব অভিযোগ ও প্রয়োজনের ব্যাপারে ছিলেন সদা সজাগ। তিনি বিশেষ ভাবে মণ্ডলীতে পুরোহিতের ঘাটতি, খ্রিস্টীয় শিক্ষার অভাব এবং সমাজের গরীব অবহেলিত মানুষের সহায়তার অভাব উপলব্ধি করতেন। মানব মুক্তির প্রয়োজনে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি নিজেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে জগতের প্রয়োজনে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা শুরু করেন- স্থানীয় কিছু সহকারী পুরোহিতদের সমন্বয়ে একটি দল গঠন করে যারা ধর্ম শিক্ষা ও বিভিন্ন প্যারিসে পালকীয় কাজে সহায়তা করতেন। পরিবর্তীতে ফাদার ড্যুজারিয়ের সথে একতাবদ্ধ হয়ে শিক্ষাদানের নিমিত্তে সাধু যোসেফের ব্রাদারদের পরিচালনা শুরু করেন এবং পর্যায়ক্রমে তিনি এই শিক্ষাকে আরও সম্প্রসারিত করার জন্য সিস্টার সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন ও উক্ত কাজে অর্ন্তভুক্ত করলেন। এভাবেই তিনি ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের নিয়ে পবিত্র ক্রুশ সংঘ প্রতিষ্ঠা করলেন; যার মধ্য দিয়ে তিনি তার প্রৈরিতিক ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আত্মবিশ্বাসের সাথে ঈশ্বরের পরিকল্পনায় প্রবেশ: ফাদার মরো গভীর আত্মবিশ্বাসের সাথে ঈশ্বরের পরিকল্পনায় প্রবেশ করেন যখন তিনি পবিত্র ক্রুশ সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। "সম্প্রদায়ের জন্য আমার কোন ভয় নেই। এমনকি যদি তোমরা সকলে মিলে আমাকে পরিত্যাগ কর কিংবা জানি যে তোমরা আমার বিনাশ চাও তবুও আমি আবার তা বাস্তবায়ন করার জন্য নতুন করে শুরু করব। কেননা আমি ঈশ্বরের পরিকল্পনা দ্বারা এতই আলোড়িত যে ঈশ্বর নিজেই চান যেন আমি তা করি।"

ফাদার মরো এই ধর্মীয় পরিবারটিতে ঈশ্বরের হাত দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি পবিত্র ক্রুশ সম্প্রদায়ের জন্য প্রথম খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন, এটি পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন বিধি বিধান দিয়েছিলেন যা বিশ বছর যাবৎ বারবার মার্জিত ও পরিমার্জিত করেছিলেন। অবশেষে পবিত্র ক্রুশ সম্প্রদায় মণ্ডলী দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করেন। ঈশ্বরের আহ্বানে পরিপূর্ণ আস্থা নিয়ে ফাদার মরোও মঙ্গলসমাচার প্রচারের উপায় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিস্তৃত অর্থে তাঁর শিক্ষা কার্যক্রমের অর্ন্তভূক্ত ছিল স্থানীয় মণ্ডলীতে বাণী প্রচার ও বিভিন্ন স্তরে ও বিভিন্ন গ্রুপে যুব সমাজকে ধর্মীয় শিক্ষাদান করা।

ফাদার মরো তাঁর সমস্ত সত্তা দিয়ে তার লক্ষ্য বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন। ঐশ অনুগ্রহের প্রতি আস্থাশীল ও ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি সজাগ ছিলেন এবং আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় সংকল্প তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল ঈশ্বরের পরিকল্পনায় সাড়া দিতে॥

খোলাজানালা

জীবনের তত্ত্বকথা ও জীবনের ভক্তিকথা

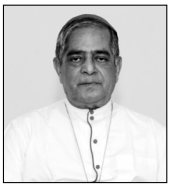

বিশপ থিয়োটনিয়াস সিএসসি

পৃথিবীতে আমাদের প্রত্যেকের জীবন ক্ষণস্থায়ী বলা হলেও বেশ কিছু সময় ধরেও চলে, আবার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের স্মৃতি দীর্ঘকাল মনে রাখার বিষয়ও হয়; আর দীর্ঘকালীন হোক বা স্বল্পকালীন হোক, আমাদের এই জীবনটি নিয়ে নিজের কাছে ও অন্যদের কাছে বহু কথা: আমাদের জীবনে থাকে অনেক বড় বড় কথা, থাকে অগণিত ছোট ছোট কথা, থাকে কত শত ইশারা ও ইঙ্গিত দিয়ে কথাবার্তা। জীবনভর জীবনের এত কথার হিসেব কে সঠিক করে রাখতে পারে? তবে জীবন কথার কথা নয়; জীবন হল বিরাট বাস্তবতা, আর সেই বাস্তবতায় থাকে জীবনের আনন্দ, মাধুর্য ও সার্থকতা, সাথে থাকে কিছু অবহেলা, কিছু কমতি ও অভাব, যা মিটিয়ে নিতে হয়।

পৃথিবীতে সুন্দর ও ভালোবাসাময় আমাদের জীবন

তবে জীবনের এত কথার ও বাস্তবতার পাহাড় থেকে নিয়ে কিছু কথা ও বাস্তবতা বহু দিনের কথা হয়ে থেকে যায়। শেষে আমাদের জীবনের শত শত কথা ও বাস্তবতা গুছিয়ে নিয়ে কয়েকটি আসল কথা ও বাস্তবতা জীবনের প্রকৃত পরিচয় হয়ে থেকে যায়; এমন কি সব কিছু অনেক গুছিয়ে নিয়ে মাত্র "একটি কথা" হিসেবেও জীবনের পরিচয় ধরা দেয়, বুঝতে পারা যায়: তখন আমরা বলতে পারি যে, আমি বা তুমি একজন প্রেমময়, কি সেবাময়, কি ভক্তিময়, কি দয়াময়, কি ন্যায়বান সুন্দর এক জন মানুষ বা ব্যক্তি পরিচয়ে নিজ জীবন গভীরে আপন হৃদয়-অন্তর-আত্মাকে দেখতে পাই; তা যেন মানুষ হিসেবে আমাদের জীবনের "স্বাদ", জীবনের মজা; জীবনটাই যেন একটি মজার কথা, জীবন গভীরে নিত্য চলমান সর্বময় নীরব কথা! উদাহরণ স্বরূপ, ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা তাঁর শিশুসুলভ ক্ষুদ্র জীবনটিকে মণ্ডীতে "প্রেম" রূপে বিবেচনা করেছিলেন; প্রেমস্বরূপ হওয়াই ছিল তাঁর জীবনের পরিচয়, তাঁর অন্তরের চেহারা, তাঁর হৃদয়-অন্তর, তাঁর জীবনের আনন্দ ও সার্থকতা। আমাদের প্রত্যেকের জীবনকেই সেই রূপ একটি মূল ভাব বা পরিচয় দিয়ে বুঝতে পারা যায়, যদিও আমরা তা সব সময় নির্ধারিত ব্যাখ্যা দিয়ে তা প্রকাশ করি না বা করতেও পারি না। তবে জীবনে এইভাবে মূল উত্তম পরিচয় আয়ত্ব করা সহজ বিষয় নয়: তা আয়ত্ব করার জন্য জীবনভর দৈহিক ও আত্মিক পরিশ্রম ও অধ্যবসায় প্রয়োজন হয়, ঈশ্বরের পুণ্য কৃপা-আশীর্বাদ এবং অন্য ভাইবোনদের সহায়তাও প্রয়োজন হয়।

তবে আমাদের জীবনকে এভাবে একেবারে গুছিয়ে নিলে পর আমরা আমাদের জীবনটিকে ২টি বিশেষ অনুভূতি ও অনুরাগ সহকারে যাপন করে আনন্দিত থাকি: তা হল যে আমাদের জীবনটি "সুন্দর" এবং যে আমরা তা "ভালোবাসি"। অসুন্দর হওয়ার ও অপছন্দের হওয়ার অভিজ্ঞতাও আছে বটে; তবে শেষমেষ "সুন্দর" ও "ভালোবাসা" এই দু'টি কথাই আমাদের মন-প্রাণের শুরুর ও সদা-সর্বদা অনুরাগ এবং মুখের সার্বক্ষনিক উচ্চারণ। কবি-মহাকবি, ছোট-বড় আমরা সবাই দিনভর সময়ভর কেবলই চিন্তা করি, বলি আর লিখি, "তুমি সুন্দর, আমি ভালোবাসি"। কথা ২টি খুবই সহজ মনে হয়; তবে বিষয় ২টি কোনভাবেই এত সহজ নয়! যথার্থভাবে নিজ ও অন্য সবার জীবনকে সুন্দর বলে বুঝতে হয় ও যথার্থভাবে ভালোবাসতে হয়; এলোমেলো ভাবে হলে চলে না। আবার সুন্দর ও ভালোবাসা ব্যাপারে আরও কঠিন আরেকটি বিষয়ও আছে: কেননা "তুমি সুন্দর, আমি ভালোবাসি" বলার মধ্যদিয়ে আমরা সুন্দরকে "পাওয়া"-র বা লাভ করার, সুন্দরকে পেয়ে নিজে লাভবান হওয়ার দিকটি বুঝি; তা ভাল বটে, তবে সুন্দরকে নিয়ে তা কেবল "চাই চাই" ব্যাপার, অনেকটা স্বার্থপর কথা। কিন্তু সুন্দরকে নিয়ে এত যে "চাই চাই" কথা, তবে সুন্দর যেন হয়, যাতে আমাদের চাওয়া পূরণ হয়, তা আরও চিন্তার বিষয়। তাই "তুমি সুন্দর, আমি ভালোবাসি" -- এই সহজ কথাটির বিপরীতে দ্বিতীয় আরেকটি পরিশ্রমের কথা রাখতে হয়, অর্থাৎ "আমি ভালোবাসি, তুমি সুন্দর হও"। প্রথমে আমাদের ভালোবাসা দিয়ে সুন্দরকে সৃষ্টি করতে হয়, সুন্দরকে রচনা করতে হয়; আর রচনাকৃত সুন্দর বিষয়টিকে সুন্দর হিসেবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয় তা আমাদের দায়িত্ব ও পরিশ্রম; এভাবেই সৃষ্টিকর্তা তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকে ভালোবাসার পরিশ্রম দিয়ে সুন্দর রূপে সৃষ্টি করেছেন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন। পৃথিবীর সমস্ত অসুন্দরকেও ভালোবাসার তেজময় শক্তি দ্বারা পুনরায় সুন্দর করতে হয়! সুন্দরকে ভালোবাসার আগে সমস্ত কিছুকে এমনকি অসুন্দরকে অলৌকিক ভালোবাসা দিয়ে সুন্দর করার দায়িত্ব ও পরিশ্রমের কথাটি আমরা যেন ভুলে না যাই। যা সুন্দর তা আমরা ভালোবাসি; তবে আরও কঠিন ও প্রয়োজনীয় বিষয় হল, আমরা যেন সব কিছুর সুন্দরকে সৃষ্টি করি, সব কিছুর সুন্দরকে রক্ষণাবেক্ষণ করি, সমস্ত অসুন্দরকে সুন্দর করি।

সুন্দর ও ভালোবাসাময় জীবনটিকে জীবনভর ২টি ধাপে যাপন করি

আমাদের জীবনটি, সাথে সৃষ্টির সকল বস্তু-উদ্ভিদ-প্রাণীর জীবন, এমনকি সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের জীবনও একই সাথে ২'টি প্রধান ধাপে চলে: এর মধ্যে প্রথম ধাপটি হল বিষয়টির নিজস্ব জীবনের ধাপ, তার নিজের গঠনের ধাপ, সে কে বা কী তা বিবেচনা করার ধাপ, নিজের জীবনটিকে একক ভাবে নিজের হিসেবে দেখার ধাপ; আর দ্বিতীয়টি হল নিজ থেকে প্রসারিত হয়ে আরও বিস্তারিত ধাপ, তা তখন নিজস্ব জীবন আশে পাশে অন্য সব কিছুর সাথে দেখে নিয়ে চলার ধাপ, সবার সাথে মিলিয়ে নিয়ে জীবনের আচরণের ধাপ।

উদাহরণস্বরূপ চিত্রকর চিত্র রচনা করতে গিয়ে প্রথমত দেখে চিত্রটি নিজে নিজে কেমন হবে, বিভিন্ন অংশের রং, দাগ, টান ইত্যাদি খুব বিবেচনা করে টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে সমস্ত অংশ পরস্পরের সাথে মিলিয়ে নেয়ার পর একটি সমন্বিত পূর্ণ চিত্র পরিপূর্ণ চেহারায় ফুটে উঠে। তখন চিত্রকর চিত্রটির "স্বকীয় গঠন" নিয়ে মগ্ন; তিনি নিজ ছোট ঘরে একলা বসে বা বাইরে কোন উন্মুক্ত স্থানে বসে বসে চিত্রটির আকার-প্রকার, চিত্রটির স্বকীয় রূপ কী হবে, তা নিয়ে মগ্ন। চিত্রটিও নিজে যেন নিজেকে ছাড়া অন্য আর কিছু দেখে না; শুধু দেখে যে "আমি" আছি, সবটাই কেবল আমি আর আমি: নিজের কাছে নিজেকে ব্যাখ্যা করে বলি, আমি একটি গাছ, বা একটি পাখী, বা একজন মানুষ, বা একটি সুন্দর চিত্র, ইত্যাদি; আমি সুন্দর, আমি নিজেকে ভালোবাসি। এই পরিচয় ও এই অনুভূতিটি হল চিত্রটির, তথা সব বস্তু-জীব-প্রাণীর জীবনের একক কিছু হওয়া: জীবনের এরূপ একক পরিচয় হল জীবনের "তত্ত্বকথা"।

তবে এই একক স্বকীয় গঠনের, জীবনের এই তত্ত্বকথার পাশাপাশি দ্বিতীয় আরেকটি কথাও থাকে, আরেকটি ধাপ থাকে। অর্থাৎ চিত্রটি রচিত হয়েছে তার জীবন পথে একা একা স্থবির হয়ে থাকার জন্য নয়; বরং পরবর্তীতে অনেকের মাঝে এবং অনেকের সাথে এক হয়ে গিয়ে বৃহত্তর নতুন পরিচয়ে চলমান থাকার জন্যে, আগামীতে বহু দিন ও বহু বছর ধরে। তাতে চিত্রটির নব নব পারস্পরিক বৃহত্তর পরিচয়ে তার জীবন সার্থক হবে! চিত্রটির জীবন কাটবে হয় তো চিত্রকরের বাড়িতে তার স্বজনদের মাঝে, হয়ত তাকে কোন প্রিয় মানুষকে উপহার দেয়া হবে, নতুবা কেউ তাকে নিয়ে ঘরে সবার দেখার মত করে সাজিয়ে রাখবে, নতুবা সে স্থান পাবে কোন চিত্রাগারে সবার দেখার উদ্দেশে। আর তখন চিত্রটির জীবনে শুধুমাত্র "আমি আছি" প্রিয় অনুভূতি নয়, বরং "আমি আছি-তুমি আছ" পারস্পরিক প্রিয় অনুভূতি। আর সেই পারস্পরিক অনুভূতিতে দীর্ঘকাল বহুর মাঝে ও বহুর সাথে অবস্থান ও চলাচল করে, দীর্ঘকাল ধরে কত প্রিয়জন ও প্রিয় পরিবেশে থেকে আনন্দ আশা, সাহস পাবে; আনন্দ, আশা, সাহস দিবে আজীবন কত জনকে কত কাল ধরে! এই দ্বিতীয় ধাপে চিত্রটির রচনার মূল নীরব চেতনা কত অভাবনীয়, অপ্রত্যাশিত

ও বিস্ময়কর রূপে বিস্তারিত হবে, ব্যাপ্তি পাবে দিনের পর দিন আগামী বহু দিন ধরে! জীবনে সবার সাথে পারস্পরিক হয়ে গিয়ে জীবন যাপন করা, পরস্পরের জীবনের প্রতি মনোযোগী হয়ে, পরস্পরের জীবনকে সুন্দর করে ও পরস্পরকে ভালোবেসে মিলে মিশে একাত্ম ও জীবন্ত হয়ে চলা; আমাদের জীবনের সবার সাথে ও সবার মাঝে আনাগোনার জীবন-যাপনের সেই বিস্তারিত ধাপটি হল জীবনভর জীবনের "ভক্তিকথা"।

ছোট বেলা থেকে শেখা আমাদের আছে ৪টি নিবেদন প্রার্থনা, যথা বিশ্বাস নিবেদন, আশা নিবেদন, ভক্তি নিবেদন ও অনুতাপ নিবেদন: এর মধ্যে আশা নিবেদন হল জীবন বলতে যা আছে তা চিরকাল থাকবে; কেননা যা কিছু সত্য রূপে আছে, তা আবার কোন এক দিন "আর নেই", কেমন করে হতে পারে? তা চিরদিন থাকবে, যদিও হতে পারে ভিন্ন ও বিবর্তিত আকারে ও চেহারাতে! আর অনুতাপ নিবেদন হল, স্বর্গস্থ পিতার মত পূর্ণ হওয়ার পথে আমরা পাপের কারণে যতটুকু বিচ্যুত হই ও কম হই, তা নম্র হয়ে স্বীকার করে নিয়ে পূর্ণতার পথে যেন এগিয়ে চলতে পারি। অন্য ২টি নিবেদন প্রার্থনায়, তথা বিশ্বাস নিবেদন প্রার্থনায় আমরা ঈশ্বরের জীবনকে "সত্যস্বরূপ, সর্বজ্ঞ ও প্রতারণার অতীত" বলে স্বীকার করি, তাতে ঈশ্বরের জীবনকে "সর্ব-সত্যময়" বলে স্বীকার করি, যা ঈশ্বরের জীবনের "তত্ত্বকথা"; সেভাবে আমাদের জীবনের তত্ত্বকথাও বুঝতে হয়। এবং ভক্তি নিবেদন প্রার্থনায় আমরা ঈশ্বরকে "পুণ্যতম, ভক্তিভাজন, তোমার প্রেমে আপন প্রতিবেশিকে আত্মবৎ প্রীতি করি" বলে ঈশ্বরের জীবনের প্রেমময়তা তথা ভক্তিময়তা স্বীকার করি, যা ঈশ্বরের জীবনের "ভক্তিকথা"; সেভাবেই আমরা আমাদের নিজেদের জীবনের ভক্তিকথাও স্মরণ করি।

জীবনের তত্ত্বকথা নিয়ে আলোচনা

আমাদের জীবনটিকে একদিকে তত্ত্বকথা হিসেবে আবার অন্যদিকে ভক্তিকথা হিসেবে দেখতে হয়, জীবনভর সেই ২'টি ধাপে নিজ জীবনকে উপলব্ধি করতে হয়।

উপরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের জীবনের তত্ত্বকথা হল নিজস্ব গঠনের বিষয়টি। আমরা সারা জীবন ধরে কিছু একটা হই, আমরা বড় হই, আমরা অনেক কিছু হই। এর মধ্যে আমরা আবার কিছু জিনিস মনে করি যে হই; তবে তা মিছেমিছি, আসলে নয়, সত্যিকারভাবে হই না; আবার আমরা এলোমেলো ভাবেও বড় হই। তবে আমরা যা-ই হই, সত্যস্বরূপ হতে হয়, সততায় হতে হয়, এবং সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে, দেহ ও আত্মা একসাথে গুছিয়ে নিয়ে একত্রিত করতে হয়, "এক" হতে হয়। তার মধ্যদিয়ে আমাদের জীবনটি আসল অর্থে সুন্দর হয়, আসল অর্থে বড় হয়; নিজেই নিজ জীবনটিকে অন্তরে রেখে ভালোবাসার মত একটি জীবন হয়। ঈশ্বর যেমন সত্যস্বরূপ, আমাদের জীবনও যেন তেমনি "সত্যস্বরূপ" হয়। এমন জীবন নিয়ে অহংকারী যেন না হই, তবে সত্যস্বরূপ যেন হই; তখন নিজেকে নিয়ে আমাদের আনন্দ সঠিক হয়, যথার্থ হয়।

আমাদের জীবন এরূপ সত্যস্বরূপ ও সুন্দর হওয়ার ব্যাপারে আবার মনেও রাখতে হয় যে, আমাদের জীবন হল সমস্তই "পাওয়া"; সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের, প্রকৃতির, পিতামাতাদের ও ভাই-বোন কত মানুষের প্রসাদ থেকে পাওয়া। জীবনটা যেন কত প্রসাদ থেকে পাওনা; সমস্তই যেন পেতে হবে, তবে অধিকার রূপে নয়, বরং প্রসাদরূপে; প্রসাদরূপে পাওনা! তাই তো জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠভাবে বড় হতে হয়, হওয়া যায়, এবং হইও বটে; তবে অহংকারে নয়, বরং বিনয়ভরে! জীবনে শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকতেও হয়, কেননা কতজন থেকে তাদের শ্রেষ্ঠ ও ভালোবাসার বিষয় থেকে যে পাই। জীবনে সব পেয়ে তা অপচয় করতে হয় না, ময়লা দিয়ে বিকৃত বা নষ্ট করতে হয় না; কেননা তেমন করলে কাজটি অসৎ হবে। ঈশ্বরের ব্যাপারে যেমন তেমনি আমাদের ব্যাপারেও জীবনের তত্ত্বকথাতে, অর্থাৎ জীবনের গঠন নিয়ে সত্য ও সৎ থাকতে হয়। আমাদের জীবনের সত্য ও সততার পূর্ণতা আজই না-ও থাকতে পারে; তবে সততার বীজ ও শিকড় সর্বদাই সংরক্ষণ করতে হয়। জীবনের সততা ও সততার সৌন্দর্য সর্বদা আকাঙ্ক্ষা করতে হয়, অন্তর গভীরে প্রার্থনার মত করে রাখতে হয়।

জীবনের ভক্তিকথা নিয়ে বিশদ আলোচনা

আমরা জীবনের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে উঠে আপন জীবনের তত্ত্বকথায় কেবলই বড় হতে চাই, এবং বড় হই। তবে সিঁড়ির উপরে উঠে গিয়ে তারপর কী হয়? উপরে উঠে গিয়ে কেবল বসে থেকে থেকে নিজের মধ্যে আটকা পড়ে নিশ্চল নিথর নিস্তব্ধ হয়ে থেকে থেকে শুকিয়ে যাওয়া যায়। নতুবা উপরে ওঠে বড় হওয়ায় অন্তরের মূল্যবান ভার থেকে ক্ষুদ্রদেরকে দিতে দিতে নিচে নেমে এসে অন্তরে হালকা তথা ক্ষুদ্র হতে হয়। উপরে ওঠার চেয়ে নিচে নেমে আসার সময়ে জীবনের জীবনময়তা শতগুণ বেড়ে যায়। সাধারণভাবে উপরে ওঠার সময়ে বড় হওয়ার চিন্তা-চেতনা অন্তরটাকে দখল করে রাখে; আর নিচে নামার সময়ে শুভভাবে ছোট বা ক্ষুদ্র হওয়ার চিন্তা-চেতনা ভিতরে ভিতরে বেশি চলমান হয়ে জীবনকে ভাবিয়ে রাখে। তবে জীবনে উঠা-নামার মজার বিষয় হল যে, মন যা-ই অনুভব করুক না কেন, বাস্তবে যে নিচে আছে, সে-ই মাত্র উপরে উপতে পারে, তাকে-ই উপরে উঠতে হয়; আর যে উপরে আছে, সে-ই মাত্র নিচে নামতে পারে, নিচে নামতে হয়। উপরে ওঠা নিচে অবস্থান করার বাস্তবতা জানিয়ে দেয়; আর নিচে নেমে আসা উপরে অবস্থান করার কথা বলে দেয়! আমরা ছোট হলে উপরে ওঠে বড় হই; আর বড় হলে নিচে নেমে ছোট হই! উঠা-নামার কোন বেলায় যে আমরা ছোট আর কোন বেলায় বড়, তা অতি বিস্ময়কর!

জীবনের বড় হওয়ার বেলায় জীবনের গঠনের বেলায় আমরা নিজেকে নিয়ে বেশি মগ্ন থাকি, আমি কে বা কেমন হয়ে আছি, কেমন হতে পারি; তবে বড় হয়ে গিয়ে ক্ষুদ্র হওয়ার বেলায় আমরা অন্যদের তথা বহু ক্ষুদ্রদের জীবনের প্রতি নিমগ্ন হই, তাদের জীবনের সাথে মিলে যাই, এক হয়ে যাই।

সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, স্বর্গ-মর্ত অসৃষ্ট ও সৃষ্ট সমস্ত বহু কিছু নিয়ে বিরাট এক সমাবেশ, বহু গুণে বৃহৎ এক মহাশূন্যে! এখানে যে কেউ নিজেকে একক ও একা মনে করতেও পারে, একক ও একা হয়ে চলতেও ইচ্ছা ও চেষ্টা করতে পারে; তবে তা বাস্তবে করতে চাইলে সব নিথর হয়ে থেমে যাবে মুহূর্তে, নিজ নিজ তত্ত্বকথার ক্ষুদ্র বেড়ীতে। জীবনময় এই সমগ্র স্বর্গ-মর্তে কারও পক্ষে একক ও একা হয়ে চলাচল মোটেই সম্ভবপর নয়, কোনভাবেই বাস্তবতা নয়। এইভাবে সব কিছু পাশে পাশে থেকে পারস্পরিক হয়ে চলাচল করা স্বর্গ-মর্তের মহা-নিয়ম, যা না হলে সমস্তই এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকত। বিজ্ঞানের ভাষায় পারস্পরিক হয়ে চলার এই নিয়মটি হল "মধ্যাকর্ষণ", অন্তরের ভাষায় তা হবে "অনুরাগ"; হৃদয়-আত্মার গভীরের ভাষায় তা হয় "প্রেম", যা শেষ প্রান্তে উপাসনা-আরাধনার ধারায় এসে হয় "ভক্তি"!

জীবনের ভক্তিকথা

ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট মানব জীবন আচরণে ঐ পারস্পরিকতার ও অনুরাগের নিয়মটি গভীর হয়ে প্রেম ও ভক্তি রূপে প্রকাশিত। প্রেম ও ভক্তি হল মানব আত্মার ও মানব জীবনের অলৌকিক সৌন্দর্য! পূর্বেই যেমন বলা হয়েছে, আমরা সেইরূপ সুন্দরকে ভালোবাসি এবং আমাদের অলৌকিক ভালোবাসা দিয়ে অন্যকে সুন্দর করি।

আমাদের জীবনে কথাবার্তায় ও আচরণে প্রেম ও ভালোবাসা কথাটি শত শত বার প্রয়োগ করে থাকি। তবুও কথা থেকে যায়, প্রেম ও ভালোবাসার আচরণে আমরা মূলত কী করি, প্রেম কি কেবল একটি সুন্দর অনুভূতি, না প্রেম আমাদের অন্তরের একটি শুভ পরিশ্রম, আত্মিক পরিশ্রম; এমনি এমনি নয়।

প্রেম হল ভক্তি নিবেদন, ভক্তির পরিশ্রম। আমাদের অন্তরে অহং-ভক্তি তথা নিজেকে ভক্তি করার ঊর্ধ্বে অন্যকে ভক্তি করতে হয়, তাকে শ্রদ্ধাভরে অনুরাগে, বলতে গেলে "আরাধনার মত" করে স্থান দিতে হয়, হোক সে ক্ষুদ্র-বৃহৎ, হোক সে পাপী-তাপী দীন জন। এরূপ ভক্তি আচরণ আমাদের অন্তরে অন্যদের নিয়ে প্রার্থনার মত হয়, উপাসনার মত হয়। তারা হয় ভক্তিভাজন; তাদেরকে পবিত্রতার আবেশে দেখতে পাই।

অন্যদের প্রতি এরূপ ভক্তি আচরণ করতে করতে আমারা নিজ অন্তরে নিজেকেও ভক্তি রূপে দেখতে পাই, ভক্তিভাজন রূপে দেখতে পাই; পবিত্রতার আবেশে দেখতে পাই। জীবনের তত্ত্বকথায় আমরা যেন নিজেকে সত্য ও পরিচ্ছন্ন করে দেখতে পাই; জীবনের ভক্তিকথায় আমরা যেন অহংমুক্ত হয়ে সবার সাথে একাত্ম হই ও পবিত্রতার পথে চলমান থাকি, শেষে ঈশ্বরের হৃদয়ে ভক্তিময় হই॥

“কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা” একটি নৈতিক প্রশ্ন

ফাদার সুনীল রোজারিও

কম্পিউটার আবিষ্কারের পর থেকেই এই ডিভাইসটি খুব দ্রুত নানা কাজের সহায়ক হয়ে উঠছে। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে যখন বিশ্লেষণধর্মী ডিজিটাল কম্পিউটার আবিষ্কার হয়, তখন থেকে এর পারদর্শিতা ও কাজের পরিধি আরো বাড়তে থাকে। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে আলেন টার্নিং নামের একজন বৃটিশ কম্পিউটার বিজ্ঞানীর “Computing Machinery and Intelligence” শিরোনামে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক ধারণা সম্বলিত একটি গবেষণাপত্র “গরহফ” নামক একাডেমিক জার্নালে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই এই নিয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণা শুরু হয়। গবেষণাপত্রের মূল বিষয় ছিলো- যন্ত্রের স্বয়ংক্রীয় আচরণ সম্ভাবনা। গবেষণার শুরুতেই ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে এই ভবিষ্যৎ যন্ত্রের নামকরণ করা হয় Artificial Intelligence বা “কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।” পরের বছর নিউ হাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যের ডার্টমউথ কলেজে একদল গবেষক দুই মাস ধরে এক কর্মশালায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। সেই থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে নানামুখী গবেষণা। আজকের Artificial Intelligence বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নানা গবেষণার বাস্তব অবস্থান।

বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম এবং তার নেতাগণ বর্তমান প্রযুক্তি এবং ক্রমবর্ধমান উন্নয়নশীল প্রযুক্তির সঙ্গে জড়িত নৈতিক বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। তারা বলতে চান, প্রযুক্তির ক্রমবর্ধনশীল উন্নয়ন স্বাভাবিক কিন্তু তার কারণে মানুষের মধ্যে নৈতিক অধঃপতণ ও অবক্ষয় যেনো না ঘটে। এইসব প্রযুক্তির মধ্যে সাম্প্রতিককালের “কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা” (অৎঃরভরপরধষ ওহঃবষষরমবহপব) যেভাবে মানুষের কার্যকলাপ, ব্যক্তি ও সামাজিক জীবন, রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করছে- তা তাদের মতে, “সমন্বিত মানব উন্নয়ন” ত্বরান্বিত করার বিরুদ্ধ আচরণ। যদি যন্ত্রই মানুষকে সব বলে দিবে তাহলে ঈশ্বর কেনো মানুষকে প্রতিভা দিয়েছেন। মানুষের প্রতিভা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেল কী বলে– “ঐশ আত্মাকে প্রকাশ করার ক্ষমতা প্রত্যেককে দেওয়া হয় সকলেরই মঙ্গলের জন্য। একজনকে পবিত্র আত্মা দান করেন প্রজ্ঞার ভাষা, আর একজনকে সেই পবিত্র আত্মাই দান করেন ধর্মজ্ঞানের ভাষা, আর একজনকে সেই আত্মাই দান করেন পরম বিশ্বাস। কাউকে আবার একই আত্মা দান করেন রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা। অন্য কাউকে নানা অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা, অন্য একজনকে প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণা করার ক্ষমতা, অন্য কাউকে নানা আত্মিক শক্তির স্বরূপ বিচার করার ক্ষমতা। অন্য কাউকে নানা অজ্ঞাত ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা। অন্য কাউকে আবার সেই ভাষা বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা। কিন্তু এই সমস্ত কিছুই সেই এক অদ্বিতীয় আত্মার কাজ। তাঁর আপন ইচ্ছা মতো যিনি এক একজনকে এক এক বিশেষ শক্তি দিয়ে থাকেন (*১ম করিন্থীয় ১২:৭-১১*)”। বাইবেলের ভাষায়, ঈশ্বর প্রতিটি মানুষকে যার যার মতো করে প্রতিভা দিয়েছেন- সৃষ্টি করার জন্য। কিন্তু এই সৃষ্টি যেনো হয় মানুষের কল্যাণের জন্য এবং সৃষ্টি যেনো কিছুতেই নৈতিকতাকে অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে না দেয়। সুতরাং প্রযুক্তির ভূমিকা হবে মানবজাতির কল্যাণ ও উৎকর্ষসাধন- নৈতিকতা বর্জন নয়, আধ্যাত্মিকতার বিনাশ নয়।

ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ক’রে মানুষের হাতে তা তুলে দিয়েছেন, যেনো মানুষ তাঁর সৃষ্টিকে আরো সুন্দর করতে পারেন। বিশ্ব সৃষ্টির মধ্যে মানুষ হলেন উত্তম। “ঈশ্বর বলিলেন, তোমরা ফলবান ও বহুবংশ হও এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর” (*আদি ১:১৮*)। “বশীভূত” করার অর্থ এই নয় যে, মানুষের ধারণার মধ্যে ঈশ্বরের অভিপ্রায় বদলে দেওয়া, নৈতিকতা ও পাপের ধারণা (ঘড়ঃরড়হ ড়ভ ঝরহ) বদলে দেওয়া। যন্ত্র যদি মানুষের মতো আচরণ করে তাহলে নতুন প্রজন্ম যন্ত্রের আচরণের মধ্যে বেড়ে উঠবে। যদি তাই হয়, তাহলে ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কেমন হবে? নাকি ঈশ্বরের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক তৈরি হবে? গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখে পোপ ফ্রান্সিস বিশ্বের নামকরা প্রযুক্তি ইনডাস্ট্রি কর্মকর্তা, ধর্মীয় নেতা ও থিওলজিয়ানদের সঙ্গে এক বৈঠকে এই প্রশ্নগুলো রেখেছেন। পোপ তাঁদের বলেছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্রুত আগমন সরাসরি মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রভাব বিস্তার করছে। পোপ ফ্রান্সিস প্রযুক্তির উন্নয়নের প্রশংসা করে বলেন, “প্রযুক্তির উন্নয়ন যেনো বিশ্বে ন্যায্যতা ও শান্তি স্থাপনে সহায়ক হয়”। পোপ আরো বলেন, “নতুন প্রযুক্তি প্রবর্তন করার পূর্বে অবশ্যই মূল্যায়ন করে দেখতে হবে, তাতে নারী-পুরুষের মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে কিনা”। বৈঠক শেষে কাথলিক, ইহুদি এবং মুসলিম নেতারা এক যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর ক’রে গবেষকদের উদ্দেশে বলেছেন, তারা যেনো “নৈতিক অবকাঠামোর মধ্যে প্রযুক্তি” সীমাবদ্ধ রাখেন। গত আগস্টের ৮ তারিখে ভাতিকান থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, “কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ধারণা ও ব্যবহারের মধ্যে দায়িত্বশীল হতে হবে, যেনো এগুলো মানবতার সেবায়, ধরিত্রী রক্ষা, নৈতিক শিক্ষা ও ধর্মীয় বিধান নিশ্চিত করে”। সুতরাং প্রযুক্তিগত উন্নয়ন হবে “বিশ্বে ন্যায্যতা ও শান্তি” স্থাপনে সহযোগিতা করা। আগামী ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ১ জানুয়ারির বিশ্ব শান্তি দিবস উপলক্ষে পোপ যে বাণী দিবেন তার মূল বিষয় হবে “কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং শান্তি।”

ভাতিকান সংবাদ সংস্থা অন্য একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ৫৮তম বিশ্ব সামাজিক যোগাযোগ দিবসে পোপের বাণীর মূল বিষয় হবে, “কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও হৃদয়ের প্রজ্ঞা: পরিপূর্ণ মানবীয় যোগাযোগের জন্য”। যা ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়- মানুয়ের হৃদয়ে রেখে দেওয়া ঈশ্বরের জ্ঞান দিয়ে মানুষের মধ্যে যে জ্ঞানের প্রসার ঘটছে, তা যেনো হয় মানুষের কল্যাণের নিমিত্তে, যেনো মানবিক নৈতিকতার সীমা অতিক্রম না করে। বার্তায় বলা হয়েছে যে, “কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এ বিবর্তন পদ্ধতি যন্ত্রের দ্বারা ও যন্ত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা এতো স্বাভাবিক করে তুলছে, যার কারণে যন্ত্রের তৈরি চিন্তা, ভাষা ও মানুষের তৈরি ভাষার পার্থক্য নির্ণয় করা ক্রমবর্ধমানভাবে কঠিন হয়ে উঠছে”। মনে হচ্ছে, মানুষের যোগ্যতাকে অতিক্রম করতে যাচ্ছে যন্ত্রের যোগ্যতা। মানুষ সামাজিক জীব, তাই কোনোভাবেই উচিৎ হবে না- যন্ত্র দিয়ে মানুষকে একাকীত্ব ক’রে তোলা। একটি স্কুলে যদি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যন্ত্রকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়, তাহলে ভেবে দেখুন সেই যন্ত্রের সঙ্গে শিক্ষকদের সম্পর্ক কেমন হবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সখ্যতা আর যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের সখ্যতা এক হবার নয়। যোগাযোগ ব্যবস্থাটা শুধু বার্তা ও তথ্যের আদান প্রদান নয়- কিন্তু মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে মিশে যাওয়া ও তাতে ক’রে বেড়ে ওঠা। মানুষের উপর যন্ত্রের কর্তৃত্ব নয় কিন্তু যন্ত্রের উপর থাকতে হবে মানুষের কর্তৃত্ব।

আর একটি নৈতিক প্রশ্ন হলো, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে মানুষের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা কী ব্যহত হবে? সংশয়টা এখানেই, জ্ঞান উন্নয়নের যে স্বাভাবিক প্রবণতা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান- তার তাগিদ থেকে মানুষ সরে যাবে। ফলে জ্ঞান চর্চার বিবর্তন থেমে যাবে আর মানুষ নির্ভরশীল হয়ে পড়বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার তৈরি ভাষা, ইঙ্গিত ও উচ্চারণ কখনোই মানুষের ভাষা, ইঙ্গিত ও উচ্চারণের সমকক্ষ হতে পারে না। তবুও বিদ্যালয়ের কৃত্রিম শিক্ষক যে ভাষা, ইঙ্গিত, উচ্চারণ-আচরণ করবে- ছাত্ররা তাই অনুকরণ করবে। এটা হয়ে দাঁড়াতে পারে মানুষকে অপসারণ করে সেখানে যন্ত্র স্থান করে নেওয়া। প্রশ্নবাক্যে যন্ত্র যখন সঠিক আচরণ করার জন্য সচেতন হয়ে ওঠে, তখন মানুষের মধ্যকার মানবিক গুণ স্থবির হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি করতে পারে, অবক্ষয় হতে পারে নৈতিকতার। অন্যদিকে মানুষের গোপনীয়তাও হুমকির মধ্যে পড়তে পারে। কারণ মেসিনের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ ও সেগুলোর বিশ্লেষণের ক্ষমতা দিন দিন তীব্র হয়ে ওঠছে। যে বিশ্লেষণ থেকে মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ বাদ যাবে না।

সুতরাং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার সীমা অতিক্রম করার আগেই কিছু সর্বজনীন পদক্ষেপ নিতে হবে যেনো মানব সমাজকে নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিতে না পারে। প্রথমত: গবেষকদের দায়িত্ব নিয়ে এগুতে হবে- যেনো যান্ত্রিক উন্নয়ন মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান উন্নয়নে অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়। আর সমান্তরালভাবে দেখতে হবে- মানুষের বাক্যের চেয়ে যন্ত্রের মাদকীয় বাক্যের প্রতি মানুষের ভালোবাসা যেনো চরমে না ওঠে॥

মট্‌স: যেখানে শিখতে শিখতে আয় করা যায়

ড. আলো ডি'রোজারিও

১। আমি প্রায় ৪০ বছর আগেকার কথা লিখছি। সেসময় মট্‌স-এর ব্যাপারে আমার আগ্রহ জেগেছিল এই তথ্য জেনে যে, এটা কারিতাসের একমাত্র প্রকল্প যেখানে 'শিখতে শিখতে আয়' করা যায়। পরবর্তীতে আরো একটি কারণে এই প্রকল্পের ব্যাপারে আমার আরো বেশি আগ্রহ জাগে, আর তা ছিল শ্রদ্ধেয় জেফরী পেরেরা স্যারের বার বার বলা একটি কথা। তিনি মট্‌স সম্পর্কে প্রায়ই বলতেন: কারিতাস নামক মুকুটের অনেকগুলো রত্নের মধ্যে মট্‌স সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন। যারা অল্পবয়সী তাদের অবগতির জন্যে লিখছি: শ্রদ্ধেয় জেফরী পেরেরা স্যার ছিলেন কারিতাস বাংলাদেশের তৃতীয় ও প্রথম বাংলাদেশী নির্বাহী পরিচালক। তার আগের দুই নির্বাহী পারচালক ছিলেন বিদেশী- সর্বপ্রথমে শ্রদ্ধেয় ফাদার চার্লস জে. ইয়াং সিএসসি, এরপরে শ্রদ্ধেয় ফাদার রিচার্ড উইলিয়াম টিম সিএসসি। এই তিনজনের একজনও বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে গত নভেম্বরের ২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত মট্‌স-এর সুবর্ণ জুবিলীতে উপস্থিত থাকতে পারতেন!

২। উপরোক্ত 'শিখতে শিখতে আয়' করা তথ্যের মানে ও জেফরী স্যারের বার বার বলা কথার তাৎপর্য জেনেছি ৩০ বছর আগে। মট্‌স-এ সরেজমিনে পরিদর্শনে গিয়ে তখন দেখেছিলাম তিন-বছর মেয়াদী কোর্সের ছাত্ররা (তখন কেবলমাত্র ছাত্ররাই ভর্তি হতে পারতেন) দ্বিতীয় বর্ষের শুরু থেকেই উৎপাদন কাজে অংশ নেয়, যা থেকে মটস-এর বেশ কিছুটা আয় আসে। তৃতীয় বর্ষের ছাত্ররা আরো বেশি সময় উৎপাদন কাজে তখন ব্যয় করত। সেই সময় আরো জেনেছিলাম: মটস-এ রয়েছে চার চারটে ইউনিট- প্রশিক্ষণ, উৎপাদন, বিপনন, এবং গবেষণা ও উন্নয়ন; মটস-এর পরিচালনা ব্যয় তখন পুরোটা আসতে উৎপাদন ইউনিটের আয় হতে; উপরন্তু ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার খরচসহ অন্যান্য খরচও বহন করা হতো উৎপাদন ইউনিটের আয় হতে। শুধুমাত্র গবেষণা ও উন্নয়ন ইউনিটের কাজের জন্যে মাঝেমধ্যে বিদেশী সহায়তা নেয়া হতো। বর্তমানে মট্‌স-এ তিন-বছর মেয়াদী কোর্সের পাশাপাশি চার-বছর মেয়াদী প্রকৌশল বিষয়েও ডিপ্লোমা ডিগ্রীর জন্যে পড়া যায়। আর বহু কারিগরী বিষয়ে বিভিন্ন মেয়াদী কোর্সও চলমান রয়েছে। এইসব কোর্সে মেয়েরাও ভর্তি হতে পারেন।

৩। কারিতাস সুইজারল্যান্ড শুরু থেকেই কারিগরি ও আর্থিক সহায়তাসহ বিশেষজ্ঞ দিয়ে মট্‌সকে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করেছে। বিশ বছর আগে আলাপ হচ্ছিল মট্‌স সম্পর্কে কারিতাস সুইজারল্যান্ডের লুজার্ণস্থ অফিসে। তখন কথায় কথায় কারিতাস সুইজারল্যান্ডের পরিচালকদের কাছ হতে জানতে পেরেছিলাম কারিতাস সুইজারল্যান্ড পূর্ব ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় মট্‌স-এর অনুরূপ অনেকগুলো প্রকল্পে পূর্বোক্ত তিন ধরনের সহায়তা দিয়েছিল স্বাবলম্বিতা অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে। আর এই ধরনের প্রকল্পে তাদের মোটামুটি সাফল্যের হার ২০ শতকরা ও আংশিক সাফল্যের হার ৪০ শতকরা। আর মট্‌স-এর ন্যায় পুরোপুরি সাফল্যের হার অর্জন করা সম্ভব হয়েছে মাত্র ১০ শতকরা প্রতিষ্ঠানের। সেজন্যেই সম্ভবত: শ্রদ্ধেয় জেফরী স্যার বলতেন- কারিতাসের মট্‌স হলো- কারিতাস মুকুটের সব রত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন। কারিতাস সুইজারল্যান্ডের সহায়তায় গড়ে তোলা বাকী ৩০ শতকরা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোনোরূপ সাফল্যের মুখ দেখেনি বলে বন্ধ হয়ে গেছে।

৫। দশ কি বারো বছর আগের কথা। আমি কারিতাসের নির্বাহী পরিচালক ও মট্‌স ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হিসেবে সেখানে গিয়েছিলাম তিন-বছর মেয়াদী কোর্স সমাপনান্তে সার্টিফিকেট বিতরণ করতে। আমাকে বলা হয়েছিল- সেদিন যারা সার্টিফিকেট নিচ্ছে তাদের চারজন বাদে বাকী সবার চাকুরীর বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। এমনকি বাকী চারজনের চাকুরীও দু'এক সপ্তার মধ্যে হয়ে যাবে। এমনিতরো সাফল্যের কথা আমি কেবলমাত্র শুনেই বিশ্বাস করিনি। সন্দেহ দূর করতে সার্টিফিকেট দেয়াকালে কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তদের চাকুরী হয়েছে কী না। তারা প্রায় সকলে হাসিমুখে উত্তর দিয়েছিলেন- স্যার, চাকুরী হয়ে গেছে। একজন আরো একটু যোগ করে বলেছিলেন- আমাদের তো স্যার আটজনের একই কোম্পানীতে চাকুরী হয়েছে। কী আনন্দের কথা! মনটা এক অবর্ণনীয় আনন্দে সেদিন ভরে উঠেছিল।

৬। তখন মি: মাইকেল বকুল গোমেজ মটস-এর পরিচালক। আমি ফোন পেলাম একটি নামকরা কোম্পানীর এইচআর ম্যানেজারের কাছ থেকে। ফোন করে সেই এইচআর ম্যানেজার বলেছিলেন,

- স্যার, আপনার একটু সহায়তা লাগবে।
- বলুন, কী সহায়তা করতে পারি?
- আমরা বেশ কিছু নতুন কর্মী নিচ্ছি। বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। অনেকেই আবেদন করেছেন। আবেদনকারীদের মধ্যে মটস-এর তৃতীয় বা শেষ বর্ষের ছাত্ররাও আছে। তাদের ফাইনাল পরীক্ষা চলছে বিধায় কর্তৃপক্ষ কিছুতেই অনুমতি দিচ্ছেন না বাইরে গিয়ে চাকুরীর জন্যে পরীক্ষা দিতে। অথচ আমাদের লিখিত পরীক্ষা হবে পরশু। সব ঠিকঠাক।
- কর্তৃপক্ষ তো সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। এই সময়ে চাকুরীর ইন্টারভিউ দিতে যাবে কীভাবে? তাদের ফাইনাল পরীক্ষা তো খারাপ হবে। ছাত্রদের কল্যাণের জন্যেই তো কর্তৃপক্ষ এই সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
- কিন্তু স্যার আমরা যে চাচ্ছি পরীক্ষা শেষ করার আগেই ওদের ধরে ফেলতে। সিলেকশন করে রাখতে। তা না হলে অন্য কোম্পানী তো আমাদের আগেই ওদের নিয়ে নিবে।

আরো আলাপের পর বিষয়টা আমার কাছে সেদিন স্পষ্ট হয়েছিল। মট্‌স-এর পাশ করা ছাত্রদের নিয়োগ দিতে বিভিন্ন দেশী-বিদেশী কোম্পানী রীতিমতো প্রতিযোগিতা করে। তাই তারা আগেভাগেই ইন্টারভিউ নিয়ে নিয়োগপত্র দিয়ে সবচেয়ে উপযুক্তদের পাওয়াটা নিশ্চিত করতে চায়। বিষয়টা আমার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হলো। তাই আমি তখন ফোন করে মট্‌স পরিচালককে বলেছিলাম ছাত্রদের নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নেবার অনুমতি দিতে। পরীক্ষা শেষ করার আগেই ছাত্রদের চাকুরী হয়ে যায় এমন শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আমার জানামতে বাংলাদেশে আছে হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র। মটস সেই হাতে গোনা অল্প কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি!

৭। মট্‌স বিষয়ক আরো একটি অভিজ্ঞতার কথা লিখি। রোম হতে দুবাই হয়ে ঢাকা ফিরছি। পথে দুবাইতে প্রায় ঘন্টা তিনেকের

(৭২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব: ভবিষ্যত কর্ম ও কর্মীদের নিয়ে ভাবনা

চয়ন এইচ রিবেরু

আজ কাল পত্র পত্রিকা, জার্নাল, সভা, সেমিনার, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সকল স্তরে যে বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয় তা হল চতুর্থ শিল্পবিপ্লব। পাশাপাশি সকল ক্ষেত্রেই সহজ কাজগুলো যা হাতে বা কায়িকপরিশ্রমে করা হতো, এখন তা যন্ত্রের দখলে চলে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলো ইন্টারনেট, তথ্যপ্রযুক্তি ও স্বয়ংক্রিয়তায় উৎপাদন কাজে নিয়োজিত হচ্ছে। যা অনেকের জন্য কর্ম শংকা দেখা দিচ্ছে, পাশাপাশি নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে।

বিশ্বায়ন, নগরায়ণ, জনসংখ্যার পরিবর্তন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের শক্তিগুলোর অভূতপূর্ব অভিসারণ ইতিমধ্যেই মৌলিকভাবে আমাদের জীবনযাত্রা এবং কাজ করার পদ্ধতি পরিবর্তন করছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং উন্নত রোবোটিক্সের ক্রমাগত অগ্রগতি উৎপাদনশীলতা এবং দক্ষতা এবং সুবিধা বৃদ্ধি করেছে, তারা অটোমেশনের কারণে চাকরি হারানোর ভয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সাম্প্রতিক COVID-১৯ বিশ্বব্যাপী মহামারী এবং আমরা কীভাবে কাজ করি তার ফলাফলগুলো এই শক্তিগুলোকে ত্বরান্বিত করবে। ইতিমধ্যে, শেয়ারিং অর্থনীতির বিঘ্নিত প্রভাব, যা পরিবহন এবং বাসস্থানের লোকেরা গভীরভাবে অনুভব করছে, তা আমাদের জীবনের অন্যান্য দিকগুলোতে ছড়িয়ে পড়তে থাকবে এবং এই সেক্টরগুলোর ঐতিহ্যবাহী সাড়াদানকারীদের সম্পূর্ণভাবে বদলে ফেলবে এবং তাদের দেওয়া চাকরিগুলোকে স্থানচ্যুত করবে। আরও, ৩D প্রিন্টিং, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, ইন্টারনেট অফ থিংস এবং ব্লক চেইনের দ্রুত উন্নয়নগুলো পণ্য তৈরি এবং পরিষেবাগুলো সরবরাহ করার পদ্ধতিতেও ব্যাঘাত ঘটাবে। বিশ্বব্যাপী সাপ্লাই চেইনের কনফিগারেশনে এবং কীভাবে ব্যবসা সেক্টর ও শিল্পের বিস্তৃত স্পেকট্রাম জুড়ে পরিচালিত হয় তার উপরও এগুলোর সরাসরি প্রভাব পড়বে। চাকরি, কাজ এবং কর্মীদের উপর প্রভাবের সম্পূর্ণ মাত্রা এখনও সম্পূর্ণরূপে বোঝা যায় নি।

এ জটিল পটভূমিতে, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং পঞ্চম শিল্পবিপ্লব প্রাক্কালে কাজের ভবিষ্যত এবং কাজের প্রকৃতি সম্পর্কে কর্মী, সংস্থা এবং সরকারগুলোর মধ্যে খুব উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা রয়েছে। চলমান পরিবর্তন সম্পর্কগুলোকে গ্রহণের পূর্বে গভীরভাবে বোঝার প্রয়োজন, এবং এর মধ্যে কোনটি গ্রহণ করা উচিত, কোনটি প্রতিরোধ করা উচিত এবং প্রতিটি ব্যক্তি, সম্প্রদায় এবং অর্থনীতির জন্য অনন্য ভবিষ্যতের জন্য কীভাবে সর্বোত্তম প্রস্তুতি নেওয়া উচিত।

কাজের নীতির ইতিহাস এবং বিবর্তন দিয়ে শুরু করে, এবং কিছু ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং ভিত্তি প্রদানের জন্য শিল্প বিপ্লব এবং শ্রমিক আন্দোলনের মতো বিষয়গুলোকে স্পর্শ করে, বর্তমানের মাত্রা এবং তীব্রতা আরও ভালভাবে বুঝতে আজকের প্রয়াস। পরিবর্তনগুলো কাজের জগতের আকার ধারণা করে এবং কী হতে চলেছে তার উপর একটি বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গি ও স্থানীয় প্রেক্ষাপটে নিহিত নির্দিষ্ট উদাহরণগুলো আমাদের অনুসন্ধান দৃষ্টিভঙ্গিও প্রসার ঘটবে।

কাজ কী

- ***মেরিয়াম-ওয়েবস্টার অভিধান:*** "মজুরি বা বেতনের জন্য নিয়মিত কাজ করা বা দায়িত্ব পালন করা"

- ***কেমব্রিজ অভিধান:*** "একটি কার্যকলাপ, যেমন একটি চাকরি, যা একজন ব্যক্তি শারীরিক বা মানসিক প্রচেষ্টা ব্যবহার করে, সাধারণত অর্থের জন্য"

-লেক্সিকো: "কোনো উদ্দেশ্য বা ফলাফল অর্জনের জন্য করা মানসিক বা শারীরিক প্রচেষ্টা জড়িত কার্যকলাপ" এর সরলতম স্তরে, কাজ একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য করা প্রচেষ্টা এবং কার্যকলাপ বোঝায়।

আইএলওর সংজ্ঞা: কাজের মধ্যে যেকোন লিঙ্গ ও বয়সের ব্যক্তিদের দ্বারা পণ্য উৎপাদন বা অন্যদের ব্যবহারের জন্য বা নিজের ব্যবহারের জন্য পরিষেবা প্রদানের জন্য সম্পাদিত যে কোনো কার্যকলাপ রয়েছে।

- কাজের আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক চরিত্র বা কার্যকলাপের বৈধতা নির্বিশেষে সংজ্ঞায়িত করা হয়। কাজ এমন ক্রিয়াকলাপগুলোকে বাদ দেয় যেগুলো পণ্য বা পরিষেবাগুলো (যেমন ভিক্ষা করা এবং চুরি করা), আত্ম-যত্ন এবং ক্রিয়াকলাপ যা অন্য কোনও ব্যক্তি নিজের পক্ষে সম্পাদন করতে পারে না।

- কাজের ধারণাটি ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টস ২০০৮ এর সিস্টেমে সংজ্ঞায়িত সাধারণ উৎপাদন সীমার সাথে সারিবদ্ধ এবং এর অর্থনৈতিক ইউনিটের ধারণা যা এর মধ্যে পার্থক্য করে:

- বাজার ইউনিট (অর্থাৎ কর্পোরেশন, আধা-কর্পোরেশন এবং পরিবারের অসংগঠিত বাজার উদ্যোগ); নন-মার্কেট ইউনিট (অর্থাৎ সরকারি এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠান যা পরিবারের সেবা করে); এবং যে পরিবারগুলো নিজের চূড়ান্ত ব্যবহারের জন্য পণ্য বা পরিষেবা উৎপাদন করে। কাজ যে কোনো ধরনের অর্থনৈতিক ইউনিটে সঞ্চালিত হতে পারে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে কর্ম ও কর্ম নিয়ে কেন এত উৎকণ্ঠা

কোভিড-১৯ আমাদের ভবিষ্যত অর্থনীতি,

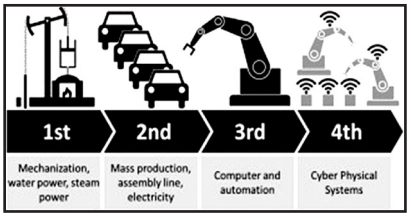

কর্মের গতিধারা এবং তথ্যপ্রযুক্তির অভিযোজন সম্পর্কে অনেক কিছু শিখিয়েছে। এ মহামারি শ্রমবাজার, সরবরাহ এবং শ্রম চাহিদার উপরও দ্রুত খারাপ প্রভাব পড়েছে। কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাব পণ্য ও পরিসেবার চাহিদা কমিয়েছে, ইনপুট সরবরাহ কমিয়েছে, তারল্য শক্ত করেছে এবং অনিশ্চয়তা বাড়িয়ে দিয়েছে। অনেক লোক কম আয়, ছাঁটাইয়ের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। স্থায়ীভাবে লাখ লাখ চাকরি চলে গেছে।

একই সময়ে, আমরা একটি অভূতপূর্ব এবং দ্রুত পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছি যেভাবে যারা তাদের চাকরি রেখেছিলেন, গৃহ-ভিত্তিক কাজ হঠাৎ করে নতুন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। এমনকি COVID-১৯ মহামারীর আগেও, প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে যুক্ত বিভিন্ন ধরনের ব্যাঘাত এবং চাহিদার প্যাটার্ন পরিবর্তন ইতিমধ্যেই অনেক দেশে শ্রমবাজারকে চ্যালেঞ্জ করেছিল।

এই পরিবর্তনগুলির মধ্যে কয়েকটি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদনে হাইলাইট করা হয়েছে, "কাজের পরিবর্তনশীল প্রকৃতি":

১. শ্রমবাজারে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়

দক্ষতার মিশ্রণে বড় পরিবর্তন। প্রযুক্তির পরিপূরক উন্নত (সাধারণ জ্ঞানীয় এবং সামাজিক আচরণগত) দক্ষতার চাহিদা বেড়েছে, যেহেতু রুটিন কাজগুলো স্বয়ংক্রিয় হয়ে উঠেছে, এবং কর্মীদের মধ্যে উন্নত অভিযোজন যোগ্যতার বেড়েছে;

২. ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের দ্রুত স্কেল আপ এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার ব্যাঘাত। ডিজিটাল প্রযুক্তি ফার্মগুলোর ঐতিহ্যগত সীমানাকে চ্যালেঞ্জ করে, বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খল এবং চাকুরির ভূগোল পরিবর্তন করে;

৩. তথাকথিত গিগ অর্থনীতির উত্থানের কারণে লোকদের কাজের পরিবর্তন, যেখানে সংস্থাগুলো বেতনভোগী কর্মী হিসাবে কর্মীদের ধরে রাখার পরিবর্তে স্বল্পমেয়াদী কাজের জন্য স্বাধীন কর্মীদের চুক্তি করে;

৪. এই বৈশ্বিক পরিবর্তনগুলো সত্ত্বেও, ২০১৯ বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদনে এই বৈপরীত্যটি তুলে ধরা হয়েছে যে অনেক উন্নয়নশীল দেশে, বিপুল সংখ্যক কর্মী নিম্ন-উৎপাদনশীল চাকুরিতে রয়ে গেছে, প্রায়শই অনানুষ্ঠানিক খাতের সংস্থাগুলোতে যেখানে প্রযুক্তির প্রবেশগম্যতা দুর্বল ছিল। সামগ্রিকভাবে, গত দুই দশক ধরে এই অর্থনীতির শ্রমশক্তির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ অনানুষ্ঠানিক খাতে রয়ে গেছে; শ্রমবাজারে এই পরিবর্তনগুলোর প্রতিক্রিয়া হিসাবে, কাজের ভবিষ্যত নীতি এজেন্ডা অন্তর্ভুক্ত করা।

শিল্প বিপ্লব

প্রথম শিল্প বিপ্লব শুরু হয় ১৭৬০ এবং ১৮২০/১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যা ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন প্রক্রিয়াগুলোতে একটি বড় পরিবর্তন হয়েছিল। ব্রিটেনে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে সুতি কাপড়ের উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়েছিল। ব্রিটেনে কয়লা ও লৌহ আকরিকের সংমিশ্রণ ছিল যা বৃহত্তর মেশিন তৈরির অনুমতি দিয়েছিল। তবে একটি শক্তির উৎসেরও প্রয়োজন ছিল- প্রথমে এটি জলের গতিশীল ছিল এবং তারপরে এটি বাষ্প ছিল। মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, উৎপাদন বাড়ি এবং দোকান থেকে কারখানায় বড় আকারে সরানো হয়েছে। এর ফলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে। এর অনেক পরিণতি আজও অনুভব করা যায়। মানব সমাজের একটি মৌলিক পুনর্গঠন ছিল এবং লোকেরা কাজের সন্ধানে বড় শহরে স্থানান্তরিত হয়েছিল। এটি নগর পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা তৈরি করে এবং আরো দক্ষ মানুষ ও আরও দক্ষ যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয়ে উঠে। পাশাপাশি এটি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠার দিকে পরিচালিত করেছিল। নতুন কারখানা এবং ব্যাপকভাবে উৎপাদিত পণ্যগুলোরও নতুন বাজারের প্রয়োজন ছিল, দেশগুলোর জন্য বাণিজ্যের নতুন সুযোগ তৈরি করা এবং ফলস্বরূপ অন্যান্য কাঁচামাল অ্যাক্সেস করা। যা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গঠনে সহায়ক হয়েছিল।

দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব

এটি ছিল ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ ৪র্থ দশকের মাঝামাঝি থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে এবং এতে যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার জড়িত ছিল। বাষ্প থেকে বিদ্যুতের উপর

নির্ভরতা বাড়ে। দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবের মূল পরিবর্তনগুলোর মধ্যে ছিল: হেনরি ফোর্ডের মুভিং অ্যাসেম্বলি আরও গ্রামীণ থেকে শহরে অভিবাসনের প্রেরণা তৈরি করেছে। এটি উৎপাদিত পণ্য, কেন্দ্রীভূত উৎপাদন, এবং অ্যাক্সেস বৃদ্ধি করেছে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ছাড়াও, দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব রেলওয়ে ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করেছে। উৎপাদনের জন্য যন্ত্রপাতি, বৃহৎ স্কেল লোহা, ইস্পাত উৎপাদন, রেলপথ, বিদ্যুৎ এবং পেট্রোলিয়াম ব্যবহার শুরু, যা অত্যন্ত শক্তিশালি শিল্প সমাজের ভিত্তি তৈরী করেছিল এবং পরবর্তীতে অনেক উদ্ভাবনের ভিত্তি এবং শর্ত উভয়ই তৈরি করেছে।

তৃতীয় শিল্প বিপ্লব

তৃতীয় শিল্প বিপ্লব ১৯৫০-খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়েছিল। এটি সম্পর্কে চিন্তা করার একটি ভাল উপায় ছিল এটি এসেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসের অবকাঠামো পুনর্গঠনের সামান্য পরে। যা আমাদের জীবনে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে এবং মানব সমাজকে নতুন রূপ দান করে। তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে: ইলেকট্রনিক্সে অগ্রগতি, টেলিযোগাযোগ (ইন্টারনেট সহ),কম্পিউটারের ব্যবহার, ইত্যাদি। তাই একে কখনো কখনো ডিজিটাল বিপ্লব বলা হয়। তৃতীয় শিল্প বিপ্লব মহাকাশ অনুসন্ধান, আণবিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির দ্বার উন্মুক্ত, জীববিজ্ঞান, কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা, জৈবপ্রযুক্তি, জিনোমিক্স এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ব্যাপকভাবে হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয় ব্যবসায়িক কম্পিউটারের মাধ্যমে, তারপর মাইক্রোসফ্ট এবং অ্যাপলের গল্প, স্মার্ট ফোন (যা ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র কম্পিউটার সংস্করণ বলা চলে)। ইন্টারনেটের আবির্ভাব তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের গল্প সম্পূর্ণ করা বলা যেতে পারে। তৃতীয় শিল্প বিপ্লব আমাদের জীবনযাপনকে, সমাজকে ও কাজকে ব্যাপক পরিবর্তন করেছে এবং সংগঠিত করেছে। অন্যদিকে আমরা কীভাবে চিন্তা করি এবং কীভাবে কর্মক্ষেত্রে আমাদের কাজগুলোর সাথে যোগাযোগ করি তা পরিবর্তন হয়েছে। আমরা এখনও তৃতীয় শিল্প বিপ্লবে বাস করছি, তবে তৃতীয় শিল্প বিপ্লব এখন সম্পূর্ণ/শেষের দিকে আসছে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব

এই বিপ্লবের প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন সম্পর্কে কথা বলা এবং আনপ্যাক করা, কাজ এবং কর্মীদের ভবিষ্যত গঠন কথা বলা। ইন্টারনেটে অগ্রগতি এবং অবিশ্বাস্য সূচকীয় বৃদ্ধির সাথে শুরু কম্পিউটিং শক্তি (আপনার স্মার্ট ফোন সহ), কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং, রোবোটিক্স, 3D প্রিন্টিং, ব্লকচেইন, ইন্টারনেট থিংস ইত্যাদি শক্তিগুলোই কাজের ভবিষ্যত গঠন করবে (যার মধ্যে "কাজ" এর অর্থও রয়েছে) এবং শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবটি গড়ে উঠেছে ডিজিটাল উত্থান দিয়ে। যার মধ্যে যুক্ত হয়েছে বহুমাত্রিক প্রযুক্তি, যেগুলো অর্থনৈতিক, ব্যবসায়িক, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত পরিসরে অভূতপূর্ব রূপান্তর ঘটাবে। এ বিপ্লব শুধু আমরা কী করছি এবং কীভাবে কর্মকাণ্ড করছি, তা বদলে দিবে না, বরং আমাদের পরিচয়ই নতুনভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে ভবিষ্যৎ কর্মী ও কর্ম সম্পর্কে যে বিষয়গুলোতে সচেতনতা দরকার

১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে ভেসেলিনা স্টেফানোভা রাচেভা ডাটা লিড, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম নিবন্ধটি তো অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি অনুশীলন, নতুন অর্থনীতি ও সমাজের কেন্দ্র, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম নতুন চ্যাম্পিয়নদের বার্ষিক সভায় কাজের ভবিষ্যত লক্ষ লক্ষ কর্মী এবং কোম্পানির জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে আজকের বাস্তবতা উঠে এসেছে এবং পৃথিবী জুড়ে, আমাদের সাম্প্রতিক ফিউচার অফ জবস রিপোর্টের ফলাফলগুলো প্রত্যাশিত প্রবণতাগুলোর দিকে নজর দেয়।

১) অটোমেশন, রোবটাইজেশন এবং

ডিজিটাইজেশন বিভিন্ন শিল্প জুড়ে আলাদাভাবে সাথী করে নিয়েছে। উচ্চ-গতির মোবাইল ইন্টারনেট, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বড় ডেটা বিশ্লেষণ এবং ক্লাউড প্রযুক্তি সেট করা। কোম্পানিগুলোর নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের জন্য নেতৃত্ব দেওয়া। ব্যবসায়িক বিনিয়োগের জন্য মেশিন লার্নিং এবং অগমেন্টেড এবং ভার্চুয়াল বাস্তবতার দিকে নজর দেয়া;

২) চাকরির জন্য একটি নেট ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে - উল্লেখযোগ্য কাজের ব্যাঘাতের মধ্যে চলতি বছরের মধ্যে, আজকের নতুন উদীয়মান পেশাগুলো ১৬% থেকে ২৭% কর্মচারী বৃদ্ধি পাবে এবং বিপরীতে ৩১% থেকে ২১% কমতে পারে। অর্থাৎ প্রায় ৭৫ মিলিয়ন চাকুরী হারাতে পারে এবং পাশাপাশি মানুষ, মেশিন এবং অ্যালগরিদমের মধ্যে শ্রমের বিভাজনে স্থানান্তরিত হওয়ার সময় ১৩৩ মিলিয়ন নতুন কাজের ভূমিকা একই সময়ে আবির্ভূত হতে পারে। ক্রমবর্ধমান পেশাগুলোর মধ্যে রয়েছে ডেটা বিশ্লেষক, সফ্টওয়্যার এবং অ্যাপ্লিকেশন বিকাশকারীর মতো ভূমিকা এবং ই-কমার্স এবং সোশ্যাল মিডিয়া স্পেশালিস্ট - যে কাজগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে বলা যায়। এছাড়াও প্রত্যাশিত কাজের ভূমিকার উপর ভিত্তি করে স্বতন্ত্রভাবেও মানব্র বৈশিষ্ট্য, যেমন গ্রাহক পরিসেবা কর্মী, বিক্রয় এবং বিপণন পেশাদার, প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়ন, মানুষ এবং সংস্কৃতি, এবং সাংগঠনিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে;

৩) মানুষ, মেশিন এবং অ্যালগরিদমের মধ্যে শ্রমের বিভাজন দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে নিয়োগকর্তারা মানুষ, মেশিন এবং শ্রমের বিভাজনে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের আশা করছেন;

৪) আমাদের ফিউচার অফ জবস রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত শিল্পগুলো মানুষের দ্বারা সঞ্চালিত হয়, এর তুলনায় ২৯% মেশিন বা অ্যালগরিদম। চলতি বছরের মধ্যে এই গড় মানুষের দ্বারা সম্পাদিত ৫৮% কাজ ঘন্টায় স্থানান্তরিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে, এবং মেশিন বা অ্যালগরিদম দ্বারা ৪২%। মোট কর্মঘণ্টার পরিপ্রেক্ষিতে, আজ প্রধানত মেশিন বা অ্যালগরিদম দ্বারা সম্পাদন হচ্ছে। চলতি বছরের মধ্যে, সংস্থার ৬২% ডেটা প্রক্রিয়াকরণ এবং তথ্য অনুসন্ধান এবং ট্রান্সমিশন কাজ মেশিন দ্বারা সঞ্চালিত হবে; (ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম)

৫) কর্মক্ষেত্রে নতুন কাজগুলো নতুন দক্ষতার চাহিদা বাড়াচ্ছে এবং এর মধ্যে বেশিরভাগ কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে স্থানান্তরিত হবে। বিশ্বব্যাপী গড় "দক্ষতা স্থিতিশীলতা" - একটি কাজ সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় মূল দক্ষতার অনুপাত প্রায় ৫৮% হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তার মানে শ্রমিকের প্রয়োজনে গড়ে ৪২%। দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে বিশ্লেষণমূলক চিন্তাভাবনা এবং সক্রিয় শিক্ষার পাশাপাশি নতুন প্রযুক্তি ডিজাইনের মতো দক্ষতার চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬) "মানব" দক্ষতা যেমন সৃজনশীলতা, মৌলিকতা এবং উদ্যোগ, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, প্ররোচনা এবং আলোচনা একইভাবে তাদের মূল্য বজায় রাখবে। পাশাপশি বৃদ্ধি করবে বিশদ, স্থিতিস্থাপকতা, নমনীয়তা এবং জটিল সমস্যা সমাধান দেবে। মানসিক বুদ্ধি, নেতৃত্ব এবং সামাজিক প্রভাবের পাশাপাশি পরিসেবা অভিযোজনও বিশেষভাবে চাহিদা বৃদ্ধি পাবে;(ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম)

৭) আমাদের সকলকে আজীবন শিক্ষার্থী হতে হবে এবং কর্মীদের পুনঃপ্রশিক্ষণ এবং আপস্কিলিংয়ের প্রয়োজন হবে। শিল্পের উপর নির্ভর করে ভূগোল, কোম্পানির একের-অর্ধেক এবং দুই-তৃতীয়াংশের মধ্যে বহিরাগত হতে পারে, যারা ঠিকাদার, অস্থায়ী কর্মী এবং ফ্রিল্যান্সাররা তাদের দক্ষতার ঘাটতি পূরণ করতে। একটি ব্যাপক কর্মশক্তি পরিকল্পনা, পুনঃস্কিলিং এবং আপস্কিলিংয়ের পদ্ধতি

ইতিবাচক, সক্রিয়তার চাবিকাঠি হবে।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউএফ) বিশ্বের আট শতাধিক কোম্পানির ওপর একটি সমীক্ষা করে গত মে ০৩, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে, ২০২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নিয়োগকর্তারা ৬ কোটি ৯০ লাখ নতুন চাকরি সৃষ্টি এবং ৮ কোটি ৩০ লাখ চাকরি বাদ দেয়ার লক্ষ্য নিয়েছেন। অর্থাৎ বিশ্বের ১ কোটি ৪০ লাখ মানুষ চাকরি হারাবেন। যা বর্তমান কর্মসংস্থানের ২ শতাংশ। ২ কোটি ৬০ লাখের মত রেকর্ড কিপিং ও প্রশাসনিক পদের চাকুরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে করানো সম্ভব হবে। এতে করে ডাটা এন্ট্রি ক্লার্ক ও নির্বাহী সচিবরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখিন হবেন বলে অশঙ্কা করা হচ্ছে।। সারা বিশ্বে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে চাকুরির বাজারে ব্যাপক বিপর্যয় ঘটে যাবে। অর্থনৈতিক সংকটের কারণে প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের পরিবর্তে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো প্রযুক্তি ব্যবহার করে এসব কাজ চালাবে। ডব্লিউইএফ অনুমান করছে, ব্যবসা বাণিজ্য-সম্পর্কিত সব ধরনের কাজের ৩৪% বর্তমানে মেশিন দ্বারাই পরিচালিত হয়। এতে করে, একদিকে যেমন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে, তেমনি নেতিবাচক ভূমিকাও রাখবে। তবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে পরিচালিত করার জন্য নতুন দক্ষ কর্মীও লাগবে। ডব্লিউইএফ বলছে, সার্বিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কর্মীদের কী কী দক্ষতা প্রয়োজন, তা পুনর্বিবেচনা করছে। প্রতিষ্ঠানগুলো এখন দক্ষভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সরঞ্জাম ব্যবহারের ক্ষমতাকে কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

বিশাল থেকে বিশালতর অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞে ইন্টারনেট, তথ্যপ্রযুক্তি এবং স্বয়ংক্রিয়তা স্বজ্ঞানে বৃদ্ধি করা হচ্ছে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির স্বার্থে। বিদ্যালয়ে পাঠদান, পরীক্ষা নেওয়া, চাল-ডাল থেকে শুরু করে অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সেবা ও পণ্য কেনা এবং উৎপাদনের নানা ক্ষেত্রে ইলেট্রনিক ব্যবস্থার প্রয়োগ ক্রমেই বাড়ছে। একদিকে কায়িক-যান্ত্রিক কর্মসংস্থান আরো দশক টিকিয়ে রাখা এবং পাশাপাশি বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার সুযোগ করে দিয়ে ক্ষমতায়নের ব্যবস্থা করা গেলে আমাদের কর্মক্ষম বিশাল জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগিয়ে দেশের আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক চলমান অগ্রযাত্রাকে আরো শক্তিশালী করবে, যা বাংলাদেশকে উন্নত, সমৃদ্ধ, প্রাযুক্তিক, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, মৌলবাদমুক্ত টেকসই ও লাগসই কল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত হবে। বর্তমানে সবচেয়ে বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি আমরা, তার মধ্যদিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নতুন নতুন প্রযুক্তি এবং এ প্রযুক্তিগুলো বুঝা ও করায়ত্ত করা। এ প্রাযুক্তিক বিপ্লবে আমাদের জীবনযাপনের ধরন, কর্ম ও পারস্পরিক সম্পর্ক আমূল পরিবর্তন ঘটবে। তাই আমাদেরকে সেভাবে নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হবে।

তথ্যসূত্র:

দ্য ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভল্যুশন, ক্লাউস শোয়েব; অনুবাদ: মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

দৈনিক প্রথম আলো, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউএফ) গবেষণা নিবন্ধ

Future of work and workers Training Handout – Coady Institute, Canada, Internet.

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও বাণী প্রচারে খ্রিস্টভক্তদের ভূমিকা

চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু

খ্রিস্টান সম্প্রদায়ভূক্ত আধুনিক প্রজন্মের অনেকেরই জানা আছে, বাংলার মাটিতে বহিরাগত পর্তুগীজ ব্যবসায়ী মহল খ্রিস্টধর্ম প্রচারে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দির জেজুইট সম্প্রদায়ের যাজকগণ মোঘল সম্রাটদের সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে তৎকালিন বঙ্গদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠাকালে, ভূষণা রাজ্যের অপহৃত রাজপুত্রকে মুক্ত করতঃ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দেন এবং প্রৈরিতিক কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করে তিনিই বাঙ্গালি খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে বাংলার মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করে ধন্য করেছিলেন। বিভিন্ন তথ্যমতে দোম আন্তনিও দ্যা রোজারিওর মধ্যস্থতায় নাগরী গ্রামটি ক্রয় করা হয়। ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দ থেকেই মূলতঃ ভাওয়াল পরগনার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নবীন খ্রিস্টভক্তদের সংঘবদ্ধ করে নাগরীতে পুনবাসিত করা হয়েছিলো। ইতিহাসের মূল্যবোধ না থাকায় সনাতনপন্থি রাজপুত্রের আদি নামটিরও কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি বিধায় একই পথ অবলম্বন করে, পর্তুগীজ বংশ পরিচয় নিয়ে ধর্মান্তরিত দেশীয় খ্রিস্টভক্তরা অদ্যাবধি বাংলার মাটিতে মাথা উঁচু করে বেঁচে আছেন। স্থানীয় মণ্ডলীর তৎকালিন প্রশাসন ব্যবস্থায় দেশী-বিদেশীদের বৈষম্যের কারণেই পরিস্কার একটি ধারণার সৃষ্টি হতে পারে, কিভাবে দোম আন্তনিওর পরিবারের পরিচয়টিও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো।

প্রথম গির্জা প্রতিষ্ঠাঃ

১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবরের অনুমোদনক্রমে চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় জেজুইট যাজকদের মধ্যস্থতায় নতুন খ্রিস্টভক্তদের উপাসনার উদ্দেশ্যে প্রথম গির্জাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো বলে জানা যায়। ১৬২২ খ্রিস্টাব্দে মোঘল সম্রাট জেজুইটদের দ্বন্দ্বের কারণে, তারা চলে যান। মগ দস্যুদের হাতে বন্দি রাজপুত্রকে আরাকান থেকে ফাদার ম্যানুয়েল ডি'রোজারিওর উদ্যোগে ৬০০ টাকার বিনিময়ে কারামুক্ত করে, তাঁকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা হয় এবং দোম (রাজপুত্র) আন্তনিও দ্যা রোজারিও নামে তাকে পরিচিত করা হয়। পর্তুগীজ ভাষা আয়ত্ব করার উদ্দেশে তাকে বোম্বে পাঠালে তিনি বাণী প্রচারে দক্ষতা অর্জন করেন। ১৬৬৬-১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে তারই মাধ্যমে ত্রিশ হাজার লোককে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছিলো বলে জানা যায়।

স্থানীয় মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠিত অবকাঠামোঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে দু'টি মহাধর্মপ্রদেশ ও ছয়টি ধর্মপ্রদেশসহ মোট আটটি ধর্মপ্রদেশ রয়েছে। প্রথম বাঙ্গালি বিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসিই প্রথম বাঙ্গালি আর্চবিশপ এবং স্থানীয় ক্যাথলিক মণ্ডলী মনোনীত সম্ভাব্য প্রথম সাধু শ্রেণীভুক্ত হতে চলেছেন। মহান গাঙ্গুলীর মতো বাংলার মাটিতে আরো সাধু পুরুষ এসেছিলেন বটে! বাণী প্রচারে গোড়ার দিকে ১৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে ২৩ মার্চ, মুন্সিগঞ্জের শ্রীপুরস্থ ফাদার ম্যানুয়েল গার্সিয়া, মোঘল সম্রাটের জঙ্গি সেনাবাহিনীর হাতে নিহত ১৬ জন যাজক ও সাড়ে চার হাজার দেশী ও নিহত পর্তুগীজ খ্রিস্টভক্তদের মাঝে একজন বাঙ্গালি যাজক ছিলেন। তিনি সে যুগের একজন সাধু পুরুষ বলে তথ্য রয়েছে। আগ্রা কবরস্থানে তিনি চির নিদ্রায় নিদ্রিত আছেন। ফাদার ম্যানুয়েল ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের ব্যান্ডেল চার্চের বাঙ্গালি খ্রিস্টানদের একজন অন্যতম পথ প্রদর্শক এবং সে যুগের একজন ধর্মপ্রদেশীয় যাজক। বাঙ্গালি খ্রিস্টভক্তরা বহুকাল তার সমাধিতে ধূপধুনা ও পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে সাধুর মর্যাদা দিয়েছেন বলে জানা যায়। ভাটিকান রাষ্ট্রের রহস্যময় কারণে ফাদার ম্যানুয়েল গার্সিয়ার নাম যেখানে সাধু হিসেবে অজ্ঞাত তৎকালিন সম্রাজ্যবাদি মণ্ডলীভুক্ত পর্তুগীজ মিশনারীদের কারণে একজন অসাধারণ বাণী প্রচারক দোম আন্তনিও দ্যা রোজারিওর জীবনে পাঁচটি আশ্চর্য কাজ করার আলামত নিয়েও ধন্য শ্রেণীভুক্ত হতে পারেন নি। মহান দোম আন্তনিওর পথ ধরে বাংলাদেশের স্থানীয় মণ্ডলীর উৎকর্ষ সাধনে যারা বাণী প্রচারের কাজ করে গেছেন, খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাসে তারা অবহেলিত এবং ইতিহাসের অন্ধ গুহায় চিরতরে হারিয়ে গেছেন। ভাওয়ালের তুমিলিয়ায় পালকীয় সেবা দিয়ে ঢাকার ভিকার জেনারেল ফাদার ক্রাউলি সিএসসি একশ বৎসর পূর্বে পাবনা জেলার মথুরাপুরে বাণী প্রচারের কাজে নিজেই স্বশ্রম সেবাদান করেছেন এবং ঢাকার বিশপের পদে স্থলাভিষিক্ত হন। সে যুগের মণ্ডলী প্রতিষ্ঠায় আদিবাসীদের মধ্যে যারা আত্মোৎসর্গ করেছেন এদের পরিচয় ছিলো মাষ্টার এবং পণ্ডিত। দোম আন্তনিওর অনুসারী মধ্যযুগের ভাওয়ালের দোমিঙ্গু (পণ্ডিত) রোজারিও দোম আন্তনিওর কৌশলে বাণী প্রচারের উদ্দেশ্য সাধু আন্তনির পালা গান, যিশুর লীলা, সাধ্বী আগ্নেসের পালা রচনা করে সর্বধর্মে বিশ্বাসী সাধারণ মানুষের মাঝে বাণী প্রচার করে প্রৈরিতিক কাজে বিশেষ ভূমিকা রেখে গেছেন। তার পথ ধরে নাগর (পণ্ডিত) রিবেরু, মঙ্গল ডি' কস্তা, মনাই আন্তনী ডি' কস্তা (মাষ্টার), ছিছিল রিবেরু (মাষ্টার), ডেঙ্গুরা পালমা (পণ্ডিত), হিরন ডি' কস্তা (পণ্ডিত), সাচাই ডি' কস্তা (পণ্ডিতগণ) প্রৈরিতিক কাজে সমৃদ্ধি লাভ করেন।

বাণী প্রচারে কবির গানঃ

পারিবারিক ষড়যন্ত্রে ভাওয়ালের রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ রায়, সিংহাসনচ্যুত হবার পর ভাওয়াল রাজা সন্ন্যাসীর ঐতিহাসিক মামলার রায়ে, রাজা মশাইর সিংহাসনে পূর্নবাসন হলে, ভাওয়ালের নাগরিক সম্বোধর্নায় রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর কবিয়াল নাগর ডি' রোজারিও, আসরে স্বরচিত গানে রাজাকে মুগ্ধ করেছিলেন, এবং পরবর্তীতে তিনি কবির গানকে বৈঠকী গান নামে বাইবেল ভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর দিয়ে বাণী প্রচারের কাজে যুগান্তকারি ভূমিকা পালন করেছেন। তার উত্তরসূরী পিটার (সরকার) রিবেরু এলাকায় বিখ্যাত এবং স্বনামধন্য গায়কে পরিণত হন। অতপরঃ তার শিষ্য এড্‌বিন ডি' কস্তা পিটার গায়েনের পথ ধরেই এলাকায় স্বনামধন্য গায়কে পরিণত হন। গ্রাম ভিত্তিক বৈঠকীগানের দলে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে তাঁরা এলাকায় সাড়া জাগান। গ্রাম থেকে ধর্মপল্লী এবং গোটা ভাওয়ালে বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং বিজয়ী দলকে কাপ প্রদানের মাধ্যমে সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের মাঝে বাণী প্রচার কর্মকাণ্ড তৎকালিন খ্রিস্টমণ্ডলীকে ধন্য করেছে। এ গানের প্রধান নেতা সর্দার নামে পরিচিত এবং তারা জনতার মাঝে সুখ্যাতি অর্জন করেন। এড্‌বিনের শিষ্য টমাস কস্তা, পিটারের শিষ্য ক্লেমেন্ট কস্তা (ভূঞা), রবি কোড়াইয়া, বাবু ডি' ক্রুজ, সুবাস ডি' রোজারিও, চড়াখোলার যোসেফ রিবেরু, পল ডি' কস্তা এবং তার পুত্র আব্রাহাম রিবেরু, আব্রাহাম অরুণ ডি' কস্তা সমাজে বৈঠকী গানের মাধ্যমে বাণী প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন।

নাটকাভিনয় ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনঃ

নাটকাভিনয়, যাত্রাপালার দল গঠন করে এলাকার সাধারণ মানুষকে নির্মল আনন্দ প্রদানের মাধ্যমে সাধারণ খ্রিস্টভক্তগণ বাণী প্রচারের ভূমিকায় বিশেষ অবদান রাখেন। ফাদার আলেকজান্ডার কস্তা, ফাদার পিটার এ গমেজ, ফাদার এলিয়াস রিবেরু, ফাদার যোয়াকিম দেছাই, ফাদার যাকব গমেজ (ভূড়া), সিলভেষ্টার রিবেরু, ষ্ট্যান্লি বিটু রিবেরু, ক্লেমেন্ট ডি' কস্তা (ভূএগ্রা), ক্লেমেন্ট ডি' কস্তা (গাজি), মার্ক ডি'কস্তা, সুনীল পেরেরা, কর্ণেলিউস গমেজ, সাচাই ডি' রোজারিও, অতুল রোজারিও, অনিল পিউরীফিকেশন, আঠারোগ্রাম ও ঢাকায় বিমল আন্তনি গাঙ্গুলি, নিধন ডি' রোজারিও, হেবল ডি' ক্রুশ, ফ্রান্সিস গমেজ, জর্জ ডি'রোজারিও, হিউবার্ট অরুন রোজারিও, ইউজিন ভিনসেন্ট গমেজ এর নাম উল্লেখযোগ্য। ক্রিড়া জগতে মারী চৌধুরী, লিও ছেড়াও, ইউজিন গমেজ, পলিনুস ম্রং, কেইন গমেজ, ডলি ডি' ক্রুজ, বার্ণাড ডি' রোজারিও, এন্ড্রু আর্থার, উইলিয়াম গমেজ বুলি, জর্জ দাস, বাবলু রিবেরু, বেনেডিক্ট (বেন্ডু) পিরিজ, উইলিয়াম রোজারিও (উলি), ক্লেমেন্ট কস্তা (ভূএগ্রা)র নাম উল্লেখযোগ্য। রাঙ্গামাটিয়ার ব্যাপ্টিষ্ট গোষ্ঠীর নেতা নিবারণ রায় (রোজারিও) কীর্তনের দল সংগঠিত করে বড়দিন ও ইষ্টারে বাড়ী বাড়ী ঘুরে গান গেয়ে মানুষকে আনন্দ দান করেছেন। সে কীর্তনই বর্তমান খ্রিস্টীয় সমাজে প্রতিযোগিতার আসরে স্থান করে নিয়েছে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ধারাঃ

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে স্বাস্থ্য সেবা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে খ্রিস্টমণ্ডলীর অবদান সর্বাধিক। বিভিন্ন গির্জাধীন দাতব্য চিকিৎসালয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে স্বাস্থ্য সেবায় খ্রিস্টান মিশনারীদের বিশেষ সুনাম রয়েছে। দরিদ্র মানুষের কল্যাণে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কালে খ্রিস্টমণ্ডলীর পক্ষে ত্রাণ সামগ্রী ও আর্থিক সহযোগিতার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

দরিদ্র খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড সোজা রাখার প্রত্যয়ে আর্চবিশপ লরেন্স গ্রেনার সিএসসি, ফাদার উইলিয়াম জে ইয়ং সিএসসির মাধ্যমে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা খ্রিস্টান সমবায় ঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠান করেন। পাশ্চাত্য ভাবধারায় গড়ে উঠা অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় করার উদ্দেশে গড়া সমবায়ে কিছু বাঙ্গালি খ্রিস্টান সংশ্লিষ্ট থাকায় বর্তমান বাংলাদেশে খ্রিস্টান সম্প্রদায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ফাদার ইয়ং এর অনুপ্রেরণা ধন্য মি. গুড্ ও মি. ম্যাকার্থীর প্রত্যক্ষ অবদান চির স্বীকার্য। বাঙ্গালিদের মাঝে প্রাথমিক সমবায় আন্দোলনে পিটার রিবেরু, পিটার ডি' কস্তা, যোয়াকিম দেছাই, জাকারিয়া ডি' কস্তা, যোনাস ডি'রোজারিওর, নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

কৃষি প্রধান খ্রিস্টান সমাজের আর্থিক উন্নয়নে নগরমুখি যুব সমাজ চাকুরিতে যোগ দিয়ে গ্রামবাসী পিতা-মাতা ও ভাই-বোনদের উন্নয়নকল্পে সেবাদান করেন। পাশাপাশি মেয়েরা নার্সিং পেশায় যোগ দিয়ে পরিবারের পাশে এসে দাঁড়ান। এ প্রক্রিয়ায় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, খুলনা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, বরিশাল, কেন্দ্রিক শহরগুলোতে খ্রিস্টান সম্প্রদায় বসবাস করতে থাকায় পারস্পারিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ে সমবায় ঋণদান আন্দোলন দেশব্যাপী জনপ্রিয় হয়ে উঠে। বিভিন্ন এলাকায় সমিতি গড়ে উঠার কারণে উঠতি সমাজ নেতাদের সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। সে যুগে মৌলিক গণতন্ত্রের প্রভাবে আপোষে নিজেরাই নিজ কাজে নেতা মনোনীত করতেন। সমাজে আন্তঃসাম্প্রদায়িক বৈষম্য হ্রাস পেতে থাকলে সাধারণ সদস্যদের মধ্যে নেতৃত্ব স্পৃহা জেগে উঠে। সমাজ পরিচালনায় আত্মঘাতি ও পেশীশক্তির নির্বাচন প্রক্রিয়া চালু হয়। ক্ষমতার মোহ বাড়তে থাকায় ক্রমানুসারে সমাজ বিভক্ত হতে থাকে। সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।" নীতিকে সামনে রেখে আন্তঃসাম্প্রদায়িক বৈষম্য পুনঃবৃদ্ধি পায়। দেশব্যপী জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে যথাযথ সুযোগের অভাবে বর্তমান প্রজন্ম নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নেতৃত্ব কুক্ষিগত করার অপচেষ্টায় খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য বিতর্কীত করে তুলছেন। সরকারী দলে রাজনীতি চর্চার অযোগ্যতায় হাতেগোনা কতিপয় ব্যক্তি সামাজিক রাজনীতি কবজা করে, নতুন নেতৃত্বের আগমনে গতি রোধ করে সামাজিক শৃংখলা বিনাশ করার মাধ্যমে পূর্ব পুরুষের অর্জিত সুনাম রক্ষা করা কঠিন আকার ধারণ করেছে।

দেশীয় খ্রিস্টভক্তদের রাজনীতিতে আবির্ভাবঃ

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের চেতনাধন্য করে, দেশীয় খ্রিস্টভক্তদেরকে বুঝান, "এদেশে যারা জন্মগ্রহণ করেছে এবং বাংলায় কথা বলে তারা সবাই বাঙ্গালি" এবং তাদের যথাযথ মর্যাদা দেয়ায়, পর্তুগীজ বংশপদবীধারী কথিত অরাজনৈতিক খ্রিস্টীয় সমাজ জাতিসত্বা বিকাশের সুযোগ গ্রহণ করে এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বশস্ত্রযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার গৌরবময় ইতিহাসে স্থান করে নেন। ইতিপূর্বে ভারত বিভক্ত হয়ে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান নামে দু'টো আলাদা রাষ্ট্রের জন্ম দেয়া ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক নেতাদের উস্কানিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়ে। সর্বধর্মে বিশ্বাসী হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করতে জাতির জনক, তার দলের সহযোগিতায় বাঙ্গালির পরিচয়কে শীর্ষে স্থান দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভিযান চালিয়েছেন। প্রাণ বাঁচাতে এবং সম্ভ্রমরক্ষায় পূর্ব বাংলার হিন্দু সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। একই ধারায় ভারতের বাংলা ভাষী মুসলমান ও বিহারি মুসলমানরা পাকিস্তানে অভিবাসন গ্রহণ করে সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের নবচেতনাকে জাগ্রত করে। ফলে সংখ্যার বিবেচনায় মুসলমান অধ্যুষিত বাংলাদেশে বর্তমানে ৯০ ভাগ মুসলমান, ৯ ভাগ হিন্দু, ০.৬ ভাগ বৌদ্ধ এবং ০.৩ ভাগ খ্রিস্টান রয়েছে বলে জানা যায়। বাংলাদেশে রোমান কাথলিকদের ইতিহাস প্রাচীন হলেও ব্রিটিশ শাসনামলে প্রটেষ্টান্ট মিশনারীদের বাণী প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। রেভা: ডঃ উইলিয়াম কেরী, পবিত্র বাইবেল বাংলায় অনুবাদ করে পবিত্র বাণী প্রচারে বিশ্ব ইতিহাসে বিশেষ স্থান করে নিয়েছেন।

রাজনীতি চর্চা ও মুক্তিযুদ্ধঃ

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী লীগের ছয়দফা আন্দোলনের যাত্রারম্ভ হলে তৎকালীন দলীয় প্রধান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও দলের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমেদসহ দলের নেতা কর্মীদের স্বদলবলে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হতে হয়। আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন ছাত্রলীগ, কৃষক-শ্রমিক লীগের নেতা কর্মীরাও কারাগারে বন্দি থাকতে বাদ যাননি। উৎসাহী খ্রিস্টান যুবগোষ্ঠী থেকে দিনাজপুর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রবার্ট আর.এন.দাস, বরিশালের ডেভিড মুখটি, আলবার্ট বিভু বাড়ৈ, ঢাকার শ্রমিক নেতা অমল ডি' রোজারিও, সুবাস ডি' কস্তা, ডনি গোমেজ কারাবরণ করে খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়কে ধন্য করেছেন।

পাবনার ডেভিড প্রণব দাস, ঢাকাস্থ ডেনিস দীলিপ দত্ত, দীপক লাল চৌধুরী, স্মীথ আর অধিকারী, রেডিও পাকিস্তান ঢাকার সুর শিল্পী সমর দাস, যোসেফ কমল রড্রিক্স, মৃত্যুঞ্জয় রেমা, ম্যাথিও দীপক বোসদের অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। ছাত্র রাজনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু, হিউবার্ট অরুণ রোজারিও, বেনেডিক্ট ডায়েস, সিমিয়ন আশ্বিষ দাস (ফেয়ার ক্রুশ) আলবিন

অনিল দেছা, ইন্দোলেখা সমাদ্দার, লুইসা বাসন্তি গমেজ, মেরী মনিকা গমেজ, নাথনিয়াল মৃদুল কান্তি দাস, উইলিয়াম গমেজ বুলি, পল মিলন কস্তা, ষ্টিফেন অমিয় সমাদ্দার, ক্লেমেন্ট ডি' রোজারিও, মাইকেল পিরিজ, বনিফাস সন্তোষ ডি'কস্তা, কলেজের ছাত্র ষ্টেনিসলাস প্রেমু ডি' রোজারিও, পেট্রিক কীরন ডি' রোজারিও, আলবার্ট পি. কস্তা, রবার্ট আর,এন,দাস, সুবল এল, রোজারিও, নেভেল ডি'রোজারিও, মন্টু লুইস অনিল কস্তা, জেমস রতন বিশ্বাস, নিরেন মালাকার, সিতাংসু সেনদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করেও ক্ষমতায় যেতে ব্যর্থ হলে আন্দোলনের রূপ বদলে যায়। ৩ মার্চ '৭১, পূর্বনিধারিত তারিখে সংসদ অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণায়, ১ মার্চ সামরিক শাসক আগা মুহাম্মদ ইয়াহিয়া খাঁন, আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধুকে বেইমান আখ্যায়িত করলে, ছাত্র-জনতার মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটে। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বটতলার প্রতিবাদ সভায় বিপ্লবী পতাকা উত্তোলনে অংশগ্রহণ করে লেখক পাকিস্তানের শত্রু তালিকাভূক্ত হলে খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে অরাজনৈতিক বলার যুক্তি হারায়। ৭ মার্চ এর মহাসভায় অধ্যাপক গাব্রিয়েল মানিক গোমেজ এর মাধ্যমে পবিত্র বাইবেল পাঠ করায় খ্রিস্টীয় গোষ্ঠির প্রত্যক্ষ রাজনীতির সমর্থন নিশ্চিত করা হয়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংগীত পরিচালক সমর দাস এবং পবিত্র বাইবেল পাঠক ডেভিড প্রণব দাস, অংশগ্রহণ করার পর ১৭ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ফাদার ফ্রান্সিস এ গমেজ (বিশপ), বাইবেল পাঠে স্টিফেন পিন্টু বিশ্বাস যিশু খ্রিস্টের নামে বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাস ধন্য করে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন।

আন্তঃধর্মীয় আন্দোলনে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ঃ

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে কাথলিক মণ্ডলীর উদ্যোগে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের যাত্রায় মানবাধিকার ও ন্যায্যতা নিয়ে নতুন অভিযান আরম্ভ হয়। ১৯৭০ এ পোপ ৬ষ্ঠ পৌল ফিলিপাইন যাত্রাকালে তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় এক ঘন্টা বিরতিকালে তার ভাষণ বাঙ্গালি জাতির মন কেড়ে নিয়েছিলো। অতঃপর, বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের ঐক্যবানে দেশীয় খ্রিস্টভক্তরাও রাজপথে নেমে আসে। ২৬ মার্চ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ করার নির্দেশ দিলে স্বদেশী খ্রিস্টীয় সমাজ-দল, মত, গোত্র ও ধর্ম বৈষম্য বদলে দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রক্তস্নাত বাংলাদেশের মাটি পবিত্র করনে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এর সংমিশ্রিত রক্ত একাকার হয়ে আন্তঃধর্মীয় পথযাত্রা আরম্ভ হয়েছিলো। আন্তর্জাতিক অপশক্তির কবলে পড়ে, স্বাধীনতা বিরোধী পক্ষ বাংলার মাটিতে নতুন আঙ্গিকে মৌলবাদের উত্থান ঘটায়। অতঃপর, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধন্য খ্রিস্টান যুব সম্প্রদায় বাংলাদেশ খ্রিস্টান যুব সমিতি গঠন করে ১৯৮০ এর নভেম্বর মাসে, ঢাকাস্থ নটর ডেম কলেজ মিলনায়তনে "সবার ওপর মানুষ সত্য" শিরোনামে দুঃসাহসিক এক আন্তঃধর্মীয় আলোচনা সভার আয়োজন করে। কয়েকশত মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন প্রখ্যাত দার্শনিক দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ এবং প্রধান অতিথি ছিলেন তৎকালিন মন্ত্রী মোহাম্মদ ইসমাইল। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশপ যোয়াকিম রোজারিও সিএসসি। আলোচকদের মধ্যে তৎকালিন ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর আবাসিক পরিচালক অধ্যাপক আব্দুল গফুর, "ইসলাম মানবতার ধর্ম" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ড. পরেশ চন্দ্র মন্ডল , "হিন্দু ধর্ম মানবতার ধর্ম" অধ্যাপক ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া "বৌদ্ধ ধর্ম মানবতার ধর্ম" রেভা ড. সাইমন সরকার "খ্রিস্টধর্ম মানবতার ধর্ম" বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন। যুব সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু এবং অধ্যাপক ষ্টিফেন অমিয় সমাদ্দার যুব সম্প্রদায়কে আন্তঃধর্মীয় অভিযানে অংশগ্রহণ করে যিশুর মহান বাণী প্রচারে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ম্যাথডিষ্ট যাজক রেভা পি, হোষ্টিংস "ইন্টার রিলিজিয়াস কাউন্সিল ফর পিস এন্ড জাষ্টিস (বিকপাস)" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে জার্মান যাজক ফাদার ক্লাউস বুয়েলি, "সোসাইটি ফর পিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এসপিডি) প্রতিষ্ঠা করে দীর্ঘকাল কার্যক্রম চালিয়েছেন। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে ১ জানুয়ারি, ফরহাদ খাঁ, আতিকুল ইসলাম ও চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরুর যৌথ আহ্বানে টিএসসি কেন্দ্রে সাধারণ সভার মাধ্যমে সৈয়দ তোষারফ আলি ও চিত্ত ফ্রান্সিস কে যথাক্রমে সভাপতি ও মহাসচিব নির্বাচিত করে বাংলাদেশ আন্তঃধর্মীয় লেখক ও সাংবাদিক সমিতি" গঠন করা হয়। বিভিন্ন সময়ে তারা বাহাই কেন্দ্রে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় প্রেসক্লাব, নীলক্ষেত গুরুদোয়ারায়, উত্তরা ডনবস্কো স্কুলে, ওয়াইএমসিএ মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করে বুদ্ধিজীবি মহলে সাড়া জাগিয়েছেন।

প্রকাশনা ও আন্তঃধর্মীয় অভিযানঃ

কাথলিক মণ্ডলীর সু প্রাচীন সংবাদ মাধ্যম সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পাশাপাশি ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ আগস্ট, পবিত্র ঈদুল ফিতর দিবসে, দেশের একমাত্র আন্তঃধর্মীয় সংবাদ মাধ্যম সাপ্তাহিক শিখা অনির্বাণ আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকাটির বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ধর্মতত্ত্ব বিভাগ প্রকাশক ও সম্পাদককে সম্মাননা পদক দান করে। একই সনে মাসিক ইছামতি বাণী, সাপ্তাহিক কুশল, চার্চ পরিষদের মুখপত্র সমকাল, চাঁদপুর বাইবেল সোসাইটি প্রকাশিত নবযুগ, সিসিডিবির স্বর্গমর্ত, মসিহী জামাতের আলোর ফোয়ারা বাইরের জগতে পরোক্ষ বাণী প্রচারের কাজ করে যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের গল্প ভিত্তিক চলচিত্র, ডেভিড প্রনব দাস এর "একাত্তরের যিশু" প্রৈরিতিক কাজে বাংলার মাটিতে সাধারণ খ্রিস্টভক্তের পক্ষে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছে।

বাণী প্রচারে স্বদেশী খ্রিস্টীয় সমাজঃ

রাজনৈতিক অঙ্গনে বঙ্গবন্ধুর অনুপ্রেরণায় বাঙ্গালি জাগরণের প্রাক্কালে দেশের প্রথম বাঙ্গালি আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস এ, গাঙ্গুলি সিএসসি বিশপ যোয়াকিম রোজারিও সিএসসি ও বিশপ মাইকেল রোজারিওর যৌথ অনুপ্রেরণায় ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় সুহৃদ সংঘ, ত্রিবেণী ছাত্র কল্যাণ সংঘ এবং খ্রিস্টান ছাত্র কল্যাণ সংঘ সহ পূর্ব পাকিস্তান খ্রিস্টান এসোসিয়েশন (বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশন) এর আর্বিভাব ও সামাজিক বির্বতন ঘটলে খ্রিস্টভক্তগণ বাঙ্গালির স্বীকৃতি পায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশীয় খ্রিস্টানদের মাঝে বাঙ্গালি, আদিবাসী ও ভিনদেশী মিশনারীদের অভাবনীয় অবদানে বাংলাদেশের ইতিহাস ধন্য হয়ে উঠেছে। দুই হাজারের উর্ধ্বে সক্রিয় খ্রিস্টান মুক্তিযোদ্ধার নাম খ্রিস্টান নেতৃত্বের অভাব ও মণ্ডলীর অবহেলায় মহা গৌরবের জাতীয় ইতিহাস থেকে হারিয়ে গেছে। স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করা না হলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী খ্রিস্টানদের সরকারী তালিকা থেকে সংগৃহীত সংখ্যা মাত্র ৪৩৮ জনের নামও হয়তো কারো পক্ষেই জানার উপায় ছিলোনা।

অজ্ঞতার কারনে পাঁচশতবর্ষ প্রাচীন খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের পরিচয় অনেকাংশে অজানা থাকলেও স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠায় খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। দেশগড়ার অভিযানে সরকারী কর্মসূচিতে সুযোগ সীমিত থাকলেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার অভিযানে, খ্রিষ্টিয় সম্প্রদায়ের ভূমিকা বর্তমান সমাজে সর্বাধিক আলোচিত এবং বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে॥

YMCA-এর কাজেই অনুপ্রাণিত আমার অনেক গান

ড. বার্থলমিয় প্রত্যুষ সাহা।

এ বছর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ২রা জুন মাসে, অনুষ্ঠিত হয়ে গেল চট্টগ্রাম ওয়াই এম সি এ'র আনন্দময় সুবর্ণ জয়ন্তী। সেই আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের কিছু দিন পূর্বে, জয়ন্তী উপলক্ষে 'স্মরণিকার' জন্যে আমার একটি লেখা লিখতে গিয়ে মনে জাগল ওয়াইএমসিএ'র সাথে জড়িত আমার জীবনের অনেক মায়াময় স্মৃতি, আর তার সাথে 'শুভ বড়দিন' ও অন্যান্য বিষয়ে রচিত আমার কত যে গানের অবিস্মরণীয় পটভূমি। এখানে তারই কিছুটা বলার চেষ্টা করছি।

ঠিক পঞ্চাশ বছর পূর্বে, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবরে আমার সৌভাগ্য হয় চট্টগ্রাম ওয়াইএমসিএ'র প্রথম সাধারণ সম্পাদক পদে এই সংগঠনে যোগ দেওয়ার। ওয়াই এমসিএ সম্পর্কে তখন আমি বিশেষ কিছুই জানতাম না। কিন্তু একটি বিশ্ব Ecumenical Youth Movement হিসেবে বিখ্যাত এই আন্দোলনের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের ফলে, অচিরেই বুঝতে পারলাম যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের ব্যক্তি-উন্নয়নে এবং একটি ন্যায্য সমাজ গঠনে ওয়াইএমসিএ কতইনা তাৎপর্যপূর্ণ একটি প্রগতিশীল সংগঠন।

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম ওয়াইএমসিএ শুরু হয় অতি সাধারণ কিছু কার্যক্রম দিয়ে। শহরের জুবিলী রোডস্থ Christ Church Hall- এ ছিল আমাদের অফিস ও প্রোগ্রাম সেন্টার। শুরু থেকেই আমরা পেয়েছি জনগণের ভালোবাসা ও সহযোগিতা। তাইতো দিনে দিনে আমাদের কর্মকাণ্ড দ্রুত গতিতে বেড়ে ওঠে। কিছু কালের মধ্যেই আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ি নানান কার্যকলাপ নিয়ে। এ সবের মধ্যে ছিল: আন্তমাণ্ডলিক ও আন্তধর্মীয় প্রার্থনা সভা, পবিত্র বাইবেল পাঠের উপর ব্যাখ্যা, ধ্যান ও প্রার্থনা, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা ও সমাধানের পদক্ষেপ নির্ণয়, হরেক রকমের খেলাধুলা, বস্তি এলাকায় সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প, শিশুদের অবৈতনিক স্কুল, বয়স্ক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রকল্প, ইংরেজী ভাষা শিক্ষার কোর্স এবং সঙ্গীত, নৃত্য, Drama Club ও Play Reading Group।

মনে পড়ে, ওই সব প্রোগ্রামে যারা দিনের পর দিন অংশ নিতেন বা নেতৃত্ব দিতেন তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অকল্পনীয় অবদানের কথা আর স্মৃতিতে ভেসে ওঠে তাদের আনন্দ-উজ্জ্বল মুখ।

সে সময়ে একদিন বাংলাদেশ বেতার, চট্টগাম কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করি আসন্ন বড়দিন উপলক্ষে একটি গীতিনকশা প্রচারের সম্ভাবনা সম্পর্কে। বেতার কর্মকর্তাদের অনেকেই আমাদের নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিষয়ে অবগত ছিলেন। তাই কিছু দিনের মধ্যেই উত্তর পেয়ে যাই ওয়াইএমসি এ'র পক্ষে ৩০ মিনিটের একটি গীতিনকশা উপস্থাপনার আমন্ত্রণ। অত্যন্ত খুশী হয়ে তখন শুরু করে দিই সেই গীতিনকশার Script লিখতে আর বড়দিনের উপর নতুন কয়েকটি গানও রচনা করতে।

সেই গীতিনকশার গানের দলে আর আবৃত্তির জন্যে আমাদের ছিল ওয়াইএমসিএ'র কয়েকজন সদস্য আর পাথরঘাটা ক্যাথিড্রাল গির্জার বাংলা গানের দলের কয়েকজন বিশিষ্ট গায়ক-গায়িকাগণ ও শহরের অন্যান্য চার্চ থেকেও কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের Studio তে সম্পূর্ণ গীতিনকশাটি Recording এর অনেক আগে থেকেই আমরা ওয়াইএমসিএ সেন্টারে অনুষ্ঠানটির Rehearsal দিই কয়েকবার। এভাবে প্রথম গীতিনকশাটি বড়দিনের রাতে প্রচারিত হলে, প্রতি বছরেই আমরা আমন্ত্রণ পাই বড়দিন উপলক্ষে নতুন গীতিনকশা উপস্থাপনার। আর ওই রেডিও প্রোগ্রাম আমাকে দারুণ ভাবে অনুপ্রাণিত করতো বড়দিনের উপর নতুন নতুন গান লিখতে ও সুর দিতে।

সে সময়ে (১৯৭৪-১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) যে সব বড়দিনের গান এভাবে আমার এসে যায়, তার মধ্যে রয়েছে "এসো হে প্রভু তুমি ধরায় এসো, তুমি এসো হে প্রভু তুমি এসো, সময় এসেছে এবার হতাশার কথা ছেড়ে আশার কথা বলার, আঁধার পেরিয়ে এলো এ ধরায় নতুন সূর্যোদয়, মুক্তিদাতা প্রভু খ্রিস্ট ওই গোয়াল ঘরে আজ জন্মেছেন, স্বর্গে উঠেছে জয় জয় রব, মুক্তিদাতার কাছে চলো, তুমি পাপীর তরে আজ এসেছ, খ্রিস্ট প্রভু জন্মেছেন আজ দাউদ নগরে এবং বেথলেহেম, বেথলেহেম চোখ মেলে তুমি দেখলে না।

এখনও দেশে বিদেশে বিভিন্ন প্রার্থনা সভায় বা উপাসনায় যখন এই সব গান শুনি তখন চট্টগ্রাম ওয়াইএমসিএ'র সেই স্মৃতিময় দিনগুলির কথাই মনে জাগে আর প্রভুকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

চট্টগাম ওয়াইএমসিএ'তে প্রায় ৭ বছর কাজ করার পর আমি হংকং এ অবস্থিত এশিয়া এ্যলায়েন্স অব ওয়াই এম সি এ'র Executive Secretary for Leadership Development পদে কাজ করার আমন্ত্রণ পাই। সেখানে থাকাকালীনই ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে আমার সুযোগ হয় বিশ্ব ওয়াইএমসিএ'র (World Alliance of YMCAS) 9th World Council Meeting এর Planning Group এর সদস্য হিসেবে জেনেভায় এক মিটিং এ যোগ দেওয়ার। সেই World Council এর Theme ছিল Your Kingdom Come: Living up to our Responsibilities"। ওই মূল সুরের উপর আমার বক্তব্য প্রস্তুতি কালে প্রভু যিশুর ঘোষিত স্বর্গরাজ্য সম্বন্ধে বেশ কিছু ঐশতাত্ত্বিক লেখা পড়ার ও সে বিষয়ে ধ্যান করারও সুযোগ পাই।

জেনেভায় ওই Planning Meeting থেকে হংকং এ ফেরার সময়, প্লেনে বসেই World Council এর Theme সম্পর্কে আরো ভাবনা জাগে। "স্বর্গরাজ্যের" মূল্যবোধে মানুষকে জাগ্রত করার যে অদম্য স্পৃহা আমার মধ্যে নাড়া দেয়, তা-ই মনের গভীরে একটি নতুন গানের আকারে রূপ নিতে থাকে। হংকং এ পৌঁছে ঘরে ফেরার পরেই একদিন সকালে "তোমার রাজ্য আসুক প্রভু" গানটি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মন থেকে বেরিয়ে আসে। অনেকেরই পরিচিত সেই গানের কথা এ রূপ।

তোমার রাজ্য আসুক প্রভু,
তোমার রাজ্য আসুক
এই নিরাশার পৃথিবীতে ,
এই হতাশার পৃথিবীতে,

এই বেদনার পৃথিবীতে, তোমার রাজ্য আসুক প্রভু
তোমার রাজ্য আসুক।
আমাদের মাঝে এত কোলাহল, এত রেষারেষি,
এত বিভেদ, এতো শোষণ এত বেদনা
আর তো কোনদিন ছিল না
আর তো কোন দিন ছিল না।
সকাল এখন আমাদের হয় অনিশ্চয়ের মাঝে
পলকের মাঝে সকল জীবন ধ্বংস হতে চলে।
ধুকে ধুকে কত মানুষ মরে, অমানুষ হয় জীবনের দায়ে,
অনাহারে আর তিক্ততা নিয়ে এত লোক কভু ছিল না।
অন্ধকে তুমি দিয়েছিলে দৃষ্টি, ক্ষুদ্রকে তুমি দিয়েছিলে মান
বন্দীকে তুমি দিয়েছিলে মুক্তি, দুর্বল পেল জীবন শক্তি।
তুমি তো এসেছ জীবন দিতে, তুমি তো এসেছ জীবন দিতে,
জীবন রাজ্য তোমার রাজ্য।

গানটির কথা ও সুর একই সাথে এসে গেল। রচনার সেই দিনটির কথা মনে পড়লে এখনও প্রাণে জাগে বিস্ময়ভরা এক জগতের অবর্ণনীয় শ্রুতিমধুর অনুভূতি। গানটি সে বছরেই (১৯৮৪ সালে) জাগরণী Song of Awakening and Hope নামক Cassette এ আমার বোন মার্গারেটের কণ্ঠে রেকর্ড করি। সে বছরে প্রকাশিত (১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে) "গীতাবলী" গানের বইয়ে (১৭ শ পরিবর্ধিত সংস্করণে) ওই গানটি সহ ক্যাসেটের আরো কিছু গান "নব জাগরণ গীতি" শীর্ষক এক নতুন অধ্যায়ে ছাপা হয়। পরবর্তীতে ওই ক্যাসেটের সব গান "বাণীদীপ্তি" থেকে সিডি আকারেও বের হয়।

১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে, বিশ্বওয়াইএমসি এ'র Environment and Development Seminar বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কিত যে Theme Song রচনা করি তার Title : "This World is Full of Wonders"। তখন আমি জেনেভায়, বিশ্ব ওয়াইএমসিএ'র Executive Secretary for Global Programmes পদে কাজ করি। গানটি ওই অনুষ্ঠানে কয়েকবার গাওয়া হয় এবং পরে তা ওয়াইএমসিএ'র বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে, Youth Choir, এবং বিভিন্ন দেশের চার্চের প্রার্থনা সভায়ও গাওয়া হয়। সে সময়ে প্রকৃতি, পরিবেশ ও মানব জীবন সম্পর্কিত যে বিষয়গুলি তুলে ধরতে চেষ্টা করি, তা গানটির Lyrics -এ রয়েছে বলে নিম্নে তা দেওয়া হলো:

This world is full of wonders
This world is full of joy
We're only its caretakers
Shall we let it be destroyed?

We are not to dominate
We're to let it grow.
We are made to liberate
Never to stop its flow.

Woman and man God made us
And gave us each a face.
Co-creators we are called
Giving to all a place.

Each one we will recognize
Respect every race.
Oppression we'll end forever
And voice the year of grace.

ঠিক বিশ বছর পরে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে, মহামান্য পোপ ফ্রান্সিসের "Laudato Si" সর্বজনীন পত্রের (Encyclical) অনুপ্রেরণায় বাংলায় আমার একটি গান এসে যায়, ১৯৯৫ সালে রচিত সেই ইংরেজী গানটিতে সে সুর দিয়েছিলাম, ঠিক সেই একই সুরে। ওই গানটির কথা এরূপ:

পৃথিবী এতো সুন্দর এতো আনন্দময়
এ সৃষ্টিকে দেখার ভার দিয়েছেন দয়াময়
এ সৃষ্টিকে রক্ষার ভার দিয়েছেন দয়াময়।
পৃথিবী এখন কাঁদছে নিদারুণ যন্ত্রণায়
মানুষের লোভ আর শোষণে - সৃষ্টি ক্ষয়ে যায়।
বায়ু মাটি আর এ জল দূষিত হয় প্রতিদিন
জীবনশক্তি হারিয়ে হয় জীবপ্রাণী বিলীন।
ঘরে ঘরে মানুষও এতো শোষিত হয়
তারা মানবেতর জীবনে নিষ্পেষিত রয়।
তাইতো বলি এসো নতুন পৃথিবী গড়ি
'সমন্বিত পরিবেশ' জীবন মন্ত্র করি।

গানটি ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, বাংলাদেশ ক্যাথালিক বিশপস্ কনফারেন্স আয়োজিত "Laudato Si" বিষয়ক সেমিনারে সিবিসিবি সেন্টারে প্রথম পরিবেশিত হয় একটি ভিডিও রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে। পরে, "সমন্বিত পরিবেশ অর্জনের লক্ষ্যে" শিরোনামে আমার একটি লেখা এবং গানটির স্বরলিপি সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে ছাপা হয়। *(সংখ্যা নং ৩৭, ২৭ সেপ্টেম্বর- ৩ অক্টোবর , পৃ: ১০-১১, ১৯৯৫)*

এবারে আসি 'সামগীত' রচনার ব্যাপারে। ওয়াইএমসিএ সংগঠনে আমার কর্মজীবনের শেষ ধাপে সুযোগ হয় বিশ্ব ওয়াইএম সিএ'র (World Alliance of YMCAs) - এর মহাসচিব (Secretary General) পদে সংগঠনের বিশ্ব-কার্যালয়ে, জেনেভা, সুইজারল্যান্ডে কাজ করার। সময়টি ছিল ২০০৩-২০১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। পৃথিবীর ১২৫ টি দেশের জাতীয় ওয়াই এমসিএ-র সমন্বয়ে গঠিত এই সংগঠনের মূলমন্ত্র অতি মহত: প্রভু যিশুখ্রিস্টের ঘোষিত স্বর্গরাজ্য আনায়নের উদ্দেশে কাজ করা। অর্থাৎ এ জগতে ন্যায্যতা, প্রেম ও শান্তির সমাজ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করা।

অনেক সময় ভাবি, বিশ্ব ওয়াইএমসিএ'র ঐ দায়িত্বে কাজ করার অভিজ্ঞতাটি না পেলে, পবিত্র বাইবেলের সামসঙ্গীতের অনুপ্রেরণায় যে গান আমার প্রাণে এসেছিল, এবং যা তিন খণ্ডে "আমার প্রাণের সামগীত " নামক পুস্তকে প্রতিবেশী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে, তা হয়তো কোনদিনই অমনি করে আসতো না। কারণ, ওই দায়িত্বে জেনেভায়, YMCA World Headquarters- এ কাজ করতে গিয়েই তো গোটা বিশ্ববাসীর সমষ্টিগত সচেতনতার স্পর্শে, নতুন চেতনায় আমি আবার ছুটে যাই পবিত্র বাইবেলের সামসঙ্গীতে- মনের সান্ত্বনার জন্যে, প্রাণে শক্তি অর্জনের জন্যে, পৃথিবীতে নতুন সূর্যোদয়ের আশায়।

এ ব্যাপারে কিছু দিন পূর্বে, ১৫-২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতের চেন্নাই শহরে অনুষ্ঠিত এশিয়া এন্ড প্যাসিফিক এ্যালয়েন্স অব ওয়াইএমসিএ আয়োজিত আন্তর্জাতিক সমাবেশে আমার ভিডিও বক্তব্যে বলেছিলাম: "It was during my work at the World Alliance of YMCAs as Secretary General (2003-2010) that I discovered the Psalms in a new light and derived much sustenance from them. As I travelled from country

to country visiting YMCA Social Development Projects; as I visited communities in cities and distant villages and saw first-hand the plight of the marginalized peoples; as I met World leaders and Religious leaders and exchanged views; as I tried to resolve organizational problems and issues in different localities for maintaining unity in the Movement, I found the Psalms a great source of strength and hope.

The more I delved into the text of the Psalms, the more I noticed that they were saying in a wonderful way, what I had long desired to express. I could see that the issues of justice and peace that I try to focus on in my writings, speeches and deliberations; the consciousness I strive to awaken amidst the environmental damage and disappearance of various forms of life due to human-made disasters, are all directly or indirectly referred to and sharply articulated in the Psalms themselves. Gradually, as I focused and meditated on a particular Psalm, certain verses stood out and began to form poetic verses in Bengali in my mind. Often a melody too, came along spontaneously with the words. Thus began a new journey with the Psalms."

স্বরলিপিসহ তিন খণ্ডের ওই "আমার প্রাণের সমগীত" গ্রন্থ প্রকাশনার ব্যাপারে মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, সিএসসি, মহোদয়ের অবদান অপরিসীম। তাঁরই উৎসাহ-উদ্দীপনায় প্রথম খণ্ডটি *(সামগীত ১-৫০)* প্রকাশিত হয় ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে, দ্বিতীয় খণ্ডটি *(সমগীত ৫১-১০০)* প্রকাশিত হয় ২০২০ খ্রিস্টাব্দে, এবং তৃতীয় খণ্ডটি *(সমগীত ১০১-১৫০)* প্রকাশিত হয় ২০২২ খ্রিস্টাব্দে। প্রতিটি খণ্ডে দেয়া তাঁর "প্রাণের শুভেচ্ছা বাণীতে" আমরা পাই সামসঙ্গীতের উপর তাঁর অমূল্য অনুধ্যান আর সমসাময়িক ঐশতাত্ত্বিক চিন্তাধারা। এর জন্যে তাঁর কাছে আমি চিরঋণী।

চট্টগ্রাম ওয়াইএমসিএ'র সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণ করে পরম প্রভুকে জানাই আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে গভীর কৃতজ্ঞতা। কারণ তিনিইতো ওয়াইএমসিএ'র মাধ্যমে আমাকে দিয়েছেন জীবন ও সমাজকে বোঝার নানাবিধ অভিজ্ঞতা। ওয়াই এমসিএ'র কাজে লিপ্ত থেকে যে চেতনা আমার মধ্যে জাগ্রত হয়েছে, তাই তো নানান ভাবে বিভিন্ন কর্মসূচীতে, এবং আমার লেখায়, কবিতায় ও গানে রূপ নিতে চেয়েছে। ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা জানাই প্রাক্তন এবং বর্তমান সকল ওয়াই এম সি এ- নেতৃবৃন্দ ও কর্মীবৃন্দদের যাদের কাছ থেকে পেয়েছি এই সুদীর্ঘ YMCA- যাত্রা পথে কতো যে অনুপ্রেরণা আর প্রাণভরা সহায়তা। তাদের অনেকেই এখন আর জীবিত নেই। প্রার্থনা করি তাদের আত্মার চির শান্তির উদ্দেশে।

পরম প্রভুকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে যে গানটি এই উপলক্ষে এসেছিল তার 'কথা' (Lyrics) দিয়ে শেষ করি এই স্মৃতিচারণ:

Song for the Golden Jubilee of Chittagong YMCA

On this Golden Jubilee day
Of Chittagong YMCA
We thank you God.
Thank you for your blessings
and care
Thank you for your love we share.
Be with us we fervently pray
Be with us in all we say.
Make us whole in Body
and Mind
Give us your Spirit, make us kind.
May we always love one another
Give you praise for every birth.
May we respect every race
And care for our mother earth.

মট্‌স্‌: যেখানে শিখতে শিখতে...

(৬৩ পৃষ্ঠার পর)

উড়োজাহাজ বদলের বিরতি। সেই সময়টাতে ঢাকাগামী প্লেনে উঠতে বসেছিলাম নির্ধারিত গেইটের অনতিদূরে। তখন ইউনিফর্ম পরা অপরিচিত একজন এসে আমাকে সালাম দিলেন। আমি সালাম গ্রহণ করে বললাম- আপনাকে তো আমি ঠিক চিনতে পারলাম না। 'স্যার, আমি মট্‌স-এর ছাত্র। আপনার হাত হতে আমি সার্টিফিকেট নিয়েছি। আপনার বক্তৃতা কয়েকবার শুনেছি এবং আপনার দেয়া কয়েকটি উপদেশ এখনো মনে রেখেছি।' উচ্ছাসভরে অনেক কথা তিনি বলে ফেললেন। এরপর আলাপে জানলাম তিন বছর ধরে তিনি এয়ারপোর্টে সিনিয়র ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে কাজ করছেন। আগে দু'বছর কাজ করেছেন দুবাই শহরে। একই কোম্পানীর চাকুরী হলেও বর্তমান চাকুরীতে বেতন আগের বেতনের দ্বিগুণের চেয়েও বেশি। আলাপের শেষ দিকে তিনি বললেন- আমি মনে রেখেছি আপনার বলা বেশ কয়েকটি কথা। তন্মধ্যে একটি হলো- সফলতার জন্যে সততা, পরিশ্রম ও ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে প্রার্থনা, এই তিনটি মাত্র পুঁজি দরকার। আমি এই কথাটা নিজে অনুসরণ করি, পরিবারে সকলকে অনুসরণ করতে বলি, কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদেরও বলি। আপনার নাম বলেই তা বলি। উত্তরে আমি কী যে তাকে আর বলবো সাথে সাথে তা ঠিক করতে সেদিন পারিনি। অবাক দৃষ্টিতে শুধু তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম।

৮। বাংলাদেশ উন্নত দেশ হতে যাচ্ছে। একটি উন্নত দেশের মোট জনসংখ্যার ২৫ শতকরা দক্ষ শ্রমশক্তি থাকাটা অপরিহার্য। আমাদের দেশে এই বছরের শেষে দক্ষ জনশক্তি হতে যাচ্ছে ১৭ শতকরা। আট শতকরার এই ঘাটতি পূরণে সরকার ব্যাপক কর্মযজ্ঞ হাতে নিয়েছে। সরকারের পাশাপাশি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এনজিওসহ আরো অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। কারিতাসের মট্‌স ও কারিগরি শিক্ষার স্কুলগুলো খুবই সুনামের সাথে দক্ষতাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। প্রকৌশল ও কারিগরি বিষয়ক প্রশিক্ষণে দক্ষ ব্যক্তিদের দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে, এই সুযোগ বাড়তেই থাকবে। তাই এই সুযোগ কাজে লাগাতে আমাদের তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীদের পরামর্শ দেওয়া অতি জরুরী॥

S.F.X. GREENHERALD
INTERNATIONAL SCHOOL
Cambridge International Centre BD600 Since 1954

May God Bless Greenherald
Greenherald be Blessed

S.F.X. GREENHERALD INTERNATIONAL SCHOOL
50 YEARS
1972 - 2022
GOLDEN JUBILEE

GLORIOUS GOLDEN JUBILEE CELEBRATION 1972 - 2022

Wishing you Merry Christmas and a prosperous New Year 2024

Sr. Virginia Asha Gomes, RNDM
Principal & Head of Centre BD600

24, Asad Avenue, Mohammadpur Dhaka - 1207 + 88-02-410 224 68 info@sfxghis.school www.sfxghis.school

বিশেষ কৃতিত্ব

ক্যাপ্টেন জয়ন্ত ভিক্টর গমেজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার থেকে গত নভেম্বর মাসে পেশাদার ও বাণিজ্যিক ক্যাপ্টেন এর লাইসেন্স লাভ করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার তার দেশের বাণিজ্যিক জাহাজ ও নৌযানের জন্য পেশাদার ও বাণিজ্যিক ক্যাপ্টেন এর লাইসেন্স প্রদান করে মার্কিন কোস্টগার্ডের মাধ্যমে। এই লাইসেন্সটির নাম হল U.S. Coast Guard Master's license. এটি দিয়ে ছোট পালতোলা জাহাজ, তিমি মাছ দেখার নৌকা, ওয়াটার ট্যাক্সি, উচ্চগতির ফেরী, টাগবোট, বড় সমুদ্রগামী নৌকা চালানো যায়। এই লাইসেন্সটি পালতোলা ও পাল ছাড়া সব নৌকার জন্যই প্রযোজ্য।

ক্যাপ্টেন গমেজ পালতোলা নৌকার উপর পূর্বে বারটি সার্টিফিকেট লাভ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তার আমেরিকান সেইলিং অ্যাসোসিয়েশন ASA 106 - Advanced Coastal Cruising সার্টিফিকেশন। যা দিয়ে আমেরিকায়, কানাডায়, ক্যারিবিয়ান সাগরে, ইউরোপে, ভূমধ্যসাগরে ও জাপানে ৫০ ফুট বড় পালতোলা নৌকা চালানো যায়। সেটা ছিল বিনোদনমূলক লাইসেন্স। আর এখনকার নতুন U.S. Coast Guard Master's license টি হলো একটি পেশাদার ও বাণিজ্যিক লাইসেন্স।

ক্যাপ্টেন গমেজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে B.Sc.ও MBA করার পর IT লাইনে চাকুরী করছেন। চাকুরীর পাশাপাশি শখ হিসাবে তিনি ছোট ও বড় বিভিন্ন নৌকার উপর দশ বছর অনেক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং মিনেসোটা স্টেট এর এক সেইলিং স্কুলে পালতোলা নৌকা চালানোর সহকারী শিক্ষক হিসেবেও আমেরিকানদের নৌকা চালানো শিখাচ্ছেন।

ক্যাপ্টেন গমেজ রাঙ্গামাটিয়া মিশনের মি: মাইকেল গমেজ ও ফুলকুমারী আগ্নেশ গমেজ-এর প্রথম সন্তান। তিনি দিগন্ত-জিনিয়া ও জেনী-জর্জ এর বড় ভাই এবং আইভান-এর বড় বাবা।

আমরা ক্যাপ্টেন গমেজ এর বিশেষ কৃতিত্বের জন্য তাকে অভিবাদন জানাই ও দীর্ঘ জীবন ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি।
ক্যাপ্টেন গমেজ এর ই-মেইল : gomesj01@hotmail.com

– পরিবারের সকলে

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন, ইনক্
Bangladesh Christian Association, Inc.
Maryland, USA

THE BOARD OF DIRECTORS 2023-2025

Shamal D' Costa
President

Nioty Rego
Vice-President

Titas Franklin Quiah
General Secretary
(Resigned)

Augustine Bipul D' Costa
General Secretary
(Co-opted)

Bivash Francis Rozario
Assistant Secretary

Milton Michael Rozario
Treasurer

Irine Purification
Asst. Treasurer

Lima Corraya
Cultural Secretary

Mukta Mebel Rozario
Asst. Cultural Secretary

Palash Damien Periz
Publication Secretary

Mukti Gomes
Religious Secretary

Subir Kashmir Pereira
Youth & Sports Secretary

Jibon Pereira
Asst.Youth & Sports Sec.

Anil Bernard Cruze
Director

Pronoti Costa
Director

Doly Rodrigues
Director

Shipra E Rozario
Director

Sujit Palma
Director

Merry Christmas

ATAB

GRACY AIR
TRAVELS LTD.

AUTHORIZED VISA AGENT
OF ROYAL THAI EMBASSY

AIR TICKETING I VISA PROCESSING I HOTEL BOOKING

AIR TICKETING
All International & Domestic air ticketing.

VISA PROCESSING
India, Thailand, Singapore,Malaysia, Dubai, China, Vietnam,Cambodia, Philippines, Hongkong, Qatar, UK, Schengen, America, Canada, Tourist visa processing.

HOTEL BOOKING
Hotel booking all over the world.

গ্রেসী এয়ার ট্রাভেলস লিঃ এর পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই বড়দিন ও নতুন বছরের শুভেচ্ছা। আমি রানা গ্যাব্রিয়েল শিকদার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গ্রেসী এয়ার ট্রাভেলস লিঃ। অত্র প্রতিষ্ঠান গঠনের পূর্বে বিগত প্রায় এক যুগ Jet Airways (India) Ltd. এয়ারলাইন্সের একজন কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরীতে কর্মরত ছিলাম। তাই আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং আপনাদের সহযোগিতা ও সুযোগ দানের মধ্য দিয়ে গ্রেসী এয়ার ট্রাভেলস লিঃ কে বাংলাদেশের একটি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ট্রাভেল পরিষেবা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে চাই। আমাদের সকলের বড়দিন ও নতুন বছর হয়ে উঠুক আনন্দময়, কল্যাণকর ও আশীর্বাদপূর্ণ।

শুভেচ্ছান্তে গ্রেসী এয়ার ট্রাভেলস লিঃ এর পক্ষে-

রানা গ্যাব্রিয়েল শিকদার
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
গ্রেসী এয়ার ট্রাভেলস লিঃ

নুপুর মেরী বিশ্বাস
চেয়ারম্যান
গ্রেসী এয়ার ট্রাভেলস লিঃ

পলাশ গিলবার্ট বিশ্বাস
নির্বাহী পরিচালক
গ্রেসী এয়ার ট্রাভেলস লিঃ

Call & Whatsapp: 01637666000; 01708455246; Email: gracyairtravels@gmail.com

"She will bear a son,
and you shall call his name Jesus,
for he will save his people from their sins."

Merry Christmas 2023 & Happy New Year 2024.
"To all my family members, friends & well wishers!
Please keep us in your prayers!"

Col. (Retd) Joseph A. Rozario &
Mrs. Monica M. Rozario
Mirpur DOHS, Dhaka

PAUL ROZARIO
26-August-1934 to 07-January-2013

TERESA ROZARIO
08-June-1937 to 07-May-2022

In loving memory of two extraordinary souls who graced our lives with their warmth, wisdom, and boundless love. Today, we honor the legacies of our beloved grandfather and grandmother, whose lives continue to inspire and uplift us.

On this day, we commemorate the life of our dear father, father-in-law, and grandfather, whose presence was a beacon of strength and kindness. His legacy of resilience, integrity, and unwavering love remains etched in our hearts. He lived a life of purpose, leaving behind a treasure trove of memories and teachings that continue to guide us each day.

We also pay tribute to our cherished mother, mother-in-law, and grandmother, a pillar of grace, compassion, and love. Her nurturing spirit and unwavering support enriched our lives in countless ways. Her laughter, wisdom, and endless love created an indelible mark on our hearts. She was the epitome of selflessness, dedicating herself wholeheartedly to her family's happiness and well-being.

We will love both of you forever.

On behalf of your bereaved family

SON: DOMINIC ROZARIO (শিল্পী)
WIFE: JACQUELINE ROZARIO (তৃপ্তি)
GRANDSON: ALEXANDER PAUL ROZARIO
GRANDDAUGHTER: JANE CATHERINE ROZARIO

SON: ALOYSIUS ROZARIO (শিমুল)
WIFE: SCOLASTICA ROZARIO (মৌসুমী)
GRANDSONS: VICTOR CHRISTOPHER ROZARIO (শাওন)
CORNELIUS ADRIEL ROZARIO (শুভ)
SON: CLEMENT ROZARIO (সমর)
GRANDDAUGHTER: ANGELINA SAMANTHA ROZARIO

ADDRESS: D.C.C.- 379 SOUTH KAFRUL,
DHAKA CANTONMENT, DHAKA– 1206

"তবু যেতে দিতে হয় তবু চলে যায়"

প্রয়াত ইমেল্ডা গমেজ
জন্ম: ৯ মার্চ, ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৪ জানুয়ারি ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত সিস্টার মেরীয়ান তেরেজা গমেজ সিএসসি
জন্ম: ২৭ নভেম্বর, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৫ জুন, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

প্রাণপ্রিয় মা ও দিদি,

জন্মসূত্রে এবং রক্তের বন্ধনে আমরা এমন ভাবে সম্পর্ক যুক্ত, এমন মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ যা ছিন্ন করা ভীষণ কষ্টের। কাউকে আমরা ছাড়তে চাই না, হারাতে চাই না। কিন্তু সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে অনন্ত লোকে চলে যেতে হয়, যেখান থেকে আর ফেরার কোন উপায় থাকে না। তোমাদের বেলায়ও তাই হয়েছে মা ও দিদি। আমরা তোমাদের ধরে রাখতে পারিনি। তোমাদের যেতে দিতে হল, তোমরা চলে গেলে। এ মর্তে যারা পড়ে রইলাম, তোমাদের আদর স্নেহ, তোমাদের স্পর্শ পাওয়ার একটা আর্তি রয়েই গেল। বিশ্বাস করি পরজনমে আবার তোমাদের কাছে পাব সেই আনন্দলোকে। তোমাদের অনন্ত শান্তি কামনা করি। সেই সাথে শুভ বড়দিন ও নববর্ষ উপলক্ষে সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

গমেজ পরিবারের পক্ষে
ছেলে/ভাই ডঃ লরেন্স গমেজ
ছেলে বউ/ভাই বউ: সুজান গমেজ।

পাদ্রীকান্দা, প্রামানিক বাড়ী।

প্রয়াত গ্যাব্রিয়েল স্বপন গমেজ

জন্ম: ২৪ মার্চ, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৬ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিগত ১৬ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রবিবার রাত ১০:৩৫ মিনিটে আমেরিকার মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের বাল্টিমোরে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় গ্যাব্রিয়েল স্বপন গমেজ মৃত্যুবরণ করেন। তার আকস্মিক মর্মান্তিক মৃত্যুতে পুরো পরিবারে যেন বজ্রপাত নেমে আসে।

তিনি সুদীর্ঘ ৩১ বছর যাবৎ নিউইয়র্কে সুনামের সঙ্গে কুইনীস্ নিউজ ষ্টেশনারী নামে গ্রোচারী ব্যবসা পরিচালনা করে আসছিলেন। তার এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে সব কিছু স্তব্ধ হয়ে যায়। ব্যক্তি জীবনে তিনি অত্যন্ত সৎ, ধর্মভীরু, সদালাপী, বন্ধুবৎসল এবং পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। তিনি স্ত্রী শিউলী এবং দুই মেয়ে টিনা ও কুইনী- কে রেখে হঠাৎ এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

ঈশ্বর তাকে চির শান্তি প্রদান করুন, এই প্রার্থনা করি।

পরিবারের পক্ষে -
স্ত্রী: মেরী শিউলী গমেজ
মেয়ে: টিনা ও কুইনী।

সিলভার স্প্রিং, ম্যারিল্যান্ড
ইউএসএ

বাংলাদেশ খ্রিস্ট মণ্ডলীতে যারা অক্লান্ত সাধনা ব্রতে শিক্ষাক্ষেত্রে গোড়াপত্তন করে গেছেন এবং প্রৈরিতিক কাজে যারা নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে রেখে গেছেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা আজ তাঁদের প্রায় ভুলতে বসেছি। আজ, তাঁদের আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি যারা আমার ব্যক্তি জীবনে সৌভাগ্যক্রমে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিল এবং যাদের কাছে আমি চিরঋণী।

Bp. L. Graner CSC

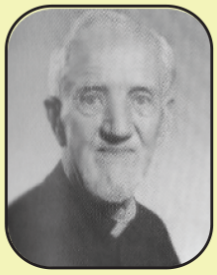
Fr. J. Jack Hennessy CSC

Bro. P. Hosinski CSC

Bro. walter J. Remlinger CSC

Bro. Andrew J. Steffes CSC

Bro.J. Bede Boderick CSC

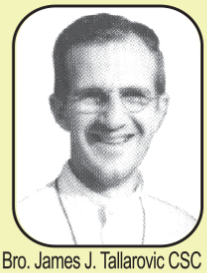
Bro. James J. Tallarovic CSC

Bro. Hubert F. Pieper CSC

Bro. Tomes O'Keefe CSC

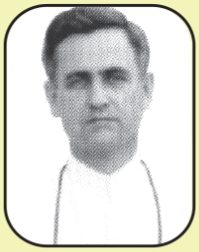
Bro. Fulgence J. Dougherty CSC

Bro. Ivan D. CSC

Bro. Dobald Schmitz CSC

Bro. Robert B. Hughes CSC

Arch Bp. Michael Rozario

Bp. Joachim Rozario, CSC

Bro. Brian J. Lyon CSC

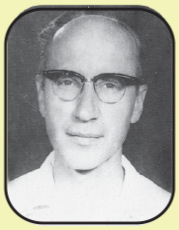
Fr.T. Zimmerman CSC

Fr. Dominic Rozario CSC

Fr. Peter CSC

Fr. Urban Corraya

Fr. Houser CSC

Fr. J. Stephen E. CSC

Fr. Evance CSC

Fr. Paul Gomes

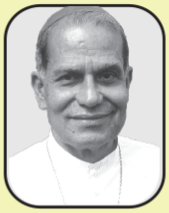
Bp. Micheal A. Rozario

Arch Bp. Moses M. Costa, CSC

Fr. James Banas, CSC

Fr. Gilbard Lague, CSC

সকল আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের প্রতি রইলো আমার এবং পরিবারের পক্ষ থেকে বড়দিন এবং নববর্ষের শুভেচ্ছা

শুভেচ্ছান্তে

ড. অগাস্টিন ক্রুজ ও পরিবারবর্গ

প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সেন্ট জুডস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা

বিনিয়োগ সমৃদ্ধির প্রথম পদক্ষেপ, স্বাবলম্বী হোন, অধিক মুনাফা অর্জন করুন!!

স্থায়ী আমানত

৫½ বছরে দ্বিগুণ

৯½ বছরে তিনগুণ

৫ বৎসর	৪ বৎসর	৩ বৎসর	২ বৎসর	১ বৎসর	৬ মাস
১৩.৫০%	১৩.০০%	১২.৫০%	১২.০০%	১১.০০%	১০.০০%

সঞ্চয়ী	ডিপোজিট / এল.টি
৬.০০%	৫.০০%

- + ৩ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতের উপর মাসিক ১,০০০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.০০%।
- + ৫ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতের উপর মাসিক ১,০২৫/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.৩০%।
- + ৩ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতের উপর তিন মাস অন্তর ৩,০৫০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.২০%।
- + ৫ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতের উপর তিন মাস অন্তর ৩,১০০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.৪০%।

Contact with us For Booking now

শান্তির নীড়

Auditorium

SHORT TERM HDPS

One Year		Two Years		Three Years	
Total Deposit (1,000 X 12)	12,000/=	Total Deposit (1,000 X 24)	24,000/=	Total Deposit (1,000 X 36)	36,000/=
Interest 9%	585/=	Interest 9.50%	2,375/=	Interest 9.75%	5,411/=
Bonus (If Regular)	500/=	Bonus (If Regular)	1,000/=	Bonus (If Regular)	1,500/=
Amount Payable	13,085/=	Amount Payable	27,375/=	Amount Payable	42,911/=

MILLIONAIRE SCHEME

Monthly Installment	Total Deposit Amount	Total Benefit	Total Amount
3 Year			
23,850/=	858,600/=	1,41,400/=	1,000,000/=
5 Year			
12,900/=	774,000/=	2,26,000/=	1,000,000/=
10 Year			
4,850/=	582,000/=	4,18,000/=	1,000,000/=
12 Year			
3,700/=	532,800/=	4,67,200/=	1,000,000/=
15 Year			
2,630/=	473,400/=	5,26,600/=	1,000,000/=

আগস্টিন পিউরীফিকেশন
চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা কমিটি

ইমানুয়েল বাপ্পী মন্ডল
সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা কমিটি

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
THE METROPOLITAN CHRISTIAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
Regd. No. 282 Dated 06.06.0978

আর্চবিশপ মাইকেল ভবন, ১১৬/১, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ +৮৮ ০২ ৫৫০২৭৬৯১-৯৪ info@mcchsl.org www.mcchsl.org

সিনড বিশিষ্ট মণ্ডলী : বাইবেল পালকীয় কার্যকলাপকে অনুপ্রাণিত করুক

ফাদার নরেন জে বৈদ্য

'সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী' বিষয়ক কাথলিক মণ্ডলীর সিনডের প্রথম অধিবেশন (*৪অক্টোবর - ২৯ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ*) অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিনডীয় যাত্রায় মণ্ডলীর কর্তব্য হলো মঙ্গলবাণী ঘোষণা করা। সিনোডালিটি নিয়ে ঐশজনগণের প্রতি বিশপদের সভার ষোড়শ সাধারণ সমাবেশ পত্র ২৫ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে মণ্ডলীর প্রয়োজন হলো ধর্মশিক্ষকদের সাক্ষ্য শোনা। অভিষিক্ত সেবাকর্মীদের কথা ও অভিজ্ঞতা জড়ো করে আনা। আলোচ্য নিবন্ধে মণ্ডলীর মিশন সম্পন্ন করতে ঐশজনগণ কীভাবে আরও তৎপর সক্রিয় হবে এবং পালকীয় কাজে বাইবেল ও বাণী প্রচারের প্রচেষ্টাগুলো তুলে ধরার প্রয়াস রাখছি।

পবিত্র বাইবেল মণ্ডলীর পালকীয় কাজের সহচর

"প্রভুর বাণী আরও প্রবল শক্তিতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, আরও গভীর প্রভাব বিস্তার করতে লাগল" (শিষ্যচরিত ৬:৭; ১২:২৪; ১৩:৪৯; ১৯:২০)। "আপল্লোস মনের আগ্রহে বাণী প্রচার করতেন; যিশুর বিষয়ে যা কিছু বলার, তা নির্ভুলভাবেই সকলকে বুঝিয়ে দিতেন।" (*শিষ্যচরিত ১৯: ২৫*)।

পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের প্রৈরিতিক পত্র "মণ্ডলীর জীবন ও প্রেরণকাজে ঐশবাণী" ৭৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "বাইবেল পালকীয় কর্মকাণ্ড/কার্যকলাপকে অনুপ্রাণিত করুক" "Let the Bible inspire pastoral activity". Pray with Bible, Live with Bible, Act with Bible. How could my life become a sign and at the same time preach the good News with a joyful heart?

সাধু পলের প্রৈরিতিক দায়িত্ব : আমাদের পালকীয় ভাবনা

ফাদার সিস্টার ব্রাদার ক্যাটেখিস্ট এবং ঐশজনগণের হৃদয় স্পর্শ করুক সাধু পলের কথা: "তোমার কথা বার্তায়, আচার- ব্যবহারে, প্রীতি ভালোবাসায়, ধর্মবিশ্বাসে, শুচিতায় সকল খ্রিস্টবিশ্বাসীর সামনে একটি দৃষ্টান্তই হয়ে ওঠ। তুমি শাস্ত্রপাঠ, উপদেশদান ও ধর্মশিক্ষার কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখ" (*১তিমথী ৪: ১২-১৩*)। "আহা, কতই না অপরূপ সেই মানুষটির পদযুগল, যে মানুষ মঙ্গলবার্তা বহন করে আনে" (*রোমীয় ১০:১৪*)। বিশ্বাস জন্মায় বাণী প্রচারের ফলে, আর বাণী প্রচার সার্থক হয় খ্রিস্টের বাণীরই গুণে" (*রোমীয় ১০:১৭*)। সাধু পল বলেন "হায়রে আমি মঙ্গলসমাচার যদি না প্রচার করি।" (*১ করি ৯:১৬ ২য় তিমথী ৪:২*) "ঐশবাণী প্রচার কর, সময়ে অসময়ে উদ্যমের সঙ্গেই তা প্রচার কর! মানুষের যত ভুল ধারণা ভেঙ্গে দাও. ধর্মশিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই ওই সব কিছু কর!।

প্রৈরিতিক কাজসমূহ ও মঙ্গলবাণী প্রচারে প্রচেষ্টাগুলো

মঙ্গলবাণী পরিবেশন মণ্ডলীর পরিচয় এবং মণ্ডলীর প্রেরণকর্ম। সাধু পোপ ২য় জন পল বলেছেন "মঙ্গলবার্তা প্রচারের মহা ঢেউ কোন প্রকারে অবদমিত করা না হোক, কারণ এটাই তো মণ্ডলীর প্রথম কাজ। (*মুক্তিদাতার প্রেরণ ও প্রেরণ কার্য*", *১৯৯০,অনুচ্ছেদ ৩৪*)। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা, ভক্তজনসাধারণের প্রৈরিতিক কাজ ৬ নং অনুচ্ছেদ বলে "মণ্ডলী ও তাঁর প্রত্যেক সদস্যের প্রৈরিতিক কাজের প্রধান লক্ষ্য হলো পৃথিবীতে কথায় ও কাজে খ্রিস্টের মঙ্গলবার্তা ঘোষণা।

পোপ ফ্রান্সিস তাঁর প্রৈরিতিক পত্র "মঙ্গলবার্তার আনন্দ" ২৮ অনুচ্ছেদে বলেছেন "ধর্মপল্লী হচ্ছে মঙ্গলবার্তা ঘোষণাকারী প্রতিষ্ঠান। ধর্মপল্লী হচ্ছে ঈশ্বরের বাণী শ্রবণের, খ্রিস্টীয় জীবনে বৃদ্ধিলাভের, সংলাপের, ঘোষণার, কল্যাণমূলক কাজ করার, উপাসনা ও প্রার্থনা করার উপযুক্ত পরিবেশ"।

বাণী নিয়ে বাংলাদেশে ৮টি ধর্মপ্রদেশ বিশ্বাসের তীর্থযাত্রায় পথচলা অব্যাহত রাখছে। বাংলাদেশে বাণী প্রচারের বয়স প্রায় ৪০০ বছরের বেশি। বাংলাদেশের ৮টি ধর্মপ্রদেশ (*৩,৯৬,৫২২ ঐশজনগণ*) বাণী প্রচারের ফসল। প্রতিটি ধর্মপ্রদেশের ২৩৩ জন ধর্মপ্রদেশীয় ফাদার, ৭ জন ডিকন, রিলিজিয়াস ১৭৬ জন, ২জন ডিকন, ব্রাদার ১২৪ জন, ১১৩২ জন সিস্টার যিশুরই গল্প বলে যাচ্ছে। (*তথ্য: দি কাথলিক ডিরেক্টরী অফ বাংলাদেশ-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ*)। বাণী প্রচারের জন্য বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ তাদের নিজস্ব কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট অনুসারে ধর্মীয় লোক-সঙ্গীত, সাহিত্য, নৃত্য, নাটক, প্রকাশনা প্রভৃতি মাধ্যমগুলো খ্রিস্টবাণী প্রচারের জন্য ব্যবহার করে আসছে।

মঙ্গলবাণী পরিবেশনের কয়েকটি ক্ষেত্র-উপায় উল্লেখ করা হলো।

১। মিলন-সমাজ গড়ে তোলা : প্রেরণকর্ম।

পোপ ফ্রান্সিস তাঁর প্রৈরিতিক পত্রে "মঙ্গলবার্তার আনন্দ" ১৭৭ অনুচ্ছেদে বলেছেন "মঙ্গলবার্তার কেন্দ্রীয় বিষয়ই হচ্ছে মিলনসমাজে জীবন যাপন ও অপরের সাথে যোগাযোগ সম্বন্ধ"। মঙ্গলবাণী পরিবেশনে সক্রিয় খ্রিস্টীয় সমাজ গঠন করতে হবে। একটি পরিপক্ক মণ্ডলীরূপে প্রকাশিত হতে হলে প্রয়োজন সেবাকারী মণ্ডলী ও সেবাকারী জনগণ হয়ে ওঠা। মিশনারী ও বাণীপ্রচারকদের পরিচর্যায় প্রতিটি ধর্মপল্লী (১১৯টি ধর্মপল্লী, ৫২টি উপধর্মপল্লী, (*তথ্য: দি কাথলিক ডিরেক্টরী অফ বাংলাদেশ-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ*) খ্রিস্ট-অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট, পারস্পরিক প্রেমে উদ্বুদ্ধ, প্রচারধর্মী, সহযোগিতামূলক, প্রার্থনাশীল মণ্ডলী হতে পেরেছে। বাইবেলে (*শিষ্যচরিত ২: ৪২-৪৭; ৪: ৩২-৩৫*) সক্রিয় খ্রিস্টান সমাজের যে নমুনা দেওয়া হয়েছে তার বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের সমাজে বিদ্যমান রয়েছে।

২) খ্রিস্টবিশ্বাস হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে মঙ্গলবার্তার নবঘোষণা

ধর্মশিক্ষা বিশ্বাস গঠনের ভিত্তি রচনা করে। "আপল্লোস মনের আগ্রহে বাণী প্রচার করতেন; যিশুর বিষয়ে যা কিছু বলার, তা নির্ভুলভাবেই সকলকে বুঝিয়ে দিতেন।" (*শিষ্যচরিত ১৯:২৫*)। "পল দেড় বছর ধরে করিন্থ নগরে রয়ে গেলেন আর পরমেশ্বরের বাণী সেখানকার মানুষকে শুনিয়ে ধর্মশিক্ষা দিতে লাগলেন" (*শিষ্যচরিত ১৮:১১*)। পুরোহিতগণ সিস্টারগণ ও ক্যাটেখিস্টগণ ধর্মশিক্ষা দিয়েছেন ও দিয়ে যাচ্ছেন। "তোমরা যদি আমার মধ্যে থাক, আর আমার বাণী তোমাদের মধ্যে থাকে, তোমরা যা ইচ্ছা যাচ্না করতে পার, তোমরা তা পাবেই"। (*যোহন ১৫:৭*)। আত্মিক সভায় ভক্তিমূলক গান গাওয়া হয় এবং বাণী পরিচর্যাকারীগণ মঙ্গলসমাচার প্রচার করে, আত্মিক খাদ্য পরিবেশন করেছেন। সাধু জেরম আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, "শাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা

(১০৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

‘উত্তম’নেতার খোঁজে’ বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নেতৃত্ব

ফাদার পলাশ হেনরী গমেজ এসএক্স

বাংলাদেশের নেতৃত্বের মডেল হিসেবে “উত্তম নেতা” সম্পর্কে বর্ণনায় যাওয়ার আগে, আমি আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটের একটি সংক্ষিপ্ত পটভূমি দিতে চাই, যাতে আমরা আমাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থার পরিস্থিতি মূল্যায়নের মাধ্যমে নেতৃত্বের সঠিক চরিত্র খুঁজে পেতে পারি। প্রধানত, তিনটি পরিস্থিতি রয়েছে, যা একসাথে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে:

প্রথমত, পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা: আমাদের আধুনিক যুগের অনেক দেশের মতো, বাংলাদেশ এখনও পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যবাদী মানসিকতার দ্বারা প্রভাবিত। পুরুষরাই সমাজের ’প্রধান, মাথা বা বড়- এই ধরনের কেন্দ্রীভূত মানসিক আধিপত্য ও সামাজিক ক্ষমতার সংস্কৃতি বিদ্যমান। তারা সামাজিক ক্ষমতার পাশাপাশি অর্থনীতি, ধর্মীয় ও পারিবারিক জীবনের প্রায় সবক্ষেত্রেই আধিপত্য বিস্তার করে থাকে। ছোটবেলা থেকেই তাদের শেখানো বা বুঝানো হয় যে কীভাবে মেয়েরা ভবিষ্যৎ ঘরণী হিসাবে এবং ছেলেরা ঘরের বাইরে আচরণ করবে। পুরুষরা ছোট থেকেই মহিলাদের সেবা দ্বারা পরিবেশীত হন। এটাই হয়ে উঠেছে অলিখিত নিয়ম। একজন পুরুষ যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন তার নিকটাত্মীয়দের নারী অর্থাৎ, মা, বোন, পিসী ইত্যাদি দ্বারা তার যত্ন নেওয়া হয়। এটি আমাদের দেশীয় বা সমাজে ব্যবস্থারও একটি সাধারণ অভ্যাসে পরিগনিত হয়ে আসছে। উদাহরণস্বরূপ, এখানে বলা যেতে পারে যে বর্তমানে সমাজের বা ধর্মীয় মৌলিক কাজগুলো যেমন, যে কোন অনুষ্ঠান, প্রার্থনা-সভা উপাসনা পরিচ্ছন্নতা, সাজসজ্জা, বা জলখাবার পরিবেশন ব্যবস্থা ইত্যাদি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মহিলারা করে থাকেন বা তারা এই সেবায় খুব বেশি জড়িত। তবুও, সভা বা সংগঠনের সিদ্ধান্ত বা শেষ কথা কিন্তু পুরুষের কণ্ঠেই থাকে বা পুরুষের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন।

দ্বিতীয়ত, বর্তমান পৃথিবীর নির্বিশেষে ধর্মনিরপেক্ষকরণ, (নকল) গণমাধ্যমের ছড়াছড়ি এবং আধুনিক গ্যাজেটগুলির প্রভাব- মোবাইল, ফেইসবুক, ইউটিউব যা মানুষকে ব্যস্ত রাখছে, যার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় যখন দেখা যায় যে তারা সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন বা আন্তরিকতার, আধ্যাত্মিক দিকের ধর্মীয় কার্যকলাপ প্রায়ই ভুলতে বসেছে। তাছাড়া, এই দৃশ্য এখন প্রায়ই দৃশ্যমান হয় যে পরিবারের সদস্যরা বা বন্ধুরা ‘বসা পাশাপাশি কিন্তু নেই কাছাকাছি’-তারা শারীরিক অবস্থানের দিক দিয়ে কাছে কিন্তু তাদের মন বা হৃদয় পড়ে আছে অন্য জগতে (ডিজিটাল) অথাৎ পরস্পরের সঙ্গে কথোপকথনের পরিবর্তে সবাই যার যার মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত। এটা যেমন একদিকে পরস্পরের মধ্যে আন্তরিকতার বা সম্পর্কের ফাটল ধরাচ্ছে তেমনি সামাজিক বা পারিবারিক নেতৃত্বের মূল্যবোধের অবক্ষয় ধরাচ্ছে। তাই, একদিকে যেমন প্রার্থনা গৃহ হয়ে পরেছে জনশূন্য তেমনি সামাজিক ও পরিবার জনবান্ধব কার্যকলাপের স্থান নিয়ে নিচ্ছে মোবাইল, ফেইসবুক, ইউটিউব এবং টেলিভিশনের সিরিয়াল ফলশ্রুতিতে, ধীরে ধীরে একদিকে যেমন মানুয় অধিক ব্যক্তিবাদী এবং স্বার্থপর হয়ে উঠছে অর্থাৎ তারা ভুলেই যাচ্ছে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব হিসাবে তাদের- ঈশ্বর ও মানুষ এবং মানুষ ও মানুষের মধ্যে অর্থাৎ পরস্পরের সঙ্গে স্বাভাবিক বা আন্তরিক সম্পর্ক রাখা জরুরী; অন্যদিকে সমাজিক মূল্যবোধগুলি যেমন মিলন, একতা, সহযোগিতা ও সহভাগিতার এমনকি সততার মান পচনের মুখে পড়ে যাচ্ছে, এই সুযোগে কিছু কিছু ধনী ও ক্ষমতালোভী ‘পাতি’ নেতারা টাকা ও দুর্নীতির মাধ্যমে সহজ উপায়ে ‘ইনষ্টান মেড’ সমস্যার সমাধান দিয়ে রাতারাতি বড় নেতা হয়ে উঠছে।

সর্বোপরি, নেতৃত্বের রক্তক্ষরণ: বিগত কয়েকদশকে বিশ্বনেতৃত্বের পাশাপাশি সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃত্বের অনেক কেলেঙ্কারি উন্মোচন হয়েছে, যা সারাবিশ্বে রাজনৈতিক, সামাজিক এমনকি ধর্মীয় জীবনে প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বাসে এবং পরোক্ষভাবে নেতৃত্বের নৈতিক মূল্যবোধে আঘাত হেনেছে। যদিও এ নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক থাকতে পারে, তবে এটা সত্য যে অনেক নেতাই নিজ নিজ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য অন্যায্যতা, দুর্নীতির আশ্রয়, অনেক স্বার্থপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অর্থব্যয়ের ক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন- যা নেতৃত্বের মর্যাদাকে অনেকাংশে ক্ষুন্ন করেছে।

সেবা- নেতৃত্বের বিশ্লেষণ: যুগ যুগ ধরে চলে আসা অনেক সেবা-নেতৃত্বের মডেল, সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে পুরানো হয়ে যাওয়াতে একদিকে তাদের আর্কষণ হারিয়ে ফেলেছে, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন দুর্নীতি বা অন্যান্য অপকর্মের কারণে বিশেষভাবে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর ক্ষমতা অপব্যবহারের ফলে এই ‘সেবা-নেতৃত্বের’ খাত নিয়তই মূল্যহীন অপসংস্কৃতির সেবার ক্ষেত্র হিসাবে রূপান্তরিত হচ্ছে। তাই যদিও বর্তমানে সমাজের সেবা-নেতৃত্বের ক্ষেত্রে একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের সঠিক চিত্র খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, তবুও সমাজে সেবা-নেতৃত্বের ইতিবাচক প্রভাব এবং অনুপ্রেরণামূলক অনেক দিক আছে বা রয়েছে, বিভিন্ন সময়ে কম করে হলেও তা গোচরে আসছে- যার পেছনে যথেষ্ট অবদান রাখছে ডিজিটাল মাস-মিডিয়া।

যদিও, উপরে উল্লেখিত তিনটি বৈশিষ্ট্য কোনো না কোনোভাবে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের অনেক নেতিবাচক পরিবর্তনের বাতাস নিয়ে এসেছে, তবুও এরই মাঝে এখনও, আমরা এমন কিছু ব্যক্তিদের বা ব্যক্তিত্ব খুঁজে পাই, যারা কোন পদ বা পদবীর জন্য নয় বরং ভালোবাসার বা বিশ্বাসের টানে এখনও দেশ ও সমাজের সেবা করে যাচ্ছেন, যা আমাদের নিরাশার পৃথিবীতে একটু হলেও আশার আলো জাগাতে পারে। ঘোর অন্ধকারের হাতছানিতে আমরা দিশেহারা হয়ে পড়লেও এখনো অনেক নাম না জানা ব্যক্তির সেবা কাজকে দেখে সত্যই হঠাৎ নিজেদের ভেতর কেমন যেন ভাল হওয়ার, ভাল থাকার এবং পরের তরে ভাল কাজ করার অদম্য ইচ্ছাশক্তি এখনো জাগে। যাইহোক, বর্তমান প্রেক্ষাপটের চিত্র বিশ্লেষণ করে অন্ততপক্ষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে বাংলাদেশে, হাজারো (হীন) নেতৃত্বের ভিড়ে একজন উত্তম নেতা যে অনেক প্রয়োজনে, যিনি যে কোন সময় সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে শান্তিপূর্ণ উপায়ে দেশ ও দশের আর্থ, সামাজিক ও এমনকি ধর্মীয় সেবার নেতৃত্বের মান উচ্চতর শিখরে নিয়ে যাওয়ার আশাকে জ্বালিয়ে রাখতে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ফিরে দেখা নেতার’ সংজ্ঞা

বাংলাদেশের একটি বিশাল জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত হলেও সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের জন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল স্তরের মানষের তরে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, তাদেরকেই কেবলমাত্র ‘নেতা’ বা ভাল নেতার ক্যাটাগরিতে বিবেচনা করা যেতে পারে। আসলে নেতা শব্দের মূল সূচনা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময় থেকেই। সেই সময়ে, এটি একটি ভাল ‘পদ’ ও ‘পদবী’ হিসাবে বিবেচনা করা হত। একজন নেতা ছিলেন জাতীয় ঐক্যের ও সংগ্রামের প্রতীক। মাহাত্মা গান্ধী যেমন ভারতীয় উপমহাদেশে তেমনি মাওলনা ভাসানী এ কে ফজলুল হক ও জাতির জনক শেখ মুজিবর রহমান বাংলাদেশের ছিলেন সেই ধরনের ব্যক্তি যাদেরকে আমরা নেতা বলে আখ্যায়িত করতে পারি এবং সেইসময় লোকেরা

তাদের প্রকৃত নেতা হিসাবে মান্য করত, কারণ তাদের মধ্যে ছিল খাঁটি নেতৃত্ব, সততা, দায়িত্বশীলতা এবং জনগণের জন্য নিবেদিত-প্রাণ জীবনের আদর্শ ও মূল্যবোধ বা গুণ। তারা সর্বদা স্বৈরশাসক শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তুলেছিলেন বজ্রের আওয়াজ, ন্যায্যতার জন্য চালিয়েছিলেন দূর্বার আন্দোলন এবং স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত করেছিলেন আমরণ লড়াই। এরা কখনো জনগণের জন্য জীবন দিতে ভয় পায়নি। অনেকবার স্বৈরশাসক তাদের কণ্ঠরোধ, গ্রেফতার বা হত্যার চেষ্টা করলেও তারা কখনো অন্যায়কারীদের সামনে মাথা নত করেননি। সেই সময় থেকে বাংলাদেশের জনগণ নেতা শব্দটিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে এবং একজন ভালো নেতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ এবং ব্যবহার করত। তবে স্বাধীনতার পর বিশেষভাবে জাতির জনক শেখ মুজিবর রহমান যখন দেশের দুর্দিনে একমাত্র নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন এবং যার কথাকেই জনগণ দেশের শাসন বলে লালন ও পালন করা শুরু করে, তখন অন্যান্য নেতাগণ তার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে ও ক্ষমতার লোভে বিপদগামী কয়েকজন সেনার সাথে হাত মিলিয়ে পরিকল্পনা করে অন্ধকার রাতে তাকে তার পরিবারের সকল আত্মীয়স্বজনসহ হত্যা করে। এই ঘটনায় একদিকে বাংলার মানুষ যেমন হতভম্ব হয়ে পড়ে, অপরদিকে প্রকৃত বা ভালোর 'নেতা' চরিত্রের মূল্যবোধটাকে গলা টিপে হত্যা করে। পরবর্তিতে অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তি 'ভাল নেতা' হওয়ার মুখোশ পড়ে সকল প্রকার নীলনকশা প্রণয়ন এমনকি ভয়ভীতি দেখানোর পথ অবলম্বন করে 'ভাল নেতা'-এর উপাধি অর্জনের আপ্রাণ চেষ্টা করলেও জনগণের চোখে তারা একে একে দুর্নীতিগ্রস্ত, ক্ষমতা ও সম্পদের লোভী হিসেবে আবির্ভূত হন, ফলে জনগণের কাছে তারা 'ভাল নেতা'র পরিবর্তে রাজনৈতিক মাফিয়াদের মূর্তি হিসেবে আর্ভিভূত হন। এরপর থেকে, 'ভাল নেতা'র পরিবর্তে 'নেতা' শব্দটি সর্বস্থানে ও সর্বস্তরে নেতিবাচক হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

পরবর্তীতে, এরই ধারাবাহিকতায় নেতৃত্বের অবক্ষয় এমনই নিম্ন পর্যায় চলে যায় যে স্থানীয় পর্যায়ে,নেতা বলতে এমন একটি 'গ্যাং লিডার বা বড় ভাই-কে' বোঝায় হয় যিনি বন্দুক এবং গুণ্ডাসহ পেশীশক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্জন নয় বরং জোরপূর্বক 'নেতৃত্বের' ক্ষমতা দখল করে। এই ধরনের ব্যক্তি সর্বদা তাদের বিশেষ বাহিনী দ্বারা বেষ্টিত থাকে, এমনকি, প্রয়োজনে নিজহাতে স্থানীয় সমস্ত আইন-কানুন ও বিচার ব্যবস্থা তুলে নেন। তিনি নিজেদের ক্ষমতা যে কোনও উপায়ে টিকিয়ে রাখার জন্য বা নিজের ক্ষমতা স্থিতিশীল রাখার জন্যও মানুষকে রক্ষার পরিবর্তে হত্যা বা সেবার পরিবর্তে ভক্ষক হিসাবে আবির্ভূত হতে থাকেন। একমাত্র একটু শান্তিতে বেঁচে থাকার তাগিদে ও সকল প্রকার ভয়-ভীতি হতে দূরে থাকার জন্যে স্থানীয় জনগণ তখন এই কথিত লোকজনকে 'নেতা' মানতে বাধ্য হন। সর্বোপরি, তখন থেকেই স্থানীয় নেতারা যেমন অঘোষিত মোঘল হিসাবে স্থানীয় লোকদের শাসন ও শোষোণ করতে থাকেন, তেমনি তারা নিজেরা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকেন উচ্চস্তরের শক্তিশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মাফিয়া দ্বারা। এ কারণে সাধারণ মানুষ তাদেরতো আর কখনো বিশ্বাস বা সম্মানও তো করেই না, বরং 'নেতা' বলতে অত্যাচারের বিভীষিকা ভেবে ভয়ে দূরে পালিয়ে যায়। সুতরাং, নেতা ধারণাটি দুর্নীতির ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিকল্প হিসাবে সমাজে বা রাজনীতিতে ব্যবহৃত হতে শুরু করে, যা এর সঠিক ধারণা থেকে সরে গিয়ে কলঙ্কজনক ভাবমূর্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অতএব, 'নেতা' শব্দটি স্বাভাবিকভাবেই বর্তমানে আর ইতিবাচক চিত্র বহন করতে পারে না, তাই আমরা প্রয়োজনে 'নেতা' শব্দটির সঙ্গে উত্তম বিশেষণ যোগ করার প্রয়াস রাখি যার অর্থ ভাল বা 'উৎকৃষ্ট'। একজন "উত্তম নেতা" এর চিত্র ও চরিত্র রাজনৈতিক নেতার পাশাপাশি স্থানীয় কনেতান সম্পর্কের বিপরীত ধারণা পোষণ ও প্রকাশ করে। "উত্তম নেতা" হলেন তিনিই-যিনি নেতৃত্ব, সরলতা, প্রজ্ঞা, কঠোর পরিশ্রম, সততার মতো অনেক গুণাবলীর অধিকারী এবং যিনি দরিদ্র মানুষের অধিকার রক্ষায় দুর্নীতিবাজ ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন। ক্ষমতাবানদের বন্দুক ও গুণ্ডাদের দ্বারা তিনি অনেক অত্যাচারিত বা ভয়-ভিতি দ্বারা কষ্ট পেলেও সামনে এগিয়ে যেতে কখনো দ্বিধা করবেন না, কারণ তিনি মনে করেন ক্ষমতাহীন মানুষের কণ্ঠস্বর ও মানব কল্যাণই তার একমাত্র দায়িত্ব ও লক্ষ্য।

অবশ্য, একজন ব্যক্তি এই "উত্তম নেতা" খেতাব সহজে অর্জন করতে পারে না কারণ এটি অনেক ত্যাগ ও সংগ্রাম এমনকি জীবনদানেরও দাবি রাখে। প্রকৃতপক্ষে, স্থানীয় জনগণ কোন লোকের সেবা বা কাজের ধরন ও তার উদ্দেশ্য বিচার বিশ্লেষণ করে এই উপাধি প্রদান করে থাকে। এই ধরনের ব্যক্তি হয়তো কখনই সরকারিভাবে নাও নির্বাচিত বা কোন উচ্চপদধারী নাও হতে পারেন, কিন্তু জনগণ তাকে ভালোবেসে স্বেচ্ছায় সকলের উপর ক্ষমতা দেয় এবং যার কথা লোকেরা শোনে, তাকে সম্মান ও সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করে; কারণ লোকেরা জানে যে, সে তাদের প্রয়োজনে যে কোন অধিকারের জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত থাকবে, কোনো পদ বা ক্ষমতার জন্য নয়। একজন "উত্তম নেতা"-এর শাস্ত্রীয় উদাহরণ হলেন মহাত্মা গান্ধী। যিনি একটি অহিংস আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে ব্রিটিশ উপনিবেশের বিরুদ্ধে সফলভাবে লড়াই করে ভারতবাসীর জন্য স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন এবং কোন 'পদ' না নিয়ে একটি ফলপ্রসূ 'নেতা' ও সেবার উৎকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন। আমি মনে করি, এই ধরনের চিত্র বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করা যেতে পারে যেখানে বেশিরভাগ 'নেতা' স্থানীয়, সামাজিক বা রাজনৈতিক সেবা করার পরিবর্তে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্ষমতার লোভ ও সম্মান পাওয়ার কাঙ্গাল।

তাই 'উত্তম' নেতার খোঁজে' খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসাবে আমরা আমাদের পবিত্রগ্রন্থ' বাইবেলের নতুন নিয়মে মথি লিখিত মঙ্গলসমাচারের (*২০:২৭-২৮*) বর্ণিত "মানবসেবাই খ্রিস্টশিষ্যর প্রকৃত জীবনপথ"- থেকে শিক্ষা নিতে পারি। "তোমাদের মধ্যে যে বড় হতে চায়, তাকে হতে হবে তোমাদের সেবক.. ঠিক মানবপুত্রের মতো: সে তো সেবা পাবার জন্যে আসেনি, এসেছে সেবা করতে এবং বহুমানুষের মুক্তিপণ হিসাবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে"- এখানে যিশু স্পষ্টভাবে তাঁর বারজন প্রেরিতশিষ্যকে 'সেবার নেতৃত্বের' যথার্থ সারমর্ম তুলে ধরেন যেখানে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে একজন উত্তম নেতার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য এবং যার মধ্যেই নিহিত আছে মানবসেবা ও সেবক নেতৃত্বের আসল প্রতিচ্ছবি। এছাড়াও সেবক নেতৃত্বের বৈশিষ্টগুলো মঙ্গলসমাচারের বর্ণিত "যিশুর শেষ ভোজ" ঘটনায় আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই, যেখানে যিশু কার্যকরভাবে কর্ম প্রদর্শনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নম্রতার সাথে হাঁটু গেড়ে তাঁর বারজন প্রেরিতশিষ্যের পা ধুয়ে দিয়ে তা চুম্বন করেন এবং তাদের পা মুছতে মুছতে বলেন, "তোমরা তো আমাকে 'গুরু' বা 'প্রভু' বলে থাক... কাজেই ' 'প্রভু' বা গুরু' হয়ে আমি যখন তোমাদের পা ধুয়ে দিলাম, তখন তোমাদেরও পরস্পরের পা ধুয়ে দেওয়া উচিত" (*যোহন ১৩:১২-১৩*)। তাই, দুইহাজার বছর আগে যিশু তার অনেক অলৌকিক ক্ষমতা থাকা সত্বেও সকল 'নেতা' মানুষদের জন্য এমন একটি সুন্দর উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন, যা বর্তমান সমস্ত নেতাদের বেলায়, একইসঙ্গে ভবিষ্যত বিশ্ব এবং আধ্যাত্মিক নেতাদের জন্য একইভাবে নম্রতা ও নিঃস্বার্থ সেবার গুরুত্ব বহন করে।

এখানে উল্লেখ না করলেই নয় যিশুর 'উত্তম মেষপালকের'(*যোহন ১০:১-৬*) উপমা কাহিনী যেখানে যিশু সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় বিশ্বের সকল সেবক নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন। এই উপমা কাহিনী থেকে আমরা তিনটি জিনিস খুঁজে পাই যেখানে যিশু নিজেকে উত্তম মেষপালক হিসাবে নিজেকে তুলে ধরেন, যা আমাদের একে অপরের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজ নিজ সেবার ধরন ও ধারার পথ দেখায়। প্রথমত, যিশু তাঁর মেষপালকে খুব ভালোভাবে চেনেন, "আমার মেষগুলি আমার কণ্ঠস্বর শোনে; আমি তাদের চিনি আর তারা আমার পিছু পিছু চলে" (*যোহন ১০:২৭*)। যিশু আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং পাপ ব্যতীত আমরা যা কিছু অনুভব করি তা ভাগ করে নেওয়ার জন্য তিনি সত্যিই আমাদের

মতো মানুষ হয়েছিলেন। তিনি আমাদের আলো এবং অন্ধকার, শক্তি এবং দুর্বলতা, আনন্দ এবং বেদনা, আমাদের গুণাবলী এবং দোষ, আশা এবং অনুশোচনাগুলি জানেন। তিনি আমাদের ভয় এবং সংকোচ, বেদনা এবং উদ্বেগ, সর্বোপরি, আমরা কে বা কেমন আছি তার সবই জানেন। তিনি এও জানেন যে, তাঁর আশীর্বাদ ও কৃপায় আমরা একদিন মহামানব বা সাধু-সাধ্বী হয়ে উঠতে পারি।

দ্বিতীয়ত, যিশু তার মেষপালকদেরও তাই দান করেন, যা তাদের সত্যিই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন অর্থাৎ শাশ্বত জীবন- যা ঈশ্বরের সাথে আমাদের জীবনের পূর্ণতা, নিখুঁত আনন্দ এবং শান্তি, "তাদের আমি দিই শাশ্বত জীবন; তারা কখনো বিনষ্ট হবে না আর কেউই আমার কাছ থেকে তাদের ছিনিয়ে নিয়ে যেতেও পারবে না" (*যোহন ১০:২৮*)। অবশ্য আমরা যা চাই তা তিনি আমাদের সর্বদা দেন না এটা ঠিক, কিন্তু পৃথিবীতে এবং ঈশ্বরের সাথে শাশ্বত জীবনের জন্য আমাদের সত্যিই যা প্রয়োজন তা তিনি অবশ্যই যথাযথ সময়ে দান করেন। তিনি আমাদেরকে সত্য, ঐশ্বরিক ক্ষমা, অনুগ্রহ, ভাল উদাহরণ, বিশ্বাস, আশা, প্রেম ইত্যাদির অক্ষুন্ন রাখেন। এমনকি এই জীবনে তাঁর জন্য আমরা যে সমস্ত কষ্ট সহ্য করি তার জন্য তিনি আমাদের সান্ত্বনা প্রদান করেন, "তখন পরমেশ্বর এদের চোখ থেকে মুছিয়ে দেবেন সমস্ত অশ্রুজল" (*প্রত্যাদেশ ৭:১৭*)। পরিশেষে, যিশু একমাত্র নিস্বার্থ ভালোবাসার কারণে স্বেচ্ছায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং আমাদের ঐশ্বরিক জীবনে সেই অংশগ্রহণের জন্য যা করণীয়, "প্রকৃত মেষপালক মেষগুলির জন্যে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেয়।" তিনি এটি করেছিলেন যাতে আমরা চিরকালের জন্য তাঁর, "কেউ তাদের আমার হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না" (*যোহন ১০:১৮*) সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারি।

সর্বোপরি, বিগত কয়েক দশকে বিশ্ব নারীনেতৃত্বের যে জাগরণ হয়েছে তা চোখে পড়ার মত। সমাজের অভ্যন্তরে সাহায্য করা থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ে এমনকি সরকার প্রধান পর্যন্ত নারীদের ভূমিকা অপরিসীম। নারীরা নেতৃত্বের সিঁড়িতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক লড়াই করে। প্রায়শই, তাদের এই কঠিন পথ পাড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় আমাদের পুরুষশাসিত সমাজে তাদের গুণাবলী বৃদ্ধিতে নানা অজুহাত এবং নেতৃত্ব বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা বা সুযোগ না দেওয়া। এক্ষেত্রে বাইবেল ঘাটলে আমরা নারীদের ভূমিকার অনেক উদাহরণ টানতে পারি। যেমন, ইহুদি সংস্কৃতিতেও নেতৃত্বে দায়িত্বে নারীদের গ্রহণ করা হতো। বাইবেল জুড়ে এমন মহিয়সী নারীদের গল্প খুঁজে পাই যারা আসাধারণ নেতৃত্ব ও সাহস দেখিয়েছিলেন। এখানে আমরা তিনজন অসাধারন বিশ্বাসী নারীর ভূমিকার কথা তুলে ধরতে চাই যাদেরকে ঈশ্বর ইতিহাসের বিশ্বাসকে রক্ষা এবং সেবার গতিপথ পরিবর্তনে সাহায্য করেছিলেন। ডেবোরাঃ একজন বিশিষ্ট বিচারক এবং ইস্রায়েলের নেত্রী (*বিচারকগ্রন্থ'৪*)। হুলদা: একজন প্রবক্তা যিনি একটা জাতিকে পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন (*২ রাজাবলি ২২*)। রাহাব: একজন বীরাঙ্গনা (*১ (সামুয়েলগ্রন্থ' ২৫*)। বিশ্বাস এবং নেতৃত্বের এই গল্পগুলি আজ আমাদের সমাজের অন্তরচোখ খুলে দিতে পারে। এই ধার্মিক নারীদের জীবন কাহিনীর মাধ্যমে আমরাও এই শিক্ষা নিতে পারি যে ঈশ্বর বিভিন্নক্ষেত্রে নারীদেরকে যেমন সম-মর্যাদা দিয়েছিলেন, তেমনি আমাদেরও উচিত নারীদের সম-মর্যাদা দিয়ে বিভন্নস্তরে নারী নেতৃত্ব গঠনে পৃষ্ঠপোষকতা করা, যাতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আমরা 'উত্তম নেতৃত্বের' সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সবাই মিলন, আংশগ্রহণ ও প্রেরণে মাধ্যমে ঐশরাজ্য স্থাপন করতে পারি, যা আর আগামীকাল নয় বরং আজ; ভবিষ্যতে নয় বরং বর্তমানে এই সুন্দর নতুন্তর ভোরেই শুরু হতে পারে।

উত্তম নেতার চ্যালেঞ্জসমূহ:

পরিস্থিতির কারণে একজন উত্তম নেতার চ্যালেঞ্জগুলো হলো যে জনগণের দেওয়া ক্ষমতা এবং তার লক্ষ্যের অপব্যবহারের সম্ভাবনাই বেশি থাকে। বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে, এই ধরনের মানুষ খুব বিরল যাদের ক্ষমতা এবং দখল সম্পর্কে কোন পক্ষপাত নেই। তাছাড়া, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক মাফিয়ারা সহজেই একজন উত্তম নেতাকে হত্যা করতে পারে শুধুমাত্র তার ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য। এই কথা সত্য যে প্রত্যেকেরই তার জীবনে ও পরিবার চালানোর জন্য অর্থ দরকার, যা বর্তমান বাস্তবতায় অর্থ উপার্জনের এত ভাল সুযোগ নেই। ফলস্বরূপ, "উত্তম নেতা" বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অর্থ এবং দারিদ্র্যের কাছে পরাজিত হতে পারে। তদুপরি, এটি সময়সাপেক্ষ, শারীরিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উভয় ক্ষেত্রেই প্রচুর পরিশ্রমের দাবি রাখে। তবুও, একজন উত্তম নেতা শাস্ত্রীয় পদ্ধতি এবং উপাদানগুলির সাথে সীমাবদ্ধ পরিরেখার বাইরে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

একজন 'উত্তম নেতার' দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার মাপকাঠি এই বিশ্বায়নের যুগে একজন 'উত্তম নেতার এর দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার মাপকাঠি এত সহজ নয়। প্রথমত তাকে অন্যান্য সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্বন্ধে অবগত থাকতে হবে এবং বর্তমান বাস্তবতার আলোকে সময়োপযোগী সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া ও প্রয়োজনে সেগুলিকে সম্মান করে চলতে হবে। অন্যদিকে, এই উচ্চমূল্যের বাজারে, একজন "উত্তম নেতার" জীবন সঠিকভাবে যাপনের জন্য একটি পেশাদার চাকরির প্রয়োজন। আরও ভালো পরামর্শক হিসাবে তিনি সাহায্য করতে পারেন বা পাশাপাশি কিছু সামাজিক কাজ যেমন শিশুদের জন্য শিক্ষা, দরিদ্র লোকদের সাহায্য করার জন্য ঋণের জন্য ক্রেডিট ইউনিয়ন, বিশেষ করে রোগীদের জন্য স্বাস্থ্যপরিসেবা দিতে পৃষ্ঠোপোষকতা করতে পারেন। এই ধরনের কাজ সারা দেশে যেমন একদিকে খুব চাহিদা তেমনি সেখানে কোন ধর্ম বা বর্ণ বা শ্রেণীগত কোন পক্ষপাতিত্ব প্রবেশ করতে পারে না। তদুপরি, তাকে বুদ্ধিমান, সাহসী এবং সরল মানুষের জন সেবার বা ভালোবাসার উদাহরণ হয়ে উঠতে হবে। বলাবাহুল্য যে, একজন উত্তম নেতা তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য যেন না থাকে, যা মানুষ বাস্তবে দেখে তা অনুসরণ করতে পারে। যেখানে বিশ্বদৃষ্টি প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে, সেখানে নতুন পদ্ধতি, নতুন চিন্তাধারনা, মাস-মিডিয়ার সৎব্যবহার এবং নেতৃতের দায়িত্বগুলো সুষম-বন্টনের মাধ্যমে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিলে নেতৃত্ব পালন সহজ ও সাবলীল হবে।

উপসংহার: একটি ইসলামী অধ্যুষিত দেশে এবং সংখ্যালঘু প্রেক্ষাপটে বসবাস করে, সমস্তনেতা বিশেষভাবে একজন খ্রিস্টান নেতাকে 'উত্তম নেতার' জীবনাদর্শনের সাক্ষী হতে হবে। যিশু যেমন ব্যক্তিগত এবং কাঠামোগত এমনকি অন্তর পরিবর্তনের জন্য সর্বদা আহ্বান করেছিলেন, তাই আমাদের অন্তত, যিশু দেয়া সেবার উদাহরণ (*যোহন ১৩:২-১৭- যিশু শিষ্যদের পা ধুয়ে দিলেন*) এবং এর মূল্যবোধের জন্য কাজ করা দরকার। নিপীড়ন এবং অবিচারের পরিস্থিতি আজকাল খুব স্পষ্ট বা জীবন্ত, কারণ আমরা যিশুর বা আমাদের পূর্ববর্তী ভাল নেতাদের দেয়া উত্তম নেতার' সেবা কাজের প্রকৃত শিক্ষা নিতে ব্যর্থ হয়েছি। সামাজিক সংঘাত বা মারামারির চেয়ে এটি আরও মারাত্মক রোগ হিসাবে সমাজে ধরা দিয়েছে। সুতরাং, 'নেতৃত্বকে' অবশ্যই 'উত্তম নেতার' বৈশিষ্ট্যের আলোকে অন্যদেরকে একটি ব্যক্তিগত এবং কাঠামোগত পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যেতে হবে যাতে আমরা মানুষের কল্যাণে একটি সামাজিক পরিবর্তন আনতে পারি। কি হবে বা কি পাবো? অর্থাৎ ফলাফলের দিকে মনোনিবেশ না করে, বরং জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসের সহযাত্রী হয়ে একসঙ্গে 'যাত্রা' করাটাকেই জীবনের একটা বড় ভাগ্য বা পাওয়া বলে মনে করে এগিয়ে যেতে পারি- এটাই হোক আগামীকালের নয় বরং আজকের প্রতিজ্ঞা।

কর্তৃপক্ষ সেবা হয়ে উঠে যখন সে এটি সহভাগিতা করে অন্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেয় এবং মানুষকে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে"॥

- পোপ ফ্রান্সিস

জগতের কিছু নতুন বাস্তবতা

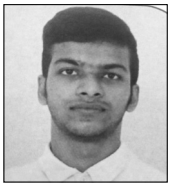

হৃদয় সুইডেন রোজারিও

আমাদের প্রত্যেকের জীবনে কিছু বাস্তবতা আছে তা আমরা সাধারণত অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে উপলব্ধি করি। আবার কিছু বাস্তবতা আমাদের নিয়ে যায় কল্পনার জগতে, কিছু নিয়ে যায় আবার বাস্তব জীবনে, কিছু বাস্তবতা হয় খুবই আনন্দের, আবার কিছু বা হয় কষ্টের। আর এগুলো নিয়েই অতিবাহিত করতে হয় আমাদের জীবন। কিছু বাস্তবতা আমরা অতি সহজে মেনে নিতে পারি, আবার কিছু বাস্তবতা আমাদের মেনে নিতে কষ্ট হয়। সবার মতো আমারও কয়েকটি ছোট অভিজ্ঞতা আছে তা বাস্তব হলেও মেনে নেওয়াটা ঐরকমভাবে সহজ হবে না হয়তো, তাও প্রকাশ করছি। আমরা অনেকেই জানি বা শুনেছি যে, গে বা টমবয় শব্দটা। আসলে সৃষ্টিকর্তা আমাদের সকলকেই পুরুষ ও নারী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন আবার কাউকে দিয়েছেন বিবাহিত জীবনে যাওয়ার ক্ষমতা আবার কাউকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়নি, আবার কেউ কেউ এই ক্ষমতা পেয়েছেন কিন্তু উৎসর্গ করেছেন সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে। এখন আসা যাক মূল কথায় সেটা হলো, একটি শিশু যখন কোল আলো করে পৃথিবীতে আসে তখন সবার মুখে ফুটে উঠে আনন্দের হাসি। কিন্তু ঐ শিশু পরবর্তীতে যখন দেখা যায় এরকম গে বা টমবয় হচ্ছে তখন ঐ পরিবারের দুঃখের সীমা থাকে না। কিন্তু আমরা কী কখনও প্রশ্ন করেছি কেন হচ্ছে এই সমস্যাগুলো? আমি যা মনে করি এই সমস্যার কারণ ধরা যেতে পারে জন্ম থেকে আবার জন্মের পর থেকে। বৈজ্ঞানিকভাবে বলা যায় মানুষের শরীরে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম থাকে তার মধ্যে ১ জোড়া থাকে সেক্স ক্রোমোজোম তার মধ্যে ছেলেদের এক জোড়া ক্রোমোজোম হলো (x,y) এবং তা মেয়েদের বেলায় হলো (x,x) ছেলে ও মেয়েদের বেলায় যখন এই দুইটার পরিমাণ যখন অর্ধেক অর্ধেক করে দেহ গঠন হয় তখন কিন্তু এই ধরনের সমস্যা যেমন: গে, টমবয় বা অক্ষমতার ইত্যাদি সমস্যা দেখা যায় না। আর এটি যখন ছেলেদের বেলায় (x,y) এর পরিমাণ কম এবং এর পরিমাণ বেশি হয় তখন এই ধরনের সমস্যা দেখা যায়। আর অন্যদিকে আমাদের পরিবারকে এই সমস্যার কারণ হিসেবে কোন কোন সময় ধরা যায়। এখানে বলা যেতে পারে মেয়েদের ক্ষেত্রে তারা এই ধরনের সমস্যা সম্মুখীন হন খুব কমই কারণ মেয়েদের সেক্স ক্রোমোজোম দুইটাই সেইম অর্থাৎ (x,x) কিন্তু ছেলেদের বেলায় সেক্স ক্রোমোজোম দুইটাই ভিন্ন হওয়ায় (x,y ছেলেরা এই সমস্যার সম্মুখীন বেশি হন। তাহলে প্রশ্ন থাকতে পারে যে, ছেলে ও মেয়েরা উভয়ে কীভাবে গে, টমবয় বা অক্ষম হন? আমরা তো একটু আগে বৈজ্ঞানিকভাবে দেখলাম কিন্তু এখন আমরা এখন একটু লক্ষ্য করি আমাদের পরিবারের দিকে, কিছু কিছু পরিবারে আমি যা লক্ষ্য করেছি তা হলো ছেলে ও মেয়ে উভয়ই যখন ছোটবেলা থেকে কাজ করে অর্থাৎ ছেলে মেয়েদের কাজ করে যেমন: থালা বাসন ধোয়া, সবজি কাটা, রান্নাবান্না করা ইত্যাদি এবং মেয়েরা ছেলেদের কাজ করে যেমন: গাছে উঠা, মাটি কাটা, ইত্যাদি। ঠিক তখনই এই সমস্যা ঘটে। তখন দেখা যায় যে, তারা স্বাভাবিকভাবেই এই সকল সমস্যায় নিজেদের বদলে ফেলে আর তখনই দেখা যায় ছেলেরা আচরণ করে মেয়েদের মতো এবং মেয়েরা করে ছেলেদের মতো। আর এর কারণে এই সকল ছেলেদের সাথে মেয়েরা মেলামেশা করতে চায় না, আবার অন্যদিকে এইসকল মেয়েদের সাথে ছেলেরা মেলামেশা করতে চায় না। আর এই কারণে তারা নিরুপায় হয়ে সেম সেক্সের ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশা করে আর এতে তাদের মধ্যে আকর্ষণ দেখা দেয় তাও আবার সেইম সেক্সের উপর। তাহলে আমরা এখন চিন্তা করতে পারি যে, এই সমস্ত ছোট ছোট সমস্যা হয়তো আমাদের চোখের আড়ালে ফাঁকি দেয় কিন্তু একটা সময় এই সমস্ত সমস্যা বড় আকারে ধারণ করে। আর তখন দেখা যায় তাদের বিয়ে করতে বললে তারা সেইম সেক্সের সাথে বিয়ে হওয়ার জন্য মতামত পোষণ করে। আর এর কারণে অনেক দেশে দেখা যায় সরকারও অনুমতি দিয়ে ফেলেছেন সেইম সেক্সের সাথে বিয়ের জন্য। তাহলে আমরা এখন দেখলাম যে, আমরা পরিবারের সদস্যরাই অনেক সময় এই সমস্ত বড় বড় সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াই তাও আবার না বুঝে। তাই আমাদের পরিবারই এই সমস্যার সমাধান অধিকাংশ করে ফেলতে পারে॥

এসো ধরা তলে

সুবীর কাস্মীর পেরেরা

ক্ষমা কর মোরে, রেখো পণ্য করে
প্রভু দয়াময়,
এসো তব ঘরে, গাহি সুরে সুরে
তুমি কৃপাময়।
ধরা মাঝে ঝরা, আমি দিশেহারা
অমানিশার ভোর,
আমি আত্মহারা, এসো এসো তরা
দাও খোলে এ দোর।
হৃদয়ে দিও ঠাঁই, আর ভয় নাই,
তোমার চরণ তল,
মনোঃ প্রাণে গাই, গানে-সুরে চাই
তোমার সুধা জল।

যুবাচত্বর

তথ্য প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যুবাদের নৈতিক গঠন

ফাদার নিখিল এ. গমেজ

বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। আর এ তথ্য প্রযুক্তিই আমাদের জীবনকে করেছে সহজ-সরল এবং প্রাণবন্ত। অন্যদিকে এ তথ্য প্রযুক্তিই মানুষের জীবনকে করেছে অনেক গতিময়, করে তুলেছে সহজতর। এদিক থেকে আমরা বলতে পারি যে, যোগাযোগ মাধ্যম ও তথ্য প্রযুক্তি মানুষের জন্য বড় আশীর্বাদ। কারণ এই প্রযুক্তি আমাদেরকে সব কিছু হাতের মুঠো এনে দিয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার আমাদের মানব সমাজ জীবনে অনেক উন্নতি সাধন করেছে এটা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। তাই এই দিক দিয়ে আমরা ভাগ্যবান বললে মোটেই কোন দিক দিয়ে ভুল হবে না।

আমাদের এই আধুনিক সমাজ জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বিশ্বের প্রতিটি দেশের প্রতিটি জায়গায় প্রযুক্তি প্রভাব ফেলছে, ফলে পাল্টে যাচ্ছে আমাদের কর্ম-পদ্ধতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, উৎপাদন প্রক্রিয়া, ব্যবস্থাপনা, এমনকি রাষ্ট্র চালানোর প্রক্রিয়া। যা আধুনিক প্রযুক্তির মোবাইল-ফোন, কম্পিউটারের মাধ্যমে সারা বিশ্বের তথ্য প্রযুক্তি খাতের পরিবর্তন, ইন্টারনেট অব থিংস, যন্ত্রপাতি পরিচালনায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ, রোবটিক্স, জেনেটিক্স, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের মতো বিষয়গুলো চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের সূচনা বলেও মনে করেন যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা।

প্রতিনিয়তই প্রযুক্তি আমাদের অনেক কিছু দিয়ে যাচ্ছে। আবার আমাদের কাছ থেকে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ কেড়েও নিয়ে যাচ্ছে। চলমান সভ্যতার উন্নয়নে এই তথ্য প্রযুক্তির অবদান অপূরণীয়। কিন্তু আমরা কি কখনো গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি যে, প্রযুক্তির নেতিবাচক দিকগুলো আমাদের সমাজের মানুষ গুলোকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে?

প্রযুক্তির সহজলভ্যতার ফলে আমাদের সমাজে আজ সৃষ্টি হয়েছে অস্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তাহীনতা। নৈতিক অধঃপতনে পতিত হয়েছে আমাদের যুব সমাজ। সহজতর যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে হারিয়ে যাচ্ছে বিশ্বাস।

বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তথা ফেইসবুক, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার ইত্যাদির মাধ্যমে অবাধ যোগাযোগ ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আর আমাদের বর্তমান যুব সমাজে দেখা যাচ্ছে ডিপ্রেশন অর্থাৎ হতাশা, দণ্ড, বিভেদ-বিচ্ছেদ কারণ হিসেবে অভিভাবকরা দায়ী করছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে? তবে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এর জন্য কী প্রযুক্তি দায়ী? না কী আমরা যারা প্রযুক্তি ব্যবহার করছি তারা দায়ী? আসুন একটু ভেবে দেখি।

আমি যেহেতু যুবাদের নৈতিক গঠনের বিষয় নিয়ে ভাবছি তাই প্রথমেই আমার প্রশ্ন জাগছে আসলে নৈতিকতা বলতে আমরা কি বুঝি? সাধারণভাবে নৈতিকতা হলো মানুষের জীবনে ভাল-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা ও বিবেচনাবোধ। অন্যদিকে মূল্যবোধ মানে হলো- আমাদের বিবেক (concience) দ্বারা পরিচালিত বোধশক্তি। তাই নৈতিকতা ও মূল্যবোধ মানে হলো-ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, পাপ-পুণ্য, ভুল-সঠিক আচার-আচরণ, চাল-চলন সম্পর্কে সঠিক নীতিমালা বা জীবনমুখী জ্ঞানবোধ। বিবেক দ্বারা পরিচালিত জ্ঞান হলো দিব্যজ্ঞান যা মানুষকে আলোর মানুষ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়।

এখন আমরা প্রশ্ন করতে পারি যে, তা হলে যুব নৈতিকতা কি? আমার মতে যুব নৈতিকতা হলো যুব জীবনে সৎ গুণের অনুশীলন করা। যে গুণগুলো অনুশীলন করার মধ্যদিয়ে যুবারা শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধন করে। নিজের ও পরের কল্যাণ সাধন করে।

নিম্নে তথ্য প্রযুক্তির যুগে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যুবাদের নৈতিক গঠন বিষয়টি তুলে ধরতে চেষ্টা করলাম। তথ্য প্রযুক্তির যুগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার সর্বাধিক বৃদ্ধি পাচ্ছে বিশেষ করে যুব-কিশোরদের মধ্যে।

গবেষণায় দেখা যায় যে, আমাদের দেশে ১৪ থেকে ২৪ বছর বয়সী যুব-কিশোর বেশি ব্যবহার করে ফেইসবুক, টুইটার, গুগল+, লিংকডইন, ইউটিউব, ইষ্টাগ্রাম প্রভৃতি সাইট ও অ্যাপস্।

আর বাংলাদেশে ফেইসবুক ব্যবহারকারীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো ১৪ থেকে ২৪ বছর বয়সী যুব-কিশোর কিশোরীরা। এদের মধ্যে আবার উল্লেখযোগ্য সংখ্যা হল ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু-কিশোর যারা নূন্যতম ১৮ বছর বয়স দেখিয়ে ই-মেইল আইডি খুলে সামাজিক মাধ্যমগুলি ব্যবহার করে যাচ্ছে।

এছাড়াও ইন্টারনেট এবং ফেইসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলিতে যুব-কিশোর কিশোরীর আসক্তির ফলাফল খুবই উদ্বেগজনক। এক জরিপে দেখা যায় যে, ১৪ থেকে ২৪ বছর বয়সী ফেইসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৫০% বেশি। গড়ে একজন যুব-কিশোর ৫ থেকে ৬টি করে সামাজিক যোগাযোগ সাইট ব্যবহার করছে। আর এই বয়সীদের সামাজিক যোগাযোগ সাইট ব্যবহারের গড় সময় দৈনিক ৩ থেকে ৪ ঘন্টা।

জরিপের তথ্য অনুযায়ী বয়সীদের সামাজিক যোগাযোগ সাইটে আসক্ত পর্যায়ে গেছে ৫০% এর অধিক। যুব ও কিশোর যারা বাবা-মা, অভিভাবকদের ফাঁকি দিয়ে এইসব সাইটে দৈনিক ৫-৬ ঘন্টা সময় ব্যয় করে থাকে যা অপ্রত্যাশিত ও অস্বাভাবিক। ফেইসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলিতে অধিক সময় ব্যয় করার কারণে স্বাভাবিকভাবেই ১৪-২৪ বয়সী কিশোর-যুবদের লেখাপড়ায় মনোযোগিতা এবং উদাসীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

জরিপে আরো দেখা যায়, সামাজিক যোগাযোগ সাইটগুলি লেখাপড়া-জ্ঞান অর্জন থেকে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সরিয়ে নিচ্ছে। যে সময় ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া ও জ্ঞান অর্জনে ব্যয় করত, সেই সময়ের সিংহ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীরা এখন ব্যয় করে বিভিন্ন সাইটগুলিতে। যে বয়সে মেধার যে মান অর্জিত হওয়ার কথা, সেই প্রত্যাশিত মান হ্রাস পাচ্ছে ক্রমেই। অনেক গবেষক মনে করেন, ছেলে-মেয়েরা ইন্টারনেট এবং ফেইসবুকসহ সহস্র সাইটে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে ক্রমেই, যা একটি জাতির মেধা শূন্য হওয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত।

সামাজিক যোগাযোগ সাইটগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুল ও বিভ্রান্তিকর এবং বানোয়াট তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করে থাকে, যা যুব-কিশোরদের মধ্যে নেতিবাচক চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ, অভ্যাস-রুচি এবং আগ্রহ সৃষ্টিতে প্রভাবিত করছে। শুধু তাই নয়, সামাজিক যোগাযোগ সাইটগুলি অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখছে। সহস্রাধিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এর মধ্যে অসংখ্য সাইট আছে যেগুলি শুধু পর্ণোগ্রাফীতে পূর্ণ। সেই সব নীল সাইট ও অ্যাপস্ যুব-কিশোরদের নৈতিক ভিত্তি নষ্ট করে দিচ্ছে।

তথ্য-প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যুবাদের নৈতিক গঠন বিষয়টি চিন্তা করতে গিয়ে দেখি যে, প্রত্যেকজন যুবাই অত্যাধুনিক যুগের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। বিভিন্ন রকমের প্রযুক্তি বিশেষ করে মোবাইল, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ফেইসবুক, ইমেইল, টেলিভিশন ইত্যাদি এগুলো আমাদের জীবনের অপরিহার্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এগুলো ছাড়া আমরা আমাদের জীবকে কল্পনাও করতে পারবোনা।

তবে উল্লেখ থাকে যে, প্রযুক্তির ইতিবাচক ও নেতিবাচক ফল বা প্রভাব দুই রয়েছে। প্রযুক্তির যথাযথ সদ্ব্যবহার করে যুবারা তাদের জীবনকে উত্তরোত্তর শিক্ষা ও সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে নিয়ে যেতে পারে। তাই যে যুবা তথ্য প্রযুক্তির সাথে

তাল মিলিয়ে চলবে ও ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করবে সে জীবনে তত বেশি সফল হতে পারবে। আবার প্রযুক্তির নেতিবাচক ব্যবহার ও অতিমাত্রায় আসক্ত হয়ে যুবারা নিজের জীবনের ধ্বংস ও পতন অনিবার্য করে তুলতে পারে।

কিন্তু একথাও সত্য যে, আমাদের যুবারা অতি মাত্রায় তথ্য প্রযুক্তির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে। যার ফলে তারা নিজের জীবন, পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। জীবনের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির প্রতি অতি মাত্রায় আসক্তি ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্যবহারের ফলে যুবারা তাদের নিজের পড়াশুনা, ক্যারিয়ার গঠন, দায়িত্বপালন, অন্যদের সাথে সুসম্পর্ক, ইত্যাদি তাদের জীবন থেকে মারাত্মক ভাবে লোপ পাচ্ছে।

তথ্য প্রযুক্তির প্রতি অতি আসক্তির কারণে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে যুবারা চরমভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। সেক্ষেত্রে যুবাদের জন্য বিশেষ সাহচর্য, যত সহায়তা ও নির্দেশনা দরকার যেন তারা তথ্য-প্রযুক্তির মন্দ আসক্তি ত্যাগ করতে পারে।

তাই বর্তমান মণ্ডলী যেমন যুবাদের কাছ থেকে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে, ঠিক তেমনি যুব সমাজও মণ্ডলীর কাছ থেকে অনেক কিছুই প্রত্যাশা করে। যুবারা চায় মণ্ডলী সব সময় তাদের পাশে থাকুক। যুবাদের বিপদের সময় মণ্ডলী সবসময় তাদের সহায়তা ও রক্ষা করুক। গঠনমূলক সংশোধন ও শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করুক। তাই পরিবার, মণ্ডলী, সমাজ ও দেশের দায়িত্ব হবে যুব সমাজকে যথাযথ পরিচর্যা ও যত্ন করা। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ক্ষেত্রে এ সহায়তা দরকার।

যুবাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে যে নৈতিকতা মেনে চলা উচিত বলে আমি মনে করি তা হলো; (ক) তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে নিজের দক্ষতা ও জ্ঞান কাজে লাগিয়ে জনগণকে সাহায্য করা। (খ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ও নীতিমালা মেনে চলা। (গ) জনগণের সমস্যা হয় এমন কোনো তথ্যের ভুল উপস্থাপন না করা। (ঘ) ব্যক্তিগত অর্জনের জন্য অবৈধভাবে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার না করা।

একটি সঠিক ধর্মীয় আদর্শ ধারণ করা উচিত যার মাধ্যমে আমাদের যুবসমাজ তাদের জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন হবে এবং তারা হয়ে ওঠবে এক একজন, মানবতার কল্যাণে-দেশের কল্যাণে, নিবেদিত প্রাণ। প্রকৃত ধর্মের শিক্ষার পাশাপাশি সঠিক প্রযুক্তির শিক্ষা আমাদের দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধি করে তুলবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

তথ্য সংগ্রহ ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ :

১। ইন্টারনেট
২। ফাদার প্রশান্ত থিওটোনিয়াস আইন্দ, পরিচালক বিসিএসএম, রাজশাহী
৩। মি. যোসেফ গমেজ, ফ্রিল্যান্সার॥

তোমাকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে এরই নাম জীবন

প্যাট্রিক সরদার

তোমাকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে এরই নাম জীবন,
তুমি শিশু হিসেবে চটপটে চঞ্চল নও,
তবে তুমি সুস্থ শিশু নও,
তোমাকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে এরই নাম জীবন।

একটু বড় হবার পর পড়াশোনায় মনোযোগ কম,
তবে তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার,
তুমি তো আইনস্টাইন হতে পারবে না,
তোমাকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে এরই নাম জীবন।

আরেকটু বড় হবার পর ভালো স্কুলে চান্স পাওনি,
তবে তুমি তো আর তাদের মতোন নও,
ভালো রেজাল্ট নেই তোমার,
তোমাকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে এরই নাম জীবন।

তুমি শ্রেণী কক্ষে সবাইকে টপকে গেছো,
বাহ্ বাহ্ বলে মা বাবা হাতে তালি দিয়েছেন,
তোমার মুখে রাফিনাতো বেলিসিমো পুরে,
তোমাকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে এরই নাম জীবন।

অতঃপর ধীরে ধীরে আরও একটু বড় হবার পর,
মেট্রিক ইন্টারে গোল্ডেন জিপিএ ৫ পেয়েছো,
বেশ্ বলে ছোট মামা অথবা ফুপি একটা
দামী বাইক বা লেটেস্ট মডেলের আই ফোন
অথবা ডিওর থেকে এনে দেয়া অতি সর্ট
একখানা টপস্ কিনে দিয়েছেন যা কিনা আবার
ডিজাইনাব্লস কালেকশান বলে কথা!
তোমাকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে এরই নাম জীবন।

পিএইচডি ডিগ্রিটা বিদেশে না করে
দেশে করেছো!
কি বললে! পিএইচডি এখনো কমপ্লিট
হয়নি তোমার
ও মাই গড - বৃথাই তোমার শিক্ষা জীবন!
তোমাকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে
এরই নাম জীবন।

পড়াশোনাতো ভালোই করেছো দেখছি!
তো কোথায় চাকুরি ব্যবসা করছো!
মাসিক রোজগার সাত ডিজিট হলো তো!
যাহ্ বাপু ছয় ডিজিটও হয়নি আজো!
তোমাকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে
এরই নাম জীবন।

তোমাকে উঠতে বসতে শ্বখানেক লোক দিনে
স্যার ম্যাডাম বলেতো!
যাক্ বাবা এই না হলে প্রতিষ্ঠিত!
তোমাকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে
এরই নাম জীবন।

যাহোক গাড়ি বাড়ি করেছো কেমন বাপু!
ক্বখানা প্লট ফ্ল্যাট হলো বাপধন
মামনি তোমার!
গুলশান বনানীতে কখানা হলো হুম!
দেখলাম গতমাসে মার্সিডিজ ছেড়ে অডি
তে এসেছো!
যাক্ এতো দিনে তোমার রুচির পরিবর্তন
হলো তবে!
তোমাকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে
এরই নাম জীবন।

বিয়ে করেছো! বলো কি! করো করো
এতো শত ধনসম্পদ তোমার,
একদম লাকি চ্যাম তুমি!
করেছো তো ক্বখানা ছেলেপুলো হলো গো!
ওহ্ মেয়ে দ্বখানা যাকগে বাপু!
তোমাকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে
এরই নাম জীবন।

এবার কোত্থেকে এলে রিসেন্টলি!
সোস্যাল মিডিয়ায় দেখলাম জাস্ট ফ্রম
এল এ!
লাস্ট মান্থেই না অফিস মিটিং এ পরিবার
সহ ইউরোপ ও নর্থ এম্যারিকা ট্যুরে
গেলে, আহ্ কি লোকেশান!
তোমরা কানাডা স্যাটেল হচ্ছো কবে!
তোমাকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে
এরই নাম জীবন।

রাস্তার পাশের কুকুরটাকে তুমি জল দাও!
মোড়ের ভিক্ষুকটার সাথে তুমি রোজ
সন্ধ্যায় সময় করে পাঁচ মিনিট চা খাও!
রিক্সা ওয়ালাটাকে মামা বলো শুনে রাস্তার
পাশের বি এম ডব্লিউ চড়া আন্টিটি ছি ছি
ডিজগাস্টিং বলে!
জমিতে পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি শত বছরের
পুরনো গাছপালা কেটে আধুনিক সব
ফ্যাসিলিটিস প্রয়োজন তোমার আর তুমি
করছো না!
কি সেকেলে সেন্টিমেন্ট তোমার!
তোমাকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে
এরই নাম জীবন।

জীবন শুধু তোমায় শেখায়নি যে আজও
তুমি ও তোমার চৌদ্দ পুরুষ একই রেখায়
ঘুরছো আর পিষ্ট হচ্ছো লক্ষ কোটি বছরের
চাকা ঘুরে,
সত্যিকারের মানুষ হতে জীবন তোমাকে
আজও শেখায়নি বা তুমি শেখোনি-
শেখানো পুরাতন লোভের শাশ্বত চাকায়।
জীবন তোমাকে শেখাবে না,
ওর তোমাকে শেখাতে বয়েই গেছে।

হুম, ঠিক তাই!
তোমাকে শিখিয়েই দেয়া হয়েছে
এরই নাম জীবন॥

যুব ভাবনায় বড়দিন

ফাদার নয়ন লরেন্স গোছাল

ভূমিকা: ঈশ্বর পুত্রের মর্তে আগমন! এই তো বড়দিন! এই আগমনকে কেন্দ্র করে বছর ঘুরে আসে আনন্দ উৎসব আর নানা আয়োজন। আয়োজনের সাথে যেটি বেশি প্রয়োজন সেটি হ'ল অন্তরে নবায়ন। নবায়ন আসে তখনই যখন প্রত্যাশা আর প্রাপ্তি, পাওয়া এবং হওয়ার মধ্যে সংগঠিত হয় যথার্থ আত্মমূল্যায়ন। এই সকল বার্তা নিয়েই যেন বছর ঘুরে ফিরে আসে বড়দিন। মানবজাতির জন্যে ঈশ্বরের বিশেষ উপহার তাঁর আপন পুত্রকে দান। তিনি উপহার দিতে নয় কিন্তু উপহার হয়েই আমাদের মাঝে এসেছেন। এর কারণ আমরাও যেন উপহার দেয়ার চেয়ে উপহার হতে পারি- ঈশ্বরের কাছে এবং পরস্পরের কাছে। উপহার দেয়া যেমন সহজ উপহার হয়ে উঠা ততটা কঠিন। উপহার দেয়ার চেয়ে উপহার হয়েই তাঁর কাছে আমরা যেতে পারি। তাঁর বর ছাড়া আমরা উপহার হতে পারি না বরং বর লাভ করেই আমরা হয়ে উঠি অনন্য উপহার। বড়দিনে এই ধরণের নানা প্রসঙ্গ-পরিসর, ভাবনা-বাসনায় অমাদের অন্তর-মনে হাতছানি দিয়ে ডাকে এবং এর প্রেক্ষিতে বাস্তবতার পর্যবেক্ষণে এবং নানা পদক্ষেপ গ্রহণে আমাদের অনুপ্রাণিত করে। বড়দিনের মহা ঘটনায় যারা সম্পৃক্ত তারা দু'জনই যুবক ও যুবতী সেই প্রেরণা থেকে বড়দিনে যুবাদের নিয়ে কিছু ক্ষুদ্র ভাবনা ব্যক্ত করার বাসনায় অনুপ্রাণিত হয়েছি।

বড়দিন রহস্য: বড়দিন একটি অভূতপূর্ব ঘটনার অবতারণা। এতে একদিকে যেমন আছে গভীর রহস্যের বেষ্টনী তেমনি রয়েছে ঐতিহাসিক সত্যতায় মুক্তির ইতিহাসের একটি স্রোতধারা। বড়দিন মানব পুত্রের দেহধারণের মহোৎসব। ঈশ্বরের মানব স্বরূপে মর্ত্যে আগমন। বড়দিন এই সত্য প্রকাশ করে যে, মর্ত্যলোক খারাপ নয় কেননা ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে দান করেছেন "ইম্মানুয়েল" হিসাবে অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর। মানুষের বুদ্ধি, যুক্তি ও চিন্তার উর্ধ্বে ঈশ্বরের সেই অসাধ্য সাধন। মানুষের কাছে তা এক রহস্যময় ঘটনা যেহেতু মানুষের জ্ঞানে জৈবিক সূত্রকে ছাপিয়ে কোন পুরুষের সংস্পর্শ ছাড়া কুমারী গর্ভবতী হলেন। "কারণ পরমেশ্বরের আসাধ্য কিছুই নেই" (*লুক ১:৩৭*)। এই ঘটনা তাই রহস্যময় এবং পূর্বে কখনও ঘটেনি। "বাণী একদিন হলেন রক্তমাংসের মানুষ; বাস করতে লাগলেন আমাদেরই মাঝখানে আর আমরা তাঁর মহিমা প্রত্যক্ষ করলাম, একমাত্র পুত্র হিসাবে পিতার কাছ থেকে সেই যে মহিমা-ঐশ অনুগ্রহ ও সত্যের সেই পূর্ণতা" (*যোহন ১:১৪*)।

বড়দিন শব্দগত অর্থে এবং বাস্তবতা পর্যবেক্ষণে দিন বড় নয়। এ যেন অন্তরের রাত্রিতুল্য অন্ধকারের নিরসনে এবং দিনতুল্য অলোরই প্রস্ফুটন। ঈশ্বরতনয় কে পরম বর হিসাবে লাভ করি বলেই এই দিনটি আমাদের জন্যে বড়দিন।

বড়দিনে যুবসমাচার: বড়দিন যে জন্যে উদ্‌যাপন করি সেই ঐতিহাসিক এবং অসম্ভব ঘটনাকে সম্ভব করতে ঈশ্বর যে মাধ্যম ব্যবহার করেছেন সেই মাধ্যম হ'লো দু'জন যুবক-যুবতী যোসেফ এবং মারীয়া। পবিত্র বাইবেল এর বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, মা-মারীয়া একজন যুবতী ও কুমারী। আর একজন যুবতী কুমারীই যে হবেন ঈশ্বর পুত্রের জননী তা বহুযুগ আগে থেকেই প্রবক্তাদের ভবিষৎদ্বাণীতে ব্যক্ত হয়েছে। তবে সাধু যোসেফের বয়সসীমার কোন সুনির্দিষ্ট বর্ণনা নেই। সাধু যোসেফর যে চিত্র আমাদের মনে ভাসে সেখানে তিনি যেন একজন বয়োবৃদ্ধ কিন্তু এটা কোথাও উল্লেখ না থাকলেও যৌক্তিক হবে যে, একজন পুরুষ স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত এবং পরিপক্ক বয়সে বিয়ে করতে যান। প্রবীণ বয়সে খুব কম লোকই বিয়ের পিড়িতে বসতে চায় যদি না সেটা খুব প্রয়োজন কিংবা দ্বিতীয় বিয়ে হয়।

ইহুদি প্রথা বিবেচনায় বিবাহ একটি ঐশ পরিকল্পনা। সাধারণভাবে একজন পুরুষ যখন যৌবনে পরিপক্ক এবং দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হয় তখন সে বিয়ে করতে পারে। সেই হিসাবে বাগদানের প্রথায় মেয়েদের বয়স বিবেচনা করা হতো বার থেকে পনের বছর এবং বিয়ে হত পনের থেকে ষোল বছরে। আর ছেলেদের জন্যে উনিশ থেকে বিশ বছর। মোট কথা বংশবৃদ্ধির করার উপযোগী সময় অর্থাৎ তাদের কৈশর থেকে বিশ বছরের মধ্যে (*তুলনীয় আদি ১:২৮*)। এটা সহজেই অনুমেয় যে, তিনি পরিপক্ক যুব বয়সে একজন যুবতীকে বিয়ে করতে অগ্রসর হয়েছেন। তাই বড়দিন ঘটনার আধ্যাত্মিকতায় যুব ভাবনাটি একটি বিশেষ অনুসঙ্গ।

যোসেফ-মেরীর স্বপ্ন এবং যুব স্বপ্ন: যুব বয়সের একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হ'লো স্বপ্ন দেখা, স্বপ্ন রচনা করা এবং সেই স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করা। স্বপ্নের সাথে সৎপ্রচেষ্টা এবং সক্ষমতার সংমিশ্রনে সৌভাগ্য এবং সফলতা রচনা করা যুব মনের একান্ত প্রত্যয়। যোসেফ-মেরীর যুগল প্রাণের অভিন্ন স্বপ্ন হ'লো একটি বিবাহ, সংসার এবং সন্তান। তাই তারা সেই লক্ষ্যে পরস্পরের সম্মতির ভিত্তিতে বাগদান প্রক্রিয়ার মধ্যে অগ্রসর হয়েছিল একটি নির্দিষ্ট স্বপ্ন পূরণের অভিপ্রায়ে। পথিমধ্যে যেন হঠাৎ স্বপ্নভঙ্গ! এ যেন জীবনের একটি ছন্দপতন! মারীয়া অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে, যোসেফ কি ভাববে বা কি করবে সেই বাস্তবতাকে ছাপিয়ে দূতের কথায় সম্মতি দিয়ে বসলেন। স্বপ্নের মধ্যে যেন আরেক স্বপ্ন। এ তো স্বপ্ন নয় যেন দুঃস্বপ্ন! একজন প্রাপ্ত বয়স্ক যুবতী হিসাবে তিনি যে ইহুদি আইন জানতেন না তা বলা যাবে না। বিয়ের আগে গর্ভবতী হওয়া এবং এই খবর প্রকাশ পেলে কি ভয়ংকর পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে এবং জীবনের চরম মূল্য দিতে হবে তা জেনেও যেন স্বেচ্ছায় বিপদের দিকে পা বাড়ানো। মারীয়ার যেন এই দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। যুব বয়সের এই প্রবণতা যেমন একদিকে সত্য তেমনি অগাধ ঈশ্বর বিশ্বাস থেকে নতুন স্বপ্নে তাঁর এই সাড়া দান। কিন্তু যোসেফের কানে অবশেষে খবরটি পৌঁছল। একটি অকস্মাৎ ঘটনায় সারা জীবনের স্বপ্ন যেন ভেঙ্গে চুরমার। এই বিয়ে হবে না। সমাজের চোখে কলংকিত, পাপময় একটি ঘটনা। তবে জাগ্রত বিবেকবোধ থেকে বিধান সংরক্ষিত এই অপরাধের রায় প্রাণনাশের মত ভয়ংকর পরিণতি থেকে মারীয়াকে রক্ষা করতে যেমন চেয়েছেন তবে তিনিও আবার এও চাননি তাঁকে ঘরে আনবেন। যেহেতু তিনি ধার্মিক মানুষ ছিলেন তাই মনে একটি ধর্মগত দ্বন্দ্ব ছিল। পিতৃপরিচয়হীন এই শিশুকে তাঁর বংশধর বলে মিথ্যা স্বীকৃতি দেয়া একটি বিধান বিরুদ্ধ কাজ। তাই মারীয়াকে নিয়ে ঘর বাধার স্বপ্ন যেন দুঃস্বপ্নে পরিণত হল। আজকের বাস্তবতায় যোসেফের মত হাজারও যুবক-যুবতীর স্বপ্ন ভাঙ্গার গল্পের মত। শেষে মারীয়ার মত সাধু যোসেফও স্বপ্নের মধ্যে আরেকটি স্বপ্ন দেখলেন। সেই স্বপ্ন সমস্ত চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করে মারীয়াকে ঘরে আনার নির্দেশ। এ যেন প্রথম স্বপ্নের পতন এবং একটি নব স্বপ্নের উত্থান। আবারও দুজনের একই স্বপ্ন কিন্তু ভিন্ন ধারায়। এই দু'টি স্বপ্ন মিলে গিয়ে যেন একই স্বপ্নে পথ চলার নির্দেশ দান করে।

আমাদের যুব জীবনে স্বপ্ন পূরণে এই ধরনের নানা বাস্তবতার মুখোমুখি হই। সাধু যোসেফ ও মা-মারীয়ার মত বড়দিনের ঘটনায় আমরা আমাদের স্বপ্নের মূল্যায়ন করতে পারি। আমরা দেখি কল্প জগতে (Virtual World) তাদের যে স্বপ্ন এবং বস্তু জগতে (Actual World) তাদের স্বপ্ন এর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। পূর্বেই যেমন বলেছি স্বপ্ন দেখা যুবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অনেক সময় যুব বয়সের স্বপ্নটি আসে কল্প জগতে স্বপ্ন ভাবনা থেকে। আবার সেই স্বপ্নকে নিয়ে অনেকে অগ্রসর হতে চায় বস্তু জগতে। তবে কোন কোন পরিস্থিতি সেই

স্বপ্ন সফলে ব্যর্থ হলে অনেকে নিজ জীবনটাকে অর্থহীন এবং ব্যর্থ মনে করে। তাদের কাছে জীবনটা তখন একটি দুঃস্বপ্ন এবং দুর্বিসহ বোঝা হয়ে উঠে। এমন অবস্থায় অনেক যুবক-যুবতী জীবনের জন্যে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে এবং এইভাবে জীবন ধ্বংস করে ফেলে। বড়দিন ঘটনায় যুবক যোসেফ এবং যুবতী মারীয়া আমাদের মাঝে স্বপ্ন বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। কিভাবে স্বপ্নের ভিতরে নিহিত জীবন বাস্তবতায় উপযোগী স্বপ্নকে নিয়ে সংগ্রাম করতে হয়। একটি স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে আবার নতুন স্বপ্ন রচনা করতে হয়।

যোসেফ-মেরীর ঘরে যিশু এবং যুব অন্তরে যিশু: যুব বয়সের আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'লো কঠিনের পথে, রোমাঞ্চকর পথে, রহস্যের পথে হাঁটা এবং ঝুঁকি গ্রহণ করা। বয়সে যারা প্রবীণ তাদের চেয়ে বয়সে যারা নবীন তারা বেশি ঝুঁকি নিতে পারে। এক্ষেত্রে মনে হয় যুব বয়সের দৃঢ় মনোবল, অদম্য স্পৃহা ও উদ্যমতা বেশি কাজ করে থাকে। যুবতী কুমারী মারীয়ার জীবনেও তাই দেখা যায়। জীবনের জন্যে অত্যন্ত কঠিন একটি সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেছেন। যুব যোসেফও কঠিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই সিদ্ধান্তে সমর্থন করেছেন। এইভাবে যোসেফ-মেরীর ঘরে এল মুক্তিদাতা যিশু। যেকোন মুক্তি অর্জনই কঠিন। তবে যিশুতে যখন মুক্তি লাভ করি তখন আমরা "আনন্দে নড়ে উঠি" (*লুক ১:৪৪*)। যিশুর উপস্থিতি চিহ্ন হ'লো "অন্ধ এখন দেখতে পাচ্ছে, খোঁড়া হেঁটে বেড়াচ্ছে; কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করা হচ্ছে; কালা কানে শুনতে পাচ্ছে, মরা মানুষ বেঁচে ইঠছে আর দীন দরিদ্রের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার করা হচ্ছে" (*লুক ৭:২২*)। যিশুর উপস্থিতির চিহ্ন হ'লো এম্মাউসের পথে দু'জন শিষ্যের যাত্রা করার অভিজ্ঞতা। "পথে তিনি যখন কথা বলছিলেন ও শাস্ত্রের অর্থ অমন বিশদভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন তখন আমাদের মনের ভেতরে কি একটা আগুন জ্বলছিল না?" (*লুক ২৪:৩৩*)।

যিশু যখন যোসেফ-মেরীর ঘরে এসেছেন তখন দেখা যায় মারীয়া যেন এক নব জীবনে তথা যিশুকে ধারণের ও গ্রহণের আনন্দে বিমোহিত এবং সেবার বাসনায় অনুপ্রাণিত। যুব অন্তরে যিশুর উপস্থিতিও একই রকম হবে। যখন যুব অন্তরে যিশু জীবন্ত হয়ে ওঠেন তখন অন্তরে জ্বলে জ্বলে উঠে সত্য অন্বেষণের ব্যাকুলতা, সেবার একাগ্র বাসনা এবং সম্প্রীতির সহাবস্থান চেতনা। যিশুই হয়ে ওঠেন জীবনের আলো, পথনির্দেশক এবং পথ প্রদর্শক। যুব অন্তরে যখন যিশু থাকেন তখন "আমরা দিশেহারা হই কিন্তু নিরাশ হই না। নির্যাতিত হই কিন্তু নিঃসহায় হই না। ভূপাতিত হই কিন্তু বিনষ্ট হই না" (*২ করি ৪:৮-৯*)। এই বাস্তবতায় যোসেফ-মেরী আমাদের সামনে প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

যোসেফ-মেরীর যাত্রায় যিশু এবং যুব যাত্রা: স্বপ্ন থেকে সত্যে বাস্তব যিশুকে নিয়ে যোসেফ-মেরীর নতুন যাত্রা শুরু হয় মিশরের অভিমুখে। খুবই চ্যালেঞ্জিং। এ যেন স্বর্গদূতের মিষ্ট প্রতিশ্রুতির বিপরীত। যিশুকে ঘরে এনে যেন নতুন সমস্যায় পতিত হওয়া। মারীয়াকে খুব সহজে যোসেফ বলতে পারতেন যে এ তো আমার সন্তান নয় তোমার সন্তান। এই সন্তানের জন্যে আমার জীবনে সব সাধ শেষ। এখন মিশরের মরুপথে জীবনও যেন জর্জরিত। এ যে শুধুমাত্র পথের মরুময় যাত্রা তা নয় কিন্তু জীবনে একটি মরুময় নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত। নতুন দেশ, নতুন যাত্রা সাথে বউ-বাচ্চা। কি হবে পেশা যেন জীবন ধারণের ক্ষীণ আশা। অজানা শঙ্কা, অনিশ্চিত ভবিষৎ। তবে এগুলো তাঁর যাত্রাকে থামাতে পারেনি কারণ যিশু তো তাদেরই সাথে সহযাত্রী। তিনি শক্তি ও শান্তির যোগানদাতা। আর এইভাবে যোসেফ-মেরী যিশুকে যাত্রী সঙ্গী করে মুক্তির ইতিহাসের অংশী হয়েছেন।

তাই বলা যায় যে, সাধু যোসেফ এবং মা-মারীয়ার মত আমাদেরও কত যুবক-যুবতী জীবনে অনেক সময় মরুপথ অতিক্রান্ত করে। অনিশ্চিত ভবিষৎ ভাবনা, স্বপ্ন পূরণের ব্যর্থতা, ভালোবাসার সম্পর্কে বিচ্ছেদ এসব মিলিয়ে জীবন বোঝা হয়ে উঠে। এক ধরণের নিঃসীম হতাশায় জীবন প্রবাহ যেন স্থবির হয়ে পড়ে। সেখানে আমরা দেখি যে, কেমন করে সাধু যোসেফ ও মা-মারীয়া মরুপথে হেঁটেছেন। চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন। সেমিনারীতে থাকতে আমাদের একজন পরিচালক বলতেন, জীবনে চ্যালেঞ্জ (Challenge) না নিলে জীবন ব্যালেন্স (Balance) হয় না। যুব বয়সের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হ'লো চ্যালেঞ্জ নিয়ে পথ চলা। কবি সুকান্তের কথায় "স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলার ঝুঁকি, বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি, পদাঘাতে চায় ভাঙ্গতে পাথর বাঁধা, এ বয়স বাঁচে দুর্যোগ আর ঝড়ে, পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে।"

যিশুকে তথা যিশুর মূল্যবোধ নিয়ে যখন যুবারা পথ চলতে চায় তাদের জীবনেও আসে বাঁধা। চাকচিক্যময় রঙ্গীন পৃথিবীতে বাহারি আয়োজনের মধ্যে যিশুর মূল্যবোধ সংযোজন বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এ সত্যের পিছনে নিজেকে ভাঙ্গার সাধনা, পার্থিব মূল্যবোধেরকাছে হাসি-ঠাট্টা ছলনার পাত্র হওয়া এবং বহু গঞ্জনা সহ্য করা। তবে এসব অনিত্যের মাঝে নিত্য হলেন স্বয়ং যিশু। তিনি আমাদের মাঝে প্রকাশিত হন মিথ্যা মোহের ডামাডোলে সত্যের মঙ্গলধ্বনি, হতাশার তমসায় আশার দীপশিখা এবং কামের উন্মাদনার বিপরীতে প্রকৃত প্রেমের জীবনধারা হিসাবে। আর এইভাবে যিশু সেই অনন্ত জীবন আকাঙ্খী যুব প্রাণে পরিতৃপ্তি ও পরম শান্তির আস্তরণ ঘটান। এর কারণ তিনি তখন যুবাদের যাত্রা পথে থাকেন সহযাত্রী, পথনির্দেশক এবং পথপ্রদর্শক হয়ে। যুবাদের অন্তর তখন "জ্বলে জ্বলে উঠে" (*লুক ২৪:৩২*)। তবে যিশুর পথে এবং যিশুর সাথে যাত্রা করা হ'লো একটি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা। এই চ্যালেঞ্জ যুব জীবনকে ব্যালেন্স করে এবং সত্যে স্বাধীন করে। তাই যোসেফ-মেরীর যাত্রাপথটি ছিল মরুময় কিন্তু যিশু তাদের সঙ্গে আছেন বলে তাঁরা আজও আমাদের সামনে মুক্তাময়। যুবা হিসাবে যিশুর সাথে যাত্রা করলে আমরাও বিপথে গিয়ে বিপদে পড়ি না বরং অগ্নি শপথে সফলতা নিয়ে এগিয়ে যাই সম্মুখ পানে ।

জীবন যাত্রায় যিশুকে নিন বড়দিন প্রতিদিন: বড়দিন ঘিরে আমাদের নানা প্রয়োজন সামনে আসে। এই প্রয়োজন মেটানোর জন্যে নানা প্রস্তুতি ও আয়োজনও হয়ে থাকে। বছরের শেষে বড়দিন আমাদের এক ধরণের মূল্যায়নেরও দিন হয়ে আসে যে, এই দিনটি ছাড়া বছরের বাকি দিনগুলো কতটুকু বড়দিন ছিল? ভোজ-উৎসবের আয়োজনে নয় কিন্তু অন্তর মন্দিরে যিশুকে রাখার সৌন্দর্য সাধনে। জগতের কোন শক্তিই আমাদের মুক্তি দিতে পারে না যিশুর শক্তি ছাড়া। জগতে সম্পদে অনেকে শান্তি পেতে চায় আর এইভাবে যাত্রাপথে যিশুকে হারায়। আলো ভেবে আলেয়ার পিছনে ছুটে চলার নিরন্তর প্রতিযোগিতা এবং প্রচেষ্টায় ক্লান্ত হয়ে তখন আর বড়দিন পায় না; পায় শুধু বড় রাত। বড়দিনের দ্বারা ঈশ্বর 'ইম্মানুয়েল' হয়েছেন অর্থাৎ আমাদের সাথে তিনি থেকেছেন এবং সর্বদাই থাকতে চান। আমরা কি তাঁকে রাখতে চাই কি-না সেটাই বিবেচ্য বিষয়। তাকে রাখতে গেলে অনেক সময় সাময়িক কষ্ট, ক্রুশ' ক্লেশ ও যাতনা আঁধারের মত আসুক না কেন তব দিন আমাদের কাছে বড় হয়ে উঠে। এর কারণ আমরা যে আলোরই মানুষ হয়ে উঠি, আমরা আলোতেই পথ চলি। এভাবে যদি তিনি আমার ও আপনার কাছে, যুব সমাজের কাছে জীবন্ত থাকেন তখন আমাদের বড়দিন একদিনের বড়দিন হয় না বরং বড়দিন তখন প্রতিদিন।

উপসংহার: পরিশেষে বলতে চাই যে, যুবরা মণ্ডলীর প্রাণশক্তি। মণ্ডলীকে প্রাণময় এবং খ্রিস্টে জীবন্ত করতে যুব শক্তির প্রয়োজন সর্বাধিক। তারা 'ভবিষ্যৎ' এইভেবে পরে করবে বললে পরে আর করা হবে না এবং যুবাদের উপস্থিতিও তখন মণ্ডলীতে পর পর মনে হবে। তাদের বিবেচনা করতে হবে 'বর্তমান' হিসাবে যেন তারা এখনই স্ব-স্ব ক্ষেত্র থেকে এগিয়ে আসে। তাদের সরিয়ে নয় কিন্তু কোথাও যদি ত্রুটি থাকলে সেখানে সারিয়ে একই সারিতে সহযাত্রীরূপে আওতাভুক্ত করতে হবে। এভাবে মা-মারীয়া এবং সাধু যোসেফ যেমন শিশু যিশুকে নিয়ে যাত্রা করেছেন তেমনি মণ্ডলীতে উন্মুক্ততায় ও উদ্যমতায় এক সাথে সহযাত্রী হোক যুব সমাজ। যিশুকে অন্তরে ধারণ করে দিনের আলোর মত জীবনে আলো লাভ করুক। এমনকি চলার পথে রাত্রিরূপ অন্ধকার আসে কিংবা আসবে সেই মুহূর্তে জগৎজ্যোতি প্রভুকে বক্ষে ধারণ করে তারা সামনে এগিয়ে যাবে-এই হোক বড়দিনে যুব ভাবনায় যুবাদের বিশেষ প্রত্যয় ও প্রচেষ্টা॥

ধর্মপল্লীর পালকীয় কাজ ও যুব সংগঠন

অরণী রেজিনা গমেজ

বিশ্বযুব দিবসের খ্রিস্টযাগে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেন, world need young people like the earth needs rain. যুবারা হচ্ছেন মণ্ডলীর প্রাণ। বৃষ্টি ছাড়া পৃথিবী যেমন প্রাণহীন হয়ে পরে তেমনি যুবাদের ছাড়া খ্রিস্টমণ্ডলীও জীবন হারিয়ে ফেলে। বর্তমানে প্রায় প্রত্যেকটি ধর্মপল্লীতে একটি করে যুব সংগঠন রয়েছে। ধর্মপল্লীর বিভিন্ন পালকীয় কাজে এসব যুব সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান যেমন মৃতলোকের পর্বের সময় কবরস্থান পরিষ্কার, বড়দিনের সময় গির্জাঘর সাজানো থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্বীয় অনুষ্ঠানে বিস্কিট বিতরণ, শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য ভলেন্টিয়ার এর দায়িত্ব পালন করে থাকে। এছাড়াও উপাসনায় পত্রপাঠ, গান পরিচালনায় ও মৃতব্যক্তিদের কবর দেয়ার ক্ষেত্রেও যুবাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়।

According to Pope Francis, we can only find happiness by sharing the grace we have received with the brothers and sisters that the Lord gives us each day. ঈশ্বরের মহিমা পরস্পরের মধ্যে সহভাগিতার মাধ্যমেই আমরা প্রকৃত সুখ খুঁজে পাবো। বিভিন্ন যুব সংগঠন যুবাদের সহভাগিতা করার সুযোগ করে দিচ্ছে। যুব সংগঠনের পরিচালনায় বিভিন্ন ধরনের গঠনমূলক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেখানে যুবারা নিজেদের মধ্যে সহভাগিতার মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলতে পারে। এসব প্রোগ্রামে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সেশনের আয়োজন করা হয় যা যুবাদের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করে তোলে। এছাড়াও যুব সংগঠনের আয়োজনে বিভিন্ন লেখক কর্মশালা, লিডারশীপ ট্রেনিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে যুবারা তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটায় এবং যুব নেতৃত্বের মাধ্যমে খ্রিস্টীয় সমাজকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে সহায়তা করে। তরুণ প্রজন্ম হলো পালকীয় পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু। বর্তমানে ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদে যুবাদের সংযুক্ত করা হয়েছে। মণ্ডলীর একটি বৃহত্তম অংশই হলো যুবারা। এই যুবরাই পারে খ্রিস্টের আদর্শকে সামনে রেখে মণ্ডলীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। বিভিন্ন ধর্মপল্লীর যুবারা কীর্তনের মাধ্যমে যিশুর জন্মোৎসবকে আরও মুখোরিত করে তোলে। যুব সংগঠনগুলো কীর্তন প্রতিযোগিতা ও গোশালাঘর প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। এছাড়াও যুব সংগঠনগুলো "বাইবেল সার্ভিস" এর মাধ্যমে খ্রিস্টের বাণী প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। তারা খ্রিস্টের আদর্শকে সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছে। তারই প্রকাশ ঘটে যখন আমরা দেখতে পাই যুব সংগঠনগুলো উদ্যোগ নেয় গির্জা ও তার আশেপাশের রাস্তা পরিষ্কারের। তারা নিজেরাই এক দল হয়ে রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু করে দেয়। সর্বোপরি এটা বলা যায় যে, খ্রিস্টমণ্ডলী ও খ্রিস্টীয় যুব সমাজ ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। খ্রিস্টমণ্ডলীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ও ধর্মপল্লীর পালকীয় কাজে যুব সংগঠনের ভূমিকা অপরিসীম॥

স্মৃতিতে তোমরা অম্লান

প্রিয় পাপা ও দাদা, তোমরা আজ আমাদের মাঝে নেই এ কথা যেন বিশ্বাস করতে আজও কষ্ট হয়। তোমাদের রেখে যাওয়া স্মৃতি আজও আমাদের কাঁদায়। তোমাদের প্রতিটা কাজ, স্পর্শ আজও আমাদের ঘিরে রেখেছে। আমাদের পাপা ও দাদা ছিলেন অত্যান্ত ধর্মপ্রাণ, স্নেহশীল, কর্তব্যনিষ্ঠা, সাহায্যকারী, পরোউপকারী এবং ঈশ্বর ভক্ত অতি সাধারন মানুষ।

মানুষের দুঃখ কষ্ট অনুভব করে নিরবে-নিভৃতে থেকে তারা অন্যকে সাধ্যমত সহযোগীতা করেছেন। তাদের শুভানুধ্যায়ীরা এখনো তাদের স্মরণ করেন।

আমাদের পাপা মি: সলোমন গমেজ ২৩ নভেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ এবং দাদা লরেন্স তুষার গমেজ ১০ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে প্রভুর কোলে আশ্রয় নেয়। সর্বদা মনে হয় তোমরা আমাদের সাথে আমাদের কাছেই আছো। আমাদের বিশ্বাস তোমরা স্বর্গীয় পিতার আশ্রয়ে পরম শান্তিতে আছো এবং আমাদের আশীর্বাদ করছো।

প্রয়াত সলোমন গমেজ
জন্ম: ১৮ জানুয়ারি, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৩ নভেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত লরেন্স তুষার গমেজ
জন্ম: ১৯ মে, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১০ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

তোমাদের আত্মার শান্তি কামনায়
স্ত্রী: মারীয়া সন্ধ্যা গমেজ
ছেলে ও ছেলে-বৌ: পাভেল গমেজ - ওয়েন্ডি মারশা ডাইয়াস
মেয়ে-মেয়ে জামাই: আগ্নেশ ডি'ক্রুজ - অমিতাভ ডি'ক্রুজ
একমাত্র নাতিন: এ্যালানা মারীয়া ইভোন গমেজ
জমাদার বাড়ি, বালিডিয়র, গোল্লা ধর্মপল্লী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

শিশু বিকাশে ও সুরক্ষায় মণ্ডলীর চিন্তা ও কর্ম পরিকল্পনা

লিলি আন্তনিয়া গমেজ

শিশু বলতে আমরা ১৮ বছরের নীচে যারা রয়েছে তাদেরকে বুঝে থাকি। এই শিশু মাতৃ গর্ভ থেকে ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। এ বৃদ্ধিকে আমরা বর্ধন ও বিকাশ দু'ভাবে বিভক্ত করে দেখালেও তা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং অবিচ্ছেদ্য। বর্ধন ও বিকাশে রয়েছে সামঞ্জস্যপূর্ণ গতিময় ধারা। শিশুর বিকাশ বলতে দৈহিক বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গের কাজের উন্নতিকে এবং মানবের গুণগত পরিবর্তনকেই বোঝায়। শিশুর বর্ধন শুরু হয় তার মায়ের গর্ভ থেকেই। গর্ভধারণের ১৮ থেকে ২৫ দিনের মধ্যে হৃদস্পন্দন এবং ২০ দিনের মধ্যে স্নায়ুতন্ত্রের কাজ শুরু হয়। চতুর্থ সপ্তাহে তার চোখ, মেরুদণ্ড, মস্তিষ্ক, পাকস্থলী, লিভার ও কিডনী গঠিত হয়। ৬-৮ সপ্তাহ অর্থাৎ ২ মাসে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি মাথা, মুখ মণ্ডল, জিভ সাধারণভাবে দেখা যায়। মাথা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয় ও দেখা যায়। গর্ভধারণের প্রথম ৩ মাসের মধেই ভ্রুণে একটি মানুষের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তৈরি হয়ে যায় এবং ৪র্থ মাস থেকে সেই গঠিত অঙ্গ প্রতঙ্গগুলোর আকার ও ক্রিয়া বৃদ্ধি পেতে থাকে। জন্মের পর থেকে শিশুর দেহের সকল অঙ্গ প্রতঙ্গ, মস্তিষ্ক, বুদ্ধিমত্তা ও মননশীলতার কার্যক্রম ধাপে ধাপে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে পরিপূর্ণতা লাভ করে একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠে।

শিশু সুরক্ষা

শিশু নিরাপত্তা (Child Protection) ও শিশু সুরক্ষা (Child Safeguarding) শব্দ দু'টো অনেক ক্ষেত্রে একই অর্থে ব্যবহার করা হলেও এদের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। যেমন শিশু নিরাপত্তার অর্থ হলো এই পৃথিবী শিশুদের জন্য নিরাপদ করে তোলা। এটার অর্থ হলো শিশুর প্রতি সহিংসতা, শোষণ এবং নির্যাতন প্রতিরোধ এবং প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়াকে বুঝায়। যৌন হয়রাণি, শোষণ, নির্যাতন, অবজ্ঞা বা অবহেলা, বৈষম্য, পাচার, শিশুশ্রম এবং শিশুর প্রতি ক্ষতিকারক প্রচলিত ব্যবহার ও আচরণ ইত্যাদি বিষয়গুলো শিশু নিরাপত্তার আওতাভুক্ত। এই ক্ষেত্রে অন্যান্যদের পাশাপাশি রাষ্ট্রের দায়িত্ব অনেক বেশি।

আর শিশু সুরক্ষা বলতে এমন একটি ব্যবস্থা বা প্রক্রিয়াকে বুঝায় - যার মাধ্যমে কোন শিশু কোন ধরনের কষ্টের/নির্যাতনের মধ্যে আছে কিনা বা কষ্টের মধ্যে পড়ার ঝুঁকিতে আছে কিনা, সুনির্দিষ্টভাবে কোন নির্যাতনের কারণে বিভিন্নভাবে অপমানের বা অবহেলার শিকার হচ্ছে কিনা তা চিহ্নিত করা হয়। এতদ্বসঙ্গে এই কাজের সাথে ধারাবাহিক এবং গভীরভাবে যুক্ত থেকে বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করে এই বিষয়গুলোতে পদক্ষেপ নেয়া হয়। অর্থাৎ কোন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির আওতাধীন শিশু কোন ধরনের ক্ষতির শিকার বা ঝুঁকিতে থাকবে না; বরং তাদের কাজের মাধ্যমে শিশুদের কল্যাণ হবে। যেমন: কোন সেবা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বা ধর্মপ্রদেশের আওতাধীন শিশুরা কোনভাবে প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে শারীরিক, মানসিক/আবেগিক, অবহেলা, যৌন নির্যাতনের শিকার না হওয়াকে বুঝায়।

সাধারণভাবে জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদ অনুসারে ১৮ বছর কিংবা এর কম বয়সী ছেলেমেয়েরা শিশু হিসেবে বিবেচিত হবে। জাতিসংঘের ১৯ ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক শিশুর সহিংসতা, শোষণ, অবমাননা/অপমান এবং অবহেলা থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে; তাই শিশুদের ঘরে ও বাইরে নিরাপত্তা দিতে হবে। শিশু সুরক্ষায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় সহিংসতা, শোষণ, অবমাননা/ অপমান এবং অবহেলা থেকে রক্ষা পাওয়ার বিষয়ে জানা এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

শিশু সুরক্ষায় কাথলিক মণ্ডলীর প্রচেষ্টা

আমরা জন্মের পরের শিশুটির সুরক্ষার বিষয়ে যেভাবে চিন্তা করছি ঠিক একইভাবে জন্মের আগের শিশুটির সুরক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়ার বিষয়টি নীতিমালায় দেখা যায় না। এখনো আমাদের দেশের অনেক মানুষকে শেখানো হয় এবং তারাও বিশ্বাস করে যে, মাতৃগর্ভে ২/৩ মাস পর্যন্ত মানবের অস্তিত্ব শুধু জরায়ুর ভিতরের একটি রক্তপিণ্ড মাত্র। কিন্তু এই রক্তপিণ্ড যদি মানব সত্তার অস্তিত্ব না হয়, তাহলে কিভাবে আমরা মানব শিশু হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন যা মানুষের জন্য একটি মৌলিক প্রশ্ন। কিন্তু খ্রিস্টমণ্ডলী এই বিষয়টি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই বিশ্বব্যাপি মানুষের সামনে তুলে ধরেছে। গর্ভস্থ শিশু অন্য সাধারণ মানুষের মত আর এক মানব সত্তা, যার সমাজের অন্যান্য মানুষের মতো বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। কারণ গর্ভের শিশু মায়ের কোলের শিশুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা অসাধ্য ব্যাপার। তাছাড়া মাতৃগর্ভে মায়ের প্রতি যে আচরণ করা হয় তা শিশুর উপর প্রভাব পড়ে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, গর্ভের শিশুরও অনেক সময় যত্ন/সুরক্ষাতো দূরের কথা; এমনকি জীবন রক্ষা করাই চ্যালেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এম.আর এবং এবরশনের নামে প্রতিদিন হাজার হাজার গর্ভস্থ ভ্রণ/শিশুকে মাতৃগর্ভে নিষ্ঠুরভাবে মেরে ফেলা হচ্ছে; যা মণ্ডলীর মতে নরহত্যার সামিল। এই সম্পর্কে দায়িত্বশীল পিতৃত্ব মাতৃত্ব বিষয়ক পোপ ৬ষ্ঠ পৌলের সার্বজনীন পত্রে এবং মানব জীবন পত্রে তুলে ধরা হয়েছে। পিতামাতা হিসেবে প্রতিটি শিশুকে বেঁচে থাকার অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

বর্তমান বিশ্বে শিশু নির্যাতনের ধরন ও বিভিন্নতা বহুমাত্রিক এবং ক্রমবর্ধমান। পত্রিকার পাতা থেকে প্রতিনিয়তই বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের কথা জানতে পারি এবং বেশিরভাগ কথা অপ্রকাশিত বা পত্রিকার আড়ালে থাকে। অনেক ঘটনা বিবেকবান মানুষকে অত্যন্ত লজ্জার মধ্যে ফেলে দেয়। এই সম্পর্কিত অনেক ঘটনা খ্রিস্টমণ্ডলীকে নাড়া দিয়েছে যা পোপ মহোদয়ের বিভিন্ন বাণীতে তুলে ধরেছেন। আমি আপনাদের কাছ থেকে সেই সহায়তা প্রত্যাশা করি যা বিশ্বমণ্ডলীতে অপ্রাপ্তবয়স্ক/শিশুদের সুরক্ষায় উত্তম নীতি ও প্রক্রিয়া উন্নয়নে এবং ঐ সকল নীতি ও প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে মণ্ডলীর কর্মী/সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণে সহায়তা করবে। আমাদের সামর্থ অনুযায়ী সর্বোত্তম প্রচেষ্টা গ্রহণ করা দরকার এটা নিশ্চিত করার জন্য যে, মণ্ডলীতে এ সকল পাপের (শিশু নির্যাতন) কোন স্থান নেই (পোপ ফ্রান্সিস, ৭ জুলাই ২০১৪)। পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত রবিবারের খ্রিস্টযাগের পরে আরও বলেন যে, সমাজের যেকোন ক্ষেত্রেই শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটতে পারে। তবে খ্রিস্টমণ্ডলীর মধ্যে এমন ঘটনা ঘটা আরও বেশি জঘন্য ও মানহানিকর কারণ তা এর নীতি এবং বিশ্বাস এর পরিপন্থী। কারিতাস যেহেতু মণ্ডলীর

প্রতিষ্ঠান সে হিসেবে তার পালকীয় পত্রে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন- কারিতাস বা তার কর্মীরা যেকোন ভাবেই হোক না কেন এ ধরনের নির্যাতন/হয়রানিমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে তা আড়াল না করে বা প্রশ্রয় না দিয়ে বরং ভবিষ্যতে যাতে এমন ধরনের ঘটনা আর না ঘটে তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। কারণ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম।

এই বিষয়গুলো কাথলিক মণ্ডলী অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিয়েছে এবং বিভিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে এবং সকল শিশুর জন্য নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করার যে উদ্যোগ বিশ্বের অনেক দেশে শুরু করেছে বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর আওতায় সকল শিক্ষা ও সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহ তার অংশ হিসেবে কাজ করা শুরু করেছে। কাথলিক মণ্ডলীর ঐতিহ্য ও শিক্ষা অনুসারে শিশুদের ব্যক্তিগত মর্যাদা এবং অধিকারসমূহকে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি হিসেবে বিবেচনা করে। আর এ কারণে তারা যত্ন ও সম্মানের যোগ্য। কাথলিক প্রতিষ্ঠানে শিশু ও যুবাদের জন্য নিরাপদ এবং নিশ্চিত পরিবেশ সৃষ্টিসহ যেকোন ধরনের শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে মণ্ডলী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই সব প্রতিষ্ঠানে বঞ্চনা, বৈষম্য, সহিংসতা এবং অসহনশীলতার কোন স্থান নেই। বরং সব মানুষের মর্যাদাকে সমুন্নত রেখে একত্রে ভালোবাসা সভ্যতা গড়তে সচেষ্ট যেখানে ন্যায়, শান্তি, সত্য, স্বাধীনতা এবং সৌহার্দ্য বজায় রাখতে হবে।

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর (সিবিসিবি) সকল শিক্ষা ও সেবা প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কার্যক্রম, কৌশল ও পরিকল্পনায় শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশে একটি শিশু সুরক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। সিবিসিবির সকল শিক্ষা ও সেবা প্রতিষ্ঠানে শিশু নির্যাতনের বিষয়টি মোকাবেলা করা হবে তারই সার্বিক কৌশল সম্বলিত হয়েছে। এই নীতিমালায় সিবিসিবি'র সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সেবা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মী, নির্বাহী বোর্ড সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান শিশুদের কল্যাণে কিভাবে আচরণ করবে এবং কিভাবে নির্যাতন হ্রাস করা যায় তার একটি দিক নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে এবং সবাইকে বিভিন্ন সেমিনার ও ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে এই বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। পাশাপাশি ব্যক্তিগত অঙ্গীকার নামায় স্বাক্ষর নেয়া হচ্ছে। একটি শিশু বান্ধব পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে- যেখানে শিশুরা বেড়ে উঠতে, শিক্ষা গ্রহণ করতে এবং সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি আবিষ্কার করার জন্য একটি সুষ্ঠু পরিবেশ খুঁজে পায়।

তাছাড়া কারিতাস কাথলিক মণ্ডলীর একটি সেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ২০১১ খ্রিস্টাব্দে শিশু সুরক্ষা নীতিমালা এবং ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে শিশু ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের সুরক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করেছে যা বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া গর্ভের শিশুকে সুরক্ষা দেয়ার বিষয়টি কমিউনিটি হেলথ্ এবং প্রাকৃতিক পরিবার পরিকল্পনা, একটি কারিতাস প্রকল্প বিভিন্ন সচেতনতামূলক সেমিনার ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে মোটিভেশন তৈরির কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর পালকীয় কর্মশালা ২০১৮ সিবিসিতে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় কর্মশালায় সবার অংশগ্রহণের ভিত্তিতে ১০টি অগ্রাধিকার আগামী দিনগুলোতে ধর্মপ্রদেশ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এই অগ্রাধিকারগুলোতে ৪ নম্বরে শিশু-কিশোর ও যুবাদের পালকীয় যত্ন: জীবনাহ্বান, বহুমাত্রিক পেশা নির্বাচন, উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে- আজকের শিশু আগামী দিনের পরিবার ও মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ। তাই শিশু কিশোর ও যুবাদের মানবিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক তথা সার্বিক গঠনদানের উপর ভবিষ্যত প্রজন্মের জীবনমান অনেকখানি নির্ভর করছে। বর্তমান কঠিন ও জটিল বাস্তবতায় বিশ্বাসের গঠনে ধর্মীয় শিক্ষা ও পালকীয় যত্ন জোরদার করা। ছেলেমেয়ে ও যুবাদের অন্তরে ধর্মীয় আহ্বানের বীজ বপন করা। তাদের অন্তরে অনুপ্রেরণা তৈরি করা, যোগাযোগ রাখা এবং বিশেষ যত্ন নেয়া। পরিবারে পিতামাতা, স্কুল কলেজে শিক্ষক শিক্ষিকা, ধর্মীয় নেতানেতৃবৃন্দ নানাবিধ পেশা উন্নয়নে, জীবনমান উন্নয়নে, নেতানেত্রী গঠনে ছেলে মেয়ে ও যুবাদের জীবন দর্শন প্রোথিত করবে। তাই পরিবারে পিতামাতা, স্কুল কলেজে শিক্ষক শিক্ষিকা, সমাজে নেতা-নেত্রী, ধর্মীয় নেত্রীবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মনোযোগ, সচেতনতা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

প্রচলিত কিছু নিয়ম কানুন ও শিক্ষা শিশুদের সঠিক মর্যাদা প্রদানের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। শিশুদের প্রতি সঠিক আচরণগুলো ভালভাবে গ্রহণ এবং অনুশীলনের ক্ষেত্রে অনেক ঘাটতি আছে। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে আমি আমার ছেলের স্কুলে রেজাল্ট কার্ড আনতে যাই। আমার সাথে ৮/১০ পিতামাতা নিজ নিজ ছেলে-মেয়েদের ব্যাপারে কথা বলার জন্য শিক্ষকদের কাছে যান। আমি শিক্ষকদের কথা শুনে রীতিমতো অবাক হয়ে যাই। কারণ শিক্ষকগণ বেশ গর্বের সাথে বলছিলেন ছেলেদের বেত না দিলে এবং ধমকের উপর না রাখলে কখনই তারা ঠিকভাবে পড়া করে না। যেহেতু সরকার এখন নিয়ম করেছে ছেলে-মেয়েদের মারধোর বা বকাঝকা করা যাবে না সেজন্য পড়া না করলে তাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। কিছু গার্ডিয়েনও ছেলে-মেয়েদের মারধোরের পক্ষে কথা বলেন। এই সময়ে ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তারা এসব কথায় প্রচণ্ড বিরক্ত এবং রাগ হচ্ছে। এই ধরনের ধ্যানধারণা শিশু তথা কিশোর কিশোরীদের মর্যাদা প্রদানে ও অধিকার সংরক্ষণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া শিশুও একজন ব্যক্তি যার মর্যাদা এবং অধিকার আছে, এই বিষয়গুলো আমাদের সমাজে কখনো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় না। ফলে তাদের উপর শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন, অবহেলা, বৈষম্য এমন কি যৌন নির্যাতনেরও মতো ন্যাক্কারজনক কাজগুলো করতে কিছু কিছু মানুষ পিছপা হয় না। তাছাড়া পরিবার সমাজ ও পারিপার্শ্বিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সমাজে নেতিবাচক কার্যক্রমকে প্রশ্রয় দেয়। দেশে পর্ণোগ্রাফি সংক্রান্ত আইন থাকলেও কোড অফ কন্ডাক্ট, ইন্টারনেট কারা ব্যবহার করবে এবং নজরদারির বিষয়গুলো সঠিকভাবে মানা হচ্ছে না ফলে অপরাধের মাত্রা আরো বেড়ে যাচ্ছে।

শিশুরা ভবিষ্যৎ দেশ ও জাতির কর্ণধার হিসেবে মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশ প্রতিনিধিত্ব করছে। তাদের সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টি কোন একক কাজ নয় বলে সবাইকে এ কাজটি ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত কাজ হিসেবে বিবেচনা করা এবং দায়িত্ব পালন করা উচিত। যখন আমরা মানুষের যত্নের কথা বলি বা তাদের যত্নশীল আচরণের কথা বলি তখন সৃষ্টিকর্তা ও তার সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসার গভীরতা প্রকাশ করি। শিশুরাও পিতামাতার জীবনে শ্রেষ্ঠ উপহার এবং তাদেরই ভালোবাসার ফসল। মাদার তেরেজা বলেছেন-The child is the beauty of the God, present in the world, the greatest gift of a family। তাই শিশুদের সুস্থ, সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলা প্রত্যেকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা হওয়া উচিত। শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করণে সবার দায়িত্ব হিসেবে বিভিন্ন পর্যায় থেকে আরো বেশি কাজ করা প্রয়োজন॥

শিশুর নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গঠনে আমাদের ভূমিকা

আগষ্টিন ডি' ক্রুজ

অনন্য সব মানবিক গুণাবলীর সমষ্টি হচ্ছে নৈতিকতা বা নীতিবোধ। মানুষ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মকে ভিত্তি করে সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-নীতি মেনে চলে। এই নিয়মগুলো মেনে চলার প্রবণতা, মানসিকতা, নীতির চর্চাই হলো নৈতিকতা। অন্তত একজন ভালো মানুষ হতে হলে, নৈতিকতাকেই আগে ভালোবেসে আঁকড়ে ধরতে হয়। এ কারণেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মনুষ্যত্বের শিক্ষাই চরম শিক্ষা, বাকি সব তার অধীন'। এক সময়ে মানুষের বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল, ধনই সব নয়-মনটাই প্রধান। এখন সে অবস্থা আর নেই। আমরা সবাই ছুটে চলেছি অর্থ, সম্পদ ও বিত্তের পেছনে। একজনকে পেছনে ফেলে আর একজনের সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা প্রত্যেককে করেছে অন্ধ। আর সেই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে গিয়ে আমরা অবলীলায় বিসর্জন দিচ্ছি নৈতিকতা। একটি সমাজের দূরন্ত বিকাশের জন্য প্রয়োজন আদর্শ ও মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন নাগরিক। একটি দেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হওয়ারও পূর্বশর্ত হলো নৈতিকতা ও মূল্যবোধসম্পন্ন মানবসম্পদ। আমাদের দেশে শিক্ষিত মানবসম্পদ তৈরি হলেও নৈতিক, মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষিত মানুষ প্রত্যাশা অনুসারে তৈরি হচ্ছে না। আর সেই কারণেই পিতা-পুত্র, পুত্র-মাতা কিংবা কন্যা-পিতা, ভাই-ভাই, ভাই-বোন পরস্পরকে খুন করছে- এমন খবরও আমাদের পড়তে হয়।

দুঃখজনক যে, নৈতিক ও মানবিক বোধবিবেচনাহীন কোমলমতি শিশু, কিশোর ও যুব সমাজ জড়িয়ে পড়ছে মাদকাসক্তি, চুরি, ছিনতাই, ইভটিজিং, জঙ্গিবাদ, খুন, ধর্ষণের মতো গর্হিত নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে। এমনকি তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দল 'কিশোর গ্যাং'। পেশাজীবি ও কর্মজীবি মানুষ নির্দ্বিধায় ঘুষ-দুর্নীতির মতো অনৈতিক কাজ থেকে সরতে পারছে না। কারণ, বাংলাদেশে পুঁথিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার হার বাড়লেও আশানুরূপ প্রসার হচ্ছে না সুশিক্ষার। সুশিক্ষা হলো সেই শিক্ষা, যে শিক্ষা মানুষকে অসৎ ও অন্যায়-অন্যায্যতার পথ পরিহার করে স্বচ্ছতা, সততা ও ন্যায্যতার পথ অনুসরণ করতে শেখায়।

ছোটবেলায় দেখেছি, কোন ছাত্র সাইকেলে যাতায়াতের সময় শিক্ষকের চলাচল দৃষ্টিগোচরে আসতেই নেমে পড়তো এবং যতক্ষণ শিক্ষক দৃষ্টির আড়ালে না যেতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সাইকেলে না চড়ে হেঁটে পথ চলতো। আমাদের খ্রিস্ট ধর্ম শিক্ষক (স্বর্গীয় লিও কস্তা) একটা গল্প শুনিয়েছিলেন। একদিন স্যার স্কুল থেকে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎ দূরে লক্ষ্য করলেন, এক ছাত্র সাইকেল চালিয়ে বাজারের দিকে আসছে। স্যারকে আচমকা সামনে দেখে ছাত্রটি এমনভাবে সাইকেলের ব্রেক কষে ধরল, একেবারে উল্টে গিয়ে রাস্তার পাশে নিচে পড়ে গেল। তড়িগড়ি করে ওঠে স্যারকে সালাম দিয়ে কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল অপরাধীর ভঙ্গিতে। আর আজকের প্রেক্ষাপটে স্যারের এ গল্প অনেকটাই অবাস্তব, হয়তো অলীক স্বপ্ন। স্যারের গল্পটা শুধুই গল্প নাকি বাস্তব সে প্রসঙ্গে নাইবা গেলাম। তবে এটুকু উপলব্ধি করি, স্যার আমাদের নৈতিকতাবোধ ও সম্মান-শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতেই গল্পটির অবতারণা করেছিলেন।

আমি মনে করি, আসলেই নৈতিক শিক্ষা অর্জনে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যদিও প্রাথমিকভাবে শিশুদের নৈতিক ও মানবিক শিক্ষা শুরু হয় তার পরিবার থেকেই। অনৈতিক ও মূল্যবোধ গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকা, সত্য বলা, কর্তব্যবোধ ও শৃঙ্খলা, সৎকাজ করা, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন, আত্মত্যাগের মনোভাব, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা এবং সমাজ তথা রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ববোধ, পরিবেশ দূষণ ও শব্দ দূষণ ইত্যাদি বিষয়ে একজন শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা আসে তার পরিবার থেকেই। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, খ্রিস্টান সমাজের অধিকাংশ পরিবারেই এখন আর এসব সুনীতির চর্চা হয় না। বিশ্বায়নের এ যুগে ভোগবাদী জীবনদর্শনে প্রভাবিত অভিভাবকদের একটি বড় অংশই তাদের সন্তানদের আলোকিত মানুষ হওয়ার পরিবর্তে এমনভাবে গড়ে তুলতে চান, যেন তারা লেখাপড়া করে ভালো উপার্জনক্ষম হয়, সচ্ছল জীবনযাপন করতে পারে, সর্বোপরি উচ্চ পদমর্যাদায় ভূষিত হয়। এই উদ্দেশে সন্তানদের উপযুক্ত করার জন্য অনেক সময় অভিভাবক নিজেরাই জড়িয়ে পড়েন বিভিন্ন রকমের অনৈতিক কাজে। পকেট ভর্তি ঘুষের টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরে সন্তানের পড়াশোনার খরচের জোগান দেন অথবা উপহার দিয়ে স্ত্রীকে খুশি করার চেষ্টা করেন। এমন অভিভাবকের কাছ থেকে কি সন্তানরা আদৌ কোনো নৈতিকতা ও ন্যায়পরায়ণতার শিক্ষা অর্জন করতে পারে?

এছাড়া, আমাদের সমাজে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এখনও মূল্যবোধের চর্চাকে দুর্বল বা বোকাদের কাজ বলে ছোট করা হয়। আমাদের দেশের যুব সমাজের দিকে তাকালে দেখতে পাই, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের করুণ ও প্রকট চিত্র। লাখ লাখ তরুণ-তরুণী, কিশোর-কিশোরী এ ধরনের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে নিজেদের ঠেলে দিচ্ছে অন্ধকারাচ্ছন্ন খোলা কূপের দিকে। আসক্ত হচ্ছে মাদকের মতো আত্মঘাতী নেশায়। জড়িয়ে পড়ছে ছিনতাই, ইভটিজিং, অপহরণ, গুম, খুন, হানাহানি, দলীয় অপরাজনীতি আর সন্ত্রাসের সঙ্গে। মনে রাখা দরকার, নির্বাচনের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠের বিজয় মানে এই নয় যে, প্রকৃত পক্ষে ন্যায় ও সত্যের জয় হয়েছে। চলমান এ অবক্ষয় থামাতে হলে, সকল স্তরের মানুষের মধ্যে বিশেষ করে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে সবার আগে প্রয়োজন নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের চর্চা। যে ব্যক্তি/নেতার মধ্যে নৈতিক শিক্ষা থাকে, মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে- ছোট অপরাধেও তার বিবেক নাড়া দেয় এবং যে কোনো বিষয়ে তিনি সরাসরি 'হ্যা' অথবা 'না' সিদ্ধান্ত নিতে বা দিতে পারেন।

এ কারণেই জীবনকে সুন্দর করে তোলার জন্য ছাত্র জীবনেই নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন।

নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি তার নীতিতে অটল থাকেন। মূল্যবোধ ব্যক্তি পর্যায়ে যেমন একজন মানুষকে বিশুদ্ধ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে, তেমনি রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও মানুষকে সুনাগরিক হওয়ার পথ তৈরি করে। নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের দরুনই মানুষ তার নিজের, পরিবারের, সমাজের, মণ্ডলির ও রাষ্ট্রের প্রতি সব দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের চেষ্টা করে। আমাদের বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থায় এবং ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্যসূচিতে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষার উপযোগী যে সকল বিষয় রয়েছে, তা বাস্তবে অনুশীলন করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও অনুকুল পরিবেশ থাকা দরকার। যে জাতি যত বেশি নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং নিজস্ব মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সে জাতি তত বেশি সুসংহত।

আমাদের বাংলাদেশে আশানুরূপভাবে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু এ বৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষা-সাফল্যের সামঞ্জস্যতা খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। একদিকে দ্রুতই বাড়ছে শিক্ষার হার ও শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা, অন্যদিকে সমাজে বাড়ছে মূল্যবোধের অবক্ষয়, হচ্ছে নৈতিকতার অধঃপতন। বাড়ছে অশ্লীলতা, স্বামী-স্ত্রী-সন্তান নির্যাতন, দুর্নীতি ও নানা রকমের অপরাধপ্রবণতা। এসব অপরাধপ্রবণতার সঙ্গে যেমন সাধারণ অশিক্ষিত মানুষ যুক্ত আছেন, তেমনি ডিগ্রিধারী শিক্ষিত মানুষও। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে অনৈতিক, অমানবিক ও অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে ডিগ্রিধারী শিক্ষিত মানুষের সংশ্লিষ্টতাই বেশি দেখা যায়। বলতে গেলে, শিক্ষিত মানুষের সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ ঠেকেছে তলানিতে। অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে পরিবার, সমাজ, মণ্ডলী ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে অস্থিরতা। সবকিছুর মূলেই রয়েছে নৈতিক শিক্ষার চর্চার অভাব।

বর্তমান প্রজন্ম নৈতিকতাকে কতটা আত্মস্থ করতে পেরেছে বা পারছে, তার প্রমাণ দেখা যাচ্ছে পরিবার ও সমাজের আনাচে-কানাচে। সর্বজনীন নয়, এমন সব উৎসব বা পার্বণে তারা আনন্দে মেতে ওঠে নেশায়, ডিজে নৃত্যে, বেখেয়ালি আতশবাজি আর বিকট শব্দ বিস্ফোরণ খেলায়। তারা একটুও তোয়াক্কা করে না, তাদের আশেপাশে কোথাও থাকতে পারেন মুমূর্ষ কোনো রোগি! তারা উপলব্ধি করে না যে, তাদের ওই খামখেয়ালিপনায় মুহূর্তেই প্রাণ হারাতে পারেন কোনো দুর্বল হৃদপিণ্ডের মানুষ। হয়তো ওই একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষটির প্রয়াণে ভিক্ষের ঝুলি ঘারে নিয়ে পথে নেমে যেতে পারে তার পুরো পরিবার।

শিক্ষার্থীরা বই পড়ে যেমন জ্ঞানার্জন করে, তেমনি নৈতিক গুণাবলীসম্পন্ন আদর্শ শিক্ষকের জীবন দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে একজন শিক্ষার্থী নীতিনিষ্ঠ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার অনুপ্রেরণা পায়। তাই একজন প্রকৃত শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে নিয়মিতভাবে যেসব শিক্ষা দেবেন- যা শিক্ষার্থীর মাঝে নৈতিক মূল্যবোধ তৈরিতে সহায়তা করবে। তবে এ কথা সত্য যে, আজকাল শিক্ষার্থীদের সামনে অনুকরণীয় হওয়ার মতো শিক্ষকের বড়ই অভাব দেখা দিয়েছে। অনেক শিক্ষক তার কর্তব্যজ্ঞান ও পেশাগত মূল্যবোধ ভুলে গিয়ে, নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে, শিক্ষকতাকে অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন। অভিযোগ রয়েছে, অনেকে আবার আলাদা সম্মানির বিনিময়ে তার কাছে কোচিং বা প্রাইভেট না পড়লে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আচরণে বৈসাদৃশ্য তৈরি করেন। অভিযোগ যদি সত্যি হয়, তাতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর মনোভাব নেতিবাচক হওয়া থেকে শুরু করে অশ্রদ্ধা-অসম্মান প্রদর্শন এবং অন্যান্য অনৈতিক কর্মকাণ্ডের পথও তৈরি হয়ে যায়।

শিশু ও কিশোরের নৈতিকতা ও সুকুমার বৃত্তি অনুশীলনের ক্ষেত্রে পরিবারের পরই কার্যকর অবদান রাখতে পারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। আমাদের দেশের পরিবার, সমাজ, মণ্ডলী ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের যে অবক্ষয় বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, তা থেকে মুক্তিলাভের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এখনই নিতে না পারলে, তার মাশুল প্রজন্ম থেকে প্রজন্মকে অবিরতই দিয়ে যেতে হবে।

বিশ্বব্যাপী ঘটছে প্রযুক্তি বিপ্লব। সেই বিপ্লবের গর্বিত অংশীদার বাংলাদেশও। বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১ প্রতিষ্ঠা এবং উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট বাংলাদেশ রোডম্যাপ এর যাত্রা শুরু হয়েছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই কোনো না কোনোভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তির অংশ হয়ে আছেন। প্রযুক্তিতে শিক্ষিত নন, এমন মানুষও ভোগ করছেন ইন্টারনেট সুবিধা। আর এ সুযোগে কোমলমতি শিশু-কিশোরদের হাতে হাতে পৌঁছে গেছে স্মার্টফোন। তরুণ প্রজন্মের উল্লেখযোগ্য একটা অংশই ইন্টারনেট প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত। লেখাপড়ার পাশাপাশি স্কুল ও কলেজ শিক্ষার্থী, এমনকি অল্প শিক্ষিত কিশোর-যুবকরাও আসক্ত এই 'ইন্টারনেট মাদকে'। এদের অনেকেই আসক্ত অনলাইন গেমস, জুয়া ও আপত্তিকর ভিডিও উপভোগে। এসব কারণেও নৈতিক স্খলন ত্বরান্বিত হচ্ছে শিশু-কিশোরদের ক্ষেত্রে। তাই প্রযুক্তির অনৈতিক ব্যবহার এড়িয়ে চলার বিষয়েও শিশু-কিশোরদের শিক্ষা দিতে হবে পরিবার থেকেই। কারণ, প্রযুক্তির উন্নয়নকে থামিয়ে দেওয়ার শক্তি আমাদের নেই। বরং প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে অভিভাবক হিসেবে আমাদের বাড়াতে হবে সচেতনতা।

বর্তমান অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, ধর্ম ও নৈতিকতার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের পড়তে হবে নতুন আরেকটি বিষয়/সাবজেক্ট- যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিখবে ও অর্জন করবে শুধু ভালো মানুষ হওয়ার গুণাবলী। যার নাম দেওয়া যেতে পারে 'মানবশিক্ষা' (Human Education)। কারণ, ধর্মমত নির্বিশেষে নীতিবোধের তারতম্য কিছুটা থাকতেই পারে। কিন্তু মানবশিক্ষার সব নীতিবোধ সব ধর্মের বা শ্রেণির মানুষের জন্যই সমান। আর প্রতিটি ধর্মই মানবকল্যাণের জন্য। মানবশিক্ষার গুণে শিক্ষার্থী বুঝতে পারবে- সমাজের প্রতিটি ঘৃণ্য কাজই তার বর্জন করা উচিত। তাহলেই সে হতে পারবে একজন প্রকৃত মানুষ। মানবশিক্ষা সে অর্জন করবে তার পরিবার ও শিক্ষকের কাছ থেকে। এ ধরনের প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই সকলের উদ্দেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'আমলা নয়, মানুষ সৃষ্টি করুন'।

সহায়ক সূত্রঃ লেখক: কর্নেল নূরন নবী (অব.) প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ এবং মাইলস্টোন কলেজ, প্রকাশিত দৈনিক যুগান্তর, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ॥

নারী ও উন্নয়ন

মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া

"উন্নয়ন" সাধনের কথা ভাবলে প্রথমে পুরুষের অবদানের কথা আমাদের মাথায় আসে। কিন্তু উন্নয়নের পিছনে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অবদানের কথা আমরা অনেকেই স্বীকার করতে চাইনা। আর এর পিছনে দায়ী আমাদের মানসিকতা, সামাজিক ও পারিবারিক দুরাবস্থা এবং ভ্রান্ত ধারণা। আমাদের সমাজ ও পরিবারে বৈষম্য নামক হীন মানসিতা ও কুপ্রথা যেমন নারীকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখে তেমনি নারীর উদ্যমতাকেও দমিয়ে রাখে। এই বৈষম্যের অন্ধকারে হারিয়ে যায় কত প্রতিভাবান নারীর জীবন, তার হিসেব আমরা কেউ রাখিনা। নারী শক্তিকে দমিয়ে রাখার বিরাট একটি হাতিয়ার হলো অশিক্ষা যার কারণে বিলুপ্ত হয় নারীর চিন্তা-চেতনা। অথচ বিশ্বে উন্নত দেশগুলো নারীর ক্ষমতায়নে সব ধরণের সহযোগিতা করে যাচ্ছে, পুরুষের পাশাপাশি বিনা বাঁধা ও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উন্নয়নমূলক কাজে অংশ গ্রহণ করছে। যার ফলে তারা উন্নত দেশ ও জাতির খেতাবে গর্বিত হচ্ছে।

"নারীকে শুধু সংসারেই মানায়" এসব হীন চিন্তা থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। নারীকে সংসারের যাবতীয় কাজে আটকে রাখার মানে নারীকে পঙ্গু করে রাখার সামিল। সংসারের সকল দায়িত্ব কেবল নারীর নয়। আমাদের পরিবারগুলোতে রান্না-বান্না থেকে শুরু করে সন্তান লালন পালন করা যেন অলিখিতভাবে নারীর একার দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সত্য এই যে, এসব কাজ নারী পুরুষ উভয়েরই পবিত্র কর্তব্য। অথচ আমরা এসব কাজ কেবল নারীর উপর চাপিয়ে দিয়ে তার কাজের স্পৃহাকে ক্লান্তিতে ভরিয়ে তুলি। ধর্মের নামে নারীকে ঘরে আটকে রাখার মত অধর্ম আর নেই। সৃষ্টির প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের মত নারীরও বিচরণের অধিকার রয়েছে, প্রতিটি সুন্দর কাজের আনন্দ গ্রহণের অধিকারও তার রয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যতদিন নারীর দাসত্ব টিকে থাকবে ততদিন সেই সমাজ উন্নতি করতে পারবেনা। নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদল হোক আমাদের। শুধু সংসারের কাজে নয়, নারীর বিচরণ ঘটুক সর্বত্র, সব কাজে ঘটুক নারী সফল্য।

নারী অনেক মমতা ও যত্নে যেমন সংসারের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে থাকে তেমনি সুযোগ পেলে যে কোনো উন্নয়নমূলক কাজেও সমান মমতায় তা করতে পারে। সেই আদিম যুগে সন্তান পালনের পাশাপাশি নারীরা জীবিকা নির্বাহের জন্য পুরুষের পাশাপাশি কঠিন কাজেও আত্মনিয়োগ করেছে। শিক্ষা ও বিপ্লবে নারীর ত্যাগের কথাও আমরা জানি। যে কোনো প্রতিকূল পরিবেশ থেকে উত্তরণে এমনকি পুরুষের পাশাপাশি অস্ত্র হাতে নারী যুদ্ধ করতেও দ্বীধা করে নি। সেই শক্তি ও সাহস এখনও সমগ্র নারীর মধ্যেও বিদ্যমান। এখনও নারীরা সুশিক্ষার সুযোগ পেলে সকল ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটাতে পারে, নিজে স্বাবলম্বী হতে পারে এবং অন্যের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ দিতে পারে। নারীর কাজকে সম্মান দেখাতে পারলে সে মর্যাদার সাথে নিজেকে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। আমাদের প্রত্যেকের উচিত নারীর হাতকে আরও শক্তিশালী করা, তার সাহসের যোগান দেওয়া ও সুশিক্ষায় শিক্ষিত সকল প্রকার উন্নয়নকে প্রসারিত করা।

আনন্দ ও আশার বিষয় এই যে, সকল বাঁধা পেরিয়ে অনেক নারীরা আজ সমাজ ও দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। শিক্ষিত ও বিত্তশালী নারীদের পাশাপাশি মধ্যবিত্ত ও তুলনামূলক দরিদ্র পরিবারের নারীরাও পিছিয়ে নেই। সংসারের প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় নারীদের বিভিন্ন কাজে উদ্যোগী হতে দেখা যাচ্ছে। সংসারের যাবতীয় কাজের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবস্যায় নিজেকে সম্পৃক্ত রাখছে, তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে মুঠোফোনের সাহায্যে তারা নিজেদের পণ্য প্রচার করতে পারছে, এতে বাড়ছে তাদের স্পৃহা ও অভিজ্ঞতা, দূর হচ্ছে সংসারের অভাব অনটন। সংসারে এই অবদানের জন্য তাদের প্রতি আমাদের অনুপ্রেরণা জোগানো ও সম্মান জানানো উচিত।

করোনা আমাদের যেমন অনেক কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে তেমনি অনেক আশীর্বাদও বয়ে এসেছে। কোভিড-১৯ এর কারণে অনেক পরিবারের উপার্জনক্ষম মানুষ চাকুরীচ্যুত হয় এবং ব্যবস্যা বন্ধ হয়ে যায় ফলে সংসারে অভাব নেমে আসে। এই অভাবের তাড়নায় অনেক নারী স্বল্প পুঁজি নিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে ক্ষুদ্র ব্যবসা করে সংসারের স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার। খ্রিস্টান নারী উদ্যোক্তা সংগঠন (CWEA) সংগঠনের নারীরা আজ তার উজ্জল দৃষ্টান্ত। কয়েকজন সাহসী নারীর উদ্যোগে ও আহ্বানে সাড়া দিয়ে অনেক নারী তাদের ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রসারের সুযোগ পেয়েছে। প্রত্যেকে নিজ ক্ষমতার মধ্যে থেকে অনলাইন ও অফলাইনে পোশাক, প্রসাধনী, নিত্যপণ্যের দোকান বা খাবার বিক্রি ও প্রদর্শনীর সুযোগ পেয়েছে। এই ধরনের উদ্যোগে নারীদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য পুরুষের উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রয়োজন সেই সাথে এক নারীর প্রতি অন্য নারীর সৌহার্দপূর্ণ মনোভাব ও পারস্পরিক সহযোগিতাও প্রয়োজন। সংসারের প্রতিটি কাজে যেমন নারীর গুরুত্ব রয়েছে তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্য বা লাভজনক বিভিন্ন কাজের প্রসারেও নারীর গুরুত্ব বোঝা উচিত। পরিবারের সকলের সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণায় একজন উদ্যোগী নারী হয়ে উঠতে পারে সফল ব্যবসায়ী।

সমাজ ও পরিবারের অনেকেই নারীর কাজের স্বীকৃতি দিতে অনীহা করি অথচ একটু সহানুভূতি ও অনুপ্রেরণা নারীর কাজকে আরও সহজ করতে সাহায্য করে। শিক্ষা গ্রহণ, নিজ প্রতিভা প্রকাশ ও কল্যাণমুখি কাজে পারিবারিক গণ্ডি পার হতে অনেক নারীকে লড়াই করতে হয়েছে তবুও তারা পিছিয়ে আসে নাই। তারা তাদের শিক্ষা ও অদম্য সাহসকে পুঁজি করে জীবনের গতি পরিবর্তন করেছে, জীবনকে আলোকিত করেছে, অন্যের জীবনে আলোক বর্তিকা হয়েছে। আমরা সম্মান জানাই নারীর এই কর্মস্পৃহাকে।

প্রকৃতি ও জন্মগতভাবে নারী-পুরুষের দৈহিক শক্তির তারতম্য থাকলেও মানসিনক শক্তি ও সাহসের দিক দিয়ে নারী পিছিয়ে নেই, সেই শক্তি ও সাহসকে কাজে লাগিয়ে নারী হয়ে উঠুন অনন্য। পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশ গুলোর মত এদেশের সকল স্তরের নারীর অংশগ্রহণ থ কুক সবকাজে। নারীর হাত স্বভাবতই মমতার হাত, এই হাতে যেমন চুড়ি ও রান্নার খুন্তি মানায় তেমনি উন্নয়নের হাতিয়ার ব্যবহারেও সে মমতার সাথে সমান পারদর্শী। সংসারে কাজের পাশাপাশি যেই সকল নারী চাকুরী ও ব্যবসা করে পরিবারের উন্নয়ন সাধন করেছে আসুন তাদের কর্মস্পৃহাকে জাগ্রত রাখি, তাদের চলার পথ বিপদমুক্ত রাখি এবং তাদের কাজের প্রসংশা ও সম্মান করি॥

যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় খ্রিস্ট মণ্ডলীতে প্রথম বাংলাদেশী সিস্টার

জেম্‌স গমেজ (আদি)

আমি জ্বালিয়ে রেখেছি আশার প্রদীপ, জানি কভু নিভবে না আমি সাজিয়ে রেখেছি ফুলের মালা, জানি কভু ছিঁড়বে না।

পরম পিতা যখন কোন যুবক-যুবতীকে ব্রতীয় জীবনাহ্বানের ডাকেন তখন দেখা যায় পার্থিব যত সুখ-শান্তি, হাসি-আনন্দ, লোভ-লালসা এবং সংসারধর্ম ত্যাগ করে সাড়া দেয় প্রভুর ডাকে। প্রভু আমাকে ডেকেছেন, আমি শুনতে পেয়েছি। আপনার ডাক, তাই তো আমি এসেছি আপনার চরণতলো

নিউইয়র্কে বসবাসকারী বাংলাদেশী যুবতী লুসিয়ানা ডি'ক্রুজ পড়াশুনা শেষ করে কর্ম জীবনে যোগ দিয়েছেন। মা-বাবা, ভাই-বোনদের নিয়ে, সুন্দর খ্রিস্টীয় পারিবারিক জীবন যাপন করছিলেন। নিউইয়র্কে ব্যস্তময় ও কর্মময় জীবনপথে চলতে চলতে এক সময় তার কানে ভেসে আসে প্রভুর ডাক। লুসিয়ানা ডি'ক্রুজ বুঝতে পারেন প্রভু তাকে ডাকছেন তার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মজুর হতে বর্তমান এ আধুনিক জীবনকে বিসর্জন দিয়ে লুসিয়ানা সিদ্ধান্ত নিলেন প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মজুর হতে। কর্ম জীবন, পারিবারিক জীবন বিসর্জন দিয়ে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে নিউইয়র্কে সিস্টার হবার প্রত্যাশায় ফিলিপ্পিনী সংঘে যোগ দিলেন। দীর্ঘ আট বৎসর ফিলিপ্পিনী সংঘে প্রশিক্ষণ নিয়ে গত ১৯ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে সিস্টার লুসিয়ানা শেষ ব্রত গ্রহণ করেন। শেষ ব্রত, আনুষ্ঠানিক ভাবে অংশ নেয় নিউজার্জি অঙ্গরাজ্যের মরেস টাউনে, সংঘের মাদার হাউজে। মাদার হাউজের সেইন্ট লুসী চ্যাপেলে বিশপ কেভেন জে সুইনি, ফাদার জাবেদ ব্রোগান, ফাদার যোসেফ জুড গ্যানন, ফাদার ডানিয়েল কিংসলী এবং ফাদার স্ট্যানলী গমেজ (আদি) সম্মিলিত খ্রিস্টযাগে শেষ ব্রত গ্রহণ করেন। এ অনুষ্ঠানে সিস্টার লুসিয়ানার ভাই-বোন ও তাদের পরিবার এবং কিছু সংখ্যক আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত ছিলেন

আমেরিকার স্থানীয় খ্রিস্টমণ্ডলীতে প্রথম এক বাংলাদেশী যুবতী সিস্টার হয়েছেন, আজ আমেরিকার গোটা বাঙালি সমাজ গর্বিত সিস্টার লুসিয়ানা ডি'ক্রুজকে ঘিরে

পরিবার পরিচিতি : পরিবারে, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুমহলে তিনি বিন্দু নামে পরিচিত। বাবা গব্রিয়েল ডি'ক্রুজ, প্রয়াত মা পুষ্প ডি ক্রুজ, প্রয়াত বড় ভাই-বৌদি এলভিস লিপিকা ডি'ক্রুজ, দিদি ও দাদা অপর্ণা ও পলাশ গমেজ, ভাগ্নে অনন্ত গমেজ, যমজ ভাই-বৌ অমিতাভ ও মনি ডি'ক্রুজ। তার শৈশব ও কৈশোর জীবন কাটে ফার্মগেটের ইন্দিরা রোডে বাবা-মার নিজস্ব বাসভবনে। তার গ্রামের বাড়ী হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর ইক্রাশী গ্রামের ক্রুশ বাড়ী এবং পূর্বে গোল্লা ধর্মপল্লীর ছোট গোল্লা গ্রামের গজিরা বাড়ী। তেজগাঁও হলিক্রশ গার্লস হাইস্কুল থেকেই তার শিক্ষা জীবন শুরু হয়। এ স্কুলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন এবং চলতি বৎসর ১৭ বয়সে পরিবারের সাথে আমেরিকা-তে চলে আসেন।

ব্রতীয় জীবনের আহ্বান: আমাদের বাংলাদেশে দেখা যায় হাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থাকাকালীন ছেলে মেয়েরা আহ্বানের ডাকে সাড়া দিয়ে সেমিনারী কিংবা কনভেন্টে প্রবেশ করে থাকে। ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণ এ বয়সের ছেলে-মেয়েদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে থাকেন সেমিনারী ও কনভেন্টে যাবার জন্যে। আমিও ১৩ বৎসর কালে বান্দুরা ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারীতে প্রবেশ করেছিলাম যাজক হবার উদ্দেশে। এ বয়স থেকে সেমিনারী কিংবা কনভেন্টে প্রবেশ করলে ব্রতীয় জীবনের ভিক্তি অল্প বয়স থেকেই নিজেকে প্রস্তুত করতে বোঝা যায় এবং আহ্বান জীবন নিজেকে বুঝতে সহস হয়। কিন্তু সিস্টার লুসিয়ানার জীবনে উনি আহ্বান পেয়েছেন বেশ পরে। সিস্টার লুসিয়ানা আমেরিকার মত দেশে পড়াশুনা করে, ভালো চাকুরী করে, মোটা অংকের অর্থ উপার্জন করে, নিউইয়র্ক সিটির চাকচিক্যময় আনন্দের জীবনে বিসর্জন দিয়ে মধ্যবয়সে আহ্বান পেয়েছেন। এ বিসর্জন সত্যিই ভাবতে অবাক লাগে।

লুসিয়ানা একাউন্টিং বিষয়ে পড়াশুনা করে কলেজ পাশ করার পর নিউইয়র্ক শহরে চাকুরী জীবনে ভালোই করতেছিলেন। কাজের পাশাপাশি তার নিজ ধর্মপল্লী সেইন্ট জেরার্ড মাহেলা চার্চে খ্রিস্টযাগে এবং মিস্টারদের বিভিন্ন কাজে বেশ সাহায্য সহযোগিতা করতেন। ধর্মপল্লীর ছোট ছেলেমেয়েদের ধর্মসার ক্লাশেও শিক্ষা দিতেন। তিনি প্রতি রবিবার চার্চের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত ছিলেন। হয়ত চার্চে এ সাহায্য সহযোগিতাই তার ব্রতীয় জীবনের আহ্বান তিনি খুঁজে পান। ২০১০ খ্রিস্টাব্দে এক যুবক লুসিয়ানাকে পছন্দ করেন এবং পারিবারিক ও সামাজিক রীতি অনুযায়ী দু'জনের মাঝে সম্বন্ধ বন্ধন হয়।

পরের বছর তার নিজ ধর্মপল্লী সেইন্ট জেরার্ড চার্চের পক্ষ হয়ে ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ ডে - তে, অংশ নিতে গ্রুপের সাথে স্পেন দেশে যান। স্পেনে ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ ডে শেষ করে দেশে ফিরে নিজেকে নিয়ে তিনি অনুধ্যান করতে থাকেন তার একাকী জীবন, বিবাহিত জীবন এবং ব্রতীয় জীবন নিয়ে। কোন জীবনকে তিনি বেছে নেবেন তা বুঝতে পারছিলেন না। অনেক চিন্তা-ভাবনা করার পর তিনি তার ফিয়ানসকে না করে দিলেন। লুসিয়ানার প্রভুর প্রতি বিশ্বাস, এবং প্রার্থনাশীলতা দিনে দিনে বেশ প্রখর হচ্ছিল। হয়তো তিনি প্রভুর ডাক শুনতে পাচ্ছিলেন। স্থানীয় ধর্মপল্লীর সিস্টার ও ফাদারদের সাথে ব্রতীয় জীবনের প্রবেশের কথা প্রস্তাব দেন। ধর্মপ্রদেশের বিশপের সাথেও তার এ বিষয়ে কথা হয়েছে। তারা সবাই লুসিয়ানাকে বেশ উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে শুরু করেন। এরপর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে ধর্মপল্লীর পক্ষ হয়ে ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ ডে-তে অংশ নিতে ব্রাজিলে যান। ব্রাজিল থেকে ফিরে তিনি ব্রুকলিন ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত নির্জন ধ্যানে ও কনফারেন্সে অংশ নেন। বিভিন্ন ধর্মীয় বইপড়তে শুরু করেন। বিভিন্ন নার্সিং হোমে, গির্জায় ভলেন্টারী কাজে অংশ নিতে শুরু করেন। ধর্মপ্রদেশের ব্রতীয় জীবনের আধ্যাত্মিক উপদেষ্টার সাথে ব্রতীয় জীবনে প্রবেশের কথা বলেন যে, তিনি ব্রতীয় জীবনে প্রবেশ করবেন। ২০১৩-২০১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি নিউইয়র্কের ব্রুকলিন ধর্মপ্রদেশের ফিলিপ্পিনী সংঘের সিস্টারদের সাথে বিভিন্ন কর্মশালায় অংশ নেন, সাহায্য-সহযোগিতা করতে থাকেন। পরিশেষে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে লুসিয়ানা ফিলিপ্পিনী সংঘে প্রবেশ করেন। এভাবেই তিনি তার ব্রতীয় জীবনের আহ্বানের ডাক শুনতে পেয়েছিলেন।

সিস্টার লুসিয়ানা ডি'ক্রুজ যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় খ্রিস্ট- মণ্ডলীর প্রথম বাংলাদেশী সিস্টার। তিনি আমেরিকার স্থানীয় খ্রিস্টমণ্ডলীর ও বাংলাদেশী মণ্ডলীর গৌরব। তার প্রতি রইল আমাদের সবার পক্ষ থেকে একরাশ অভিনন্দন। তার জীবনযাত্রা দেখে আমেরিকার আরো অনেক বাংলাদেশী যুবতী ব্রতীয় জীবনে প্রবেশের অনুপ্রাণিত হতে পারে এ প্রত্যাশাই রাখি প্রভুর চরণে॥

স্বাস্থ্যকথা

শীতকালে চর্মরোগের প্রকোপ: উপসর্গ ও করণীয়

ডা. নেলসন ফ্রান্সিস পালমা

বাংলাদেশ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলীয় একটি দেশ। গাঙ্গেয় বদ্বীপ হওয়ায় এ দেশের বেশির ভাগ এলাকায় খাল-বিল, নদী-নালায় ভরপুর। এ কারণে বছরের অনেকটা সময় দেশের গ্রামীণ অঞ্চলের মানুষদের স্যাঁতস্যাঁতে ও আর্দ্র আবহাওয়ায় কাটাতে হয়। ফলে চর্মরোগের প্রকোপ অনেক বেশি। বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ঋতুভেদে চর্মরোগের ধরন ও প্রকোপে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।

আমাদের শরীরের সবচেয়ে বড় অর্গান বা অঙ্গ হচ্ছে চামড়া বা ত্বক, যার রয়েছে দুইটি স্তর। সব ধরনের পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর জন্য সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে এই ত্বক। তাই আবহাওয়ার তারতম্যের সঙ্গে সঙ্গে ত্বকেরও কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। আমরা অনেকেই হয়তো জানি না যে, শীত এলে বেশ কিছু চর্মরোগ হয় যা কিনা গরমকালে তেমন একটা লক্ষ্য করা যায় না। আর একটা ব্যাপার প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় যে, রোগীরা এসে বলে শীত এলে তার শরীর খুবই চুলকায়। অথচ রোগীর শরীর পরীক্ষা করলে কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে চুলকানির মূল কারণ হচ্ছে শীত এলে তার ত্বক অধিক পরিমাণে শুষ্ক হয়ে যায় আর এ শুষ্কতার কারণ হচ্ছে বাতাসে যেহেতু শীতকালে জলীয় বাষ্প কমে যায় তাই বায়ুমণ্ডল ত্বক থেকে পানি শুষে নিয়ে যায় ফলে ত্বক শুষ্ক হয়ে পড়ে এবং ত্বকে চুলকানি শুরু হয়। সেই চুলকানি আরো বেড়ে যায় যখন নখ বা অন্য কিছু দিয়ে বারবার চুলকানো হয়।

শীতে যেসব রোগ বেড়ে যায় সেগুলো হলো ডার্মাটাইটিস/একজিমা, ইকথায়োসিস, সোরিয়াসিস, সেবোরিক ডার্মাটাইটিস, খুশকি, স্ক্যাবিস, চিলাইটিস, ঠোঁট ফাটা, ক্র্যাক হিল বা পা ফাটা ইত্যাদি। এখানে তিনটি রোগ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

ডার্মাটাইটিস/একজিমা: শরীরের ভেতর থেকে অথবা বাইরে থেকে কোন বস্তু যখন ত্বকের উপর প্রভাব ফেলতে থাকে, তখন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে ত্বকের উপর একজিমার উপসর্গ দেখা যায়। যে বস্তুগুলো দেহের বাইরে থেকে প্রভাব ফেলে সেগুলোর মধ্যে আছে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ, বস্তু ও বিভিন্ন ধরনের ওষুধ। ভেতর থেকে যেগুলো প্রভাব ফেলে সেগুলো হলো বিভিন্ন এন্টিজেন ও শরীরে উৎপাদিত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ। এর উপসর্গগুলো হচ্ছে তীব্র চুলকানি, চামড়ার নির্দিষ্ট অংশ লাল হয়ে ফুলে যাওয়া, চামড়া ওঠে যাওয়া, চামড়া ফেটে রস বের হওয়া ইত্যাদি। এর বিভিন্ন ধরন আছে। এগুলো হচ্ছে-

- অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস- বাচ্চাদের মুখ ও মধ্য শরীরে হয়। যেহেতু বাচ্চারা আক্রান্ত জায়গায় আঁচড়াতে থাকে, তাই চামড়া উঠে যায় এবং লাল হয়ে যায়। ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়। প্রাপ্ত বয়স্কদের হাতে, চোখে ও শরীরের ভাঁজে বেশি হয়।
- সেবোরিক ডার্মাটাইটিস- মাথা, মুখ ও দেহের উর্ধাংশে বেশি দেখা যায়। বাচ্চাদের এই রোগ হলে মাথায় চামড়া ওঠে, বগলে ও কুঁচকিতে ফুসকুড়ি হয়। বয়স্কদের ক্ষেত্রে চোখের পাতার উপরে এবং পাপড়ির স্থানে চামড়া উঠে। চুলকানি সাধারণত কম থাকে।
- কন্টাক্ট ডার্মাটাইটিস- ধুলাবালু, নিকেলের গয়না, উল বা কৃত্রিম তন্তুর পোশাক, প্রাণীর লোম, কোনো উদ্ভিদ, বিশেষ রাসায়নিকযুক্ত ক্রিম, লোশন, সাবান ইত্যাদির সংস্পর্শে এলে কারো ত্বক লাল হয়ে যায়, চুলকাতে থাকে, জ্বালা করে, জায়গায় জায়গায় ফুলে যায়। ত্বকের সরাসরি সংস্পর্শে এলে এটি হয় বলে এর নাম কন্টাক্ট ডার্মাটাইটিস। অনেক সময় সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া না হয়ে ১২ ঘন্টা থেকে ৩ দিনের মধ্যে হতে পারে।

এছাড়া আরো কিছু ধরণের ডার্মাটাইটিস আছে যা ব্যক্তি ও বয়স ভেদে ভিন্ন ধরনের উপসর্গ নিয়ে দেখা দেয়।

সোরিয়াসিস: সোরিয়াসিস রোগে শরীরের হাঁটুতে, কনুইতে এক ধরনের আঁশের মতো দেখা যায়। এক ধরনের রূপালি আঁশ বা মাছের আঁশের মতো দেখা যায়। যখনই আঁশ উঠে হাল্কা একটু রক্তক্ষরণ হয়। এটাতে তেমন কোনো চুলকানি হয় না। তেমন কোনো ব্যথা হয় না। উপসর্গ কম থাকে বলে অনেকে একে গুরুত্ব দেয় না।

সোরিয়াসিসের কারণ এখনো তেমনভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তবে এক নম্বর কারণ হলো, জেনেটিক। পরিবারের কারো থাকলে এটি হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি। দ্বিতীয় হলো, পরিবেশ- শুষ্ক পরিবেশ, দূষণযুক্ত পরিবেশ। আমাদের দেশে পরিবেশ দূষণ বেশি, কার্বণ বেশি। এই কারণে সমস্যা হতে পারে। এ ছাড়া ভেজাল খাওয়া-দাওয়া থেকেও এটা হতে পারে। গরুর মাংস বা রেড মিট থেকে এটি বাড়ে। আর দেখা যায়, কিছু ওষুধ, যেমন বিটা ব্লকার জাতীয় ওষুধ খেলে এগুলো বাড়ে। অনেকের হয়তো সোরিয়াসিস হওয়ার আশঙ্কা ছিল না, তবে এধরনের ওষুধ খাওয়ার কারণে হয়ে যাচ্ছে। কারণ একটি মানুষ জন্মগতভাবে হয়তো কয়েকটি রোগ হওয়ার প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সে রোগ তার হয় না, যদি ওই পরিবেশ তৈরি না হয়। হয়তো তার জিনের মধ্যে আছে, তবে প্রকাশ পাওয়ার জন্য কিছু কারণ কাজ করে। এই কারণের মধ্যে দুঃশ্চিন্তা আছে, মানসিক চাপও রয়েছে। স্থূলকায় মানুষ যারা এবং যাদের অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস আছে, তাদের এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

এটি কোনো ছোঁয়াচে রোগ নয়। যদি কারো ইমিউনিটি (রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা) কমে যায়, তখন এর জন্য সোরিয়াসিস হয়। তার হয়তো আগে থেকেই রোগটি জিনের ভেতর রয়েছে, তবে রোগ আগে প্রকাশ পায়নি। কিন্তু এই ইমিউনিটি কমে যাওয়ার জন্য রোগটি প্রকাশ পায়।

এই রোগের উপসর্গগুলো হলো- মাথায় খুশকি এবং খুশকি থেকে রক্ত আসা, এটি ছোপ ছোপ আকৃতির হয়। অনেকের নখের মধ্যে দানা দানা বা গর্ত দেখা যায়, রোগীর হাঁটু অথবা কনুইতে এক ধরনের আঁশের মতো দেখা যায়।

স্ক্যাবিস: এই রোগটিকে বাংলায় খোস-পাঁচড়াও বলে থাকেন অনেকেই। এটি একটি পরজীবীবাহিত রোগ। যে কীটটি দিয়ে এ রোগটি হয় তার নাম হচ্ছে সারকপটিস স্ক্যাবি (Sarcoptes scabei)। এটির সঙ্গে যদিও সরাসরি শীতের বা বাতাসের আর্দ্রতার কোনো সম্পর্কের কথা জানা যায় না তবুও দেখা গেছে

এ রোগটি শীত এলেই ব্যাপক আকারে দেখা দেয়। বিশেষ করে শিশুরা এতে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হতে থাকে। হতে পারে শীতকালে যেহেতু এক বিছানায় একত্রে অনেকেই চাপাচাপি করে থাকে। সে কারণে রোগটি এ সময়ে ব্যাপকভাবে সংক্রমিত হয়ে থাকতে পারে। এ রোগটি আমাদের দেশের নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে বেশি হতে দেখা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যে সব শিশু স্কুলে যায় বা হোস্টেলে থাকে, তারাই এতে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে শরীরে অসম্ভব রকম চুলকানি হতে দেখা যায় এবং রাতে চুলকানির তীব্রতা আরো বাড়ে। এ ক্ষেত্রে সাধারণত পরিবারের একাধিক ব্যক্তি এ রোগে ভুগে থাকেন। ফলে পরিবারের সবাইকেই অথ বা হোস্টেলে এক ঘরে থাকা সকলকে এ রোগের চিকিৎসা এক সঙ্গে করাতে হয়, নয়ত ভালো হয়ে এ রোগ আবার তার দেহে দেখা দেবে।

করণীয়ঃ

- এ সময় ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। এ জন্য নারিকেল বা অলিভ অয়েল, প্যারাফিন অয়েল বা ক্রিম, পেট্রোলিয়াম জেলি বা গ্লিসারিন ব্যবহার করা যায়। এ ছাড়া মেডিকেটেড ময়েশ্চারাইজার, গ্লিসারিনযুক্ত সাবান সপ্তাহে দুই-তিন দিন ব্যবহার করা যায়।
- খুব গরম পানি ব্যবহার না করে কুসুম গরম পানি গোসলে ব্যবহার করা।
- খুশকি দেখা দিলে কিটোকোনাজলসহ শ্যাম্পু ব্যবহার করা যেতে পারে।
- যেহেতু আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের পরিবর্তন আসে, তাই এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে আবহাওয়া উপযোগী তেল, ময়েশ্চারাইজার ও সাবান ব্যবহার করা এবং নির্দিষ্ট ঋতুর উপযোগী জিনিস ব্যবহার করলে ত্বককে সঠিকভাবে পরিচর্যা করা সম্ভব।
- এ ছাড়া প্রচুর পানি খাওয়া, ভিটামিনসমৃদ্ধ ফলমূল ও শাকসব্জি খাওয়ার মাধ্যমে ত্বককে সজীব রাখা সম্ভব। গুরুতর ক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত কোনো ওষুধ বা লোশন/ক্রিম ব্যবহার করা যাবে না॥

নারী মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ ও আমাদের করণীয়

ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও

মূত্রতন্ত্র আমাদের শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রস্রাব তৈরী হয় ও তা আমরা বর্জ্য পদার্থ হিসাবে বাইরে বের করে দেই। মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ (Urinary Tract Infection - UTI) মহিলাদের জন্য একটি সাধারণ রোগ। মানুষের শরীরে যত রকমের ইনফেকশন হয়, তার মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হলো মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ বা ইনফেকশন। প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে প্রায় ১০% লোক এ রোগে আক্রান্ত হয়।

৬০% মহিলা জীবনে কোন না কোন সময় মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ রোগে ভুগে থাকে। প্রতি বছর যত লোক এ রোগের শিকার হন, তার প্রায় ৫০% লোক পুনরায় এ রোগে আক্রান্ত হন। পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে এ রোগের প্রার্দুভাব চারগুণ বেশি হয়। হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগীদের মধ্যে নতুনভাবে প্রায় ৪০% রোগী এ রোগে আক্রান্ত হয়। মেয়েদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে মূত্রতন্ত্রে জীবানু বেড়ে যাবার প্রবণতা বাড়ে। বৃদ্ধ মহিলাদের তুলনায় যুবতীদের এ ধরণের ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হবার হার ৫০% বেশি। ৭৫ বছর বা তার উপরে পুরুষদের শরীরে এ ধরনের জীবানু সংক্রমনের হার ৭-১০% বেশি। বাচ্চাদের মধ্যে প্রায় ১০% এ রোগে আক্রান্ত হয়। বাচ্চাদের মধ্যে ৩ মাসের কম বয়সী ছেলেরা যাদের ত্বকচ্ছেদ (Circumcision) করা হয়নি তারা এক বছরের কম বয়সী মেয়েদের তুলনায় বেশি এ রোগে আক্রান্ত হয়। নারী ডায়াবেটিকস্ রোগীরা এরোগে সাধারণত বেশি অক্রান্ত হতে পারে। পুনঃ পুনঃ এ রোগে আক্রান্ত হলে কিডনির সমস্যা হতে পারে। সেজন্য এ বিষয়ে সাবধাণতা ও সচেতনতা দরকার। নারীরা একটু সচেতন হলেই এ রোগ থেকে সহজে রেহাই পেতে পারেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর প্রায় ৭০ লক্ষ লোক মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ সমস্যায় ডাক্তারের কাছে যায়। ১০ লক্ষ লোক হাসপাতালের জরুরী বিভাগে দেখায়। তন্মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ লোক হাসপাতালে ভর্তি হয়। তাদের চিকিৎসা বাবদ প্রতি বছর প্রায় ১৬ কোটি টাকা খরচ হয়। এক জরিপে জানা গেছে, বাংলাদেশে গামেন্টস কর্মীদের মধ্যে প্রায় ৭০% নারী মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ রোগে ভুগে।

ইতিহাসের পাতা থেকেঃ

১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে প্যাপিরাস পত্রে প্রথম এ বিষয়ে মিশরীয়রা লিখেন - মূত্রথলি থেকে অত্যাধিক জ্বালাপোড়া নির্গত হয়ে এ রোগ হয়। ১৯৩০ খ্রিস্টব্দে অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের পূর্বে এ রোগের জন্য গাছ-গাছালি জাতীয় ঔষধ ব্যবহৃত হত ।

মূত্রতন্ত্রঃ

- ২টি কিডনি,
- ২টি মূত্রবাহী নালী (Ureter),
- একটি মূত্রথলি (Urinary bladder) ও
- একটি মূত্রনালী (Urethra) অবস্থিত ।

স্ত্রী মূত্রতন্ত্র

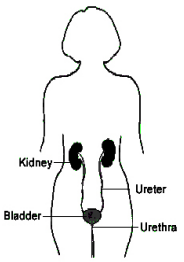

স্ত্রী মূত্রতন্ত্র

নারী মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণঃ

একজন সুস্থ মানুষের শরীরে প্রতি মিনিটে একটি কিডনি ৩ আউন্স করে রক্ত ছেঁকে থাকে ও অতিরিক্ত পানি ও শরীরের বর্জ্য পদার্থকে মূত্র আকারে মূত্রনালীর মাধ্যমে শরীরের বাইরে বের করে দেয়। মূত্রতন্ত্রে যে কোন সংক্রমণকে মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ বলে। শরীরবৃত্তীয় কারণে নারীদের মধ্যে বেশি এ ধরনের সংক্রমণ হয়ে থাকে। নারীদের খাটো মূত্রনালীর কারণে সহজেই মূত্রথলিতে জীবানুর সংক্রমণ ঘটে থাকে। নারীদের মূত্রনালী, মাসিকের পথ এবং পায়ুপথ কাছাকাছি বলেও সহজে মূত্রথলিতে এ ধরনের সংক্রমণ হয়ে থাকে। ফলে নারীদেহে তাদের জীবনকালে মূত্রতন্ত্রের ইনফেকশনের হার ৫০% এর বেশি। শারীরিক মেলামেশার মাধ্যমে নারীদেহের মূত্রনালী কাছাকাছি থাকায় এ ধরনের ইনফেকশনের সম্ভবনা বেশি থাকে। এক জরীপে দেখা গেছে, যুবতী ও শারীরিক মেলামেশাকারী নারীদের ক্ষেত্রে ৭৫-৯০% মূত্রথলিতে ইনফেকশন (Cystitis) হতে পারে। নব্য বিবাহিত নারীদের অনেকেই হানিমুনজনিত মূত্রথলিতে ইনফেকশন (Honeymoon cystitis) রোগে ভুগে থাকেন। সাধারণত মূত্রনালীর মাধ্যমে জীবানু মূত্রথলিতে প্রবেশ করে ও সেখানে ধীরে ধীরে ও দিনে দিনে সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকে, যা পরবর্তীতে মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ ঘটায়। নারীদের মাসিক পরবর্তীসময় বা মেনাপোজ এর ক্ষেত্রে শারীরিক মেলামেশাজনিত মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ অনেকটাই কমে যায়। কিন্তু এস্টোজেন হরমোন কমে যাবার কারণে এর সম্ভাবনা তখন বেড়ে আয়। পুরুষদের সাধারনত মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ কম হয়। তবে তারা একবার এ রোগে আক্রান্ত্র হলে পুনরায় আক্রান্ত হতে পারে কারণ প্রোস্টেট গেন্ডে এর জীবানু থেকে যেতে পারে।

মূত্রতন্ত্র ও এর সংক্রমণ/ইনফেকশন এর কারণঃ

ফাংগাস, ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের কারণে এ ধরনের সংক্রমণ হয়ে থাকে। মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণের জন্য ব্যাকটেরিয়াই প্রধাণত দায়ী। এরমধ্যে ই-কলাই নামক ব্যাকটেরিয়া এ রোগের জন্য প্রধানতম দায়ী। ই. কলাই এর কারণে ৮০-৮৫% ও স্ট্যাফাইলোকক্কাস ব্যাকটেরিয়ার কারনে ১০-১৫% মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ হয়ে থাকে। ক্ল্যামাইডিয়া ও মাইকোপ্লাসমা মূত্রবাহী নালী ও জননতন্ত্রে সংক্রমনের মাধ্যমে মূত্রতন্ত্রের ইনফেকশন করে থাকে। ভাইরাসের কারণে মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ কম হয়ে থাকে।

কারা এ রোগে বেশি আক্রান্ত হতে পারে?

যে কেউ এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে, তবুও কোন কোন কারণে কারো কারো এ রোগে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি বেশি থাকে। তারা নিম্নরূপ:

- যারা পানি কম পান করেন।
- যারা স্নায়ুরজ্জু বা স্পাইনাল কর্ডের ইনজুরীতে আক্রান্ত, ফলে তারা নিয়মিত প্রস্রাব করে না - তাদের মূত্রথলিতে জীবানু বেশি জন্মাতে পারে।
- কিডনিতে পাথর বা প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড বড় হয়ে যাওয়া।
- শরীরে যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম যেমন - ডায়াবেটিকস রোগী।
- কিছু কিছু জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর ব্যবহার যেমন: কনডম, ডায়াফ্রাম, স্পারমিসাইড ইত্যাদি।
- দীর্ঘদিন মূত্রনালীতে ক্যাথেটার ব্যবহারকারী। মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ এর সম্ভবনা এক্ষেত্রে ৩-৬% বেড়ে যায়।

প্রাপ্তবয়স্কদের প্রস্রাবে ইনফেকশনের লক্ষণসমূহ:

ক্রমিক নং	মূত্রতন্ত্রের ইনফেকশন	লক্ষণসমূহ
১.	কিডনিজনিত সমস্যা বা সংক্রমণ	• তলপেটে বা কোমরের পিছনে দুইদিকে বা একদিকে ব্যথা
		• তীব্র জ্বর
		• শীত শীত বোধ করা ও কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসা
		• বমি বমি ভাব
		• বমি করা
২.	মূত্রথলিতে সংক্রমণ	• তলপেটে তীব্রচাপ অনুভূত হওয়া/ভারী ভারী বোধ হওয়া
		• প্রস্রাবে জ্বালাপোঁড়া, বার বার প্রস্রাব হওয়া
		• প্রস্রাব করার পরেও তা শেষ হয়নি বোধ করা
		• লাল বর্ণের প্রস্রাব হওয়া
৩.	মূত্রনালীতে সংক্রমণ	• প্রস্রাবে জ্বালাপোঁড়া
		• বার বার প্রস্রাব হওয়া

- অজ্ঞান ব্যক্তি ।
- পরিবারে মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ এর ইতিহাস

পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত মূত্রতন্ত্রের ইনফেকশন (Recurrent Infections):

অনেক মহিলা পুনঃ পুনঃ মূত্রতন্ত্রের ইনফেকশনে আক্রান্ত হয়। যুবতীদের মধ্যে যারা মূত্রতন্ত্রের ইনফেকশনে আক্রান্ত হন, তাদের মধ্যে প্রায় ২০% পুনঃ পুন:ঃ মূত্রতন্ত্রের ইনফেকশনে আক্রান্ত হয়। মূত্রতন্ত্রের ইনফেকশনে আক্রান্ত নারী পুনরায় এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। কিছু কিছু মহিলা বছরে প্রায় ৩-৪ বারও এ রোগে পুনঃ আক্রান্ত হয়ে থাকে ।

প্রসূতীকালীন সময়ে মূত্রতন্ত্রের ইনফেকশন:

কিছু কিছু রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রসূতীকালীন সময়ে ৪-৫% পর্যন্ত মূত্রতন্ত্রের ইনফেকশন হতে পারে। যদিও এ সময় নারীরা অন্যান্য সময়ের মতই অন্য রোগেও আক্রান্ত হতে পারে।

মেডিক্যাল টেস্ট/পরীক্ষা ও চিকিৎসা এবং রেফারেল:

উপরে আলোচিত মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ এর লক্ষণ প্রকাশ পেলে দেরী না করে অবশ্যই আপনার নিকটস্থ এমবিবিএস ডাক্তার/ ফ্যামিলি ফিজিসিয়ানকে দেখান। রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক প্রস্রাব ও রক্ত পরীক্ষা করাতে হতে পারে। অনেকের ক্ষেত্রে অন্যান্য পরীক্ষা যেমন ইউরিন কালচার, আল্টাসনোগ্রাফি, আইভিইউ ইত্যাদি করা লাগতে পারে। ডাক্তার মেডিক্যাল টেস্ট ও রোগীর রোগের লক্ষণ বিবেচনা করে এ রোগের চিকিৎসা হিসাবে অ্যান্টিবায়োটিক, জ্বর উপশমে প্যারাসিটামল ও প্রয়োজনে অন্যান্য ঔষধ দিতে পারেন। কিডনি সমস্যায় বা জটিল অবস্থা বিবেচনায় তিনি রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি হবার পরামর্শ বা কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ/ ইউরোলজিস্ট/ ডায়াবেটলজিস্ট এর কাছেও রেফার্ড করতে পারেন।

মনে রাখতে হবে, যত তাড়াতাড়ি রোগ শনাক্ত হবে, তত শীঘ্র রোগী সুস্থ হবে, তত বেশি খরচ কম হবে এবং স্বাস্থ্য জটিলতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। চিকিৎসকের নির্দেশমত একবার অ্যান্টিবায়োটিক শুরু হলে রোগের লক্ষণ ভালো হলেও তা নির্দিষ্ট মাত্রায় নির্দিষ্ট সময়/দিন পর্যন্ত শেষ করুন। নচেৎ উক্ত অ্যান্টিবায়োটিক পরবর্তী সময়ে আপনার শরীরে আর কাজ নাও করতে পারে। সাধারণত অ্যান্টিবায়োটিক সাতদিন বা তার বেশি সময়ের জন্য দেয়া হয়ে থাকে। সেজন্য আপনার ডাক্তারের কাছ থেকে জেনে নিন - আপনার চিকিৎসায় অপনাকে কোন অ্যান্টিবায়োটিক দেয়া হয়েছে কিনা এবং তা কতদিন খেতে হবে। নিজে নিজে বা দোকানদারদের কাছ থেকে অ্যান্টিবায়োটিক বা অন্য ঔষধ কিনে ভুল মাত্রায় ভুল ঔষধ খাবেন না। এতে আপনি নিজেকে ভয়ানক ঝুঁকি বা বিপদের মধ্যে ফেলতে পারেন। আত্মীয়, বন্ধু বা অন্যের কাছ থেকে একই রকমের স্বাস্থ্য সমস্যায় অন্যের চিকিৎসা বা ঔষধ খাবেন না। যা আপনি একই মনে করছেন, তা ভুল হতে পারে। এ সময় আপনি আপনার ডাক্তারের কাছে যান। এক্ষেত্রে তিনি আপনার সবচেয়ে বড় বন্ধু। তিনি আপনাকে সঠিক রোগ বিষয়ে জানতে, বুঝতে ও রোগ নির্ণয়ে এবং চিকিৎসায় সর্বিক সহযোগিতা করতে পারেন।

মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ প্রতিরোধে আমাদের করণীয়:

আমরা সহজেই এ রোগের হাত থেকে নিজেদেরকে প্রতিরোধ করতে পারি। মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ খুব একটা জটিল সমস্যা নয়। নিচের বিষয়গুলো আমরা সহজেই নিজেরা করতে পারি ও এর হাত থেকে নিজেরা মুক্ত থাকতে পারি।

- প্রচুর পানি ও তরল খাবার পান করা। তার মাধ্যমে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া দূরীভূত হতে পারে। পানি সবচেয়ে ভালো ঔষধ। দৈনিক আমাদের ৮-৯ লিটার পানি ৭-১০ বারে পান করা উচিৎ। যাদের কিডনির সমস্যা রয়েছে তারা তাদের ডাক্তারের নির্দেশে এর চেয়ে কম পরিমাণে পানি পান করবেন।
- চা, কফি যাতে ক্যাফেইন থাকে, সফট্ ড্রিংকস যাতে সাইট্রাস থাকে, অ্যালকোহল বা মদ্যপান ইত্যাদি পরিত্যাগ করা। না হলে মূত্রথলিতে ইনফেকশনের ঝুঁকি বাড়তে পারে।
- প্রস্রাবের বেগ হলে নিয়মিত তা সম্পন্ন করা। প্রস্রাব বেশিক্ষণ আটকে রাখা ঠিক নয়। তাতে ব্যাকটেরিয়া বেশি জন্মাতে পারে।
- পায়খানার পর পায়ুপথ সামনে থেকে পিছনে পরিষ্কার করা। এক্ষেত্রে নারীদের মূত্রপথ ও মাসিকের পথে যাতে পায়ুপথের ময়লা না লাগে তা খেয়াল রাখা। প্রস্রাব করার পর তা পরিষ্কার রাখা। নারীর জন্য এ বিষয়টি মেনে চলা খুব জরুরী।
- শারীরিক মেলামেশার পর নারী পুরুষ সকলের নিয়মিত প্রস্রাব করা ভালো। এরপর পানি পান করা উপকারী।
- সূঁতী জাতীয় প্যান্টি/আন্ডারওয়ার ব্যবহার করা। প্রয়োজনে দৈনিক তা পরিবর্তন করা। টাইট ফিটিং আন্ডারগার্মেন্টস্ এড়িয়ে চলা দরকার ।
- মাসিকের সময় পরিষ্কার পারিচ্ছন্ন থাকা, পুষ্টিকর খাবার, টাটকা শাকসবজী, ফলমূল ও প্রচুর পানি খাওয়া। স্যানিটারী প্যাড পরিধান করা ।
- ডায়াফ্রাম, স্পারমিসাইড, কনডম এড়িয়ে চলতে পারলে ভালো। প্রয়োজনে অন্য পদ্ধতি নিলে ভালো।
- নিয়মিত ডায়াবেটিকস্ এর সুগার পরিমাণ করুন। ডায়াবেটিকস নিয়ন্ত্রনে রাখুন। প্রয়োজনে আপনার ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন।

আমরা সচেতন হলে সহজেই মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ এর হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারি। সামান্য সমস্যা নিজেদের অজ্ঞানতা, অবহেলার কারনে নিজেদের জীবনে ভয়ানক বিপদ ডেকে আনে। স্বাস্থ্যশিক্ষা আমাদের অধিকার। আমরা জানার মাধ্যমে মেনে চললে নিজেদের জীবনে ও অন্যদের জন্য অনেক বড় সুফল বয়ে আনতে পারি ।

তথ্যসূত্র: Davidson's Medicine, Internet.

লেহ লাদাখ ভ্রমণ!

রোজলিমা রোজারিও

বহু বছরের স্বপ্ন ছিল লাদাখ ভ্রমণের! অবশেষে স্বপ্ন পূরণ হলো ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে। লাদাখ ভারতের চীন সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত। দুর্গম পার্বত্য এলাকা এটি। লাদাখ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩,০০০ মিটারেরও বেশি উচ্চতায় অবস্থিত ও লাদাখের রাজধানী লেহ শহর ৩,৫০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। এত উচ্চতায় অবস্থিত বলে সেখানে অক্সিজেনের মাত্রা অত্যন্ত কম। লাদাখ ভ্রমণ করতে হলে শারীরিক ও মানসিকভাবে যথেষ্ট ফিট থাকতে হয়। যাদের শ্বাসকষ্ট আছে, হৃদরোগ আছে, শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল তাদের লাদাখ ভ্রমণ না করাই ভালো।

সৌন্দর্যের লীলাভূমি হলো লাদাখ! গাছপালাবিহীন পাথুরের পাহাড়-পর্বতের সৌন্দর্য যে এত মনোমুগ্ধকর তা নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হতো না। পাহাড়-পর্বতের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি মারতে দেখা যায় ছোট গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদের। বেশিরভাগই ক্যামেল ট্রি মানে উট গাছ। একধরনের কাটা জাতীয় গাছ ও তাতে ছোট ছোট সবুজ পাতা যা উটের প্রধান খাবার। এছাড়া আরও একধরনের গাছ দেখেছি বেশ লম্বা। তবে নাম জানি না। কিছুটা পাইন ট্রির মতো দেখতে। বাংলাদেশ থেকে লেহ লাদাখ গিয়েছিলাম বিমানে করে প্রথমে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ভারতের দিল্লি, বিমানে সময় লাগে মাত্র ২ ঘন্টা ও দিল্লি থেকে লেহ বিমানবন্দরে সময় লাগে মাত্র ১ঘন্টা ১৫মিনিট। ট্রানজিটসহ মোট ১২ ঘন্টার জার্নি ছিল। ২৭ তারিখ রাতে রওনা হয়ে লেহ বিমানবন্দরে পৌঁছায় ২৮ তারিখ সকাল ১০:০০ টায়। এরপর লেহের হোটেল হিল টাউনে গিয়ে বিশ্রাম নিয়ে ফ্রেশ হয়ে ২:৩০ মিনিটে হোটেলের পাশে চমৎকার একটি রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাবার খেয়ে ৩:৩০দিকে ঘুরতে বেরিয়ে পড়ি।

প্রথমেই যাই শান্তি স্তুপ। শান্তি স্তুপ হলো উত্তর ভারতের লাদাখের চাংপা, লেহ জেলায় পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত একটি বৌদ্ধ সাদা গম্বুজযুক্ত স্তুপ। এটি ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে জাপানি বৌদ্ধ ভিক্ষু, জিওমিও নাকামুরা দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। শান্তি স্তুপটি ১৪তম দালাই লামা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ ধারণ করে। স্তুপটি শুধুমাত্র ধর্মীয় গুরুত্বের কারণেই নয় বরং এর অবস্থানের কারণেও পর্যটকদের আকর্ষণে পরিণত হয়েছে যা আশেপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের মনোরম শোভা দেখে বোঝা যায়। অনেক উঁচুতে বৌদ্ধ মন্দিরটির অবস্থান। অনেকটা পথ হেঁটে হেঁটে ওপরে ওঠতে হয়। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। বেশিক্ষণ হাঁটা যায় না। একটু হাঁটা, একটু বিশ্রাম এভাবে ধীরে ধীরে ওপরে ওঠতে হয়। ওঠার পরে মনে হবে সব কষ্ট দূর হয়ে গিয়েছে কারুকার্যময় মন্দিরের অপরূপ সৌন্দর্যে ও তার আশেপাশের পাহাড়-পর্বত, গিরিখাত ও কিছুটা সবুজের হাতছানিতে! লেহ শহরটা প্রায় সম্পূর্ণটাই দেখা যায় শান্তি স্তুপ থেকে। সে এক অবিশ্বাস্যময় সৌন্দর্য! বেশ খানিকটা সময় প্রকৃতি ও মানুষের তৈরি সৌন্দর্যকে উপভোগ করে চলে গেলাম লেহ প্যালেসে। লেহ প্যালেস হলো একটি ঐতিহাসিক রাজকীয় প্রাসাদ যা হিমালয় পর্বতমালার মধ্যে লেহ-লাদাখ শহরের উপর দেখা যায়। সেঙ্গে নামগিয়াল ১৭০০ শতকে এই রাজকীয় প্রাসাদটি নির্মাণ করেন। ১৯০০ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ডোগরা বাহিনী লাদাখের উপর নিয়ন্ত্রণ দখল করলে, এই সুন্দর প্রাসাদটিকে পুরোপুরি পরিত্যক্ত করে রেখেছিল যখন রাজ পরিবার স্টোক প্রাসাদে স্থানান্তরিত হয়েছিল। প্রাসাদটি ভারতীয় আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে (এএসআই) -এর পরিচর্যা ও পুনরুদ্ধারের উদ্যোগে রয়েছে।

প্রাসাদটি সাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকে। বর্তমানে প্যালেসটিকে মিউজিয়ামে পরিণত করা হয়েছে। এর ছাদ থেকে লেহ এবং তার আশেপাশের অঞ্চলের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখা যায়।

লেহ প্যালেস ঘুরে চলে গেলাম লেহ মার্কেটে। অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন লেহ মার্কেট। ফুটপাতে দেখতে পেলাম নিজেদের চাষ করা সবজি, ফলমূল, বিভিন্ন ধরনের মসলা নিয়ে বসে আছে বিক্রেতারা। একটি বিষয় দেখে খুব অবাক হলাম বিক্রেতাদের বেশিরভাগই নারী! এছাড়া দোকানগুলোও খুব সুন্দর ও পরিপাটি! সবকিছুই পাওয়া যায় শৌখিন জিনিসপত্রসহ দৈনন্দিন জীবনে যা প্রয়োজন। প্রায় ঘন্টাখানেক সময় কাটিয়ে ও কিছু কেনাকাটা করে ফিরে গেলাম হোটেলে। হোটেলেই রাতের খাবার খেলাম।

পরের দিনের গন্তব্য নুব্রা ভ্যালি! সকালের নাস্তা সেরে তল্পিতল্পাসহ ৯:০০টার মধ্যে বেড়িয়ে পড়লাম! ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন লেহ শহর পেরিয়ে নির্জন-নিস্তব্দ উঁচু উঁচু পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলতে লাগলো আমাদের গাড়ি। কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু আঁকাবাঁকা সর্পিল রাস্তা ধরে গাড়ি শুধু ওপরের দিকেই ওঠছে। আমি অবাক-বিস্ময়ে হা করে দেখছি ও ভাবছি কেমন করে এত উঁচুতে পর্বতগুলো কেটে কেটে এ রাস্তা তৈরি করেছে! মনে হচ্ছে আমাদের গাড়ি আকাশ ছোঁয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে! রাস্তা থেকে নিচের দিকে তাকালে ভয়ে শিউরে ওঠতে হয়। আমরা কত উঁচুতে! চারিদিকে বিভিন্ন রঙ-বেরঙের পর্বত! কোনোটা বরফের চাদরে ঢাকা সাদা ধবধবে, কোনোটাতে হালকা গোলাপী ও নীল রঙের ছটা, কোনোটা ছাই রঙের, কোনোটাতে সোনালি রঙের বিচ্ছুরণ! সে এক অবাক করা ভয়ংকর সৌন্দর্য! ভাষায় ব্যক্ত করা সত্যিই কঠিন! সবুজবিহীন শুধু পাথুরে পর্বতের এমন সৌন্দর্য দেখে সবাই আমরা বিমোহিত! গাড়ি ছুটে চলেছে তো ছুটেই চলছে। আর আমরা অবাক-বিস্ময়ে চারিদিকের সৌন্দর্য শুধু উপভোগ করছি। একটা সময় গাড়ি থামলো! বললো এটা খারদুংলা পাস, পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচুতম মোটারেবল রাস্তা! উচ্চতা ১৮,৩০০ ফুট! আপনারা নেমে ছবি তুলতে পারেন। সাথে সাথে গাড়ি থেকে নামলাম। নেমে ৫মিনিটও থাকতে পারিনি। তীব্র ঠাণ্ডা ও জোড়ালো বাতাসের কারণে শরীর বরফ হয়ে যাচ্ছিলো। আর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গিয়েছিল। অক্সিজেনের মাত্রা অত্যন্ত কম! কোনোরকমে দু'টি ছবি তুলে তড়িঘড়ি করে গাড়িতে ওঠে পড়লাম। স্বাভাবিক হতে বেশ সময় লেগেছে। পরে গাড়িতে চড়েই সে ভয়ংকর সৌন্দর্য উপভোগ করেছি। কখনো কখনো মনে হচ্ছিল সুরঙ্গের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। দুই পর্বতের চূড়াগুলো এত কাছাকাছি তার মাঝখান দিয়ে রাস্তা! উঁচুনিচু, আঁকাবাঁকা রাস্তা অতিক্রম করে নুব্রা ভ্যালিতে চলে আসলাম। দুপুরে খেয়ে নিলাম রাস্তার পাশে এক রেস্টুরেন্টে। খাওয়ার পর আবার গাড়ির ছুটে চলা। নুব্রা ভ্যালির চোখ

ধাঁধানো সৌন্দর্যে আবারও বিমোহিত হলাম! চুর্তদিকে বিভিন্ন রং-বেরঙের পর্বতের সারি, নীল জলধারার পাশে বালিয়াড়ি মরুভূমি! লেহ শহর থেকে নুব্রা উপত্যকা কম-বেশি ১২০ কি: মি: পথ। উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩০০০হাজার মিটার। এই উপত্যকার দুটো বিখ্যাত জনপদ হল ডিস্কিট ও হুন্ডার। ডিস্কিট বিখ্যাত তার পাহাড়চূড়ায় বিশাল এক গুম্ফা ও অপূর্ব সুন্দর বুদ্ধমূর্তির জন্য। আর হুন্ডার জনপ্রিয় এখানকার দু'কুঁজওয়ালা উটের জন্য। দেশ বিদেশ থেকে দলে দলে পর্যটকরা আসেন এই দু'কুঁজওয়ালা উট দেখতে ও তার পিঠে সওয়ারী হয়ে আনন্দ উপভোগ করতে। নীল জলধারায় বহু দু'কুঁজওয়ালা উটের জলপান ও জলকেলি দেখে দৌড়ে কাছে চলে গেলাম ও স্পর্শ করার চেষ্টা করলাম। ওদের গুরুগম্ভীর হাঁকডাক শুনে স্পর্শ করতে ভয়ও পেলাম একটু। এত সৌন্দর্য ও এত উট দেখে কৌশরের চঞ্চলতা ভর করলো আমার ও আমার হাসব্যান্ডের ওপর! উটের পিঠে চড়বোই যত টাকা লাগে! খোঁজ নিয়ে জানলাম আসা-যাওয়া মিলে ২কি: মি: ৫০০রুপি করে প্রতিজনে। তাতেই রাজী হয়ে গেলাম! কিন্তু ছেলেমেয়ে তারা ওঠতে চাইলো না। আমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে পছন্দ করে উটের পিঠে চড়ে বসলাম বহু কসরত করে। দারুণ রোমাঞ্চকর ছিল জার্নিটা! আমাদের সাথে আরও তিনজন ছিল মোট ৫জন ৫টি উটে চড়ে এক সওয়ারী আমাদের নিয়ে যাত্রা শুরু করলো গন্তব্য স্থলে। একটির সাথে আরেকটি রশি দিয়ে বেঁধে সওয়ারি হেঁটে নিয়ে চললো আমাদের। উঁচুনিচু এবড়ো-থেবড়ো বালিয়াড়ি পাড় হয়ে রঙবেরঙের পর্বতের দিকে এগিয়ে চললাম। ১কি: মি: যাওয়ার পর আবার ফিরে এলাম একইভাবে। দারুণ উপভোগ্য ছিল বৈচিত্র্যময় এই জার্নি! জীবনে প্রথম উটের পিঠে চড়লাম! প্রায় ঘন্টা দুয়েক সময় কাটিয়ে চলে গেলাম হোটেল অ্যাপল কটেজ ক্যাম্প। হোটেলে ঢুকে বিস্ময়ে অভিভূত! আপেল গাছে ভর্তি হোটেলের আঙিনা। তাতে প্রচুর আপেল ধরে আছে। মনে হচ্ছে ফলের ভারে গাছ নুইয়ে পড়েছে। এতো আরেক সুন্দরের সমাহার! পাশেই ফুলের বাগান। তাতে নানা রঙের ও বর্ণের ফুল ফুটে আছে! হোটেলে প্রবেশ করে ফ্রেশ হয়ে বিশ্রাম নিলাম। বিকালের চা ও রাতের খাবার হোটেলেই খেলাম। পরের দিনের জন্য শক্তি সঞ্চয়ের জন্য প্রচুর বিশ্রামের দরকার।

পরের দিন সকালে হোটেলে নাস্তা সেরে ৯:০০টার মধ্যে বেড়িয়ে পড়লাম। উদ্দেশ্য প্যাংগং লেক এবং পথিমধ্যে নুব্রা ভ্যালিতে ডিস্কিট মনেস্টারি দেখা। হুন্ডার জনপদের সৌন্দর্য পেরিয়ে ডিস্কিটে চলে আসলাম। গাড়ি এক জায়গায় পার্ক করলো। আমরা হেঁটে হেঁটে ওপরে ওঠলাম। খুব ধীরে ধীরে হেঁটে ওপরে ওঠলাম। কারণ একটু হাঁটলেই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। বেশি কষ্ট হয়েছে আমার ও আমার ছেলের। মেয়ে ও আমার হাজব্যান্ডের তেমন সমস্যা হয়নি। ওপরে ওঠে বেঞ্চে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। কারণ শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। স্বাভাবিক হলে ভালো করে লক্ষ্য করলাম বিশালাকৃতির বুদ্ধ মূর্তি! ১০৬ ফুট উঁচু! খুবই সুন্দর দেখতে! পরিষ্কার নীল আকাশ ও সাদা মেঘের ভেলার নিচে অপরূপ পার্বত্য এলাকার মাঝখানে বসে শোভা বর্ধন করছে। মূর্তিটির গায়ের রঙ সোনালি, কাপড়ে লাল ও সবুজ রঙ ব্যবহার করা হয়েছে! অসাধারণ তার নির্মাণশৈলী! ওখান থেকে ডিস্কিট জনপদের পুরোটাই দেখা যায়। চতুর্দিকে পর্বতের সমারোহ ও তার পাদদেশে জনপদটি অবস্থিত। ঘন্টাখানেক থেকে পুনরায় যাত্রা শুরু করলাম প্যাংগং লেকের উদ্দেশে। সময় লাগবে ৫ঘন্টা। এবার নুব্রা ভ্যালির অন্য একটি রাস্তা ধরে গাড়ি এগিয়ে চললো। উঁচু-নিচু পাহাড়-পর্বত, ঝর্ণা, নদীর ধারা ডিঙিয়ে আঁকাবাঁকা পথে গাড়ি ছুটে চলেছে। নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক এ দৃশ্যের বর্ণনা করা অসম্ভব! শুধু মনে পড়ে যাচ্ছিল কৌশর বয়সে পড়া মাসুদ রানা গল্পে দুর্গম পার্বত্য এলাকার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল সেই বর্ণনার কথা! কখনও রঙ-বেরঙের পর্বত অতিক্রম করছি, কখনো ঝর্ণার ধারা ও নদীর ধারা অতিক্রম করছি, কখনো উপত্যকার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। এ সৌন্দর্য উপলব্ধির কথা ভাষায় ব্যক্ত করা সত্যিই কঠিন! নদীটির নাম সায়ক নদী। রিমো হিমবাহ থেকে সায়কের উৎপত্তি। উত্তরের সিয়াচেন হিমবাহ থেকে বয়ে আসা এক ধারা নুব্রা নদীতে এসে মিশেছে সায়কের সঙ্গে। এই মিলিত ধারা সায়ক নামেই প্রবাহিত হয়েছে সমগ্র নুব্রা উপত্যকা জুড়ে। নদীর পানির রঙ দেখে অবাক হলাম! সবুজ রঙ! যাকে বলে বটল গ্রিন! নদীর দু'পাশে ক্যামেল ট্রি! নদীটি কখনো আমাদের রাস্তার সাথী হচ্ছিল, কখনো আবার গাড়ি তার থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। এভাবেই উঁচু-নিচু, আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করতে করতে আমরা পৌঁছে গেলাম প্যাংগং লেকে। দূর থেকেই প্যাংগং লেকের সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হয়ে পড়লাম! লেকের চারিপাশে বিভিন্ন রঙের পাহাড়-পর্বত এবং পাহাড়-পর্বতের পাদদেশের অলি-গলিতে তার অবস্থান। গাঢ় ঘন নীল আকাশের নিচে গাঢ় ঘন নীল রঙের জলধারা! অপূর্ব সৌন্দর্যের সমাহার! কিন্তু কোনো গাছপালা নেই। গাড়ি চলে গেল একদম লেকের কাছে। গাড়ি থেকে নামার সাথে সাথে অনুভব করলাম প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটায় যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে! ধীরে ধীরে লেকের কাছে গেলাম ও সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগলাম! যেমন বাতাস, তেমন ঠাণ্ডা! একটু হাঁটলেই শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায়। এর উচ্চতা ৪, ৩৫০ মিটার। এ হ্রদ ১৩৪ কি:মি: লম্বা। বিশ্বের সবচেয়ে বড় লবনাক্ত হ্রদ এটি। এর এক-তৃতীয়াংশ ভারতে এবং বাকী অংশ চীনে।

এখানে অক্সিজেনের মাত্রা অত্যন্ত কম! এখানেই শুটিং হয়েছে ভারতের বিখ্যাত ছবি থ্রি ইডেয়টস্ এর। ঘন্টা দুয়েক থাকার পর লেকের পাশেই কটেজে চলে গেলাম। একেকটা কটেজে দুটি করে রুম ও তাতে ডাবল খাট পাতা। দুটি রুম সম্পূর্ণ আলাদা ও দুই রুমের আলাদা দরজা। কটেজগুলো কাঠের তৈরি ও বারান্দা কাঁচ দিয়ে ঘেরা। কোনো জানালা নেই। ঠাণ্ডা ও ঠাণ্ডা হাওয়া যাতে প্রবেশ করতে না পারে এবং দিনের বেলা ও রাতের বেলার অপরূপা প্যাংগং লেকের শোভা দেখার জন্য এ ব্যবস্থা। কটেজে প্রবেশ করেই শীত নিবারণের জন্য মসলাদার চা পান করলাম। কটেজের ম্যানেজার বারবার সতর্ক করছিল যেন বাইরে তেমন না যাই। কারণ অসুস্থ হয়ে যেতে পারি। রাতের বেলা তাপমাত্রা জিরো ডিগ্রিতে নাকি চলে যায়। মোটা গরম কাপড়, মাথায় টুপি যেন সবসময় পড়ে থাকি। রাতের বেলাটা কটেজে থাকলাম এবং রাতের খাবারও কটেজে খেলাম।

রাতে আমি ও আমার ছেলে একটুও ঘুমাতে পারলাম না। কারণ কটেজে কোনো জানালা ছিল না, যেখান দিয়ে একটু বাতাস প্রবেশ করবে। অক্সিজেনের অভাবে মাথা ভার ভার লাগছিল ও শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। আমি থাকতে না পেরে গভীর রাতে কটেজের দরজা খুলে দিলাম আর ছেলেকে নিয়ে আমার হাসব্যান্ড বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো। মেয়ে ও হাসব্যান্ডের তেমন কোনো সমস্যা হয়নি।

পরের দিন খুব সকালবেলাই ফ্রেশ হয়ে সকালের নাস্তা সেরে ৮:৩০টার মধ্যে প্যাংগং লেক ত্যাগ করলাম। কারণ খুব কষ্ট হচ্ছিল আমাদের সবার বিশেষ করে আমার ও আমার ছেলের। প্যাংগং লেকের সকালের দৃশ্যটাও অপরূপ।

উদ্দেশ্য লেহ শহরে ফিরে যাওয়া। ফেরার পথে আরও বেশ কিছু দর্শনীয় স্থান দেখলাম। চেংলা পাস, সিন্ধু ঘাট, সী রয়েল প্যালেস, ড্রুক হুয়াইট লোটাস স্কুল ও রেনচো স্কুল। রেনচো স্কুলে থ্রি ইডিয়টস ছবির শুটিং হয়েছিল। সবকিছু দেখে লেহ শহরে পৌঁছলাম ৫:৩০টার সময়। হোটেলে না গিয়ে লেহ মার্কেটে ঢুকলাম। প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র কিনে কফি খেয়ে ঘুরাঘুরি করে হোটেল হিল টাউনে ফিরে গেলাম ৭:০০টার মধ্যে। রাতের খাবার হোটেলেই খেলাম।

পরের দিন অনেক অনেক অভিজ্ঞতা ও ভুরি ভুরি স্মৃতি নিয়ে ফিরে আসলাম বিমানে করে লেহ থেকে দিলি এবং দিলি থেকে নিজ মাতৃভূমি বাংলাদেশে। মোট ৪ রাত ৫দিনের ভ্রমণ ছিল। আমরা গিয়েছিলাম ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে। সকালের নাস্তা ও রাতের খাবার মিলিয়ে জনপ্রতি খরচ পড়েছে ৩০ হাজার টাকা। দুপুরের খাবার ও বিকালের নাস্তা নিজেদের। কেউ যদি যেতে চান অবশ্যই প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও বেশি করে গরম কাপড় নিয়ে যাবেন। ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে যাওয়াই ভালো। কারণ সীমান্তবর্তী দুর্গম পার্বত্য এলাকা লাদাখ। অনেক জায়গায় যাওয়ার জন্য অনুমতির প্রয়োজন হয়। এজেন্সি আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করে রাখে। লাদাখ ভ্রমণের উত্তম সময় হলো জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। শীতের সময় লাদাখ বরফের চাদরে ঢাকা থাকে। তাই সেই সময় না যাওয়াই ভালো। লাদাখে বৃষ্টিপাত হয়না বললেই চলে। তাই গাছপালাও তেমন নেই। আর এজন্যই অক্সিজেনের পরিমাণ কম। তাই যারা সুস্থ দেহের অধিকারী তারাই শুধু লাদাখ যাওয়ার পরিকল্পনা করবেন, অন্যরা নয়॥

দেখে এলাম ত্রেনতো

দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ

স্বপ্নের দেশ ইতালী আসার মাত্র সাত মাস পার হতেই আমি হাতে পেলাম ইতালীর 'সৌজন্য (ইতালীতে বৈধ ভাবে থাকার ও কাজ করার কার্ড)। সৌজন্য পাবার পূর্বে প্রতিদিন মাত্র ৩ ঘন্টা করে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি এবং সে সময় শনিবার রবিবার কোথাও বেড়াতে যাওয়া খুব কঠিন হতো না। ইতালীর প্রথম ৬ মাসে ৩ বার মিলান, ২ বার পাদুভা, ফিনেন্স ও পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ভাসমান শহর ভেনিস বেড়ানোর সুযোগ হয়। কিন্তু সৌজন্য পাবার সাথে সাথে মা-মারীয়ার বিশেষ আশীর্বাদ ও আমার হেনরী দা'ও দিদির ঐকান্তিক সহযোগিতা ও প্রচেষ্টায় বাসার একদম পাশে এক মেটাল ফ্যাক্টরীতে কাজ পেয়ে গেলাম। শুরু হয় সকাল ৮ হতে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ব্যস্তময় কর্মময় জীবনযুদ্ধ। সাপ্তাহিক ছুটি শনিবার ও রবিবার।

প্রতিদিনের রুটিন মাফিক ৮ ঘন্টা + ওভার টাইম কাজ। শনিবার ও রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি। ৫ এপ্রিল দিনটি ছিল শনিবার। তখনও ইতালীতে ভীষণ শীত। বিকেল ৪ টায় বলোনিয়া হতে ত্রেনতোর পথে যাত্রা শুরু হলো প্রাইভেট গাড়িতে। আমাদের সাথে আমাদের এক আত্মীয়ের পরিবারও ত্রেনতোর পথের সাথী হলেন। এটা আমার প্রথম ত্রেনতো যাওয়া ।

ইতালীর উত্তরে অবস্থিত ত্রেনতো শহর। বলোনিয়া হতে ত্রেনতোর দূরত্ব ২৩২ কিলোমিটার। এই গোছানো সুন্দর শহরটি গড়ে উঠেছে বিখ্যাত আদিজ নদীর তীর ঘেষে। এই শহরের জনসংখ্যা মাত্র ১,১৮,০৪৮ জন। এই শহরের মধ্যে রয়েছে বিখ্যাত ত্রেনতো বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন দেশ হতে পড়াশোনার জন্য ভালো স্কলারশিপ দিয়ে থাকেন। শহরটি প্রকৃতির সীমাহীন ছোট বড় পাহাড় পর্বত দিয়ে ঘিরে রাখা এক দৃষ্টিনন্দন শহর। ত্রেনতো শহর বিখ্যাতর কারণ, এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা, বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। এখানে বিদ্যমান বড় বিশ্ববিদ্যালয়, সেন্টার, যাদুঘর ও ক্যাথেড্রাল। আমাদের ২টা গাড়ি ত্রেনতোর পথে চলা শুরু করলো। তখন রৌদ্র উজ্জ্বল এক পড়ন্ত বিকেল । শীতের বাতাস গায়ে লাগছে। চারিদিকে সবুজের মেলা। গাড়ি বলোনিয়ার গেটে যথারীতি টোল দিয়ে মদেনা ডিরেকশনে পা বাড়ালো। রাস্তার দু'পাশে সারি সারি লম্বা লম্বা গাছগুলো যেন আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে। রাস্তার পাশে বিশাল বিশাল জমিতে আঙ্গুর ও আপেল বাগান। বাগানের ভিতর রয়েছে খামার বাড়ি। সাধারণত খামারগুলোতে মালিকগণ কর্মচারীদের নিয়ে কাজ করার সময় এখানে অবস্থান করেন এবং এখানে কৃষিকাজ ও বাগান করার সকল যন্ত্রপাতি সুরক্ষিত থাকে। একদম ফাঁকা জায়গা মনে হলো অনেক দূরে দূরে ভিলা বাড়ি গড়ে উঠেছে। কয়েকটি ভিলা বাড়ির সাথে গড়ে উঠেছে পবিত্র গির্জাঘর। বাগান, খামার বাড়ি ও গির্জাঘরের চোখ ধাঁধানো সুন্দরতা দেখতে দেখতে চলে এলাম ইতালীর মদেনা শহরে। একটি পেট্রোল পাম্পে এসে গাড়ি থামল। গাড়ি হতে নেমে সবাই একটু ফ্রেশ হয়ে কফি পানে শরীর গরম করে নিলাম।

এবার গাড়ি যাত্রা শুরু করলো ভেরোনার পথ ধরে। অদ্ভুত সুন্দর পড়ন্ত বিকেলের প্রকৃতির দৃশ্য। রাস্তার দু'পাশে শুরু হল ছোট বড় পাহাড় দেখার পাল্লা। মনে হলো, পৃথিবীর সব পাহাড়গুলো যেন ঈশ্বর এখানে গড়ে দিয়েছেন। কবি নজরুলের সেই প্রিয় গানের কলিটা তখন মনের আনন্দে গেয়ে উঠলাম, "আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায়"। পাহাড়ের সীমাহীন সবুজ প্রকৃতি এতো সুন্দর হতে পারে তা জানা ছিল না। পাহাড়ের গায়ে সুন্দর সুন্দর ছোট ভিলা বাড়ি, ফুলের বাগান ও গির্জাঘর দেখে মনে হচ্ছিল এখান থেকে যেতে। পাহাড় ও বাড়িগুলো যে রকম সুন্দর সেই সুন্দরতার লেখার সুন্দর ভাষা আমার নেই। একটু সামনে এসে চোখে পড়লো, ছোট খাল এবং সেই খালের পাড়ে বসে বেশ কয়েকজন বড়শি দিয়ে মাছ ধরছে মনের আনন্দে। একসময় দেখলাম, বিকেলের শেষ বেলার সূর্যটা একবার উঁকি দিচ্ছে আবার হঠাৎ লুকিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের আড়ালে ।

পাহাড়ের অবিরাম সুন্দরতা দেখতে দেখতে আমাদের গাড়ি প্রবেশ করলো 'রবাটো' নামক ছোট উপশহরে। এবার দেখলাম রাস্তার পাশে এক পাহাড়ের মাঝখানে সুন্দর এক ঝর্ণা প্রবাহমান। তখন মনে হলো গাড়ি থামিয়ে ঝর্ণাতে স্নান করতে নেমে পড়ি। রবার্টো পার হয়ে গাড়ি চলছে লিপ্প পথে খুব ধীর গতিতে। কারণ, লিপ্পর রাস্তা খুব সরু। রাস্তার পাশে পাহাড়ের মেলা বসেছে। লিপ্প পার হয়েই চোখে পড়লো আমাদের গন্তব্য স্থল 'ত্রেনতোর'। বিশাল সাইনবোর্ডে লেখা ইতালী ও ইংরেজি ভাষায় "ত্রেনতো শহরে আপনাকে স্বাগতম"।

তখন আমাদের সবার মন আনন্দে ভরা। মিনিট দশেকের মধ্যে চলে এলাম আমরা যে বাসায় বেড়াতে এসেছি সেই বাসায়। বাসার লোকেরা আমাদের পেয়ে তো আনন্দে একদম আত্মহারা। তখনও কিন্তু ইতালীতে বিকেল অর্থাৎ সন্ধ্যা ৭ টায় সূর্য তখনও অস্ত যায় নি। আমরা সবাই ফ্রেশ হলাম। তারপর আমাদের জন্য তৈরি করা মাতৃভূমি বাংলাদেশী নানা প্রকার পিঠা, পায়েস। পেট ভরে খেলাম। সন্ধ্যা ৮ টায় আমারা ত্রেনতো শহর ঘুরতে যাওয়ার জন্য বাসা হতে বের হলাম। ত্রেনতো শহর ভীষণ ছিমছাম ও গোছানো শহর । আমরা দেখলাম শহরের একটু দূরে দূরে হোটেল, বার, পার্ক ও গির্জাঘর। তখন শহরের ল্যাম্পপোষ্টের লাইটগুলো জ্বলে উঠছে। আমরা শহরের সুন্দরতা দেখতে দেখতে চলে এলাম ত্রেনতোর অদ্ভুত সুন্দর 'লগো দি কলদোনজা ত্রিলাকয় বিশাল খাল ঘেষা এই স্থান। এখানকার জল একদম নীল। রাতের আলোতে লেকের সুন্দরতায় নিজেকে যেনো হারিয়ে ফেললাম। আমরা সবাই লেকের এক রেঁস্তোরা ইতালীর বিখ্যাত ম্যাগডোনালসে রাতের ভূরিভোজে অংশ নিয়ে পেটভরে খেলাম ও গল্পে গল্পে সময় কাটালাম। রাত এগারোটায় সবাই বাসায় এসে ফ্রেশ হয়ে বিছানায় চলে গেলাম ।

রাতেই পরিকল্পনা করা হয় সকালে সবাই নাস্তা করে ত্রেনতোর বিখ্যাত ক্যাথেড্রালে সকাল ৯ টার পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করবো। যেই কথা সেই কাজ। নাস্তা করে তিন গাড়ি করে আমরা রবিবার খ্রিস্টযাগে অংশ নিতে বাসা হতে বের হলাম । শহরের মধ্যে অবস্থিত সবুজ প্রকৃতির বেষ্টনীর মধ্যে গড়ে উঠা বিশাল সুন্দর ত্রেনতো ক্যাথেড্রাল। ক্যাথেড্রালের ভিতর কি যে সুন্দর চারুকলার কাজে গড়া, তা না দেখলে বিশ্বাস হবে না। প্রায় ৫ জন যাজক একসাথে ক্যাথেড্রালে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করলেন। ক্যাথেড্রাল এরিয়ার মধ্যে খেলার মাঠ, কমুনিটি সেন্টার সব ঘুরে দেখলাম। এরপর আমরা রওনা হলাম ত্রেনতোর বিখ্যাত বিজ্ঞান যাদুঘর পরিদর্শনে। বিশাল সুন্দর যাদুঘর। ইতালীর অনেক ঐতিহাসিক স্থাপত্য শিল্পের সমহারে যাদুঘর ভর্তি।

যাদুঘর হতে বের হয়ে আমরা রওনা হলাম ত্রেনতোর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের পথে। চলে এলাম দ্রুত সময়ে বিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায়। চারিদিকে সবুজের ছায়ানীড়ে গড়ে উঠা সুন্দর বিশ্ববিদ্যালয়। জানতে পারলাম, বিজ্ঞানের জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে অনেকে চলে আসেন লেখাপড়া করতে। তখন ঘড়িতে দুপুর ২ ঘটিকা। পেটে ক্ষুধা পেয়েছে আবার বিকালে বলোনিয়ার পথে রওনা হতে হবে। তাই ফিরে এলাম আত্মীয়র বাসায়। ফ্রেশ হয়ে বাংলাদেশী বিভিন্ন রান্নায় সবাই ভীষণ তৃপ্তি নিয়ে খেলাম। খাবার পর ক্ষণিকের বিশ্রাম ।

তখন বিকেল ৪:৫০ মিনিট। বিদায়ী কফি পান করে সবাই সবার কাছ হতে বিদায় নিলাম। তখন আনন্দের মধ্যেও মন একটু খারাপ। তারপর একে একে দুই গাড়িতে চড়ে বসলাম। চারিদিকে সবুজের পাহাড় দিয়ে ঘেরা খোলা নীল আকাশ সীমানায় প্রকৃতির সকল অদ্ভুত, অফুরন্ত সুন্দরে ভরা ত্রেনতোর একদিনের অনেক সুন্দর স্থান দেখা, অভিজ্ঞতা অর্জন অতিথেয়তার সুন্দর সব স্মৃতির পাতায় গেঁথে রেখে আমাদের গাড়ি ধীরে ধীরে রওনা হলো, সেই নিত্যদিনের চিরচেনা ব্যস্তময় ও কর্মময় শহর বলোনিয়ার পথ ধরে॥

ঘুরে এলাম দার্জিলিং

মাইকেল ডেরিক গমেজ

২৪ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ আমার জন্য একটি স্মরণীয় দিন। জীবনে প্রথম বারের মত আকাশ পথে দেশের বাইরে ভ্রমন করতে দার্জিলিং যাচ্ছি। রানাঘাট থেকে রাতের বাসে শিলিগুড়ির উদ্দেশে যাত্রা করি। শিলিগুড়ি হতে জিপ ভাড়া করে দার্জিলিং এর উদ্দেশে যাত্রা শুরু হয়। যাত্রা পথে পাহাড়ী আঁকা বাঁকা রাস্তা, মেঘে ঢাকা পাহাড়, বন, চা বাগান, পাইন গাছের বাগান, মাঝে মাঝে বৃষ্টি, আবার কোথাও মেঘের মধ্যদিয়ে চলা, পাহাড়ের ঢালে মানুষের বসতি সে এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়।

দার্জিলিং হল ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটি শহর। এই শহরটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬,৭০০ ফুট (২,০৪২.২ মি) উচ্চতায় অবস্থিত। শহরটি চা শিল্পে, বিশ্বের তৃতীয় উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য ও ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের জন্য খ্যাত একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। দার্জিলিং হিমালয়ান রেল এই শহরকে সমতলের সঙ্গে যুক্ত করেছে। ভারতের যে অল্প কয়েকটি বাষ্পচালিত ইঞ্জিন এখনও কার্যকরী, তার মধ্যে কয়েকটি এই রেলের অন্তর্গত।

দার্জিলিং নামটির উৎপত্তি তিব্বতি শব্দ দোর্জে ও লিং শব্দ দু-টি থেকে।

দার্জিলিং শহরে হিমালয়ের পাহাড়ী অঞ্চলের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া বিরাজ করে। বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ১৫.৯৮ ক্বসে (৬০.৭৬ ক্বফা) ও গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮.৯ ক্বসে। এই শহরে প্রতি বছর গড়ে ১২৬ দিন বৃষ্টিপাত হয় ও বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩০৯.২ সেমি (১২১.৭ ইঞ্চি)। জুলাই মাসে সর্বাধিক বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকে। আমরা যখন ছিলাম তখনও শীতের প্রকোপ বেশ ছিল। মনে হয়েছিল মাঘের শীতের মধ্যে আছি। মাঝে মধ্যে মেঘরাশি এসে আমাদের সামনে হাজির হয়ে আমাদের চলার পথ আটকে দিতো মনে হতো মেঘ আমাদের সাথে লুকোচুড়ি খেলছে। বেশ ভালই ছিলাম শীতের আমেজ নিয়ে। দার্জিলিং-এ দুটি শীর্ষ পর্যটন ঋতু রয়েছে, সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর এবং এপ্রিল থেকে মে।

চৌরাস্তা (ম্যাল রোড, চক বাজার, নেহেরু রোড ও জাকির হোসেন রোডের সংযোগস্থল) হল একটি জনপ্রিয় কেনাকাটা এবং জমায়েতের এলাকা যেখানে একজন পর্যটক রঙিন এবং দেহাতি স্থানীয় পোশাক পড়ে তাদের ছবি তুলতে পারেন।

দার্জিলিং হিমালয়ান রেল (DHR) দ্বারা দার্জিলিং পৌঁছানো যায় যা শিলিগুড়ি থেকে ৮৮ কিলোমিটার (৫৫ মাইল) দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করে। বাষ্পীয় ইঞ্জিন দ্বারা চালিত, এটি প্রতি ঘন্টায় ২০ কিলোমিটার (১২ মাইল) থেকে ২৫ কিলোমিটার (১৬ মাইল) গতিতে চলে। যদিও সেবাটি ১৯ শতকে শুরু হয়েছিল মানুষ এবং মালবাহী বাহনকে দক্ষতার সাথে স্থানান্তর করার জন্য। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কো দার্জিলিং হিমালয়ান রেলকে বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত করে।

দর্শনীয় স্থানসমূহ যা আমি ঘুরে দেখেছি

- পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুওলজিক্যাল পার্ক :

(দার্জিলিং চিড়িয়াখানা হিসাবেও পরিচিত) হচ্ছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের দার্জিলিং এ ৬৭.৫৬একর (২৭.৩ হেক্টর) স্থানজুড়ে অবস্থিত একটি চিড়িয়াখানা। চিড়িয়াখানাটি ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে চালু করা হয় এবং ৭,০০০ ফুট(২,১৩৪ মিটার) উচ্চতায় অবস্থানের কারণে ভারতের সর্বোচ্চ উচ্চতায় অবস্থিত চিড়িয়াখানা হিসাবে প্রসিদ্ধ। চিড়িয়াখানাটিতে প্রতিবছর প্রায় ৩,০০,০০০ দর্শনার্থী আসেন। পার্কটির নাম সরোজিনী নাইডুর মেয়ে পদ্মাজা নাইডু (১৯০০-১৯৭৫) এর নাম অনুসারে রাখা হয়। এই চিড়িয়া খানায় লাল পান্ডা, তুষার চিতা, তিব্বতীয় নেকড়ে সহ পূর্ব হিমালয়ের প্রচুর বিপদগ্রস্ত ও বিলুপ্ত পক্ষী ও প্রাণীদের দেখতে পাওয়া যায়।

- বঙ্গল ন্যাচারাল হিস্টোরি মিউজিয়াম: এই জাদুঘর গাছপালা ও পশুপাখিদের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে তা তৈরী করা হয়েছে।
- হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট : হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট (এইচএমআই) বিশ্বের অন্যতম প্রধান পর্বতারোহণ ইনস্টিটিউট। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ নভেম্বর ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু অন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, প্রয়াত তেনজিং শেরপা ও স্যার এডমুণ্ড হিলারি এভারেস্টের প্রথম সফল আরোহণকারী। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রধান পর্বতারোহণ ইনস্টিটিউট হওয়ায় এইচএমআইকে ভারতীয় পর্বতারোহণের মক্কাও বলা হয়। ইনস্টিটিউটের একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি রয়েছে এবং বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার মানুষকে পর্বতারোহণ এবং জোটবদ্ধ অ্যাডভেঞ্চার ক্রিয়াকলাপে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- ঘুম বৌদ্ধ মনেস্ট্রিঃ এটি এই অঞ্চলের সর্ববৃহৎ মনেস্ট্রি।
- জাপানি বুদ্ধ মন্দির
- শান্তি প্যাগোডা
- রক গার্ডেন-অবিরত পাহাড় থেকে ঝর্নার পানি নির্গত হচ্ছে যা প্রাকৃতিক পরিবেশ কে আরো মনোরম করে তুলছে।

ম্যাল রোড সংলগ্ন অবস্থান:

- অবজার্ভেটরি হিল : ধীরধাম মন্দির এবং বৌদ্ধ সংরক্ষণালয় এই পর্যবক্ষেণ পাহাড়ের উপর অবস্থিত।
- উইন্ডামেয়ার হোটেল
- কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ পয়েন্ট যা ঘন মেঘের জন্য দেখা যায়নি ।
- সেন্ট অ্যাণ্ড্রু চার্চ
- মহাকাল মন্দির॥

স্মৃতিচারণ

মধুর ভান্ডার

ডেভিড স্বপন রোজারিও

"দেখা হয়নি চক্ষু মেলিয়া,
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া।"

অনেক সাধ-সাধ্য থাকা সত্ত্বেও কিন্তু জাতির পিতা 'বঙ্গবন্ধুর সমাধি' দেখতে যেতে পারিনি। যাঁর বজ্রকণ্ঠের আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়ে, হাজার হাজার মানুষ, দেশকে শত্রুমুক্ত করতে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। সেই মহান নেতার সমাধি দেখার জন্য এবার দারুণভাবে সংকল্পবদ্ধ ছিলাম। কেবলমাত্র কি তাই? স্বপ্নের পদ্মাসেতু দেখার আগ্রহও ছিল প্রচুর।

৯ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে, সকাল সকাল আত্মীয় স্বজন মিলে একটি মাইক্রোবাস ভাড়া করে, 'টুঙ্গিপাড়ার' উদ্দেশে রওনা হলাম। বিশাল পদ্মাসেতুতে এসে মোহমুগ্ধ হয়ে পড়লাম। এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য, প্রচুর ছবি তুললাম। রূপসী পদ্মার ভয়ঙ্কর রূপ দেখে অভিভূত হয়ে পড়লাম। চারিদিকে নদীবক্ষে নৌকা চলাচলের দৃশ্য, পণ্যবাহি বড় বড় জাহাজ, মৎস্যজীবীদের আনাগোণা এবং স্পিডবোটের যত্রতত্র ছোটাছুটি দেখতে ভালোই লাগছিল।

ভাবতে অবাক লাগে, প্রমত্তা পদ্মার বুকে নির্মিত এই নান্দনিক স্থাপত্যশৈলী বাস্তবায়নের জন্য প্রায় দুই দশক, বহুমুখী প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে হয়েছে। জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্মিত এই সেতুর বাস্তবায়নের কৃতিত্বের দাবিদার বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা।

পদ্মাসেতু আজ বাস্তব সত্য। ফলে দেশের এক তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড প্রথমবারের মত সড়কপথে সরাসরি যুক্ত হলো পুরো দেশের সাথে। অর্থনৈতিক সুবাতাস পৌঁছে যাবে ঐ এলাকার অন্তত পাঁচকোটি মানুষের ঘরে ঘরে।

পদ্মাসেতু জনগণের অর্থে নির্মিত হয়েছে, সুতরাং এর মালিক জনগণ। এই সেতু এখন আপামর বাঙালির আত্মপ্রত্যয়, মর্যাদা ও গর্বের প্রতীক। এই অর্জন পুরো বাঙালি জাতির। বিশ্বের সবচেয়ে খরস্রোতা ও প্রায় অতলস্পর্শী গভীর নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করে নতুন করে, নিজেদের জাত চিনিয়েছে 'বীর বাঙালি'। নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতের উন্নত বাংলাদেশ গড়ার পথে বিরাট এক মাইলফলক হয়ে থাকবে।

আমরা দুপুরের কিছু আগে বঙ্গবন্ধুর জন্মস্থান গোপালগঞ্জ টুঙ্গিপাড়া গ্রামে এসে পৌঁছলাম। যেখানে তিনি ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ১৭ মার্চ একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

গাড়ি থেকে নেমে একটি অতিপ্রাচীন অট্টালিকার দিকে এগিয়ে গেলাম। নিরাপত্তারক্ষী বললো, "এটি শেখ পরিবারের ঐতিহ্যবাহী আদিবাড়ী।" প্রায় দুইশত বছরের পুরনো বাড়িটা সংস্কার করা হয়েছে। বিশাল একটি সাইনবোর্ড বাড়ির পাশে ঝুলানো। যেখানে বঙ্গবন্ধুর, বাবা -মা'র সাথে বেশ বড় বড় কয়েকটি অন্তরঙ্গ ছবি। যার পাশেই বঙ্গবন্ধুর অকপট স্বীকারোক্তি উল্লেখ আছে, যা নিম্নরূপ-

"আব্বা আমাকে একটা কথা বলেছিলেন, "বাবা, রাজনীতি কর; আপত্তি করবো না। একটা কথা মনে রেখ- 'Sincerity of purpose and honesty of purpose থাকলে জীবনে পরাজিত হবে না।' একথা কোনদিন আমি ভুলি নাই। "সূত্র: অসমাপ্ত আত্মজীবনী পৃঃ ২১

বঙ্গবন্ধু আরো বলেছিলেন-

"..... আমার জন্ম হয় এই টুঙ্গিপাড়া শেখ বংশে। শেখ বোরহানউদ্দিন নামে এক ধার্মিক পুরুষ এই বংশের গোড়াপত্তন করেছেন বহুদিন পূর্বে। শেখ বংশের যে একদিন সুদিন ছিল, তার প্রমাণস্বরূপ মোঘল আমলের ছোট ছোট ইটের দ্বারা তৈরি চকমিলান দালানগুলি আজও আমার বাড়ির শ্রী বৃদ্ধি করে আছে। বাড়ির চার ভিটায় চারটি দালান। বাড়ির ভিতরে প্রবেশের একটা মাত্র দরজা, যা আমরাও ছোট সময় দেখেছি, বিরাট একটা কাঠের কপাট দিয়ে বন্ধ করা যেত। একটা দালানে আমার এক দাদা থাকতেন। এক দালানে আমার মামা আজও কোন মতে দিন কাটাচ্ছেন। ...এই বংশের অনেকেই এখন এ বাড়ির চারপাশে টিনের ঘরে বাস করেন। আমি এই টিনের ঘরের এক ঘরেই জন্মগ্রহণ করি।...আমাদের বাড়ির দালানগুলির বয়স দুইশত বৎসরেরও বেশি হবে।" (সূত্র: অসমাপ্ত আত্মজীবনী পৃঃ ৩)

নিরাপত্তারক্ষীদের প্রধানের সহযোগিতায়, প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাংশে ঘুরে ঘুরে দেখলাম। অনেক অজানা ইতিহাস ভদ্রলোক আমাদের কাছে তুলে ধরলেন। এরপর আমরা এলাম সেই 'হিজলতলা', যেখানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা গোসল করতেন। আজও ক্ষয়ে যাওয়া শান বাঁধানো ঘাটটি আছে।

সময়ের প্রেক্ষাপটে পুরোপুরি হারিয়ে গেছে, ঐতিহ্যবাহী মধুমতী নদীর পূর্বরূপ। কচুরিপানা ও 'মুথা' গাছে (সুগন্ধি শেকড়যুক্ত তৃণবিশেষ) ভরে গেছে চারিপাশ। তারি মাঝে 'মধুমতী নদী'র স্রোতধারা রিমঝিম শব্দে বয়ে চলেছে। আর এই স্মৃতিবিজড়িত মধুমতী নদীর তীরে, জাতীর জনক বঙ্গবন্ধুর সমাধি অবস্থিত। আর ঠিক পাশেই একটি কৃত্রিম ঝর্ণার নীচে, শ্বেত পাথরের উপর খোদাই করে লেখা এক অমর গাঁথা-

"যতদিন রবে পদ্মা-যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান,
ততদিন রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।।"

সমাধির প্রধান ফটকের সামনে বামপাশের ভবনটি ছিল তার পিতামাতার বাড়ি। ডান পাশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশাল সমাধি সৌধ, যিনি ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট নিহত হন।

সমাধি সৌধটি সুন্দরভাবে পরিকল্পিত কাঠামোর অধীনে আবৃত। প্রত্যেককে সমাধির ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোন ছবি তোলার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

কমপ্লেক্স সুসংগঠিত স্থানে, যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য স্থাপনাগুলো রয়েছে তার মধ্যে একটি জাদুঘর রয়েছে যেখানে পর্যটকরা শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের অনেক ঐতিহাসিক জনপ্রিয় এবং দুর্লভ আলোকচিত্র দেখতে পাবেন। সারাবিশ্বের মহান নেতাদের অন্তরঙ্গ মুহূর্তেরও ছবি, অত্যন্ত যত্নসহকারে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। জাদুঘরের পাশেই একটি ছোট্ট লাইব্রেরীও রয়েছে। দেশ-বিদেশের সব প্রখ্যাত কবি সাহিত্যিকদের বই থরে থরে সাজানো রয়েছে। বিদগ্ধ পাঠকদের জন্য সাহিত্য চর্চার সুবন্দোবস্ত আছে। ক্ষুধার্ত দর্শকদের জন্য ক্যাফেটেরিয়াও আছে। সমাধির পাশেই শেখ মুজিবুর রহমানের পিতা মাতা শেখ লুৎফর রহমান ও সায়েরা খাতুনের কবর রয়েছে।

আমরা সব স্থান ঘুরে একটি খোলা চত্বরে বের হয়ে এলাম। বেশ কতকগুলো বইয়ের দোকান। 'টুঙ্গিপাড়া স্টোর' থেকে দুটো বই কিনলাম; একটি বঙ্গবন্ধু অসমাপ্ত আত্মজীবনী, অপরটি কারাগারের রোজনামচা।

সমাধি পরিদর্শনের সময়সূচী=
= গ্রীষ্মকালীন (মার্চ- আগস্ট)
৯:০০টা হতে ৬:০০ টা পর্যন্ত
= শীতকালীন (সেপ্টেম্বর - ফেব্রুয়ারি)
৯:০০ টা হতে ৫:০০ টা পর্যন্ত
আমরা পড়ন্ত বিকেলে একরাশ মধুর স্মৃতি

রোমন্থন করতে করতে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। চমৎকার পিচঢালা পথ, গাড়ি দ্রুত বেগে ছুটে চলেছে। আমরা যখন পদ্মাব্রীজ পাড়ি দিচ্ছিলাম, তখন চারিদিকে অন্ধকার ঘনিভূত হয়ে আসছে। ব্রীজের উপর সারিবদ্ধ আলো জ্বলে উঠেছে। আলোকোজ্জ্বল ব্রীজের যে মনোরম দৃশ্য দেখলাম, তা কিন্তু কখনো ভোলার মত নয়। পুঁতির মালার মতো সমগ্র পথকে আলোকিত করে তুলেছিলো। এ অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে, আমার ভাগিনী মেঘনা গলা ছেড়ে গান ধরলো-

"আলো আমার, আলো ওগো,
আলোয় ভুবন ভরা,
আলো নয়ন ধোওয়া আমার
আলো হৃদয় হরা।।"

আমরাও ওর সাথে কণ্ঠ মিলালাম।

পরদিন সকালে আনন্দচিত্তে, মনিপুরীপাড়ায় এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছিলাম, যা দেখেছি, যা শুনেছি সেই অমূল্য স্মৃতি সহভাগিতার জন্য। পথে, নিরব শ্যামুয়েল গমেজের সাথে দেখা। নিরব অত্যন্ত সহজ সরল একটি ছেলে। দীর্ঘদিন আমার সাথে একসঙ্গে সমাজসেবা করেছে, খুব কাছ থেকে আমার কাজের পদ্ধতি ও সাংগঠনিক কার্যক্রম দেখেছে। একটি নির্ভেজাল চরিত্র। দোষের মধ্যে একটি- সে অনর্গল কথা বলতে পারে। সৎ ও পরোপকারী হিসেবে সে সবার কাছে প্রিয় মুখ। তবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে একটি প্রতিবাদী কণ্ঠ। ওকে দেখলেই মনের মধ্যে 'শপথ বাণী' গুনগুনিয়ে ওঠে- "যাহা বলিব, সত্য বলিব, সত্য বই মিথ্যা বলিব না।"

তার এই সদ্‌গুণের জন্য আমি তার নাম দিয়েছিলাম, 'সত্যবাদী'। গলির মুখে আমাকে দেখে ভূত দেখার মত সে চমকে উঠলো। আবেগে আপ্লুত হয়ে গদগদ কণ্ঠে বললো,

- দাদা, কবে এসেছেন?

বললাম- প্রায় পনেরো দিনের মতো হবে।

- বলেন কি! এতোদিন হয় এসেছেন, আমি কোন খবর পেলাম না। আর কিছু কুশল বিনিময়ের পর, মনিপুরিপাড়ার ব্যস্ত রাস্তার একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বলতে লাগলো-

জানেন দাদা, দেশেতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে 'হরিলুটের' রাজত্ব চলছে। কিছু নেতার অর্থলিপ্সু আচরণের জন্য সমাজের বেহাল অবস্থা হয়েছে। দিন দিন প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। নানা প্রকল্পের নামে বিশাল অংকের কারচুপি চলছে, সাধারণ সদস্যদের চোখের আড়ালে-আবডালে। ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে, এমনকি নিজেদের অন্যায়ভাবে গোপনে অর্থ আত্মসাতের নানা ঘটনা ধামাচাপা দিতে, নিজেদের পক্ষের লোকেদের ক্ষমতায় বসিয়ে 'রামরাজত্ব' চালাচ্ছে। আমরা এদের অবৈধ অর্থের কাছে বারবার পরাজিত হচ্ছি। সমস্ত স্থানে নিজেদের দুষ্কর্ম ঢাকতে অর্থ দিয়ে মুখ বন্ধ করে রেখেছে। আমরা আপনার এবং সুবাসদা (সুবাস সেলেস্টিন রোজারিও) এর সাথে জনগণের সেবা দিয়ে যে সততা ও গৌরব অর্জন করেছিলাম, আজ এদের কারণে, আমাদের খ্রিস্টান সমাজের এতদিনের সুনাম ও ঐতিহ্য নানা কোট কাচারি করে, ধুলিস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে। আপনারা আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসুন। কথাগুলো বলতে বলতে সে হাঁফিয়ে উঠলো। সে থামতেই আমি মুচকি হেসে বললাম-

আমি দেশে থাকলে কিন্তু এদেরই সমর্থন করতাম। জিজ্ঞেস করতে পার - কেন? আজ যদি আমি তাদের সব কাজে ভূয়সী প্রশংসা করি, সদা সবর্দা জ্বি হুজুর, জ্বি হুজুর করি, তবে সম্মানিত উপদেষ্টা হতে পারবো। যে কোন অনুষ্ঠান ও মঞ্চে আমার আসন সুনিশ্চিত এবং বক্তৃতা যতক্ষণ খুশি দাও এবং যা কিছু বল না কেন কেউ বাঁধা দেবে না। সবাই জয়গুরু জয়গুরু বলে বাহবা দেবে। তদুপরি বিভিন্ন বিলাসবহুল রিসোর্টে, যে কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের, যাবতীয় সুযোগ পাবো। আর যদি বিরেধিতা করি তবে মাত্র একটি 'অপশন'- নির্ঘাত মেম্বারশীপ চলে যাবে। কারণ কথায় বলে না- "উচিৎ কথার ভাত নেই।" এসব লোভনীয় সুযোগ হাতছাড়া করতে অনেকে চায় না। এখন বলো, কোনটা ভালো, লেজুরবৃত্তি করা, নাকি বিরোধিতা করে নিজেকে সৎ সাব্যস্ত করতে সুযোগগুলো হাতছাড়া করা?

তীব্র ঘৃণায় ও বিস্ময়ে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ফোরিত নেত্রে চিৎকার করে সে বললো:-

- "ছি দাদা। ছি ছি ছি। যাকে আমার আদর্শ বলে সারা জীবন ভেবে এসেছি, তার মুখে এই কথা" বলেই পিছন ফিরে হন হন করে হাঁটতে লাগলো। আমি এই যে ডাকতে থাকলাম, "নিরব, নিরব" কিন্তু কে শোনে কার কথা। ও ছুটছে, আমিও ওকে ধরার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি। সেলেসিয়ান সম্প্রদায়ের সিস্টারদের কনভেন্টের সামনে দিয়ে সুজন আসছিল, আমি বললাম, "নিরবকে ধর"। সুজন ওকে জাপটে ধরলো। সে কোনমতেই আমার সাথে কথা বলবে না।

যা হোক, শেষে নিরবকে একরকম জোর করেই ধরে এনে, আওলাদ হোসেন মার্কেটে, 'বিক্রমপুর মিষ্টান্ন ভান্ডারে' এসে বসলাম। আমি এখান থেকে বেশ কয়েকদিন ধরে মিষ্টি কিনছি, মাঝে মাঝে মিষ্টির গুনাগুণ নিয়ে তারিফও করি, সে সুবাদে মালিক মোটামুটি আমাকে চিনে রেখেছে।

বললাম- ভাই আমাদের বগুড়ার দই ও পোড়াবাড়ির চমচম দিন।

ভদ্রলোক মুচকি হেসে বললেন - "দাদা আপনি যা চাচ্ছেন, এখন তা ধরা ছোঁয়ার বাইরে, মুক্তাগাছার মন্ডা, কুমিল্লার রসমালাই, নাটোরের কাঁচাগোল্লা, যশোরের জামতলার রসগোল্লা, বিক্রমপুরের ছানা ইত্যাদি আজ সব গালগল্প। অনেক দোকানদার, খদ্দের টানার জন্য বানিয়ে বানিয়ে বলবে। কিন্তু সেই ঐতিহ্যবাহী কারিগর কই? সে আবারও হেসে বললো- 'হাজির বিরিয়ানী'র নাম শুনেছেন?

বললাম- "হ্যাঁ।" বিমানের গাড়ি করে পুরাতন শহরে বন্ধুরা সব ছুটে যেতাম।

আজ হাজারো দোকান হয়েছে, হাজির বিরিয়ানী নামে। সবাই এ নামে চুটিয়ে ব্যবসা করছে। সেই রামও নেই, সেই অযোধ্যাও নেই। সব ফুসফাস, যে যেভাবে পারছে, দু'পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে আর কি!

দই মিষ্টি খেতে খেতে নিরবকে বললাম, "আরে পাগল, ওই কথাগুলো আমার মনের কথা নয়। সারাটা জীবন সৎভাবে থাকতে চেয়েছি এবং থেকেছিও। ছোটবেলায় একদিন সান্ধ্য প্রার্থনায় বাবা বলেছিলেন- জীবনে যদি সত্যিকারের মানুষের মত মানুষ হতে চাও, তবে তিনটি কথা মনে রাখবে- 'শ্রদ্ধাশীল হও', 'সময়নিষ্ঠ হও' এবং 'সত্যবাদী হও'-তবেই তুমি জীবনের সব ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করতে পারবে।"

আমি আর সুবাসদা সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে, কিভাবে অন্যায়-অবিচার-দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো! দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণকে তোমাদেরই জাগিয়ে তুলতে হবে। এরা সোচ্চার হলে কুচক্রীরা পালানোর পথ পাবে না। এরাই একযোগ হয়ে একদিন বলবে-

"দড়ি ধরে মারো টান
রাজা হবে খান খান।"

সুবাসদা প্রায়শই একটি প্রবাদ বাক্য বলতেন, "You can run but you cannot hide from the truth" আর তুমি বললে না, এরা সাধারণ সদস্যদের কষ্টের জমানো অর্থ লুটপাট করছে। তুমি শোননি,

"শ্বশুড় বাড়ি মধুর হাড়ি
যত পাবি তত খাবি।"

এ মহামন্ত্রে এরা দীক্ষিত। তবে একটা কথা মনে রেখো, সব সময় সব দিন কিন্তু সমান যায় না। সুশীল সমাজ ও সৎ আদর্শবান নেতা কর্মীরা একবার যদি জেগে ওঠে তবে এরা পালানোর পথ পাবে না। চোরেরা কখনো আদর্শ সমাজ গড়ার কারিগর হতে পারে না, কারণ এদের নজর থাকে সর্বদা 'তহবিলের দিকে'। এক জীবনের গল্প বলি শোন- "একদিন একটি পাখি সহানুভূতির সুরে মৌমাছিকে প্রশ্ন করলো-

"এতো কঠিন পরিশ্রম করে তোমরা মধু তৈরি করো, কিন্তু মানুষ সেই মধু চুরি করে, এতে

তোমার কষ্ট হয় না।"

মৌমাছির উত্তর, "না, কষ্ট হয় না। কারণ মানুষ শুধু আমাদের মধুই চুরি করতে পারে, আমাদের কৌশল নয়।"

ঠিক তেমনি কেউ হয়তো তোমার অর্জিত সম্পদ চুরি করবে, কিন্তু তোমার সত্ত্বা চুরি করতে পারবে না। তাই জীবনে যতবারই কিছু হারাবে, আবার নতুন করে গড়বে। তোমার সত্ত্বাই তোমার আসল সম্পদ। সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে এ চিন্তা করলে, কেউ প্রতিবাদ করতে পারবে না। স্বার্থত্যাগ করতে হবে।

সব কথা শোনার পর, নিরব আমাকে জড়িয়ে ধরলো এবং প্রচণ্ড আবেগে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললো, "দাদা আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমি আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম। কিন্তু এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কি দাদা?"

- "অন্যায়ের কাছে কোন দিন মাথা নত করবে না। যত বাঁধা বিপত্তি আসুক না কেন, নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে হবে। বলতে গেলে লজ্জাও লাগে, আবার দ্বিধাও লাগে। টাকার কাছে সমস্ত বিবেক বিক্রি হয়ে গেছে। তোমরা একবার ব্যর্থ হবে, আবার উঠে দাঁড়াতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সাফল্য একদিন আসবেই আসবে।

দেখ, দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত মহান নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা কি বলেছেন, জানো?

"দক্ষতা তৈরি হয়, অভিজ্ঞতা থেকে,
আর অভিজ্ঞতা আসে, ব্যর্থতা থেকে।
তাই ব্যর্থতা, খারাপ কিছু নয়,
এটা সাফল্যের প্রথম ধাপ।"

কিছুদিন আগে ফেইসবুকে একটি লোমহর্ষক ঘটনা দেখেছিলাম। একটি বানর তার শিশু বাচ্চাকে নিয়ে বন্য নদী পাড় হচ্ছিল। হঠাৎ একঝাঁক হিংস্র কুমিরের তাড়া খেয়ে, বানরটি মাঝ নদীতে পুতে রাখা একটি খুঁটির উপর চড়ে বসে। কুমিরগুলো তাকে খাওয়ার জন্য খুঁটির চারপাশে তোলপাড় করে ফেললো।

এদিকে অপ্রশস্ত নদীর একপাশে একদল সিংহ এবং অপরপাশে একদল বাঘ ওঁৎ পেতে বসে আছে, কখন বানরটি বাচ্চা নিয়ে ডাঙায় ফিরবে, সে আশায়। বেচারা বানর নিরুপায় হয়ে ভীত সন্ত্রস্তভাবে চারিদিকে দেখছে। এই জীবন মরণ সন্ধিক্ষণে কি করবে? কখন মুক্তি পাবে এ দুঃসহ অবস্থা থেকে, কে মুক্তিদাতা হয়ে এগিয়ে আসবে তাদের উদ্ধারের জন্য, সে নিজেও জানে না। যেমন- সমাজের সাধারণ লোকেরাও জানে না কবে এ দুঃশাসন থেকে তাদের প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠানগুলো মুক্তি পাবে। কে মুক্তিদাতা? সময় ঘনিয়ে আসছে, কেবল অপেক্ষা মাত্র॥

স্মৃতিকথা

মাস্টার সুবল

পৃথিবীতে একজন লেখক তিনি অনেক কিছু লিখে থাকেন। সত্য ঘটনা তুলে ধরেন। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বা পরোক্ষভাবে অনেক কিছু লিখে থাকেন। কাল্পনিক চিন্তা ধারায় বিভিন্ন লেখা লিখে থাকেন। বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়েও লিখে থাকেন। সত্যবান লেখক কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেন না। নিজের লেখায় অন্যের সঠিক সমালোচনায় দুঃখ প্রকাশ করেন না। পৃথিবীতে একজন মানুষ, হোক সে নর বা নারী, মৃত্যুর পর তার কিছু স্মৃতিকথা থাকে। স্মৃতি কথাগুলো ইহকালে পৃথিবীতে ভাসমান অবস্থায় এবং পরকালে অনন্তকালের জন্য স্বর্গে স্থায়ী হয়ে থাকে। আমি কয়েকজন স্বর্গীয় ব্রাদারদের অল্প স্মৃতিকথা তুলে ধরছি।

ঢাকার নারিন্দা সাধু যোসেফের কারিগরি বিদ্যালয়ে বিকালে ৪৫ মিনিট করে ৩ পিরিয়ড থিউরী ক্লাশ হয়। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় ব্রাদার এন্ড্রু স্টেফাস সিএসসি ৩০ মিনিট ক্লাশে ছাত্রদের শিক্ষা দিয়ে, ছাত্রদের ক্লাশের কাজ দিয়ে, রোজারীমালা নিয়ে ক্লাশের কোনায় বসে প্রার্থনা করতেন। আমি একদিন ব্রাদারকে সাহস করে জিজ্ঞাসা করি, তিনি ক্লাশে বসে প্রার্থনা করেন কেন। ব্রাদার নরম গলায় বলেন, শোন সুবল, আমি যেন তোমাদের ক্লাশে ভাল শিক্ষা দিতে পারি এবং তোমরা যেন তা গ্রহণ করতে পার সে উদ্দেশে মা মারীয়ার সাহায্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। প্রার্থনা করি বিদ্যালয়ের সার্বিক মঙ্গলের জন্য।

বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল স্বর্গীয় ব্রাদার ডোনাল্ড বেকার সিএসসিকে প্রশ্ন করেছিলাম, ব্রাদার, মানব জাতির ৩ টি আদেশ পালনের নিয়ম বলেন। ব্রাদার বলেছিলেন, প্রথমে প্রভু পরমেশ্বরকে পূজা ও সেবা করবে, দ্বিতীয় শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তায় ডাক্তারের আদেশ পালন করবে, তৃতীয় পিতা-মাতার ভালা আদেশ পালন করবে। ব্রাদারকে বলেছিলাম, আমি ৩টি আদেশই ভালভাবে পালন করছি, তবে আপনার চিন্তাধারায় আমি কত শতকরা ভাল আছি। ব্রাদার বলেছিলেন, সুবল, তুমি শতকরা প্রায় একশত ভাগ ভাল আছ। আমি বলেছিলাম, ব্রাদার, শতকরা একশত ভাগ ভাল থাকলেতো আমি যিশু হয়ে যেতাম, তাই না? আমার কথা শুনে ব্রাদার হেসে দিয়েছিলেন।

আমি পর্যায়ক্রমে স্বর্গীয় ব্রাদার এন্ড্রু সিএসসি, স্বর্গীয় ব্রাদার ডোনাল্ড বেকার সিএসসি, স্বর্গীয় ব্রাদার ডোনাল্ড স্মিথ সিএসসি, স্বর্গীয় ব্রাদার রবার্ট হিউস সিএসসি, স্বর্গীয় ব্রাদার ব্রায়েন সিএসসি এবং স্বর্গীয় ব্রাদার টমাস মোর সিএসসি এর কাছ থেকে আমার কর্মের বেতন গ্রহণ করেছি। পর্যায়ক্রমে সমস্ত ব্রাদারগণই আমার মাসিক কর্মের টাকা মাঝে মাঝে বেশী দিয়ে দিতেন। আমি ব্রাদারদের বেশি টাকাগুলো ফেরৎ দিয়ে বলেছিলাম, ব্রাদার আমাকে যে কর্মের টাকা দিচ্ছেন তা সাধু যোসেফের টাকা। আমি বিশ্বাস করি আমার সততায় সাধু যোসেফ আমাকে বিশেষ সাহায্য করবেন। আমার এ কথায় সবাই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

প্রয়াত ব্রাদার ডানিয়েল রোজারিও পহেলা মে অনুষ্ঠানের জন্য বাজার করতে আগের দিন রাতে আমাকে ১০ হাজার টাকার একটা বান্ডেল দেন। কিন্তু পরের দিন সকালে আবার আমাকে ১০ হাজার টাকার আরো একটা বান্ডেল দেন। আমি বলেছিলাম, ব্রাদার গত রাতেতো আমাকে ১০ হাজার টাকার বান্ডেল দিয়েছিলেন, কিন্তু আজ আবার সকালে টাকা দিলেন কেন? ব্রাদার, ও তাই বলে হেসে দিয়েছিলেন। একবার আমার অসুস্থতায় ব্রাদারকে বলেছিলাম, ব্রাদার, আমি আর বাঁচবো না, মরে যাব। ব্রাদার আমাকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, মরে যাব একথা আর কোনদিন বলবে না, কারণ বাঁচা মরার দায়িত্ব ঈশ্বরের উপর। ঈশ্বর যতদিন জীবিত রাখেন ততদিন কেউ মরবে না। ঈশ্বর যখন ডাক দিবেন তখন কেউ বাঁচতে পারবে না, বুঝলে?

বলার কথা বলতি চাই। নারিন্দা সাধু যোসেফের কারিগরি বিদ্যালয়ে, আমার শিক্ষা, শিক্ষকতা এবং কর্ম জীবনে শুধুমাত্র দেশী এবং বিদেশী ব্রাদারদের সাথে সময় অতিবাহিত করেছি। সমস্ত ব্রাদারগণকে আমি ধার্মীক হিসাবে মূল্যায়ন করি। আমি সাপ্তাহিক প্রতিবেশীসহ বিভিন্ন মিশনের বিভিন্ন ম্যাগাজিনে অনেক কিছু লিখেছি এবং লিখে যাচ্ছি। আমার যে সমস্ত লেখাগুলো প্রকাশিত হয়েছে আর যেগুলো অপ্রকাশিত রয়েছে আমি উভয় লেখাকে সমতুল্য মনে করি॥

আমার বাবা ও সেনাসংঘ

চিত্রা রোজারিও

আমার বাবা সিরিল ডি'রোজারিও, প্রথম জীবন থেকে সেনাসংঘের সাথে জড়িত ছিলেন না। বাবা মহিলাদের সেনাসংঘ পছন্দও করতেন না! ছোটবেলা থেকেই আমার মাকে দেখেছি কুমারী মারীয়ার নামে সেনা সংঘের সাথে যুক্ত থেকে মাসিক মিটিং, পারিবারিক প্রার্থনা, রোগী বাড়ি পরিদর্শন করতে-কিন্তু বাবা তা মোটেও পছন্দ করতেন না বাবা বলতেন, মহিলারা একত্র হয়ে বিভিন্ন ধরণের কথা চালাচালি করে, যা অনেক সময় পরিবারের শান্তি নষ্ট করে - মা এসব শুনতেন কিন্তু জবাবে শুধু হাসতেন।

১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের দিকে বাবা হঠাৎ অনেক অসুস্থ হয়ে প্রায় মর মর, একেবারে কোমাতে চলে যাওয়ার উপক্রম এমত শারীরিক পরিস্থিতিতে বাবা বিছানায় শুয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে "ঈশ্বরের আশীর্বাদে এবং মা মারীয়ার কৃপায় যদি জীবন ফিরে পান, তাহলে তিনি সেনাসংঘে যোগ দিবেন এবং সারা জীবন মা মারীয়ার জন্য কাজ করবেন। বাবার মুখে এটা অবশ্য পরে শুনেছি ; ঈশ্বর-এর আশীর্বাদে ও মা মারিয়ার কৃপায় বাবা আশ্চর্য জনক ভাবে সুস্থ হলেন; বাবা সুস্থ হয়ে প্রথমে লক্ষীবাজার হলি ক্রস প্যারিসের অধীন মা মারীয়ার সেনাসংঘে যোগ দিয়েছিলেন, আমার মা এসব দেখে অবাক হয়েছিলেন এবং স্বামীর প্রাণ ফিরে পাওয়ার জন্য বাড়িতে মা মারীয়ার সেনাসঙ্গীদের নিয়ে ধন্যবাদের প্রার্থনা সভার আয়োজন করেছিলেন - এসব কোনো গল্প নয় বা কাকতালীয় ঘটনাও নয়, শোনা কথা ও নয়, আমার নিজে চোখে দেখা - যা এখন শুধুই স্মৃতি!

আমার বাবা সুস্থ হয়ে শুধুমাত্র সেনাসংঘের সাথে যুক্তই হননি, তিনিই প্রথম লক্ষীবাজার ধর্মপল্লী অধীন পুরুষদের নিয়ে সেনাসংঘ গঠন করে তা দক্ষভাবে পরিচালনা করছিলেন, স্বর্গীয় ফাদার পল রোজারিও বাবার সব ধরণের কার্যক্রমে অত্যন্ত খুশী ও সন্তুষ্ট ছিলেন ; আমার মা-বাবা দুজনেই ঢাকা কমিশিয়ামের সাথে যুক্ত ছিলেন। বাবা রমনা ক্যাথিড্রাল এর অধীন কমিশিয়াম এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন, আমার মাও সেক্রেটারি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বাবা-মা দুজনে একত্রে সমভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করেন। বাবাই প্রথম বাংলাদেশের সব জেলার সেনাসঙ্গীদের নিয়ে, ঢাকার লক্ষীবাজার ধর্ম প্রদেশে মহা সম্মেলনের আয়োজন করেন এবং পাঁচ (৫) বার এই সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। বাবার আগে কেউ করেনি, বাবা দেশ থেকে চলে আসার পরেও কেউ করেনি।

বাবা মা দু'জনকেই দেখেছি বাংলাদেশের বহু জেলাতে সেনাসংঘের প্রেসিডিয়াম গঠন করতে এবং পরিদর্শন করতে; তারা দুজনেই মা মারীয়ার যেমন ভক্ত ছিলেন, তেমনি একনিষ্ঠ সেবকও ছিলেন।

১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে বাবা মাকে আমার দাদা স্বপন রোজারিও আমেরিকাতে নিয়ে আসেন। প্রবাদ আছে, 'ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙ্গে' বাবা আমেরিকার নিউ জার্সিতে আমার মেজো দাদার বাসায় থাকালীন সময়ে, নিউজার্সিতে প্রথম বাঙালী সেনাসংঘের প্রেসিডিয়াম গঠন করেন, যার আধ্যাত্মিক পরিচালক ছিলেন শ্রদ্ধেয় ফাদার স্ট্যানলি গমেজ (আদি); তিনি এখনো আধ্যাত্মিক পরিচালক হিসাবে শুধু মাত্র নিউজার্সিই নয়, নিউইয়র্ক এর দুটো প্রেসিডিয়াম এবং ম্যারিল্যান্ডেরও প্রেসিডিয়াম এর আধ্যাত্মিক পরিচালক হিসাবে কাজ করেছেন। বাবা নিউজার্সিতে সদ্য প্রয়াত আন্তোনিয়া গমেজ এবং মিসেস লিলিয়ান দাসকে সেক্রেটারি করে, ৫ জন সেনা সদস্যকে নিয়ে, আমেরিকাতে প্রথম বাঙালি সেনা সংঘ - প্রেসিডিয়াম শুরু করেছিলেন, সেখানে এখন ১৫ জন সেনাসভ্য কাজ করেছেন ; মিসেস জাসিন্তা গমেজ -প্রেসিডেন্ট এবং মিসেস জলি গমেজ সেক্রেটারি হিসাবে প্রেসিডিয়মের কাজ সুন্দর ভাবে পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

অতঃপর, বাবা-মা নিউইয়র্ক এর মানহাট্টন এ থাকাকালীন সময়ে আর একটি সেনাসংঘের প্রেসিডিয়াম গঠন করেন, যাদের মধ্যে ছিলেন স্বর্গীয় নিকোলাস রোজারিও, স্বর্গীয় রাফায়েল গমেজ এবং তার সহধর্মিনী সিসিলিয়া গমেজ -যিনি, এখন কুইন্স এ বসবাস করছে, মি. উইলিয়াম গমেজ তার স্ত্রী সিসিলিয়া গমেজ, মি. ফিলিক্স কুইয়া, মি.ডমিনিক মৃ বর্তমানে মি. সুশীল রোজারিও প্রেসিডেন্ট এবং মি. গডফ্রে রোজারিও সেক্রেটারি এবং মি. ডমিনিক মৃি কোষাধ্যক্ষ হিসাবে, ৬ জন সেনাসভ্যকে নিয়ে প্রেসিডিয়ামের কাজ পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

২০১২ খ্রিস্টাব্দে কুইনসের জ্যামাইকাতে মি. এলেন গনসালভেস, মিসেস প্রভা গনসালভেস এর উদ্যোগে "জপমালার রাণী" নামে কুইন্স এ প্রেসিডিয়াম গঠন করেন, যার প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি দায়িত্ব পালন করছি, ভাইস প্রেসিডেন্ট মি. এলেন গনসালভেস, সেক্রেটারি মিসেস প্রভা গনসালভেস, কোষাধ্যক্ষ মি. জোনাস বনি গনসালভেস এবং মি. পিটার মেন্ডেজ সহকারী সেক্রেটারি হিসাবে, ১৫ জন সেনাসঙ্গীকে সংঘের কাজ খুব সুন্দরভাবে পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

২০১৪ খ্রিস্টাব্দে মেরিল্যান্ড-এর খ্রিস্টানদের সহায় নামে সেনাসংঘের প্রেসিডিয়াম গঠন করেন, যার দায়িত্বে আছেন মিসেস ছবি রোজারিও প্রেসিডেন্ট, মিসেস রুবি রোজারিও - সেক্রেটারি এবং মি. সমর বার্থলমিও কস্তা কোষাধ্যক্ষ -হিসাবে, ২৫ জন সেনাসভ্যকে নিয়ে প্রেসিডিয়ামের কাজ পরিচালিনা করে যাচ্ছেন।

২০০৩ খ্রিস্টাব্দে বাবা আমেরিকাতে বর্তমান বাংলাদেশ থেকে আগত আমেরিকায় কানাডাতে বসবাস রত প্রাক্তন সেনাসংঘীদের নিয়ে বাঙালি মহাসম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন, আমি সবে মাত্র বাংলাদেশ থেকে আমেরিকাতে আসি, বাবাকে দেখেছি -অত্যন্ত নিয়ম শৃঙ্খল ভাবে এই সম্মেলনের আয়োজন করতে; ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে বাবার উৎসাহে ও পরামর্শে, জপমালার রাণী নিউ ইয়র্ক কুইন্স প্রেসিডিয়াম নিউজার্সি, ম্যারিল্যান্ড ও মানহাট্টন এর সেনা সভ্যদের নিয়ে আরো একটি সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন নিউজার্সিতে, যেখানে ৮৮ জন সেনাসংঘী অংশগ্রহণ করেছিলেন।

সবসমই বাবাকে দেখেছি সব কাজ লিখে লিখে সময়ের মধ্যে করতে, মা-বাবা সত্যিই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মারীয়ার সেনাসংঘ করে জীবন পার করেছেন। এমন কি আমার বাবার শেষ কথা ছিল "মা মারিয়া আমাকে কৃপা কর" তিন বার এই কথা উচ্চারণ করার পর বাবা শেষ নিঃশ্বাসের আগে আর কথা বলতে পারেনি।

আমাদের সেনাসংঘের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে মাসিক সভা করা, পৃথিবী ও পরিবারের শান্তির জন্য প্রার্থনা করা, অসুস্থদের ও অন্যান্য বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রার্থনা করা, অসুস্থদের বাড়ি অথবা হাসপাতালে অসুস্থদের সাথে সাক্ষাৎ করা, মে এবং অক্টোবর - মা মারীয়ার মাসে বাড়ি বাড়ি প্রার্থনার আয়োজন করা, যিশুর যাতনাভোগ মাসে ক্রুশের পথের আয়োজন করা, কারো মৃত্যুর পর প্রার্থনায় অংশগ্রহণ - এ ভাবেই প্রেসিডিয়ামের কার্যক্রম চলছে - চলবে, বর্তমান বিশ্বের কোনো দেশেই শান্তি নাই, শান্তি নাই পরিবারে; মানুষের মনেও অস্থিরতা - তাই জপমালার রাণী প্রেসিডিয়ামের পক্ষ থেকে সকল দেশ, পরিবার, ব্যাক্তি মানুষদের জন্য রইলো শুভকামনা এবং প্রার্থনা, মা মারীয়া যেন তার কৃপা দিয়ে সবাইকে সাহায্য ও রক্ষা করেন॥

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা

এ এম আন্তোনী চিরান

ভূমিকা:

আদিকাল থেকেই মানুষ এমন এক অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্বকে উপলব্ধি করেছে, আবিষ্কার করেছে এবং ধ্যানে-জ্ঞানে-দর্শনে প্রত্যক্ষ করেছে এবং প্রমাণ করছে যে- সেই অদৃশ্য শক্তিই বিশ্ব সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করছে, পরিচালনা করছে। সেই অদৃশ্য মহাশক্তির প্রতি মানুষ তার শ্রদ্ধা-ভক্তি-সম্মান সর্বোপরি পূজা-অর্চনার মাধ্যমে তার বিশ্বাস ও আনুগত্যের অর্ঘ্য নিবেদন করে আসছে তা মানব জাতির ইতিহাসে এক অবিশ্বাস্য, স্মরণীয় যুগান্তকারী ঘটনা। আমাদের আদি পুরুষগণও সেই অদৃশ্য শক্তিকে আবিষ্কার করেছিলেন এবং তাদের সন্তুষ্টির জন্য তাদের সাথে আত্মার সম্পর্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং তাদের কাছ থেকে প্রয়োজন মাফিক সাহায্য-সহযোগিতা, সাহচর্য এবং চাহিদা পূরণের উদ্দেশে সেই সব দেবদেবীর পূজার্চনা করতেন। যারা সাংসারেক তারা এখনও সেই দেবদেবীর পূঁজাঅর্চনা করছেন। গারোদের মধ্যে অনেক দেবদেবী রয়েছে; যেমন: সালজং, চুয়াবুদি, গয়রা, আসিমা, দিংসিমা, ঢাংরেংমা, নাওয়াং, আল্লেমি, মেগাফাপিয়া, চুরাসি, উদুম প্রভৃতি প্রধান। সেইসব বদেবীর জন্য যে সব আচার অনুষ্ঠান করা হতো সেগুলির মধ্যে ওয়ানগালা, রুগালা, আমুয়া, আজিয়া, আগালমাক্কা, আসংনিম্মা, সারামসা ইত্যাদি। আরো অনেক পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠান আছে যা এখনও নানা গোত্র আর নানা মাহারীদের কৃষ্টি-সংস্কৃতির মধ্যে লুকায়িত রয়েছে। যা একান্ত পারিবারিক ঘরোয়া পরিবেশে সীমাবদ্ধ।

ধর্ম কি?

সংস্কৃত ভাষায় ধৃ+মন থেকে বাংলায় ধর্ম শব্দের উপত্তি অর্থাৎ মনকে স্রষ্টার সাথে একাত্ম করে ধরে রাখার নামই ধর্ম। মানুষ তার ব্যক্তিগত জীবনে তার মনের ধ্যান-ধারণায়, সাধ্য-সাধনার বিভিন্ন কর্ম-কাণ্ডে তার বিশ্বাসকে প্রকাশ করে আসছে তা ঐশ বিশ্বাসই হোক আর দৈব্য বিশ্বাসই হোক। প্রতিটি ব্যক্তি সমাজের ধর্মীয় জীবনের মূল অস্তিত্ব এই বিশ্বাসের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ধর্মীয় জীবনে মূল উৎসে রয়েছে ভাল মনের গুরুত্ব ও মাহাত্ম। কারণ, ভাল মনহীন জীবনে ধর্মের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। যেমন- মৃত মানুষ, পাগল মানুষ আর গোবেট মানুষ প্রতিটি মানুষের জন্যেই ঈশ্বর মন, হৃদয় ও আত্মা দিয়েছেন। যা অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে বিশেষ মর্যাদা বা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে।

প্রতিটি মানুষের মধ্যেই ভাল-মন্দ আর খারাপ মনের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, তবে সময়, পরিবেশ কিংবা ধর্মাচরণের কারণে মানুষ খারাপ মনকে দমিয়ে রাখে অর্থাৎ ভাল মন যখন সজাগ থাকে, তখন খারাপ মন অবচেতন বা নিষ্ক্রিয় থাকে আর খারাপ মন সজাগ থাকলে ভাল মন তখন অবচেতন বা নিষ্ক্রিয় থাকে। আর তখই মানুষ খারাপ প্রবৃত্তিতে বা গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়; যেমন- চুরি, ডাকাতি, গুণ্ডামী, পরশ্রীকাতরতা, বদমায়েসী, রাহাজানি, মাস্তানী, মাদকাসক্তি ইত্যাদি। লাটিন ভাষার Relgare শব্দ থেকে ইংরেজী শব্দ Religion শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ হলো রীতি-নীতির বন্ধনে জীবন-যাপন করা। ধর্ম সম্পর্কে Encyclopaedia Britanica গ্রন্থে উল্লেখ আছে- Religion by which mean the modes of divine worship. অর্থাৎ ঈশ্বরের উপাসনাকেই ধর্ম বলা হয়। মনীষী কান্ট ধর্ম সম্পর্কে বলেছেন- 'Religion is morality.' অর্থাৎ মানবের আচার-আচরণ নৈতিক শিক্ষার ফলকেই তিনি ধর্ম বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ধর্ম সম্পর্কে মনীষী ফেজারের মত হলো- 'Religion is knowledge.' অর্থাৎ জ্ঞান বা উপলব্ধিই হচ্ছে মানুষের ধর্ম। ফরাসী সমাজ বিজ্ঞানী এমিল দূর্খানের মতে, ' পবিত্র বস্তু এবং করণীয় ও অকরণীয় কার্যের প্রতি বিশ্বাস এবং কৃতকর্মের সমন্বিত রূপকেই ধর্ম বলা হয়।' তার মতে- ধর্মের উপাদান হলো দু'টি- (ক) বিশ্বাস ও (খ) আচার।

বিশ্বাস:

ঈশ্বরের উপস্থিতিকে উপলব্ধি করা এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা, সেটা ধ্যানে-জ্ঞানে অথবা কর্মেই হোক তার নামই বিশ্বাস। হিব্রু ১১:১ পদে বলা হয়েছে- মানুষ যে বস্তু সম্বন্ধে জানতে চায় বা বুঝতে চায় সেই বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে সূক্ষ ধারণা এবং সেই সূক্ষ ধারণাকে প্রমাণ সাপেক্ষে অন্তরে ধারণ করার নামই বিশ্বাস। আমাদের খ্রিস্ট ধর্মের পরিত্রাণের ইতিহাসে দু'টি বিশেষ আশ্বাসের উপর নির্ভর করেই পুরাতন নিয়ম আর নতুন নিয়মের সৃষ্টি হয়েছে। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর তাঁর প্রিয় পুত্র যিশুখ্রিস্টকে মানব জাতির পরিত্রাণের জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করবেন। এই ছিল আমাদের বিশ্বাসী পিতা আব্রাহামের নিকট পিতা ঈশ্বরের বিশেষ আশারবাণী। নতুন নিয়মে স্বয়ং যিশুখ্রিস্ট মানব জাতির পরিত্রাণকে নিশ্চয়তা প্রদান করেছিলেন। তিনি বলেছেন, 'আমিই পথ, সত্য ও জীবন; যে আমাতে বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবন পাবে।' অর্থাৎ স্বর্গ লাভ করবে। যিশুখ্রিস্টের এই ত্রাণদায়ী আহ্বান সর্বজনীন এবং নিঃশর্ত তবে তিনি চেয়েছেন তাঁর উদাত্ত আহ্বানকে মানুষ যেন বিশ্বাস সহকারে অনুসরণ, অনুকরণ করে। পৃথিবীর কোন মানুষ, কোন জ্বীন, দেব- দেবতা, কোন আউলিয়া, দরবেশ, কোন ভাববাদী বা কোন অবতার যিশুর মতো এমন পরিত্রাণ দানের জন্য নিশ্চয়তা দিতে পারেননি। আর, এর জন্যই খ্রিস্ট ধর্ম আর অন্য ধর্মের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বাসের মূল ধারা দু'টি- (ক) ঐশ বিশ্বাস, (খ) দৈব্য বিশ্বাস। পৃথিবীতে দু'টি বিশ্বাসেরই অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্ব জুড়েই তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশ। আবার দৈব্য শক্তিরও অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় কোন ভূতগ্রস্ত লোকের মধ্যে। এরকম বহু ভূতগ্রস্ত, অপদূতে পাওয়া লোককে যিশু সারিয়ে তুলেছিলেন।

আচার:

মানুষ তার ধর্মীয় বিশ্বাসকে কোন নির্দিষ্ট আকার-ইঙ্গিতে অথবা কোন কৃষ্টি-সংস্কৃতির চিহ্নে প্রকাশ করে থাকে, তার

নামই আচার। যেমন-খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠানকরণ, প্রার্থনা অনুষ্ঠানকরণ, সাক্রামেন্তীয় অনুষ্ঠান পালন ইত্যাদি। আবার প্রকৃতি পূজারী বা সাংসারিকদের মধ্যে অমাবশ্যা পূর্ণিমা পালন, কোথাও চলাফেরার আগে বা যাত্রাকালে শুভ-অশুভ নির্ণয় করে চলে। যাত্রাকালে খালি কলসী দর্শনকে অশুভ বলে মনে করা। কোন মৃত বাড়ীতে উঠা বা ঢোকা অশুচি হওয়া, গর্ভবতী মহিলার মৃত বাড়ীতে প্রবেশ নিষিদ্ধ, স্বামীর আগে স্ত্রীদের অন্ন গ্রহণ স্বামীর মর্যাদা ক্ষুন্ন করা। আরোও এরকম বহু আচার রয়েছে যাকে আমরা কুসংস্কার বলে থাকি। আচার সাধারণত: বিশ্বাসপ্রসূত, বাস্তব কর্মকাণ্ড বা তার প্রতিফলন। কুসংস্কার ছাড়াও আচার ধর্মীয় কর্মকাণ্ডও হতে পারে।

মনীষী ফেজারের মতে, ' ধর্ম হচ্ছে- মানুষ তার চেয়ে উচ্চতর এমন এক শক্তির সন্তুষ্টি বিধান, যে শক্তি মানব জীবন ও প্রকৃতির ধারাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকে। তাঁর মতে- ধর্মের মূল উপাদান দু'টি- (ক) মানুষের উচ্চতর শক্তিতে বিশ্বাস, (খ) সেই অতিমানবিক শক্তির আরাধনা। ধর্ম সম্পর্কে নৃ-বিজ্ঞানী টেলর বলেছেন, 'ধর্ম হচ্ছে প্রেতাত্মায় বিশ্বাস।' তার মতে, 'আদিম মানুষের ধর্মের মূলমন্ত্র হচ্ছে অবিনাশিতা ও প্রেতাত্মায় বিশ্বাস।'

উপরোক্ত আলোচনায় বোঝা যায় যে, আদিকাল থেকেই মানব সমাজে ধর্মের অস্তিত্ব ছিল। অন্তত: যে দিন তারা ঐশ শক্তি সম্বন্ধে বা দৈব্য শক্তি সম্বন্ধে ধারণা করতে পেরেছিলেন, সেদিন থেকেই ধর্মের অস্তিত্বের সৃষ্টি হয়। ফলে, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়,সংগত-অসংগত, বিশেষ রূপে পাপ-পুণ্যের ধারণা সৃষ্টি হয় এবং তা মানব জাতির কৃষ্টিতে বিমূর্ত হয়ে উঠে। মানব সমাজের এমন প্রকৃত ঐশ আরাধনার ক্ষেত্রে দৈব্য শক্তির আরাধনাই ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিমূখ করে তুলছে, বিকৃত করছে। যা খ্রিস্টীয় বিশ্বাসে নিষিদ্ধ। যেমন- অমাবশ্যা-পূর্ণিমা পালন, দেব-দেবীর নামে বলি উৎর্সগ, যাদুবিদ্যা চর্চা ও ব্যবহার ইত্যাদি।

আধ্যাত্মিকতা:

মানুষ যখন তার দেহ-মন-আত্মায় ঈশ্বরের সাথে একাত্ম হতে- সাধনার জন্য যে মাধ্যমকে অনুসরণ-অনুকরণ বা ব্যবহার করে থাকে সাধনার সেই মাধ্যমকেই আধ্যাত্মিকতা বলা হয়। ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা, সর্বশক্তিমান, তিনি পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা এবং সর্বনিয়ন্তা। এই আত্মবিশ্বাসকে নিয়ে মানুষ ঈশ্বরের স্পর্শকে অনুভব করতে চায়, তাকে আপন করে নিতে চায়, তাঁর সাথে একাত্ম হতে চায়, তাঁর সীমাহীন ভালোবাসাকে প্রত্যক্ষ করতে চায়। জীবনের সফলতা পেতে ঈশ্বরের সাহায্য-সহযোগিতা পেতে নিজেকে তার মনের মতো গড়তে প্রার্থনায়, উপবাসে, ত্যাগ স্বীকারে অথবা কৃচ্ছ্রসাধনায় সর্বোপরি খ্রিস্টীয় আদর্শে, ভ্রাতৃপ্রেমের বন্ধনে সবার আপনজন হতে চায়; যেখানে ঈশ্বর অবস্থান করেন, সেই ঐশ করুণা লাভের জন্য যে নিরন্তর সাধনা তারই নাম আধ্যাত্মিকতা।

বিশ্বাসের দৃষ্টিতে মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করেছে, আবিষ্কার করেছে এবং বিশ্বাসের দৃষ্টিতে বাহ্যত মানুষ তার আনুগত্য প্রকাশের জন্য, তাঁর অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য বিভিন্ন নিয়ম-নীতি আর বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঈশ্বরের স্তব-স্তুতি, পূজা-অর্চনা করে আসছে। আধ্যাত্মিকতা মূলত ঈশ্বর ও মানব আত্মার পবিত্র মিলন বন্ধনের নিরন্তর ঐকান্তিক সাধনা। আমাদের অবিনাশী আত্মাকে রিপু মুক্ত রাখার জন্য মানুষের আত্মিক চেতনালব্ধ নিরন্তর প্রচেষ্টাকে আধ্যাত্মিকতা বলা হয়। আমাদের কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা বইয়ে বলা হয়েছে, 'ঈশ্বর প্রদত্ত নিয়ম ও ঐশ অনুগ্রহের সহায়তার দ্বারা এবং ঈশ্বরের বিরচিত দ্বিবিধ আজ্ঞা পূরণের উপযোগী আচরণের দ্বারা ধর্মীয় জীবন কাটানোকে আধ্যাত্মিকতা বলা হয়েছে।' আমাদের প্রতিটি ব্যক্তিজীবনে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, আনুগত্য, তাঁর পূজা, সেবা এবং সর্বজনীন ভ্রাতৃপ্রেমের উপরই আমাদের খ্রিস্ট ধর্ম প্রতিষ্ঠিত।

পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর মোশীর মাধ্যমে তাঁর মনোনীত ইস্রায়েল জাতির জন্য দশটি আজ্ঞা প্রদানের মাধ্যমে ধর্মীয় অনুশাসনগুলো মেনে চলতে আদেশ দিয়েছিলেন। আব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির কথা, 'আমি তোমাকে বহু জাতির পিতা করব..... তোমার বংশে মানব জাতির পরিত্রাণের জন্য আমার একমাত্র প্রিয় পুত্রকে পাঠাব, যে সমগ্র মানব জাতির পরিত্রাণ করবে।' আর নতুন নিয়মে সে-ই প্রতিশ্রুতিকে রক্ষা করতে ঈশ্বর তাঁর প্রিয় পুত্র যিশুকে পৃথিবীতে পাঠালেন। আর যিশু মানব হয়ে পৃথিবীতে এসে যে বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন তা হলো- সেই যুবকের প্রতি যিশুর উচ্চারিত বাণী- 'তোমার মন, সমস্ত অন্তর ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রভু ঈশ্বরকে ভালোবাসবে।' আর দ্বিতীয়টি হলো- 'তোমার প্রতিবেশিকে নিজের মতোই ভালোবাসবে।' ধনী যুবককে তিনি আর একটি বিষয় সুস্পষ্ট করে বলেছিলেন- তা হলো- পুণ্য অর্জন করতে হলে তার সঞ্চিত ধন-সম্পদ গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে যেন তাকে অনুসরণ করে। কারণ, যেখানে ধন সেখানে তোমার মন থাকবে।'

যিশুর কথা অনুসারে এই কথা নিশ্চিত করে যে, তাঁকে অনুসরণ ও অনুকরণ করলে অনন্ত জীবন প্রাপ্তি অনিবার্য। আমাদের মানবীয় জীবনের ধার্মিকতার জন্য শুধু ঈশ্বরকে বিশ্বাসই নয় তাঁর সাথে সম্পৃক্ত থাকার জন্য শাস্ত্রীয় বচনগুলো মেনে চলতে হবে এবং কর্ম সাধনার মাধ্যমে পুণ্য অর্জন করতে হবে। সাধু যাকোব এজন্যই কর্মবিহীন বিশ্বাসকে মৃত বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর প্রেরিত দূত পল বলেছেন- অধ্যাত্ম সাধনার জন্য ঈশ্বরের সাথে সম্পৃক্ত থেকে শয়তানের সাথে আপ্রাণ যুদ্ধ করতে হবে। আরোও বলেছেন- সজাগ দৃষ্টি রেখে সাবধানতার সাথে প্রার্থনার দ্বারা ঐশ অনুগ্রহগুলো রক্ষা করতে হবে।

গারোদের সামাজিকতা-বাস্তবতা:

আমাদের বর্তমান গারো সমাজের ধর্মীয় জীবন, সামাজিক জীবন অবলোকন করলে দেখা যায় , সব কিছুতেই স্থুলতা বা স্থবিরতা এসে গেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটলেও নৈতিক অধঃপতন লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ যেন নিতান্ত তাল সামলানো অথবা সামাজিকতা রক্ষা করা। সবকিছুতেই যেন মেকী আর লোক দেখানোর ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিওবা কথাগুলো সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বিভিন্ন শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব- যেমন-ইন্টারনেট, ফেইসবুক, ভাইভার, ইমু, আর মেসেঞ্জারের প্রভাব বর্তমান গারো সমাজের চিন্তা - চেতনাকে যান্ত্রিক ও স্থুল করে তুলছে। উগ্র আধুনিকায়নে জাতিগত কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ধর্ম-কর্ম এমনকি মানবীয় চারিত্রিক অমূল্য সম্পত্তিতেও ঘূণ ধরাচ্ছে। যদিও আন্তঃদেশীয় বা আর্ন্তজাতিক কৃষ্টি-সংস্কৃতির আদান-প্রদান জাতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধশালী করে কিন্তু বাস্তবতার নিরীখে দেখা যায় ভালোর চেয়ে খারাপ দিকটাই আমাদের গারো সমাজকেও

প্রভাবিত করছে। যার জন্য আমাদের গারো সমাজেও নৈতিক অবক্ষয়, অপরাধ প্রবণতা, মাদকাসক্তি, এমনকি যৌনাচারের মতো ঘৃণ্য প্রবৃত্তিতেও ধারণাতীতভাবে ঝুঁকে পড়ছে।

আমাদের গারো জাতিকে অন্যান্য জাতিরা সহজ-সরল, নিরীহ, ধর্মভীরু হিসাবে মূল্যায়ন করে। কিন্তু বর্তমানে সেই জাতীয় সুনামটা যেন কালচক্রের রাহুগ্রাসে মূহ্যমান, অতীতের বুকে বিস্মৃত। শিক্ষার প্রসারতার সাথে সাথে আমিত্ববোধ, স্বার্থ দ্বন্দ্ব, অনৈতিক জীবন-যাপন, উগ্রমনোরথ জাতীয় মূল্যবান সত্তা ও মর্যাদাকে অবনমিত করছে, ক্ষুন্ন করছে। যদিও আমরা শিক্ষাকে উন্নয়নের চাবিকাঠি মনে করি কিন্তু বাহ্যত বর্তমান সমাজ শিক্ষার মানদণ্ডে জিম্মি। উগ্র আধুনিকতার ফলে আবশ্যকীয় চাহিদাগুলো পূরণ করতে বাস্তব জীবনে অর্থলিপ্সায় জিম্মি, উন্নয়নের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় কর্মক্ষেত্রে জিম্মি। এই দিকে সমাজ, মণ্ডলী, জাতীয় স্বার্থগুলো হয়ে পড়ছে গৌণ, অবহেলিত, কঠিন বাস্তবতায় জিম্মি। সমাজে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে যুব সমাজ হয়ে পড়ছে ছন্নছাড়া, বিক্ষিপ্ত। এই হেন অপরিপক্ক, অদক্ষ, অশিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারা কিভাবে সমাজ-মণ্ডলী সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে? যারা শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষিত তারা সবাই শহরমুখী। নিজ ব্যক্তিস্বার্থ, পারিবারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সবাই চাকরীর জন্য ঘর ছাড়া। বড়দিন অথবা বছরের যে কোন লম্বা ছুটিতে আসেন আর ছুটি শেষ হলেই কর্মস্থলে চলে যান।

আজ বর্তমান সময়ের দাবি সামাজিক অবক্ষয় রোধে, মণ্ডলীর মাণ্ডলিক কর্ম-কাণ্ডে গতিশীলতা আনতে, নৈতিক অবক্ষয় রোধে শিক্ষিত সমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে। আর একটি বিষয় নিশ্চিত যে, যেহেতু আমাদের গারো সমাজগুলো চার্চমুখী বা মিশনমুখী, তাই স্থানীয় মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ বা মিশনারীদেরকেই মূখ্য ভূমিকা পালন করাকে একান্ত জরুরী মনে করি। কারণ, প্যারিশ কাউন্সিল অথবা গ্রাম মণ্ডলীগুলো মিশনারীদের কাজে সাহায্য-সহযোগিতার জন্যই গঠিত হলেও বর্তমান বাস্তবতায় মিশনারীদেরকেই সামাজিক, ধর্মীয় তথা গারো সমাজের মানবিক জীবনের সার্বিক অবক্ষয় রোধে নির্দিষ্ট নীতিমালা হাতে নিয়ে এগিয়ে আসাকে সংগত মনে করি। কারণ, বর্তমান সমাজ, শিক্ষিত মহল কর্তৃক অবহেলিত, নানা পারিপার্শ্বিক চাপে সমস্যাগ্রস্ত। অথচ গারো সমাজে শতকরা ৩০ জনই উচ্চ শিক্ষিত। যারা উচ্চ শিক্ষিত তারা নিজ নিজ কর্ম জীবনের দায়-দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত। গারো সমাজে অনেক সংঘ-সমিতি আছে তাও শহরকেন্দ্রিক, গ্রামের প্রাণ কেন্দ্রে এর প্রভাব, কার্যকারিতা কোথাও নেই বললেই চলে। কয়েকজন ব্যক্তির মদদে পারিপার্শ্বিক চাপ রক্ষার জন্য নতুবা বিভিন্ন স্বার্থ হাসিলের জন্য সংগঠণগুলো ব্যবহার হচ্ছে। তবুও সাংগঠনিক কাজ হচ্ছে এটা অনস্বীকার্য।

পরিসমাপ্তি কথা:

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই যে, মিশনারীদেরই সর্বোচ্চ সাহায্য-সহযোগিতায় বর্তমান গারো সমাজ শিক্ষায় প্রভূত উন্নতি লাভ করেছে। এতে মিশনারীদের বিশেষ ভূমিকা ও অবদান রয়েছে। আবার ৯৯% জনই যে খ্রিস্টান এটাও মিশনারীদেরই বিশেষ অবদান। মিশনারীগণ যদি আমাদের যত্ন না নিতেন, শিক্ষার আলো না ছড়াতেন, তাহলে গারো সমাজ অশিক্ষা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অন্ধকারময় জগতে বাস করত। আমাদের জাতির জন্য এটা এক অযাচিত ঐশপ্রাপ্তি। যা ঈশ্বর নিজে দিয়েছেন। এই সত্যটাকে অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই। খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করার সাথে সাথে আমাদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, বিশেষ করে ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা, তারপর স্কুল, হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করে আমাদের জাতিকে জাতীয়-রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় উন্নিত করেছে, এসব কিছুই সম্ভব হয়েছে জাতীয় ভিত্তিক খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করার ফলে। তাই আজ আন্তঃমাণ্ডলিক ঐক্য প্রচেষ্টায় গারো সমাজের সার্বিক মঙ্গলের জন্য, উন্নয়নের জন্য প্রার্থনার আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত। কারণ, যিশু নিজে বলেছেন,' চাও, তোমাদের দেয়া হবে, দরজায় ঘাঁ দাও তোমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হবে, যেখানে একের অধিক মানুষ আমার নামে একত্র হয় সেখানেই আমি আছি।' যিশুর এই অমোঘ বাণীর উপর নির্ভর করে সবারই এগিয়ে আসা উচিত; একমাত্র ঈশ্বরই তাঁর পুত্রের মাধ্যমে আমাদের রক্ষা ও পালন করতে পারেন, সাহায্য করতে পারেন, উন্নয়ন আনতে পারেন- ঈশ্বর আমাদের সবার মঙ্গল করুন॥

কলাম: কাথলিক মণ্ডলীতে মূর্তি ...

(১১৪ পৃষ্ঠার পর)

করা হয়েছে, "বাইজান্টাইন ঐতিহ্য বরাবরই শিক্ষাদানের মধ্যে মূর্তিকে একটি বিশিষ্ট স্থান দিয়ে আসছিল। এগুলো ছিল অনেকটা যেন 'নীরব ধর্মোপদেশ', 'নিরক্ষরদের জন্য বই'-এর মতো এবং তা এমন সন্মান করা হত, মনে হত যাকে রূপায়িত করা হত, তার উপস্থিতি যেন তাতে মূর্ত রয়েছে" (পৃষ্ঠা ১২৮)। রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের সম্রাজ্ঞী আইরিন যিনি খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। পোপ মহোদয়ের অনুমতিক্রমে ৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় নিসিয়া মহাসভা আহবান করেন। বিজ্ঞজনের উপস্থিতিতে দীর্ঘ সময় আলোচনার পর মণ্ডলীর চিরাচরিত ঐতিহ্য ও প্রথা অনুসারে সাধু সাধ্বীদের প্রতিমূর্তি, মা মারীয়ার মূর্তিসহ নানা চিত্র কর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ভক্তি প্রদর্শনের নিয়ম ঘোষণা দেয়। মধ্য যুগে পাথরের নির্মিত মূর্তিগুলো ছিল নিরক্ষর মানুষের বই। কাথলিক মণ্ডলীতে কখনই মূর্তির পূজা করে না তবে 'মৃন্ময়ের মাঝে চিন্ময়কে খুঁজি/ভজি অর্থাৎ ভক্ত বিশ্বাসী দুর্বল বিশ্বাসের কারণে মূর্তি ও প্রতিকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। এছাড়া কাথলিক মণ্ডলীর দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য-প্রথা, বিশ্বাস ও শিক্ষার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে আছে।

রেনেসা যুগে ধর্মীয় চিত্রকলার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। মণ্ডলীর ঐতিহ্যে, সাধু-সাধ্বীদের জীবনী, বাইবেলের অসংখ্য ঘটনা পাথরের খোদাই করে রাখা হয়। কাথলিক শিল্পকলা ও আর্ট-কালচার-গির্জা-বাসিলিকা কেন্দ্রিক। যুগে যুগে বিখ্যাত শিল্পীদের দ্বারা অসংখ্য চিত্র, মূর্তি-প্রতিকৃর্তি তৈরী হয়েছে গির্জা বাসিলিকায় যা খ্রিস্টমণ্ডলীর বিশ্বসের সাক্ষ্য বহন করে এবং সত্য-সুন্দর প্রকাশ করে। যুগে যুগে খ্রিস্টমণ্ডলী "মূর্তি রক্ষা করতে গিয়ে অনেক সন্ন্যাসীকে ধর্মশহীদের মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। সাম্রাজ্ঞী আইরিন ৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে নিসিয়াতে সপ্তম বিশ্বজনীন মহাসভা আহবান করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি শান্ত করেন। এই মহাসভায় ধর্মীয় মূর্তির প্রতি সন্মান প্রদর্শনের বিধানকে স্বীকৃতি দান করা হয়" (খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাস, পৃষ্ঠা, ১২৯)। কাথলিক মণ্ডলীর ঐতিহ্যের বাস্তবায়ন বর্তমানেও বিদ্যমান। তাই গির্জা, বাসিলিকা, সংঘ-প্রতিষ্ঠান, পরিবারসহ নানা স্থানে বিশ্বাস ও ভক্তির চিহ্ন হিসাবে মূর্তি, প্রতিকৃতি, ছবি ও নানা ধরনের চিহ্ন আল্পনা দেখতে পাওয়া যায়॥

তৃতীয় সহস্রাব্দের বাস্তবতায় খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য, নৈতিকতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি

মানব সভ্যতার ইতিহাসে তৃতীয় সহস্রাব্দ আমাদের সামনে অনেক নতুন সৃষ্টি, উদ্ভাবন, সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের দ্বারে উপস্থিত হয়েছে। যা আমাদের প্রথাগত ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিকতা, সামাজিক-ধর্মীয়-কৃষ্টিগত মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক অঙ্গন, নতুন সৃষ্টি, হত্যাদি সর্বক্ষেত্রে অভূত প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। যেমন: মোবাইল, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, রিমোট কন্ট্রোল, আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স, ড্রোন বা চালকবিহীন বিমান, ধর্মহীনতা, মুক্ত যৌনতা, আরো কতো কি!

এক অপ্রতিরোধ্য গতিতে এসব কিছু নিয়ে তৃতীয় বিশ্ব এগিয়ে চলেছে। তৃতীয় বিশ্বের অভাবনীয় চলার পথের কর্ম-যজ্ঞগুলো মানুষের প্রচলিত ধর্মীয়, সামাজিক বিশ্বাসে যেমন নব-জাগরণ ঘটিয়ে চলেছে, তেমনি অনেক সময় আমাদের প্রচলিত বিশ্বাসে, মূল্যবোধের, ক্ষেত্রে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে নানান চ্যালেঞ্জ নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে এবং আমাদেরকে দারুণভাবে ভাবিয়ে তুলছে। নতুন নতুন সৃষ্টি ও উদ্ভাবন ও সম্ভাবনাকে অনেকে যেমন স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছে এবং অনেকে, বিশেষ করে,তরুণ প্রজন্ম যেমন আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত হচ্ছে, তেমনি প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাাজিক ও কৃষ্টিগত মূল্যবোধে বিশ্বাসী ও লালনকারী ব্যক্তিদের কাছে তা হয়ে উঠছে মন-তাড়ণা ও ভীষণ চ্যালেঞ্জের বিষয়। এক সময় ধর্মীয় প্রচলিত বিশ্বাস ও পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানহীনতার কারণে পৃথিবীর সঠিক গতিবিধির প্রথম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ধারক গালিলিওকে যেমন তৎকালীন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ করেছিলেন, তৃতীয় সহস্রাব্দের নতুন নতুন ধারণা, আবিষ্কার ও সৃষ্টির বিরাট সম্ভাবনার যুগে আমাদের ব্যক্তিগত ও খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাস, ঐশতাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণা, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রচলিত মূল্যবোধ, রীতি-নীতি অনেকের কাছে তেমনি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। নিম্নে কিছু কিছু অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর অলোকপাত করা হলো:

১। 'সর্বযুক্ত' বা 'পরিবেষ্টক' মণ্ডলী ('Inclusive' Church)

খ্রিস্টমণ্ডলী সম্পর্কে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের একটি কালজয়ী দিকদর্শন (Vision) ও লাতিন ভাষায় মূলমন্ত্র (Motto) বা স্লোগান হলো: "tutti, tutti, tutti", অর্থাৎ 'সকলে সকলে সকলে' : "Everyone, Everyone, Everyone"- যার মধ্য দিয়ে পোপ ফ্রান্সিস বলছেন যে, মণ্ডলী হলো সাদরে গৃহীত হওয়ার স্থান (the church as a place of welcome)।[১] পোপ ফ্রান্সিস তার এই মহান দূরদর্শিতা ও মণ্ডলীর জন্যে পালকীয় কালজয়ী দিকদর্শনের জন্যে অমর হয়ে থাকবেন। খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্যে তার এই দিক দর্শন ও মূলমন্ত্র মাণ্ডলিক জীবনে শত সহস্র বছর ধরে প্রচলিত রীতিনীতি, ঐতিহ্য ও ধ্যান–ধারণাকে প্রচণ্ড ভাবে নাড়া দিচ্ছে এবং মণ্ডলীর প্রাণের গভীরে নতুন প্রাণের সাড়া জাগাচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে তিনি যখন লেজবিয়ানদের সাথে কর্মরত নেতৃবৃন্দের সাথে ভাতিকানে সাক্ষাৎ করতে গেলেন, তখন তাদের হাতে পোপ মহোদয়ের মণ্ডলীর মূলমন্ত্র খচিত ব্যানারে লাতিন ভাষায় লেখা ছিল: "tutti, tutti, tutti", : "Everyone Everyone Everyone": "সকলে সকলে সকলে"।

অতি সম্প্রতি (৩-২৯ অক্টোবর, ২০২৩) রোমে Synod on Synodality-এর উপর প্রায় এক মাস ব্যাপি বিশেষ সভা বা মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে সারা পৃথিবী থেকে মণ্ডলীর সকল স্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে বিশেষ ধ্যান-অনুধ্যান, বক্তব্য, আলোচনা, সহভাগিতা, প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। এই সিনডে বিশেষ গুরুত্বের সাথে জোর দেওয়া হয়েছে 'শ্রবণ' বা ('LISTENING')- এর উপর, কথা 'বলা, ('SPEAKING')-এর উপর নয়। এই 'শ্রবণ' বা 'LISTENING' হলো নীরব ধ্যান-প্রার্থনার মধ্যদিয়ে পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর শ্রবণ ('LISTENING' to the voice of the Holy Spirit)। আর এর পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে সব দেশে (যেখানে কাথলিকগণ রয়েছে), এক বছর ব্যাপী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে অনেক সভা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে সকল স্তরের জনগণের অংশগ্রহণ ও তাদের কথা শ্রবণ - এই দু'টির উপর অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই Synodality-এর উপর অনুষ্ঠিত ধর্মপল্লী, ধর্মপ্রদেশ ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সভা-সম্মেলনে কার্ডিনাল, আর্চবিশপ, বিশপ, যাজক, ধর্মব্রতী-ধর্মব্রতিনী, পিতামাতা, যুবক-যুবতী, শিশু, প্রতিবন্ধী, ইত্যাদি সকল স্তরের ও বয়সের মানুষের অংশগ্রহণ ও তাদের কথা শ্রবণ - এই দু'টির উপর প্রাধ্যান্য দেওয়া হয়েছে।

খ্রিস্টমণ্ডলী সম্বন্ধে পোপ ফ্রান্সিস কতকগুলো যুগান্তকারী, বিবর্তনবাদী ও বৈপ্লবিক প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণা করেছেন, যা পূর্বের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা থেকে অনেক স্বতন্ত্র, এবং বিশেষ অনুপ্রেরণামূলক ও নবপ্রাণ সঞ্চারী। এটি যেন মণ্ডলীর নবায়নের উদ্দেশে দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার পূর্বে ১১ অক্টোবর, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে সাধু পোপ ত্রয়োবিংশ যোহন কর্তৃক ঘোষিত মহা অনুধ্যান: "মণ্ডলীর জানালাগুলো খুলে দাও এবং ভিতরে আত্মার নির্মল বায়ু প্রবেশ করতে দাও" ("Throw open the windows of the Church and let the fresh air of the Spirit blow through.")।[২]

২। তৃতীয় সহস্রাব্দের প্রবক্তা পোপ ফ্রান্সিসের মাণ্ডলিক দিকদর্শন ও প্রাবক্তিক বাণীসমূহ মণ্ডলীর নবায়নের উদ্দেশে প্রবক্তা পোপ ফ্রান্সিসের বিশেষ কতকগুলো অনুধ্যান ও প্রাবক্তিক বাণী বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়, তা হলো:

(১) **পোপ ফ্রান্সিসের মাণ্ডলিক মূলমন্ত্র: 'সকলে, সকলে, সকলে': 'everyone, everyone, everyone'**

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের মাণ্ডলিক ধারণাটি মূলত: অন্তর্ভূক্তিমূলক (Inclusive) ও অংশগ্রহণমূলক (participatory)। যিশুর মণ্ডলীতে সবাই আমন্ত্রিত - শুধু পুণ্যবানগণ নন, পাপী-দুর্বল মানুষও; শুধু সুস্থ-সবল ব্যক্তিরা নন, দীন-দুঃখী, অসহায়, বঞ্চিত, পথহারা, সমাজচ্যুত, পরিত্যাক্ত-সবাই যিশুকে অনুসরণ করার আহ্বান পেয়েছে এবং মাতা-মণ্ডলীতে তাদের স্থান রয়েছে। তাই ইতালিয়ান রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন RAI কর্তৃক Synod on Synodality-এর আলোকে homosexuality-এর উপর আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন করা হয়, তখন পোপ ফ্রান্সিস বলেন: "যখন আমি বলি 'সকলে, সকলে, সকলে', তখন আমি লোকদের কথা বলি। মণ্ডলী সকল জনগণকে গ্রহণ করে। এবং তখন সে প্রশ্ন করে না তুমি কেমন ধরণের। তখন ভিতরে সবাই বৃদ্ধি লাভ করে, কিন্তু একজন খ্রিস্টান হিসেবে। মণ্ডলী সকলকে গ্রহণ করে। যাদেরকেই দীক্ষিত করা যাবে, মণ্ডলী তাদের সবাইকে গ্রহণ করে।" ("When I say 'everyone, everyone, everyone,' [I'm speaking about] people. The Church receives people. Everyone. And it does not ask how you are. Then, inside, everyone grows, but

from a Christian belonging."). --- "The Church receives everyone. --- The Church receives all those who can be baptized.)।[৩]

(২) "মণ্ডলী হলো যুদ্ধ পরবর্তী একটি হাসপাতাল" : "The church as a field hospital after battle"

সাধু আগষ্টিন মণ্ডলী সম্পর্কে বলেছিলেন: "মণ্ডলী হলো পাপীদের জন্যে একটি হাসপাতাল, এটি সাধু-সাধ্বীদের যাদুঘর নয়" ("The church is not a museum for saints, it is a hospital for sinners.")।[৪]

পোপ ফ্রান্সিস খ্রিস্টমণ্ডলীর পরিচয় বা স্বরূপ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সাধু আগষ্টিনের উদ্ধৃতির অনুসরণে বলেছেন: আমি দেখি "মণ্ডলী হলো যুদ্ধ পরবর্তী একটি হাসপাতাল স্বরূপ। একজন গুরুতর আহত ব্যক্তিকে এটি বলা অর্থহীন যে, আপনার কলেসটোরাল আছে কি-না এবং রক্তে চিনির পরিমাণ ঠিকআছে কি-না। আপনাকে আগে রোগীকে সারিয়ে তুলতে হবে। তারপর আপনি সবকিছু সম্বন্ধে কথা বলতে পারেন" ("ও see the church as a field hospital after battle. It is useless to ask a seriously injured person if he has high cholesterol and about the level of his blood sugars. You have to heal his wounds. Then we can talk about everything else.")।[৫] অর্থাৎ, তিনি বলতে চেয়েছেন যে, যিশুর মণ্ডলীতে সব ধরণের মানুষ আসবে সেবার উদ্দেশে, ব্যবসার জন্যে নয়। এই সেবার পরিসর বৃহৎ-আধ্যাত্মিক ও জাগতিক: আত্মায় ও বাহ্যিক দীন-দরিদ্র,অসহায়, পাপী-তাপী, ঘৃণিত, পরিত্যক্ত, অবাঞ্চিত, বঞ্চিত, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী, বিকলাঙ্গ, ইত্যাদি সকল স্তরের মানুষের জন্য। মণ্ডলীর হৃদয়-দ্বার যেন হয় যিশুর মত সর্বদা উন্মুক্ত, যিনি বলেছেন: "মানবপুত্র সেবা পেতে নয়, সেবা করতে এসেছে" (*মথি ২০:২৮*)।

(৩) "মেষপালকের গায়ে থাকবে মেষের গন্ধ" ("Being Shepherds with the smell of the Sheep")

পোপ ফ্রান্সিস তার পালকীয় অভিজ্ঞতার আলোকে খ্রিস্টমণ্ডলীর পালকীয় সেবাকাজের ধরণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মেষপালের সাথে মেষপালকের গভীর সুসম্পর্কের কথা তুলে ধরেছেন। এই সম্পর্ক ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত - হৃদয়-আত্মায় তারা যেন এক গভীর ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ। কেননা, মেষপালক মেষদের তাদের আদর করেন, যত্ন নেন, তাদের সুখ-দুঃখের কথা হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন; তার মেষদের প্রাণভরে ভালোবাসেন। এমনকি, মেষপালক মেষদের জন্যে তার নিজের প্রাণও দান করেন - ঠিক যিশুর মত, যিনি বলেন: "আমার মেষদের জন্যে আমি নিজের জীবন বিসর্জন দেই" (*যোহন ১০:১৫*)। সেই আলোকেই পোপ ফ্রান্সিস ২৮ মার্চ ২০১৩, পবিত্র তেল আশীর্বাদের খ্রিস্টযাগের উপদেশে প্রত্যেক পুরোহিত (ও ব্রতধারী-ব্রতধারিণীদের) উদ্দেশে বলেছেন: "মেষপালকের গায়ে থাকবে মেষের গন্ধ। যদি একজন পুরোহিত মেষপালক হয়ে থাকেন, তবে তার কাছ থেকে অবশ্যই মেষের গন্ধ আসবে, যেহেতু তিনিই মেষদের সব চেয়ে কাছের ব্যক্তি। তদ্রুপ, একজন পুরোহিতকে অবশ্যই হতে হবে তার জনগণের সব চেয়ে কাছের মানুষ, তাদের গায়ের গন্ধ তার থাকবেই।" ("A priest should smell of sheep. If a priest were, let's say, a shepherd, he must smell of sheep, as he has to be the person closest to his sheep. 'Likewise, a priest must be the person closest to his people, smelling and smelling of their flesh.")[৬]

(৪) "প্রান্তসীমানায় যাও" ("Go to the peripheries---")

পুণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিস ২৮ আগস্ট, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ভাতিকানে আগত ফ্রান্সের একটি সংগঠন French "Lazare" Association-এর একদল সদস্যদের সাথে সাক্ষাতের সময় তাদের বলেন: "প্রান্তসীমানায় যাও, যা সাধারণত একাকিত্ব, বেদনা, অন্তরের ক্ষত এবং জীবনের প্রাণবন্তহীনতার গ্লানিতে পূর্ণ। তোমাদের কথায় ও কর্মে ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে সান্ত্বনার ও নিরাময়কারী তৈল ঢেলে দাও।" ("Go to the peripheries, which are often filled with solitude, sadness, inner wounds and loss of a zest for life. With your words and actions, pour the oil of consolation and healing on wounded hearts.")।[৭]

পোপ মহোদয় পুরোহিত/প্রচারকদের উদ্দেশে যা বলেছেন, তা তিনি বাস্তবে নিজে প্রথমে করেছেন। ৩১ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বের, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে, মঙ্গোলিয়াতে পোপ ফ্রান্সিসের সাম্প্রতিক পালকীয় সফর তার বাস্তব ও উজ্জ্বল প্রমাণ। মাত্র ১,৪৫০ জন কাথ লিকদের দেশ মঙ্গোলিয়াতে তিনি ৮৬ বছর বয়সে ছুটে যান তাদের কাছে একজন দরদী, মেষপ্রেমিক, দয়ালু পিতা হয়ে এবং সেখানে তিনি দীর্ঘ পাঁচ দিন অবস্থান করেন। ভাতিকান থেকে সুদুর মঙ্গোলিয়ায় বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদের দেশে অতি ছোট্ট কাথলিক মণ্ডলীর কাছে তিনি দীর্ঘ পাঁচ দিন অবস্থান করেন। আমার কাছে এটি খুবই অবাক লাগে যে, সুদূরের মেষদের জন্যে তার অন্তরের গভীর ভালোবাসা ও টান দেখে। এ যেন পোপ ফ্রান্সিসের জীবনে যিশুর অমর বাণীর বাস্তব প্রতিফলন: "আমি প্রকৃত মেষপালক। আমার মেষগুলিকে জানি আর আমার মেষগুলিও আমাকে জানে। আমার মেষদের জন্যে আমি নিজের প্রাণ বিসর্জন দেই" (*যোহন ১০:১৪-১৫*)। অর্থাৎ, মেষপাল যেখানে, মেষপালক থাকবে সেখানে ।

(৫) অন্তর্ভূক্তিমূলক মণ্ডলী (Inclusive Church)

যিশুর বাস্তব জীবনে যেমন ধনী-গরীব, পাপী-সাধু, অবহেলিত, যোগ্য-অযোগ্য, তুচ্ছ, নগন্য, পতিতা, অবাঞ্চিত, সমাজচ্যুত, ইত্যাদি সকলের স্থান ছিল, ঠিক তেমনি তাঁর স্থাপিত মণ্ডলীতে সকলের স্থান রয়েছে, সকলের সমান অধিকার। তাই, পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের মাণ্ডলিক পালকীয় ধ্যানে-দর্শনে ফুটে উঠেছে সমস্ত মানুষের জন্যে যিশুর হৃদয়ের গভীর ভালোবাসা - যার প্রকাশ তার বিখ্যাত ধ্যানমন্ত্র: "tutti, tutti, tutti", : "Everyone, Everyone, Everyone": "সকলে, সকলে, সকলে"।

অতীতে বিভিন্ন সময় মণ্ডলী বিভিন্ন আইন তৈরী করে 'অনুপযুক্ত' ('disqualified') ও অবাঞ্চিতদেরকে শাস্তি দিয়ে মণ্ডলীর বাইরে রেখে দেওয়া হয়েছে; এমন কি, অতীতে কাউকে কাউকে মণ্ডলী হতে 'ত্যাজ্য' বা 'বহিষ্কৃত' ('excommunicated') করা হয়েছে - বিশেষ ভাবে, ভিন্ন মতাবলম্বী ও ভ্রান্ত-মতবাদীদেরকে। উদাহরণ স্বরূপ, গালিলিও, মার্টিন লুথার, এরিও,---। বিগত বছরগুলোতে, বিশেষ ভাবে, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পূর্বে (এবং পরবর্তীতেও) মণ্ডলীর আইন অমান্যকারীদেরকে, যেমন: কোর্ট ম্যারিজ করা ব্যক্তি, অবৈধ সন্তান জন্মদানকারী, অবৈধ বিবাহকারী ও বহু বিবাহকারী, বিবাহ বিচ্ছেদকারী, অন্য ধর্মের ব্যক্তিকে বিবাহকারী, ইত্যাদি ব্যক্তিদের বিভিন্ন ধরণের শাস্তি দেওয়া হতো; কোথাও কোথাও পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল; রবিবার দিন গির্জার উপাসনার সময় সকলের সামনে মোমাবাতি ধরে দাঁড়ানোর বিধান ছিল। খ্রিস্টান সমাজে এখনো এই ধরণের ব্যক্তিরা অনুরূপ শাস্তি ভোগ করে থাকে তারা কোথাও কোথাও সমাজচ্যুত হয়ে থাকে।

পোপ ফ্রান্সিসের Synodality-এর ধারণায় যিশুর দ্বারা স্থাপিত মণ্ডলীতে কেউ অবাঞ্চিত নয়, কেউ ফেলে দেওয়ার বা ফেলে রাখার নয় - কেননা, যিশু-হৃদয়ের ভালোবাসায় সবারই স্থান ছিল এবং থাকবে। তাই, পোপ ফ্রান্সিস যখন চিরাচরিত প্রথা ভেঙ্গে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করছেন: "সকলে,সকলে, সকলে", তখন মনে হচ্ছে, তা যেন মরুভূমিতে দীক্ষাগুরু যোহনের একটি কণ্ঠস্বর: "তোমরা মন ফিরাও।" তাই তিনি বলছেন যে, যিশুর মণ্ডলীতে বিবাহ

বিচ্ছেদকারী, সমাজচ্যুত, তৃতীয় লিঙ্গ (হিজরা বা Transgender people), মণ্ডলীর নিয়ম ভঙ্গকারী - তথা, সবারই স্থান রয়েছে। ভাতিকানের নৈতিক শিক্ষা দপ্তর (Vatican's doctrinal office) এমনও বলছে যে, "তৃতীয় লিঙ্গ (হিজরা) কোন ব্যক্তির ধর্মপিতা/মাতা হতে পারে, কোন ধর্মসম্মত বিবাহের সাক্ষী হতে পারে এবং কাথলিক মণ্ডলীতে তারা দীক্ষা নিতে পারে" ***("Transgender people can be godparents at Roman Catholic baptisms, witnesses at religious weddings and receive baptism themselves")*** ।[৮]

৬) একতানে চলা মণ্ডলী এবং মহিলা যাজক ও ডিকন (Synodality in the Church and Women Ordination)

একতানে বা একসাথে অংশগ্রহণকারী মণ্ডলী বা Synodal Church - এই বিষয়টি এখনো পর্যন্ত কাথলিক মণ্ডলীতে বড় একটি প্রশ্ন, ঐশতাত্ত্বিক বিতর্ক ও চ্যালেঞ্জ। এমনও প্রশ্ন আজ কাল করা হচ্ছে যে, মণ্ডলীর সর্বক্ষেত্রে একসাথে অংশগ্রহণ বা Synodality কি সম্ভব, যখন মণ্ডলীর বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এর প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যার তেমন কোন অংশগ্রহণ থাকে না? বিশেষ করে, নারী ধর্মব্রতিনীগণ ও নারী নেতৃবর্গ সেই প্রশ্নই মণ্ডলীর দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছেন। তারা এবং কিছু বিজ্ঞ ঐশতত্ত্ববিদ সেই দিকেই মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন - যেখানে অনেক দেশে ও সমাজে নারীরা পুরুষের পাশাপাশি অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়ে অনেক মহৎ দায়িত্ব সুচারু রূপে পালন করে চলেছেন। তারা মণ্ডলীতে নারীদের আরো সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রত্যাশা ও দাবি করেন - যেমন: মহিলা ডিকন, মহিলা পুরোহিত, ইত্যাদি।

এই ক্ষেত্রে কিছু প্রটেস্টান্ট মণ্ডলী কাথলিক মণ্ডলীকে আলোকিত করতে পারে। বাংলাদেশেই আমি দেখেছি যে, কিছু প্রটেস্টান্ট মণ্ডলীতে মহিলা ডিকন, মহিলা অভিষিক্ত পুরোহিত রয়েছেন। এমন কি, আমি একবার বাংলাদেশে আফ্রিকার কোন একটি দেশ থেকে আগত একজন মহিলা বিশপ দেখেছি। কাথলিক মণ্ডলীর জন্যে বড় একটি চ্যালেঞ্জ: মণ্ডলী কোন পথে হাঁটবে এবং এগিয়ে চলবে।

মণ্ডলীতে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রসঙ্গে পেরুর কার্ডিনাল পেদ্রো বারেতোর বক্তব্য অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লাতিন আমেরিকার একজন প্রভাবশালী কার্ডিনাল।

মণ্ডলীতে নারীদের গুরুত্ব প্রসঙ্গে তিনি ৩০ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষে *Crux* পত্রিকার সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেন: "আজ মণ্ডলী, বিশেষ ভাবে, লাতিন আমেরিকায়, যদি নারীরা অংশগ্রহণ করা বন্ধ করে দেয়, তবে মণ্ডলীর অস্তিত্ব থাকবে না। এটিই বাস্তব। আমার ধর্মপ্রদেশে নারী ধর্মব্রতিনীগণ রয়েছেন যারা দীক্ষাস্নান দিচ্ছেন, বিবাহ আশীর্বাদ করছেন, যেসব ধর্মপল্লীতে পুরোহিত নেই সেখানে উপাসনা পরিচালনা করছেন"। ("Today in the Church, especially in Latin America, if women stopped participating, the Church would not exist. This is real. In my archdiocese, I have women religious who baptize, who celebrate marriages, who celebrate for liturgies in parishes where there are no priests.")[৯]

৭) মণ্ডলীতে সমকামী, লেসবিয়ান ও হিজড়াদের স্থান (Homosexuals, Lesbians and Eunuchs in the Church)

মণ্ডলীতে সমকামী ব্যক্তি ও লেসবিয়ানসদের স্থান ও ভূমিকা নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক অনেকটা নতুন হলেও বিষয়টির গুরুত্ব অনেক। বহু বছর ধরে মণ্ডলী এই বিষয়টি মনে হয়েছে এড়িয়ে চলেছে বা চুপ থেকেছে। ঈশ্বরের পরিকল্পনায় মানুষের মধ্যে জন্মসূত্রেই কেউ সমকামী, কেউ লেসবিয়ান, আবার কেউ হিজড়া হয়েছে। তাই, এদের জন্মের জন্যে এরা তো কেউ দায়ী নয়। কিন্তু মণ্ডলীতে, সমাজে, এমন কি, পরিবারে এদের স্থান কি? বাংলাদেশসহ আরো কিছু দেশের অভিজ্ঞতা বলছে: এরা মানব-সমাজে সবচেয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। এরাও যে মানুষ, তথা মানবীয় ব্যক্তি (human person) হিসেবে গণ্য হচ্ছে না। কোথাও জন্মদাতা নিজ পরিবার এদের ত্যাজ্য করছে; নিজ সমাজ এদের তুচ্ছ ভেবে ছি: ছি: করছে এবং ত্যাজ্য করছে; রাষ্ট্র এদের মর্যাদা দান, কর্মদক্ষতা সৃষ্টি ও সুরক্ষায় অক্ষমতা প্রকাশ করছে। যিশুর যে হৃদয়টিতে সবার স্থান আছে, তাঁর স্থাপিত সেই মণ্ডলীতে এদের জন্য কোন স্থান, মর্যাদা ও ভূমিকা আছে কি?

পোপ ফ্রান্সিস একজন প্রাবক্তিক পোপ হিসেবে এক যুগান্তকারী মঙ্গলবাণী উচ্চারণ করেছেন, যা আমাদের সবার হৃদয়-মনের দ্বার খুলে দিচ্ছে। ২ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষে ইতালিয়ান টেলিভিশন RAI কর্তৃক Synod on Synodality I homosexuality - এই দুটি বিষয়ের উপর পোপ মহোদয়কে প্রশ্ন করা হয়। বা সমকামিতার তখন তিনি উত্তরে বলেন: "আমি যখন বলি: সকলে,সকলে, সকলে, তখন আমি লোকদের বিষয়ে বলি। মণ্ডলী সকলকে গ্রহণ করে। সকলকে। তখন এটি জানতে চায় না তুমি কোন ধরণের মানুষ। আর তখন মণ্ডলীর ভিতরে সবাই বৃদ্ধি পেতে থাকে, কিন্তু একজন খ্রিস্টান হিসেবেই।" ("When I say 'everyone, everyone, everyone,' [I'm speaking about] people. The Church receives people. Everyone. And it does not ask how you are. Then, inside, everyone grows, but from a Christian belonging.")।[১০]

(৮) বিবাহ বিচ্ছেদ (Divorce) ও মণ্ডলীতে বিবাহ বিচ্ছেদকারীর (Divorcee) স্থান

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই রাষ্ট্রীয় আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ (Divorce) আইনসিদ্ধ ও বৈধ। অর্থাৎ, রাষ্ট্রীয় আইনে তা কোন অপরাধ (বা পাপ) নয়। দিন দিন সব দেশেই সকল ধর্মের ও মতাদর্শের মানুষের মাঝে বিবাহ বিচ্ছেদ বাড়ছে এবং তা ঊর্ধ্ব গতিতে ছুটে চলেছে। এমন কি, কিছু কিছু কাথলিক খ্রিস্টান অধ্যুষিত দেশেও বিবাহ বিচ্ছেদ রাষ্ট্রীয় আইনে বৈধতা দান করা হয়েছে। মণ্ডলীতেও এই ধরণের বিবাহ বিচ্ছেদ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমাদের প্রথাগত 'এক স্বামী এক স্ত্রী' - যিশুর এই শিক্ষা মেনে চলতে অনিহা প্রকাশ করছে। ফলে, এরূপ ব্যক্তিদের অনেকে মাণ্ডলিক বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের কারণে গির্জা-প্রার্থনা পরিহার করছে এবং মণ্ডলীর বাইরে থেকে যাচ্ছে, যা পরবর্তীতে তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, সমাধি দান এবং তাদের সন্তানদের দীক্ষা ও অনান্য সংস্কার প্রদান কঠিন হয়ে উঠছে। পোপ ফ্রান্সিস আহ্বান জানাচ্ছেন যে, মণ্ডলীর দ্বার যেন এদের জন্যে বন্ধ হয়ে না যায়, বরং উন্মুক্ত যেন থাকে। কেননা, তার ভাষায়: মণ্ডলী সকলকে গ্রহণ করে; মণ্ডলী সবার জন্যে। মণ্ডলী নিয়ে তার বিখ্যাত ধ্যানমন্ত্র: "Everyone, Everyone, Everyone": "সকলে, সকলে, সকলে"।

নিম্নোক্ত আরো কতকগুলো বিষয় বর্তমান মণ্ডলীর জন্যে বিশেষ চ্যালেঞ্জ স্বরূপ:

৩। মুক্ত যৌনতা (Free Sex)

বর্তমান উন্মুক্ত বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম বিকাশের যুগে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্মে উন্মুক্ততার প্রভুত প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এবং দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষ পূর্বের মত নিজেকে পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চায় না বা পছন্দ করে না। বর্তমান যুগ উন্মুক্ততার যুগ - কোথাও কোথাও লাগামহীন উন্মুক্ততা পরিবার, সমাজ ও ধর্মীয় নেতৃবর্গকে দারুণ ভাবে ভাবিয়ে তুলছে। গণতন্ত্র ও উন্মুক্ততা (---) - এই দুইয়ের সমীকরণে প্রচলিত পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতি, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও নেতৃত্ব দারুণ ভাবে হোঁছট খাচ্ছে এবং চ্যালেঞ্জের মুখে পতিত হয়েছে। গণতন্ত্রের বুলি 'ব্যক্তি স্বাধীনতা'র দোহাই দিয়ে " My Body is my right" "আমার দেহ আমার অধিকার"- এই জাগতিক মন্ত্রে বিশ্বাস করে কেউ কেউ নিজ দেহকে বানিজ্যিক পণ্য হিসেবে গণ্য করছে; কেউ বা

নিজেকে পতিতাবৃত্তিকে নিয়োজিত করছে।

অনেকে আজ যৌনতকে বিবাহের বেড়াজালে আবদ্ধ রাখতে চায় না, তাকে মুক্ত করে 'মুক্ত যৌনতা'র প্রমোদ তরীর সুখাসনে বসিয়েছে এবং জীবন-যৌবন-যৌনতাকে সীমাহীন ভাবে ভোগ করছে। সেখানে তারা পাপ-পুণ্য বলে কিছু দেখছে না, ব্যভিচার হিসেবেও ভাবছে না। "তোমাদের দেহ হলো তোমাদের অন্তর-নিবাসী পবিত্র আত্মার মন্দির" (*১ করিন্থীয় ৬:১৯*) - এই ধর্মীয় শিক্ষাকে তারা ক্রুশে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে। তাতে অবশ্য তাদের কোন যায় আসে না, কোন খারাপও লাগে না। অনেকে আবার উন্মুক্ত যৌনতাকে প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যকার ভালোবাসার চিহ্ন হিসেবে দেখছে। সেই ক্ষেত্রে মণ্ডলীর নৈতিক শিক্ষা হলো: "বিবাহের আধ্যাত্মিকতা হলো যৌনতা। আনন্দময় গভীর সান্নিধ্য হলো দম্পতিদের আহ্বান, তাদের জন্যে ঈশ্বরের পরিকল্পনা। প্রকৃত পক্ষে, ঈশ্বরের সাথে তাদের গভীর সান্নিধ্য প্রকাশের এটি একটি সুযোগ।"("Marital spirituality, then, is sexual. The joyful intimacy is the vocation of the spouses, God's plan for them. It is the occasion, indeed the intrument, of their closeness to God…")।[১১]

৪। বিবাহ-বহির্ভূত সন্তান ও মণ্ডলীর নৈতিকতার চ্যালেঞ্জ

অবাধ স্বাধীনতা ও উন্মুক্ততার যুগে পাশ্চাত্যের কিছু কিছু দেশে ধর্মীয় বিবাহ বহির্ভূত সন্তান জন্মদান বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বেশ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে - যা মণ্ডলীকে ভাবিয়ে তুলছে। নিম্নে বিবাহ-বহির্ভূত সন্তান জন্মদানের কিছু দেশের চিত্র এখানে তুলে ধরা হলো।

ইউরোপের মধ্যে ফ্রান্সে সব চেয়ে বেশি বিবাহ-বহির্ভূত সন্তানের জন্ম হয়। প্রতি ১০০ জন শিশুর মধ্যে ৬০ শিশুর বাবা-মা বিয়ে ছাড়া সন্তান জন্ম দেয়। ফ্রান্সের পর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বেলজিয়াম: ৫৮.৫ জন শিশুর জন্ম বিবাহ-বহির্ভূত। স্লোভেনিয়ায় এই হার ৫৭.৭ এবং পর্তুগালে এই হার ৫৭.৫৫। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপে এরূপ শিশুদের জন্মোহার ছিল ২৫ শতাংশ; ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে এই হার ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে এরহার ছিল ৪২ শতাংশ।[১২]

৫। গর্ভপাত ও কৃত্রিম জন্ম-নিয়ন্ত্রণ

এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মণ্ডলীতে ভিন্ন ভিন্ন মত ও নৈতিক শিক্ষা প্রচলিত রয়েছে। অনেক দেশে গর্ভপাত ও কৃত্রিম জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বৈধ হিসেবে আইনগত ভাবে বৈধতা আছে। এমন কি, কিছু কাথলিক সংখ্যা গরিষ্ঠদেশেও গর্ভপাতকে আইনগত ভাবে বৈধতা দিয়ে রাষ্ট্রীয় আইন পাস হয়েছে। অথচ, কাথলিক চিরাচরিত ভাবে এই নৈতিক শিক্ষা দিয়ে আসছে যে, নরহত্যা মহাপাপ। গর্ভপাত যেহেতু ভ্রুণ অবস্থায় একটি নরহত্যা, তাই তা একটি মহাপাপ। কিন্তু অনেক খ্রিস্টান ব্যক্তি আজ তা তোয়াক্কা করছে না; আর রাষ্ট্র তো তা করার জন্যে আইনই পাস করিয়ে নিয়েছে। কৃত্রিম জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিও অনেকটা যেন অচল হয়ে পড়েছে। এসব ক্ষেত্রে মণ্ডলীর নৈতিকতার শিক্ষাও যেন ক্ষীণ হয়ে আসছে; বরং জাগতিক বা রাষ্ট্রীয় আইন বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে।

৬। একক মাতৃত্ব/পিতৃত্ব (Single Parenthood)

বর্তমান যুগে বেশ কিছু নারীর মধ্যে এই আবেগজনিত ধারণাটি প্রসার লাভ করছে যে, তারা অন্তরে মাতৃত্বের ক্ষুধার কারণে সন্তান লাভ করে মা হতে চান, কিন্তু স্বামী চান না। সারা জীবনের জন্যে স্বামী থাকা, বা স্বামীর অধীন হয়ে থাকা আজকাল অনেক নারী পছন্দ করছেন না। ফলে, তারা বিবাহ বহির্ভূত সন্তান লাভ করছেন। সেই ক্ষেত্রে তাদের জীবন কতটুকু ধর্ম-সঙ্গত, বা মণ্ডলীর আইন সঙ্গত, তা তারা ধার ধারছেন না। তাছাড়া, ভবিষ্যতে তাদের সন্তানের চরিত্র, বিবাহ, মানবিক ও নৈতিক জীবন কেমন হবে, তা-ও তারা গভীর ভাবে দেখতে উপেক্ষা করছেন। এরূপ ক্ষেত্রে, মণ্ডলীর আইনকানুন, দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্ষা কী হবে - তা সত্যই একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

৭। ভাড়াটে মা (Surrogate Mother)

ভাড়াটে মা-অতি সাম্প্রতিক কালের এই ধারণাটির সজ্ঞায়িত করা হয়েছে এই ভাবে: Surrogate Mother: "a woman who bears a childon behalf of another woman, either from her own egg fertilizedby the other woman's partner,or from the implantation in heruterus of a fertilized egg from the other woman"।[১৩]

বর্তমানে ভাড়াটে মায়েদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, যেহেতু আধুকিতার যুগে নানান জটিলতায় বেশ কিছু নারী নিজ সক্ষমতায় 'মা' হওয়ার পরম সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাই অন্তরের গভীরে 'মা' হওয়ার এক গভীর ক্রন্দনের কারণে তাদের কেউ কেউ 'ভাড়াটে মা'-এর সাহায্য নিয়ে নিজেদের মাতৃত্বের অতৃপ্ত ক্ষুধা মেটাচ্ছেন। গত শতাব্দীর পূর্বে এমনটি শোনা যায়নি, কেননা তখন চিকিৎসা বিজ্ঞান এত উন্নত ছিল না। তাই এটি বর্তমান যুগের মণ্ডলীর চ্যালেঞ্জ এই জন্য যে, এরূপ ক্ষেত্রে বর্তমান মণ্ডলীর শিক্ষা ও নৈতিকতার ভিত্তি কী হবে, তা নির্ধারণ করা। মণ্ডলীর প্রচলিত রীতি-নীতি ও আইন মোতাবেক সন্তানের জন্মদান (procreation) হবে শুধু মাত্র বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলনের মধ্যদিয়ে।

তাছাড়া, নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর মাণ্ডলিক নৈতিক শিক্ষা আরো স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। যেমন:

ক. একত্র বাস (Live-toegether),
খ. কৃত্রিম উপায়ে জাত মানবশিশু (Test-tube babies)
গ. পিতাহীন সন্তান লাভ
ঘ. বীর্য ব্যাংক (Sperm Bank)
ঙ. যন্ত্রণাহীন মৃত্যু (Painless Death), ইত্যাদি।

৮। যাজকীয় ও ব্রতচারী জীবনের আহ্বানের প্রতি চ্যালেঞ্জ ও সংকট

একক পিতৃত্ব/মাতৃত্ব - এরূপ ব্যক্তিদের সন্তান, বিবাহ-বহির্ভূত সন্তান, পিতাহীন সন্তান, বিবাহ বিচ্ছেদকারীদের সন্তান - এদেরকে যাজকীয় ও ধর্মব্রতী জীবনে গ্রহণ করা হবে কি-না, তা বড় একটি প্রশ্ন। মণ্ডলী ও সমাজের কাছে এসব প্রশ্নের উত্তর এত সহজ নয় বলেই মনে হয়। কেননা, মণ্ডলীতে ও সমাজে এরূপ ব্যক্তির সন্তানদের গ্রহণীয়তা কতটুকু থাকবে, তা বড় প্রশ্নবোধক। এসব নানাবিধ কারণে মণ্ডলীতে যাজকীয় ও ব্রতচারী জীবনের প্রতি আহ্বান একটি চ্যালেঞ্জ ও হুমকিস্বরূপ এবং তা সংকটে পড়েছে, এবং দিনে দিনে নিবেদিত জীবনের প্রতি আহ্বান সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে।

উপসংহারে বলা যেতে পারে, মণ্ডলীর নেতৃ বর্গকে এসব নানাবিধ কঠিন বিষয়ের সুন্দর সঠিক খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ভিত্তিতে উত্তর খুঁজে বের করে জনগণকে যিশুর পথে চলতে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে হবে। অন্যথায়, লোকেরা তখন নিজেরাই তাদের সুস্থ-অসুস্থ বিবেক নিয়ে যে যার মত জীবনের পথে এগিয়ে যাবে। এমতাবস্থায় মণ্ডলীকে হয়তো বা নির্বাক তাকিয়ে তাকিয়ে তা দেখতে হবে জনগণের দুর্ভোগ, যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। খ্রিস্টমণ্ডলী হলো যিশুর মত, যিশুর নামে এবং যিশুর স্থানে জগতের আলো। তাই দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার একটি বিখ্যাত দলিলের নামকরণই করা হয়েছে: 'আনন্দ ও আশা' ('Gaudium et spes': 'Joy and Hope')। যিশু নিজেও বলেছেন: "তোমরা জগতের আলো স্বরূপ। তোমাদের আলো অন্যের সামনে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলুক" (*মথি ৫:১৪*)। যিশুই আমাদের প্রত্যাশার আনন্দ; তিনিই তাঁর মণ্ডলীর পালক এবং আমাদের চালক। জগতের সবার সামনে যিশুর আলো মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে আরো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলুক -এই আনন্দময় আশা রাখি ও প্রার্থনা করি॥

উন্মাদ!

মিল্টন রোজারিও

সেদিন আমি একজনকে বললাম, তোমার ভাই তো একটা উন্মাদ। ব্যস, হয়ে গেল। সে আর যাবে কোথায়! রেগে মেগে ভাইকে জানালো। আমি ভেবেছিলাম আমার কথাটি সে গুরুত্বের সাথে নেবে! কেন আমি তাকে এই কথাটি বললাম, জিজ্ঞেস করবে; কিন্তু না! আমার কথাটি গুরুত্বহীন হয়ে হিতে-বিপরীত হয়ে গেল। হঠাৎ যেন আশ্বিনে কালো মেঘ, বজ্র এবং টর্ণেডো এসে পড়লো আমার উপর! আমি তো বিনে মেঘে বজ্র এবং টর্ণেডোর আঘাতে হতভম্ব। পরবর্তিতে আমি সব দেখে শুনে বুঝে সামলে নিলাম। আবহাওয়া অফিসকে কোন দোষারোপ না করে নিজের দিকে দোষারোপ করলাম এই ভেবে যে, মা আমাকে ছোটবেলায় বলেছিলেন, পাগলকে কখনো পাগল বলতে নেই। আমি মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন মা? মা তখন বলেছিলেন, পাগলকে পাগল বললে সে ক্ষেপে যাবে। তোমাকে মারতে আসবে। খারাপ খারাপ কথা বলবে। কথাটি মনে থাকে যেন। আমি বলেছিলাম, ঠিক আছে মা।

ছোটবেলায় আমাদের এলাকার বাজারে কেতু পাগলা, মাটু পাগলাকে দেখেছি। তাদের আচার-আচরণ দেখেছি। কেতু পাগলা বা মাটু পাগলাকে আমি কখনো পাগলামী করতে দেখিনি। কেতু পাগলাকে সব সময় বান্দুরা বাজারেই ঘুরতে দেখেছি। একটি লেংটি পড়ে খালি গায়ে সারা বাজার দিয়ে ঘুরে বেড়াতো। আমরা সকালে যখন হাসনাবাদ ডন-বস্কো স্কুলে যেতাম তখন তাকে মেউছ্যা ঘরে শুয়ে থাকতে দেখেছি। বেঘোরে ঘুমিয়ে থাকতো মাটির বিছানায়। বাজারের মানুষজন যে যা দিতো তাই খেয়ে কেতু জীবন ধারণ করতো। মার্টিনকে বলা হতো মাটু পাগলা। এলাকায় খুব নাম করা একজন ফুটবল খেলোয়ার ছিলেন তিনি। স্টপার ব্যাক হিসেবে খেলতেন সব সময়। তার ফুটবল মার ছিল দেখার মত। বিপক্ষের খেলোয়ারেরা যখন বল নিয়ে গোল দেয়ার জন্য এগিয়ে আসতো, মাটু পাগলা তখন তাদের পা থেকে বল নিয়ে এমন জোড়ে লাথি মারতেন যেন বলটি ফেঁটে যাবে। তার মারে বল আকাশ ছুঁই-ছুঁই করে মাঠের বাইরে গিয়ে পড়তো, আর এই মার দেখে মাঠের দর্শকেরা বলতো, মাটু পাগলার মার, মাঠের বাইর।

আমরা অনেক সময় মজা করার জন্যে অন্যকে পাগল বলে আখ্যায়িত করে থাকি এবং উৎফুল্ল হই তার পাগলামী দেখার জন্যে। প্রতিটি মানুষের ভিতর কিন্তু কিছুটা পাগলামীর ভাব আছে। কারো ভিতর বেশি, কারো ভিতর কম। কেউ পাগলামী প্রকাশ করে তার কথায়, তার আচার-আচরণে, চলন বলনে। কেউ আবার স্বভাবগত ভাবে সেটাকে সংবরণ করে রাখে। মা-বাবা তার ছেলে বা মেয়েকে অনেক সময় বলে থাকেন, আমার পাগল ছেলেটা বা পাগল মেয়েটা। তাতে কিন্তু কেউ পাগল হয়ে যায় না। আবার অনেকে আছে নিজেকে সত্যি পাগল ভেবে উত্তেজিত হয়ে উন্মাদের মত আচরণ করে থাকে। এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে থাকে। এই সব পাগলেরা হয় জ্ঞান-পাগল। পাগলামী করে নিজের স্বার্থ হাসিল করতে চায়।

আমাদের সমাজে প্রায় প্রতিটি গ্রামে, পাড়ায়, মহল্লায় অনেকেই এমনি পাগলের খেতাবের অধিকারী রয়েছে। বলাবাহুল্য, আমরা আমাদের এলাকার কয়েকজনের নাম উল্লেখ করতে পারি যেমন - যুদ্যাব পাগলা, হেবল পাগলা, জানি পাগলা, বিমল পাগলা, মেনু পাগলা, নিজু পাগলী, কাননের মা পাগলী, বেনী পাগলা এবং আরো অনেকে। তবে এদের মধ্যে কেউ কিন্তু প্রকৃত অর্থে ডাক পাগল নয়। পারিপার্শ্বিক কারণে এরা পাগল হয়েছিল। কিছু কিছু মানুষ এদেরকে নিয়ে পাগলামী করে বেশ মজা পেতো।

পরিবেশগত ভাবেও অনেকে পাগল হতে পারে। ছোট বেলায় আমরা অনেকে গল্পে পড়েছি, শুনেছি এবং আমরা অনেকে ইংরেজি "টারজান" ছবিটি দেখেছি। একটি পরিবার বিমান দুর্ঘটনায় জঙ্গলে পড়ে যায়। পরিবারের ছোট শিশুটি জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তারা আর সেই শিশুটিকে খুঁজে পায় না। অবশেষে সেই শিশুটি জঙ্গলেই একটি শিম্পাঞ্জি পরিবারে আশ্রয় পেয়ে বড় হতে থাকে। শিম্পাঞ্জির মত আচার-আচরণ শিখে। খায় বনের ফল, মধু, কাঁচা পশু-পাখির মাংস। একজন মানুষ হয়েও মানুষের সংস্পর্শ না পেয়ে মানুষের মত স্বভাবিক চলতে বলতে পারে না। তার আচার-আচরণ হয় সব শিম্পাঞ্জির মত। সাধারণ মানুষের মাঝে এলে স্বভাবতঃ সেই শিশুটির আচার-আচরণ দেখলে যে কেউ তাকে পাগল বলেই আখ্যায়িত করবে।

আমরা আমাদের বাস্তব জীবনের দিকে তাকালে আরো দেখতে পাবো। যেমন, আমরা যখন ছোট্ট শিশু ছিলাম, তখন আমাদের মা, বাবা, পিসি-মাসি, ঠাকুরমা-নানীরা আমাদের হাত ধরে হাঁটতে শিখিয়েছেন। কথা বলতে শিখিয়েছেন। মাকে মা, বাবাকে বাবা ডাকতে শিখিয়েছেন। পানিকে পানি, দুধকে দুধ বলতে শিখিয়েছেন বলেই আজ আমরা খুব সহজে এই ভাষায় কথা বলতে পারছি এবং সব জেনেছি এবং শিখেছি। আর যদি সেই টারজান শিশুর মত হতাম, তাহলে নিশ্চয়ই স্বাভাবিক মানুষের মত কথা বলতে বা চলতে পারতাম না। উপরন্তু আমাদের সবার ধ্যান-জ্ঞান এক নয়। হতে পারে না। প্রত্যেকজন মানুষের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা আলাদা-আলাদা হয়ে থাকে। তার একটি উদাহরণ স্বরূপ যদি বলি, কোন ছেলে হয়তো তার বশতঃ বড় বড় চুল-দাঁড়ি রাখলো। আমরা অনেকে তাকে দেখে তখন বলে ফেলি ছেলেটি পাগল নাকি! ঠিক তেমনি মেয়েদের বেলায়ও বলি যদি দেখি তাকে স্বাভাবিক থেকে অস্বাভাবিক ড্রেস বা সাজগোজ করে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে আসে।

উন্মাদদের আচার-আচরণ সাধারণত কেমন হয়ে থাকে? কেউ হয়তো কারণ ছাড়াই অনর্থক হাসছে, কাঁদছে অথবা কথা বলছে। কেউ আবার হয়তো কাউকে উদ্দেশ্য করে বকাবকি করছে ইত্যাদি। আমার দেখা এক পাগলীর কথা বলতে পারি। আমাদের বাড়ীর

কাছেই ছিল তাদের বাড়ী। সব সময় দেখতাম সেই পাগলী বাড়ীর পথের হালটে মাটিতে ধূলাবালিতে বসে থাকতো। একা একা ভুনুর ভুনুর করতো, মাথা থেকে উকুন এনে মারতো। কেউ কিছু বললে, শুধু হাসতো। মুখে কিছুই বলতো না। এই ধরনের পাগল বা পাগলীরা সবার সাথে পাগলামী করে না। কাউকে কাউকে তারা মান্য করতো, তাদের কথা শুনতো। তাদের হাতে খাবার খেতো। আর একজন পাগলীকে দেখেছি, তার নাম ছিল কাননের মা। সে সব সময় একটি লাল সুয়েটার পরে থাকতো। একটি উঁড়ায় বেশ কিছু খড়ি-লাঠি নিয়ে ঘুরতো। খাবারের মধ্যে দেখেছি তাকে প্রচুর পান খেতে। কাননের মার স্বভাব ছিল একা একা কথা বলা।

উন্মাদ বা মানসিক রোগে আক্রান্ত যারা তারা কখনও স্বাভাবিক মানুষের মত আচরণ করতে পারতো না। এমন কি ঘরেও থাকতে চাইতো না। আমরা তাদেরকে সব সময় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে দেখি। আবার যারা ডাক-পাগল হয়ে থাকে তাদেরকে ঘরে বা বাড়ীতে শিকল বা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়। কারণ, তাদের দ্বারা যে কোন সময় যে কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দেওয়া সম্ভব।

মানুষ পাগল বা মানসিক রোগি হয় কেন? মানুষ পাগল বা মানসিক রোগি হয় যখন তার মস্তিষ্কের স্নায়ুর স্বাভাবিক কর্ম ব্যাহত হয়। তারপরও পাগল হবার আরো বহু কারণ রয়েছে। যেমন - প্রেমে ব্যর্থতা, টাকা-পয়সা হারানো, আপনজনদের হারানো ইত্যাদি। একটি উদাহরণ দিয়ে যদি বলি, কিছু দিন আগে বহু মানুষ শেয়ারের ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল। অনেকে প্রচুর টাকা-পয়সা কামিয়েছে আবার অনেকে প্রচুর কামিয়েও সেই টাকা ধরে রাখতে পারে নাই। শেয়ারে ধস্ নেমেছিল। অর্থাৎ অনেক শেয়ারের কোম্পানী হঠাৎ করে মানুষের টাকা-পয়সা নিয়ে উধাও হয়ে গেছে। কাজেই সেই সব মানুষদের মন-মানসিকতায়ও তখন ধস নেমেছিল। অনেকের হৃদস্পন্দন ঠিক মত কাজ করে নাই। এই সব ক্ষেত্রে অনেকের মস্তিষ্ক ঠিক মত কাজ করে না। তখন অনেকে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়, আবার অনেকের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে আর পাগল হয়ে যায়।

প্রকৃত অর্থে পাগলরা কিন্তু পাগল নয়। তারাও আমাদের মত মানুষ। তাদেরকে আমরা অসুস্থ বলতে পারি। আর এই অসুস্থতা হচ্ছে মানসিক, শারীরিক নয়। আমরা সাধারণ মানুষজন তাদেরকে না বুঝেই পাগল বলে থাকি। রাস্তার পার্শে উস্কো-খুশকো ভারসাম্যহীন মানুষকে দেখে আমরা নাক ছিঁটকাই তাকে পাগল বা পাগলী বলে থাকি। ভাবি মানুষটি পাগল/পাগলী। তাদেরকে আমরা মানুষের পর্যায়ে ফেলি না, আনতে চাই না। ভাবি না সেও আমার আপনার মত একজন মানুষ। চিকিৎসা বিজ্ঞানে বা মনোবিজ্ঞানদের মতে কাউকে পাগল বলা অপরাধ। আর প্রতিটি অপরাধ কিন্তু শাস্তিযোগ্য। মনোবিজ্ঞানীরা তাই এই সব অসুস্থ মানুষের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের পাবনা জেলার হেমায়েতপুরে এই সব অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

বর্তমানে আমাদের সমাজে নানাবিধ পাগলের দর্শন পাওয়া যায়। অর্থাৎ পাগলেরা আগে রাস্তা-ঘাটে থাকতো আর এখন প্রায় প্রতিটি ঘরেই একজন করে পাগল খুঁজে পাওয়া যাবে। এরা সবাই নেশাগ্রস্থ পাগল। সমাজে অবাধ এই নেশাকে প্রতিরোধ করতে না পারলে আমাদের আগামী প্রজন্ম মুখ থুবড়ে পরবে এতে কোন সন্দেহ নাই। মাদক এমন একটি গুপ্ত মরণ ব্যাধি যা সমাজের মানুষজন এখনও উপলব্ধি করতে পারছে বলে মনে হয় না। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এর প্রভাব এবং প্রকোপ তীব্রতর। গ্রামে বেকার ঘুরে বেড়ানো ছেলেদের পাশাপাশি কোথাও কোথাও মেয়েরাও এই ভয়ঙ্কর নেশায় জড়িয়ে পড়ছে। সরকারের জিরো টলারেন্স কোথাও এখনও সঠিক ভাবে দৃশ্যমান হচ্ছে না। সামাজিক বা ধর্মীয় যে কোন উৎসবে নেশা ছাড়া যেন তাদের চলেই না। এমনও শোনা যায়, কিছু কিছু এলাকার যুবকেরা যখন গোর খোদকের কাজ করতে যায়, তখন তারা নাকি ডোমদের মত নেশা সেবন করে থাকে। সচেতন মহল এখনই সচেতন না হলে আগামীতে প্রতিটি গ্রাম, মহল্লায়, পাড়ায় নেশাগ্রস্থ পাগলদের দৌড়াত্ব ভয়ঙ্কর ভাবে বেড়ে যাবে এতে কোন সন্দেহ নাই। আর আমাদের সব সুন্দর সুন্দর পরিবারগুলো ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে মাত্র একটি পরিবারে একজন নেশাগ্রস্থ ছেলে অথ বা মেয়ের জন্যে। তখন আর কাউকে বলতে হবে না, তোমার ভাই উন্মাদ নাকি??

সিনড বিশিষ্ট মণ্ডলী : বাইবেল...
(৭৩ পৃষ্ঠার পর)

হলো খ্রিস্ট সম্পর্কে অজ্ঞতা"। "ধন্য সেই মানুষ, ভগবানের বিধানই যার আনন্দ, তাঁর বিধানই যে নিশিদিন জপ করে!" (*সাম ১:২*)। বিধান বাণী শুনতে শুনতে তাদের সকলেরই চোখ দিয়ে জল ঝরছিল" (*নহেমিয়া ৮:৮*)। "বাইবেল ভুলেছি তো খ্রিস্টানরা মরেছি"। প্রতিদিন বাইবেল পাঠ ও ধ্যান অভ্যাসে গড়ে পরিণত হোক।

৩। ঈশ্বরের বাণী অনুসারে জীবনযাপনঃ পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন

পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়নের সুযোগ প্রতিটি ভক্তবিশ্বাসীর জন্যই থাকতে হবে। প্রকাশিত ঐশবাণী যাতে আমাদের ধর্মশিক্ষাকে এবং ধর্মবিশ্বাস হস্তান্তরর সকল প্রচেষ্টাকে শেকড়সুদ্ধ সমৃদ্ধ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খ্রিস্টাদর্শ প্রচারের অপরিহার্য দাবী হচ্ছে ঐশবাণীর সাথে ঘনিষ্ট পরিচয়; তা নিশ্চিত করতে হলে ধর্মপ্রদেশ, ধর্মপল্লী ও বিভিন্ন কাথলিক সংগঠনের পর্যায়ে অবিরাম মানসম্মত বাইবেল শিক্ষার প্রশিক্ষণকোর্স পরিচালনা করতে হবে। (*"মঙ্গলবার্তার আনন্দ", অনুচ্ছেদ ১৭৫*)। বাইবেল স্টাডি গ্রুপ আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা পাইনি। "তোমার বাণী তো প্রদীপের মতো আমায় দেখায় দিশা, তা যেন আমার পথে রেখে দেওয়া আলো" (*সাম ১১৯:১০৫*)।

উপসংহার

জীবন গঠনে বাইবেলের গুরুত্ব রয়েছে। ঐশাবাণী মণ্ডলীকে যুগে যুগে জীবিত ও শক্তিশালী রেখেছে। ঈশ্বরের জনগণ সর্বদাই বাণী থেকে শক্তিলাভ করেছে। মঙ্গলবাণী প্রচার হয়ে উঠুক আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার। আমরা হই মঙ্গলসমাচার প্রচারের একজন এজেন্ট। প্রেরণকর্মের চেতনা ও দায়বদ্ধতা পুনরুজ্জীবিত হোক। ঐশবাণী নিয়ে ধর্মপল্লীর তীর্থযাত্রায় আমরা আমাদের পথচলা অব্যাহত রাখি। আমরা মঙ্গলবাণী প্রচারের জন্য উদ্বুদ্ধ হই। আমরা একটু ভাবি ধর্মপল্লীতে বাস্তবতাগুলোর নিরিখে মঙ্গলবাণী মঙ্গলবাণী ঘোষণার জন্য কি কি চ্যালেঞ্জ রয়েছে? মঙ্গলবাণী প্রচারের ক্ষেত্রে বাধা সমূহ চিহ্নিত করণ ও উত্তরণের উপায় কি কি? আমাদের কণ্ঠে সর্বদাই অনুরণিত হোক একই সুর - "খ্রিস্টের বাণী প্রচারিব মোরা করেছি অঙ্গীকার, কণ্ঠ বীণায় তাই তো তুলেছি তাঁরই নামে ঝঙ্কার"। বাণী প্রচারকগণের উপস্থিতি যুগ পরিক্রমায় আরো সার্থক, সক্রিয় হয়ে ওঠুক॥

ইতিহাস কথা কয়
পূর্ব বঙ্গের ক্যাথিড্রালের যাত্রাপথ : লক্ষ্মীবাজার থেকে রমনা!

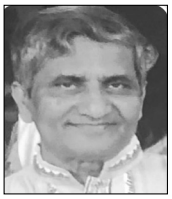

ডা. নেভেল ডি রোজারিও

বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্মের প্রচার, প্রসার বা বিস্তার লাভের ক্রমঃবির্বতনের ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অঞ্চল বিশেষের খ্রিস্টীয় জনগোষ্ঠীর সঞ্চালন ও লালন, উপাসনালয় বা গির্জা নির্মাণের উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা বহুলাংশে নির্ভরশীল, সংযুক্ত ও সম্পর্কিত ছিল ঐ বিশেষ অঞ্চলের তৎকালীন সমাজব্যবস্থা, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান, ক্ষমতাসীন আঞ্চলিক বা কেন্দ্রীয় শাসক বা তাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তাদের আচরণ, পৃষ্ঠপোষকতা বা বিরোধিতার উপর। রাজানুগ্রহ যেমন অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে উৎসাহিত করেছে তেমনি কখনো কখনো শাসকবৈরিতা এ ধরণের কর্মকাণ্ডকে করেছে ধীরগতিসম্পন্ন বা স্তিমিত। তাই বাংলায় খ্রিস্টধর্মের প্রচার, প্রসার ও গির্জা নির্মাণ কাহিনীর সাথে বিদেশী পর্তুগীজ ও তাদের এদেশীয় খ্রিস্টীয় জনগোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডের নিয়ামক তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থার চিত্র, শাসনব্যবস্থা বা শাসকদের মনোভাবের কাহিনী চলে এসেছে প্রাসঙ্গিক ও অবধারিতভাবে, অবলীলাক্রমে নিজস্ব ধারাবাহিকতায় ও আঙ্গিকে। বাংলায় খ্রিস্টধর্ম প্রতিস্থাপন ও স্থাপত্যময়তার দৃঢ়করণে এ কাহিনী বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে কালের আর্বতে কালের সাক্ষীরূপে। ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুন পোপ দশম লিও ও পর্তুগালের রাজার মধ্যে পাদ্রোয়াদো পর্তুগীজ (Padroado Portugues) নামে এক চুক্তির ফলে পর্তুগীজরা ভারতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। সংক্ষেপে চুক্তিটি হয়ে দাঁড়ায় ভারতে নতুন নতুন খ্রিস্টীয় মিশন গড়ে তোলা, ডায়োসিস বা ধর্মপ্রদেশ গঠন, ডায়োসিসের বিশপ নিয়োগ, উচ্চতর ধর্ম-যাজকদের মনোনয়ন করার ক্ষমতা পর্তুগালের হাতেই ন্যস্ত থাকবে। ভারতে পোপের কোন আদেশ বা নির্দেশ পর্তুগালের রাজার অনুমোদন ছাড়া প্রেরণ করা যাবে না। পর্তুগীজ রাজকীয় আইন অনুযায়ী প্রতিটি পর্তুগীজ জাহাজেই একাধিক ধর্মযাজক (Chaplain) থাকা বাধ্যতামূলক ছিল। মিশনারীগণ কেবল পর্তুগীজ জাহাজেই গমনাগমন করতে পারবেন। খ্রিস্টমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় সমস্ত ব্যয়ভার পর্তুগালের রাজাই বহন করবেন। পর্তুগীজ মিশনারীগণ ভারতে নতুন রূপে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। ভাস্কো-দা-গামা বঙ্গদেশে না আসলেও এর কথা জানতেন এবং এ সম্বন্ধে লিখে যান। বঙ্গকে তখন ভারতের ভূ-স্বর্গ (Paradise of India) বলা হত। ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে ফাদার ফ্রান্সেসকো ফের্নাণ্ডেস এবং তার সঙ্গী ফাদার ডমিঙ্গো ডি'সুজা, এসজে প্রথমবারের মত পা দিলেন চট্টগ্রামের মাটিতে। চট্টগ্রামে (Porto Granda) পৌঁছে নেতৃস্থানীয় জন-সমাবেশে তাদের আগমনের কারণ ঘোষণা করে বলেন যে, "পর্তুগীজ স্থানীয়দের সাক্রামেন্ত প্রদান এবং তাদের কাছে ঐশবাণী প্রচার করতে এবং ধর্মবিশ্বাসের জ্ঞান অবিশ্বাসীদের কাছে প্রচার করতে আমরা এসেছি।"

১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে জেজুইট সংঘের সিদ্ধান্ত অনুসারে বেঙ্গল মিশন খোলা হয় এবং ফাদার ফ্রান্সেসকোকে বেঙ্গল মিশনের প্রথম সুপিরিয়র রূপে নিযুক্ত করা হয়। ফাদার ফ্রান্সেসকো তাঁর সঙ্গী ফাদার ডমিঙ্গো ডি'সুজাকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গের হুগলি বন্দরে ২১ মে ১৫৯৮ খ্রিষ্টাব্দে এসে পৌঁছালেন। হুগলিতে থাকাকালে ফাদার ফ্রান্সেসকো বাংলার বার ভুঁইয়ার অন্যতম চান্দিকানের (ঐতিহাসিক যশোর) রাজা প্রতাপাদিত্যের কাছ থেকে তার রাজ্যে আসার জন্য আমন্ত্রণ পান। কিন্তু ফাদার ফ্রান্সেসকো, ফাদার ডমিঙ্গো ডি'সুজাকে সঙ্গে নিয়ে ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে দিয়াঙ ও চট্টগ্রামে আসেন। চান্দিকানে না গিয়ে সরাসরি চট্টগ্রামে চলে যাওয়ায় রাজা প্রতাপাদিত্য অসন্তুষ্ট হন খবর পেয়ে ফাদার ফ্রান্সেসকো তৎক্ষণাৎ চট্টগ্রাম থেকে ফাদার ডি'সুজাকে চান্দিকানে পাঠিয়ে দেন। অবশ্য জেজুইট সংঘের আরও দু'জন ফাদার চট্টগ্রামে তার সাথে যোগ দেওয়ায় ফাদার ফ্রান্সেসকো ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে চান্দিকানে এবং ডিসেম্বর মাসে শ্রীপুরে পর্তুগীজ খ্রিস্টানদের পরিচর্যা করতে যান।

৩টি খাল বেষ্টিত ছোট্ট একটি শহর ঢাকা। প্রচুর ব্রিটিশ, ফরাসী, পর্তুগীজ, ডাচ, আর্মেনিয়ানদের বাস ছিল এখানে যাদের অনেকেই ছিল খ্রিস্টবিশ্বাসী। তারা ছিল বনিক শ্রেণীর এবং পাট, নীল, মসলিন, লবণ, মশলার ব্যবসা করে হয়ে ওঠে বিত্তশালী। ঢাকার অর্ধেক শহর ছিল আর্মেনিয়ানদের ও বাকী শহর ছিল নবাবদের। আর্মেনিটোলায় ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল আর্মেনিয়ান গির্জা Armenian Apostolic Church. ঢাকা শহর তখন বিস্তৃত ছিল ঢাকার পুরোনো রেলস্টেশন ফুলবাড়িয়া ও নবাবপুর রেল ক্রসিং পর্যন্ত। এর পর থেকেই শুরু বন জঙ্গলের। রমনা এলাকা ছিল জঙ্গলে ভরপুর।

ঢাকায় তখন তেমন স্থাপত্য ছিল না, ছিলনা কোন অট্টালিকা। আর্মেনিয়ান বিত্তশালী অনেক ব্যবসায়ী খরিদ সূত্রে কিছু জমির/ জমিদারীর মালিক বনে যান। আর্মেনিয়ান ব্যবসায়ী মানুক বর্তমান বঙ্গভবনের চত্বরে 'Manuk's Palace' নামে পরিচিত এক বিলাস-বহুল বাগান বাড়ী নির্মাণ করেন যা এখনও বঙ্গভবনের চত্বরে বিদ্যমান এবং বর্তমানে বঙ্গভবনের তোষাখানা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পরবর্তীতে ঢাকা শহরে Ahsanullah Palace, Manuk's Palace Ges Bishop's Palace নামে ৩ টি অট্টালিকার কথা জানা যায় ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার নবাবের সেনাদের সাথে রায়টের কারণে অনেক আর্মেনিয়ান পালিয়ে এসে লক্ষ্মীবাজার পবিত্র ক্রুশ ক্যাথিড্রালে আশ্রয় নেয়। অনেকে ক্যাথলিক ধর্মমত গ্রহণ করে এবং ইংরেজদের সাথে, এংলো-ইন্ডিয়ানদের সাথে Holy Cross Cathedral এর আশেপাশে লক্ষ্মীবাজার এলাকায় বসবাস করা শুরু করে। মণ্ডলীতে তখন ল্যাটিন যুগ, লক্ষ্মীবাজার ক্যাথিড্রালে বাংলায় কোন খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ হতো না, বাংলায় প্রার্থনা ও গানের তো কোন প্রশ্নই উঠে না।

মাণ্ডলিক ইতিহাস ঘেটে দেখা গেল ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের পোপীয় ঘোষণা ভাটিকান থেকে ঘোষিত হয়েছিল ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে। এমনকি ঢাকার প্রথম আর্চবিশপ লরেন্স গ্রেণার বিশপ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তখনকার লক্ষ্মীবাজার ক্যাথিড্রাল গির্জায়। দেশ ভাগের পরেও ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা ধর্মপ্রদেশ ছিল কোলকাতা আর্চ-ডাইয়োসিস এর আওতাধীন। ঢাকার

প্রথম ক্যাথিড্রাল ছিল লক্ষ্মীবাজার হলি ক্রস ক্যাথিড্রাল (Holy Cross Cathedral). লক্ষ্মীবাজার গির্জার টিনের ছাঁদের নীচের পাটাতনটা সেগুন কাঠ দ্বারা পুরোটা আচ্ছাদিত ছিল, যাতে ছিল দেবদূত ও খ্রিস্টীয় ধরণের পেইনটিং সম্বলিত। বৃটিশ আমলের ব্যবহৃত টিনের ছাদ, পাটাতনের কারণে সংস্কার না করাতে গির্জায় অত্যাধিক পানি পড়ার কারণে এ কাঠের পাটাতনের কাঠ খুলে ফেলতে বাধ্য হয়েছিল। সে সময়ে শুধু কাঠগুলোই বিক্রি করা হয়েছিল লক্ষ টাকায়। চলচ্চিত্রকার জহীর রায়হান উনসত্তরে তার 'Let there be light' সিনেমার কিছু স্পট খুঁজতে এসে পাটাতনটা না দেখে আফসোস করেছিলেন।

বাংলার পূর্বাঞ্চলে খ্রিস্টধর্ম প্রবর্তনের শুরু ও তার পরবর্তী ঢাকায় খ্রিস্টধর্ম প্রবর্তনের ঘটনাবলী সবার বিবেচনার জন্যে পাঠকদের জ্ঞাতার্থে ধারাবাহিকতার দালিলিক প্রমাণাদির উপর ভিত্তি করে Chronologically বা ক্রমানুসারে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি :-

১৬০০ - কোনো এক শুভক্ষণে ঐতিহাসিক যশোহরের বর্তমান বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানাধীন ঈশ্বরীপুরে ১ জানুয়ারি, বাংলার বার ভূঁইয়ার অন্যতম রাজা প্রতাপাদিত্য'র বদান্যতায় তারই দানকৃত জমিতে পর্তুগীজ জেজুইট ফাদারদের নির্মিত বাংলার প্রথম গির্জা "প্রভু যিশুর গির্জা" রাজা প্রতাপাদিত্য কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছিল। একই বছর পরে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের দিয়াং, জামাল খান ও ব্যান্ডেলে তিন জায়গাতেই ফাদার ফ্রান্সেসকো ৩ টি গির্জা নির্মাণ করেন।

১৬০৮ - সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইসলাম খান মোঘল রাজ প্রতিনিধিরূপে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে বাংলায় আসেন এবং ঢাকায় রাজধানীর পত্তন করেন।

১৬১২ - পর্তুগীজ অগাষ্টিনিয়ান সম্প্রদায় ঢাকায় প্রথম খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তন করেন।

১৬১৫ - সন্দ্বীপের পুনের পর পর্তুগীজ সর্দাররা সালভেজ নামক একজন জেসুইট পাদরীকে নবাবের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন ঢাকায় আগত প্রথম জেসুইট পুরোহিত কিন্তু ঢাকার নবাব তাকে সসম্মানে ঢাকায় বন্দী করে রাখেন।

১৬১৬ - ঢাকাতে পর্তুগীজদের মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৬২৮ - অগাষ্টিনিয়ান সম্প্রদায় নারিন্দায় (নারায়ণদিয়া) ঢাকার ১ম গির্জা (বর্তমানে অস্তিত্ব-বিহীন) "Church of the Assumption" নির্মাণ করে। এ গির্জায় উপাসনা করতো ক্যাথলিক ও আর্মেনিয়ান সেনারা ও ইংরেজ খ্রিস্টভক্তগণ। একবার খ্রিস্টান বনাম মুসলিম সৈন্যদের দাঙ্গার সময়ে গির্জাটি ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং গির্জার পালক ফাদার বার্ণাডো এসেনশন ১৬২৮ সনে মারা যান। গির্জার সন্নিকটে ওয়ারীর কবরস্থানের পাশেই নবাব স্ট্রিটে (ওয়ারী কবরস্থান থেকে টিপু সুলতান রোড ধরে পশ্চিমে যাবার পথে র‍্যাঙ্কিন ষ্ট্রিট এর আগের ডান দিকের গলিতে) গির্জা সংলগ্ন ছোটা আরও একটি কবরস্থান ছিল। কবরস্থানটি জঙ্গলময় অবস্থায় ছিল। এক সময়ে লক্ষ্মীবাজারের সহকারী পুরোহিত ফাদার ষ্ট্যানিসলাস ডেভিড সিএসসি কোর্ট থেকে নথিপত্র বের করে খ্রিস্টান যুব প্রতিষ্ঠান 'সুহৃদ সংঘ' এর সুহৃদদের নিয়ে সারাদিন পরিশ্রম করে জঙ্গল পরিষ্কার করে অস্থায়ী বেদী করে ফাদার গিলেস্পি সিএসসি এর সাথে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেছিলেন।

১৬৩২ - ঢাকাতে পর্তুগীজ অগাষ্টিনিয়ান সম্প্রদায়ের একটি দুতাবাস ছিল তা ইতিহাসে পাওয়া যায়। মানরিক দুতাবাস সংলগ্ন গির্জাটি বলতে এ গির্জাটিরই ইঙ্গিত দান করেছেন। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী পর্যটক ও মানরিক বাপ্তিস্তা তাভারনিয়ে তার Travels to India তে এর উল্লেখ করেছেন। টি, রাঙ্কিনও জোর দিয়ে বলেন যে, তাভারনিয়ে উল্লেখিত এ গির্জাটি নারায়ণ দিয়াতে অবস্থিত ছিল। মানরিক ও তাভারনিয়ে উভয়েই এ গির্জাটির সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন এবং মানরিক ও সেভেন্ট ঐ সেন্ট আগষ্টিন মঠের কথা উল্লেখ করে বলেছেন;

"Later as time went on, our Brethern penetrated still further into the interior of those principalities until they reached the city of Daack as the Lusitanian idiom it...The well known suburbs of Manaxor at one end & Mv suitably. These suburbs Christian settlements in which any sacred order possesses a picturesque though small monastery with a good church…The earliest Brethren built in this city another church attached to Residendand later two more in the Bandeles of Siripur and Naricul"

১৬৩২ - মোগল সম্রাট বাদশাহ শাহজাহান এর আদেশে মোগল বাহিনী হুগলী আক্রমণ করে এবং বিজয়ী হয়েও মোগল সেনারা প্রায় ১০ হাজার ক্যাথলিক অধ্যুষিত ব্যান্ডেল জনবসতিটি ধূলির সাথে মিশিয়ে দেয়। মোগল বাহিনীর হুগলী দখলের সংবাদে ঢাকায় পর্তুগীজ ও স্থানীয় খ্রিস্টান নিধন শুরু হয়। ঢাকাতে গণ-আক্রোশের বহ্নিশিখা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছালে হুগলী অবরোধকালেই এখানে ইসলামপুর গির্জার ফাদার ফ্রেই বার্ণাজোড যিশুকে পিটিয়ে হত্যা করা হল।

১৮৩৪ -বিশ্বাস বিস্তার সংস্থার ভাটিকানের নির্দেশে কোলকাতাকে কেন্দ্র করে Vicar Apostolic of Bengal গঠন করা হয়।

১৮৫০ - Vicar Apostolic of Bengal চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে পূর্ব ও কোলকাতাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমাঞ্চল রূপে দু'ভাগে ভাগ করে কাজ শুরু করা হয়।

১৯৫০ - ১৫ ফেব্রুয়ারি মনসিনিয়র টমাস অলিফ পূর্ণ ক্ষমতাসহ পূর্ব ভিকারিয়েট এর দায়িত্ব নেন।

১৮৫২ - পূর্বাঞ্চলের হেড কোয়ার্টার ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়।

১৮৫২-৫৩ : মনসিনিয়র টমাস্ অলিফ ভিকার এপোষ্টলিক। মনসিনিয়র অলিফ প্রথমে চট্টগ্রামে অবস্থান করলেও পরে ঢাকায় চলে আসেন। বৈরী আবহাওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ (বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, নৌকাডুবি), ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, কলেরা, মারাত্মক পেটের পীড়া, ডাইরিয়া জাতীয় মরণঘাতি রোগ, বন্য প্রাণীর আক্রমণ, বিষাক্ত সাপের ছোবলের অপঘাতে মৃত্যু আলিঙ্গণে ইউরোপীয় মিশনারীদের নিকট বাংলা পরিচিত হয়ে উঠে 'Graveyard of Europians' বা 'ইউরোপীয়ানদের কবরস্থান' হিসেবে। সে কারণে অনেক মিশনারী সম্প্রদায় একের পর এক চলে যাচ্ছিল তেমনি নতুনদেরও ছিল অনীহা। ফলশ্রুতিতে দেখা দেয় মিশনারী সংকট। মনসিনিয়র অলিফ রোমে বিশ্বাস বিস্তার সংস্থার কাছে অনুরোধ করেও কাউকে পেলেন না। এদিকে ফ্রান্সের নবগঠিত ধর্মপ্রদেশীয় সম্প্রদায় 'The Association of Our Lady Holy Cross' এর প্রতিষ্ঠাতা ফাদার আন্তনী বাসিল মরো তার সম্প্রদায়ের অনুমোদনের জন্যে রোমে গেলে বঙ্গে পুরোহিত সংকটের কারণে পূর্ব বাংলায় নিয়োজিত হবার একদল মিশনারী পাঠানো হয়। সে দলে যাজক, ব্রাদার ও সিষ্টারগণ ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল, নোয়াখালী (পূর্ব নাম ভূলুয়া) হয়ে ঢাকায় পৌঁছান। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুন বিশ্বাস বিস্তার সংস্থা জানিয়েছিল যে ফাদার মরোর দলের রোমের অনুমোদন পাওয়া পূর্ববঙ্গে প্রেরণকর্মী পাঠানো ও তাদের প্রৈরিতিক কাজের উপর নির্ভরশীল।

১৮৫৩ - ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টার সমন্বিত Holy Cross মিশনারী ১ম দল ঢাকায়।

১৮৫২-৫৩ - Rev. Louis Veritec csc, Pro-Vicar Apostolic.

১৮৬০ - রেভা: পিয়ারে ডুফল সিএসসি বিশপীয় বিধিবদ্ধে ক্ষমতাবিহীন Titular Bishop of Delcon হিসেবে ফ্রান্সে ভূষিত হন এবং পরের বছর ঢাকায় এসে ১৮৭৬ পর্যন্ত ভিকার এপোষ্টলিক ছিলেন।

১৮৬২ - হলি ক্রশ ফাদারদের আমলে লক্ষ্মীবাজারে সিস্টারদের কনভেন্টের জমিতে গির্জা নির্মাণ করা হয়। পোপ ৮ম বনিফাস কর্তৃক সাধু ঘোষিত ফ্রান্সের রাজা Louis IX এর নামে গির্জাটির নামকরণ করা হয় St Louis Church.

১৮৬৫ - ধর্মপল্লীর জন্যে জমি কেনা হয়।

১৮৬৭ - সিস্টারদের জমির উপর গির্জার পাকা দালান নির্মিত হয়েছিল, কিন্তু ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ঘূর্ণিঝড়ে কাঠামোটি গুরুতর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৮৭৬ - কোন এক বিশেষ কারণে ফ্রান্স কেন্দ্রিক Holy Cross সম্প্রদায় একযোগে সবাই বাংলা ছেড়ে চলে যাওয়াতে Anglo-Belgian Benedictine Monks সম্প্রদায় দায়িত্ব নেন।

১৮৮২ - বেলজিয়ান বেনেডিক্টিয়ান যাজক, Fr. Gregory de Groove OSB কর্তৃক

স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৮৮৬ - Fr. Dom Cuthbath Downey OSB প্রো ভিকার এপোষ্টলিক। পরবর্তীতে Fr. Dom Gregory de Groove OSB প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৮৮৬ - পোপ ত্রয়োদশ লিও হুমান ইস্যুকৃত 'Salubis' নামক পোপীয় প্রৈরিতিক অনুশাসনপত্র দ্বারা ঢাকাকে 'ধর্মপ্রদেশ' বা Diocese ঘোষণা করেন। সে ঘোষণায় বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ডাইয়োসিস এলাকা, আসামের শিলাচর বার্মার (বর্তমান মিয়ানমার) প্রোম এলাকা ঢাকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যশোর/খুলনা ছিল কোলকাতা আর্চডাইয়োসিসের আওতাধীন।

১৮৮৭ - ঢাকা ডায়োসিস ঘোষিত হলেও ২৪ ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদে সর্বভারতীয় ও সিংহলী বিশপদের সম্মেলনে ফাদার ডোম গ্রেগরী OSB ঢাকার প্রতিনিধিত্ব করেন নতুন ঢাকা ডাইয়োসিসের প্রশাসক হিসেবে কারণ তখনো ঢাকাতে কাউকে পোপ মহোদয় বিশপ নিযুক্ত করেননি এবং ঢাকা ডায়োসিস তখনো independent হয়নি বরং কোলকাতাধীন ছিলো।

১৮৮৭ - হলিক্রশ সংঘের পূর্ব বাংলায় পুনরাগমন।

১৮৮৯ - কোন বিশপ না পাওয়ায় পবিত্র ক্রুশ সংঘের সুপিরিয়র ফাদার মাইকেল ফালিজ ২য় প্রশাসক।

১৮৯০ - 'মিয়া ভাই ময়দান' এর নাম পরিবর্তন করে এলাকার নামকরণ করা হয় লক্ষ্মীবাজার। পাঞ্জাব থেকে আঠারো শতকে ঢাকায় আসা গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ডিকনলাল ঠাকুর এ এলাকার নামকরণ করেন লক্ষ্মীবাজার।

১৮৯০ -পুণ্য পিতা পোপ ত্রয়োদশ লিও ৬৫ বছরের ফরাসী যাজক ফাদার আগষ্টিন লুয়াজ পংপকে ঢাকা ডায়োসিসের ১ম বিশপ মনোনীত করেন।

১৮৯১ - তখন হয়ে যায় পূর্ব বাংলার প্রথম ক্যাথিড্রাল 'হলি ক্রশ ক্যাথিড্রাল'।

১৮৯১ - নিউসীর পবিত্র ক্রুশ চ্যাপেলে ১১ জানুয়ারি মন্ট্রিলের আর্চবিশপ ফ্যাবে কর্তৃক ঢাকার বিশপ হিসেবে অগাষ্টিন লুয়াজ সিএসসি অভিষিক্ত হন।

১৮৯১ - ঢাকার প্রথম বিশপ হিসেবে অভিষিক্ত বিশপ অগাষ্টিন লুয়াজ সিএসসি ১০ মার্চ ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে এসে বিশপীয় দায়িত্ব নেন। এর পর থেকে লক্ষ্মীবাজার পরিচিত হয় 'লক্ষ্মীবাজার হলি ক্রশ কাথিড্রাল' হিসেবে।

১৮৯৪ - ৮ জুন বিশপ লুয়াজের মৃত্যু হলে লক্ষ্মীবাজার ক্যাথিড্রালের ভিতরে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। ২৬ জুন, ১৮৯৪ তে জার্মানীতে জন্ম গ্রহণকারী ফাদার পিটার যোসেফ অ্যার্থ সিএসসি ঢাকার দ্বিতীয় বিশপ পদে মনোনীত হন।

১৮৯৬ - বছরের শুরুতে ঢাকার দ্বিতীয় বিশপ পিটার যোশেফ অ্যার্ত সিএসসি এর আমন্ত্রণে ফ্রান্স থেকে ৭-সদস্য বিশিষ্ট সেলিসিয়ান সিস্টার দলের ব্রিটিশ ভারতের পূর্ব বাংলায় আগমন ও Holy Cross Sisters পরিচালিত লক্ষ্মীবাজারের St. Xavier-Indian School এর দায়িত্ব নেন। সালিসিয়ান সিস্টারগণ Co-education বিশিষ্ট School এর পাশাপাশি শিশুদের এতিমখানা, বিধবা ও উদ্ধারকৃত দুস্থ এবং অখ্রিস্টান ভিক্ষুকদের জন্যে সর্বজনীন (Omnibus) 'Poor House', ডিসপেন্সারি ও পরে Leprosy Home গড়েন।

১৮৯৭ - ১২ জুন বিকেল ৫ টার দিকে ঢাকায় ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্পের ফলে গির্জা, স্কুল, কনভেন্টসহ যাবতীয় স্থাপনা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। প্রথম তলার দেয়াল ধ্বসে পড়ে দু'জন সিষ্টার মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিলেন। একই বছর ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ (ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস) ঢাকা, চট্টগ্রাম ও আরাকানের মিশন আঘাত করে সকল স্থাপনা ভূমিসাৎ করে প্রভূত ক্ষতি করে।

১৮৯৮ - বিশপ মহোদয় বাংলা মণ্ডলীর আর্থিক দুরবস্থার কারণ জানিয়ে ফ্রান্স, মন্ট্রিল ও যুক্তরাষ্ট্র প্রভিন্সিয়ালের সাহায্য কামনা করলে কমিশন করে ৩ এলাকার সিএসসি প্রভিন্সিয়াল সহায়ক ফান্ড গঠন করলো। "…For the first time there was a commission on missions at a general chapter and this commission's report claimed that in the eyes of the Pope the mission in Bengal was Holy Cross's "raison d'etre". Hurth addressed the chapter on the difficulties of the building of the church in Bengal, the poverty of the people and the lack of the resources. Each csc provinces was ordered to have a promoter who would gather resources for the support of the work in Bengal.

১৮৯৮ - ১৪ সেপ্টেম্বর বিশপের অনুপস্থিতিতে ফাদার মাইকেল ফাসিজ লক্ষ্মীবাজারে নবনির্মিত ক্যাথিড্রাল উদ্বোধনী আশীর্বাদ করেন।

১৯০২ - ১ এপ্রিল সৌভাগ্যবশত, রমনায় যেখানে এখন হাইকোর্ট সেখানে বিশপ অ্যার্থ সিস্টারদের Poor House নির্মাণের জন্যে এক টুকরো জমি অধিগ্রহণ করতে সক্ষম হন। সেখানকার জমিটি ছিল বর্জ্য ফেলার খালি জায়গা, যেখানে হিন্দুদের দখলে কয়েকটি মাটির ঘর ছিল যারা ক্ষতিপূরণ (মোট ১৩২৫/- টাকা) পেয়ে জায়গাটি ছেড়ে চলে যায়। সেখানে অনাকাঙ্ক্ষিত ও এতিম শিশু, বিধবা ও উদ্ধারকৃত অখ্রিস্টান ভিক্ষুকদের জন্যে সেলেসিয়ান সিস্টারদের লক্ষ্মীবাজারের ছোট্ট উপনিবেশটি স্থানান্তর করা হয়। প্রাপ্ত-বয়স্কদের জন্য মাটির ঘর ব্যবহার করা হয়; শিশুদের জন্য অবিলম্বে মাদুরের কুঁড়ে ঘর তৈরি করা হয়েছিল, এমনকি ধর্মীয় সেবা ও লক্ষ্মীবাজার ক্যাথিড্রাল থেকে আসা পুরোহিতদের খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের জন্যে একটি সুন্দর মাদুর চ্যাপেল (St Martha's Chapel) স্থাপন করা হয়েছিল।

১৯০৫ - বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হওয়ার পরে প্রাদেশিক রাজধানী গড়ার জন্যে যে সব ইমারত নির্মিত হয়েছিল কার্জন হল তার অন্যতম। পাশাপাশি সরকার সিস্টারদের জমি (যেখানে পুরোনো হাইকোর্ট নির্মিত) একোয়ার করে নেয়। বঙ্গভঙ্গ বাতিল হবার পর অনেক দিন ঢাকা কলেজ ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'বার পর ঢাকা কলেজকে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে পরিণত করে স্থানান্তর করা হয় পুরোনো হাইকোর্ট ভবনে, যা নির্মিত হয়েছিল পূর্ব বঙ্গের ছোট লাটের জন্যে, সালেশিয়ান সিস্টারদের জমি অধিকরণ করে। ঢাকা হাইকোর্টের অনেক বছরের কর্মকর্তা (Assistant Registar) ৯৪ বছর বয়সী ছিরিল রোজারিও মৃত্যুর আগে আমাকে দেয়া এক ইন্টারভিউতে জানিয়েছিলেন ১নং কাকরাইলের জমিটা নাকি সরকার কর্তৃক অধিকৃত সিস্টারদের জমির রহ-exchange এ দেয়া হয়েছিল।

১৯০৮ - হাইকোর্ট এলাকা ছেড়ে দেবার পরে সালেসিয়ান সিস্টারগণ ভাড়া বাড়িতে তাদের কার্যক্রম চালাতেন। সিস্টারগণ ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে রমনার কাকরাইলের জমিতে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে 'সাধু যোসেফের আবাসন ও চ্যাপেল স্থানান্তর করেন।

১৯০৯ - সিএসসি প্রভিন্সিয়াল সহায়ক ফান্ড গঠনে কার্যত কিছু না হওয়াতে Bishop Hurth রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে ফেব্রুয়ারিতে বিশপ পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং এক মাস পরে নতুন বিশপ ফ্রেডেরিক লিনবর্ন সিএসসি ঢাকার ৩য় বিশপ হন।

১৯০৯ - ১১ এপ্রিল কার্ডিনাল গাত্তি কর্তৃক ৬৫ বছর বয়সী ফাদার ফ্রান্সিস ফ্রেডারিক ঢাকার তৃতীয় বিশপ হিসেবে অভিষিক্ত হন।

১৯০৯ - নতুন বিশপ সালেসিয়ান সিস্টার সম্প্রদায়কে গোল্লা ও হাসনাবাদে পাঠান। সিস্টারগণ সকালে স্কুল দেখ-ভাল করতেন এবং বিকেলে গ্রামে গ্রামে খ্রিস্টবাণী প্রচারে বের হতেন।

১৯১২ - যেহেতু তাদেরকে ফ্রান্সে ফেরত যেতে বলা হয়েছিল, তাই তারা সেন্ট জেভিয়ার্স কনভেন্ট, লক্ষ্মীবাজারকে আওয়ার লেডি অফ নটর ডেম মিশনস (RNDM)-এর কাছে হস্তান্তর করে পূর্ব বাংলা ছেড়ে চলে যান।।

১৯১৫ - হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বিশপ ফ্রান্সিস ফ্রেডারিকের পরলোক গমন। লক্ষ্মীবাজার ক্যাথিড্রালের ভিতরে সমাধিস্থ।

১৯১৬ - ৫ নভেম্বর রোম নগরে ঢাকার ৪র্থ বিশপ হিসেবে বিশপ যোসেফ আরমন্ড ল্যাগ্রাঁ সিএসসি অভিষিক্ত।

১৯২৩ - বিশপ লাগ্রাঁ সিএসসি ডিসেম্বর মাসে রমনার বিল্ডিং এ থাকা শুরু করলেন। বিল্ডিং এর অংশবিশেষে (আর্চবিশপ ভবনের পার্লার রুম ও বর্তমান ক্যাথিড্রাল সংলগ্ন অংশে ছিল 'সেন্ট মডুকা' চ্যাপেল।

১৯২৭ - বিশপ ল্যাগ্রা পংপ কে সহায়তার

জন্যে পোপ একাদশ পিউস সহকারী হিসেবে ফাদার তিমথী জন ক্রাউলী সিএসসি কে ঢাকার বিশপের উত্তরসূরী মনোনীত করেন।

১৯২৭ - ১ মে লক্ষীবাজার ক্যাথিড্রালে ফাদার তিমথী জন ক্রাউলী সিএসসি বিশপ পদে অধিষ্ঠিত।

১৯২৯ - বিশপ ল্যাগ্রা অবসর নিলে বিশপ তিমথী জন ক্রাউলী সিএসসি ঢাকার পঞ্চম বিশপ হিসেবে দায়িত্ব নেন।

১৯৪৫ - ২য় মহাযুদ্ধে মানবতাবাদী ভূমিকার জন্যে 'কাইজার-ই-হিন্দ' উপাধিপ্রাপ্ত ও স্বর্ণপদকে ভূষিত বিশপ ক্রাউলী সিএসসি কোলকাতার এক হাসপাতালে জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২ অক্টোবর মারা গেলে তার মরদেহ ঢাকায় নিয়ে এনে ৪ অক্টোবর লক্ষীবাজার ক্যাথিড্রাল গির্জার ভেতরে কবরস্থ করা হয়।

১৯৪৭ - পাক-ভারত বিভক্তিকালেও পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা ডাইয়োসিস তখনো ছিল কোলকাতা আর্চডায়োসিসের Suffragan Diocese. (Saffragan Diocese Bishop আর্চডায়োসিস ছাড়া অন্য একটি ধর্মপ্রদেশ পরিচালনা করেন।

১৯৪৭ - ২২ অক্টোবর দেশ বিভাগের যুগ-সন্ধিক্ষণে লক্ষীবাজার হলি ক্রস ক্যাথিড্রালে বিশপ লরেন্স গ্রেণার পংপ বিশপ পদে অধিষ্ঠিত হন।

১৯৫০ - ১৫ জুলাই পোপ দ্বাদশ পিউস মহোদয় ঢাকা ডায়োসিসকে কোলকাতা মহাধর্মপ্রদেশ থেকে পৃথক করে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশে (Ecclesiastical Province) উন্নীত করেন।

১৯৫৬ - আর্চবিশপ লরেন্স গ্রেণার সিএসসি ২৩ মে কাকরাইলের গীর্জাকাটিকে 'ধন্যা কুমারী অমলোদ্ভব' এর ধর্মপল্লীতে উন্নীত করেন। এ সময়ে এ গীর্জাকায় প্রথমবারের মত দীক্ষাস্নান (Baptism) দেয়া হয়। আর্চবিশপ গ্রেণার পংপ এর উদ্যোগে রমনার গির্জিকাটির পাশে উপযুক্ত গির্জা নির্মাণের কাজ শুরু হয়। একই বছর ৮ ডিসেম্বর অর্ধ-সমাপ্ত গির্জাটিকে 'ধন্যা কুমারী অমলোদ্ভবের গির্জা' নামে উৎসর্গীকৃত করা হয়।

১৯৬৫ - ৯ জুলাই আর্চবিশপ লরেন্স গ্রেণার সিএসসি জারিকৃত এক নির্দেশনামাবলে কাকরাইল গির্জাটিকে 'ধন্যা কুমারী অমলোদ্ভবের ক্যাথিড্রাল' এ উন্নীত করে লক্ষীবাজারের প্রাক্তন ক্যাথিড্রালকে 'পবিত্র ক্রুশ গির্জা' নামে এক সাধারণ গির্জায় রূপান্তরিত করেন।

১৯৭৬ - আর্চবিশপ গাঙ্গুলী সিএসসি কাকরাইলের ক্যাথিড্রাল এর নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করেন 'সেন্ট মেরীস ক্যাথিড্রাল'।

রমনার ভবনটি ইটের গাঁথুনীতে তৈরী করা। তাই এ বিল্ডিংটা উলম্বভাবে বা vertically সম্প্রসারণ করা সম্ভব নয়। সর্বোপরি পুরোনো বিল্ডিং হবার কারণে বিল্ডিংটিতে কালে কালে ফাটল দেখা দেয়। আর্চবিশপ হাউজ আর গির্জার মাঝের ঘর, যেখানে ছিল সেন্ট মণিকা চ্যাপেল, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার অনেক পরে, ফাদার পৌল গমেজ ঢাকা আর্চ-ডায়োসিসের চ্যান্সেলর থাকাকালীন একবার ঐ রুমটি পানিতে সয়লাব হয়ে গিয়েছিল। সে সময় ঐ রুমে থাকা আর্চডাইয়োসিসের অনেক জমি ও সম্পত্তির দলিল ও মণ্ডলীর অনেক ঐতিহাসিক দলিল নষ্ট হয়েছিল। একসময় পুরো বিল্ডিংটা ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণের চিন্তা করলেও ততদিনে বিল্ডিংটি UNESCO ঘোষিত দেশীয় Heritage বা প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত হয়ে যাওয়াতে তা আর করতে পারেনি। পরে বাংলাদেশে পোপের প্রতিনিধি মারফত কোটি টাকা ব্যয় করে ইটের গাঁথনীর সাথে আধুনিক প্রযুক্তির সংমিশ্রণে পিলার সংযুক্তিতে বিল্ডিংটির আমূল সংস্কার করা হয়। বাংলাদেশ ক্যাথলিক মণ্ডলী কেন জানি মণ্ডলীর কোন গৌরবময় ঐতিহ্য ও ইতিহাস সংরক্ষণে আগ্রহী নয়। UNESCO বাঁধা না দিলে ৩৪৪ বছরের তেজগাঁও Holy Rosary Church, 423 বছরের St Nicholas Tolentinu Church, Nagori, লক্ষীবাজার Holy Cross Church বলি হতো মণ্ডলীর কর্তা ব্যক্তিদের হাতে। ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে দোম আন্তনিও ভাওয়ালে বসে অক্লান্ত পরিশ্রম করে কথোপকথনের ভঙ্গিতে রচনা করেন বাংলা ভাষার প্রথম মুদ্রিত গদ্য পুস্তক *'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'।* নাগরী গ্রামের এখানেই রচিত হয়েছিল বাংলার প্রথম অভিধান। সে সবই সতেরো শতকের প্রথম দিকের কথা। নাগরীর যেসব বাংলা ভাষার ইতিহাসে থাকলেও অতীতের কোনো চিহ্নই এখন আর সেখানে নেই, আমরাই তা শেষ করেছি। বাংলাদেশের ক্যাথলিক মণ্ডলীতে ইতিহাসের অনুসন্ধানী প্রচেষ্টা না থাকাতে ভ্রান্তিবিলাসের কারণেই নাগরী গির্জার ৩০০ বছরের জুবিলী দুই দফায় আয়োজিত হয়েছিল। প্রথমবার ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বার ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে। লক্ষীবাজারের গির্জার ১৫০ বছর-পূর্তি ২০১৮ সনে উদ্‌যাপন করা হয়েছে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দকে নির্মাণকাল ধরে যদিও ইতিহাস বলে লক্ষীবাজারের প্রথম গির্জা নির্মিত হয়েছিল ফ্রান্স থেকে আসা হলিক্রস সম্প্রদায়ের প্রথম দলের হাতে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে।

সবার শেষে মনে প্রশ্ন থেকেই যায়, একটা বিল্ডিং এর ১০০ বছরের পূর্তি পালন করে দেশবাসীকে পূর্ব বাংলায় খ্রিস্টধর্ম উদ্ভবের অপর্যাপ্ত বা কিছুটা অপূর্ণাঙ্গ ধারণা না দিয়ে ঈশ্বরীপুরে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে প্রতিষ্ঠিত বাংলার প্রথম গির্জা "প্রভু যিশুর গির্জা" প্রতিষ্ঠার ৪২৫ বছর পূর্তি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে বা ৪ বছর পরে তেজগাঁও Holy Rosary Church এর ৩৫০ বছর পূর্তি-উৎসব করতে পারতাম, যা আমাদের মণ্ডলীর গৌরবের। এ গৌরব বাংলাদেশ মণ্ডলীর সব অঞ্চলের সব খ্রিস্টানের। যা আমাকে করেছে গৌরবান্বিত, যা আমার, আপনার ধর্মবিশ্বাসের অহংকার। যা আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা যোগাবে ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাহসিকতায়, এনে দেবে ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত ও সামাজিক ধর্মীয় অনুশীলনীময়তা। এখনই সময় সত্য অন্বেষণের অনুসন্ধানী ব্রতী হওয়ার।

পুস্তক/তথ্য সহায়িকা এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকারেঃ

যশোহর খুলনার ইতিহাস, সতীশ চন্দ্র মিত্র, ১৯১৪, কোলকাতা

বঙ্গদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়, প্রথম খন্ড, লুইস প্রভাত সরকার, প্রভু যিশুর গির্জা, কোলকাতা, আগস্ট ২০০২।

Holy Cross in Bengal 1860-1910 A matter of Survibal by Fr James T. Connelly csc Paper presented in 1998 Conference of Holy Cross Congregation, June 11-14, 1998, Stonehill College, North Easton Massachusette, USA

Calncey, Raymond J. C.S.C. The Congregation of Holy Cross (csc) in Eastern Bengal (1852-1876) Part 1, Rampura, csc centre Library & University of Notre Dame Archives, Indiana, USA.

Fr. Edmund N. Goedert C.S.C., Rev. H. Josson S. J : La Mission de Bengale এর উপর ভিত্তি করে লিখিত Holy Cross Priests in the Diocese of Dhaka এর মুখবন্ধ Province Archives Centre Indiana

যেরোম ডি. কস্তা, বাংলাদেশ ক্যাথলিক মণ্ডলী, ১ম খণ্ড, প্রতিবেশী প্রকাশনী, ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, ঢাকা।

মুনতাসীর মামুন, 'ঢাকা -স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী (অখণ্ড), অনন্যা প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।

'শেকড়ের অন্বেষণে, বঙ্গে খ্রিস্টধর্মঃ প্রথম গির্জা ও প্রাসঙ্গিক ঘটনা', ডাঃ নেভেল ডিঃ রোজারিও ঃ সমবার্তা ঃ ১৫ বর্ষ ৫ম- ৮ম সংখ্যা, ২০০২ ও বিশপ জের্ভাস রোজারিও সম্পাদিত 'প্রদীপণ', ২০০৩।

হিউবার্ট অরুণ রোজারিও, ভার্জিনিয়া ও সুভাষ সেলেষ্টিন রোজারিও, মেরিল্যান্ড।

লেখক ডা. নেভেল ডি'রোজারিও বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রাক্তন মহাসচিপ, সুহৃদ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, খ্রীষ্টান ছাত্রকল্যাণ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষা সম্পাদক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্রসংসদের প্রাক্তন সেক্রেটারী জেনারেল শমরিতা হাসপাতালের প্রাক্তন মেডিকেল কো-অর্ডিনেটার বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র অভিবাসী। তিনি ডিজিটাল মিডিয়ায় লেখালেখিতে সক্রিয়। - সম্পাদক।

পানজোরাতে মহান সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসবে সকলকে আমন্ত্রণ

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ রোজ শুক্রবার, নাগরীর পানজোরাতে পাদুয়ার সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসব মহাসমারোহে পালন করা হবে। এই তীর্থোৎসবে পর্বকর্তাদের জন্য শুভেচ্ছা দান ১,০০০ (এক হাজার) টাকা এবং খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য ২০০ টাকা মাত্র। এছাড়াও যারা তীর্থভূমি উন্নয়নে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করতে চান, অনুদান দিতে চান ও মানত পূরণ করতে চান তাদেরকে সরাসরি নাগরী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঐতিহ্যবাহী পানজোরার অলৌকিক কর্মসাধক মহান সাধু আন্তনীর এই মহা তীর্থোৎসবে যোগদান ক'রে তাঁর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও দয়া-আশীর্বাদ লাভ করতে আপনারা সকলেই আমন্ত্রিত।

বি. দ্র.

১। পর্বকর্তাদের শুভেচ্ছাদান সরাসরি নাগরী ধর্মপল্লীতে অথবা স্থানীয় পাল-পুরোহিতের মধ্যদিয়ে দিতে পারবেন।

২। আগাম যোগাযোগের ভিত্তিতে ৫০ টাকা রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে পর্বদিনে দুপুরের প্যাকেট লাঞ্চ সংগ্রহ করার সুবিধা রয়েছে। তবে অবশ্যই ২৫ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ এর মধ্যে স্থানীয় পাল-পুরোহিতের মাধ্যমে জানাতে হবে।

৩। পর্বকর্তাদের জন্য শুভেচ্ছা দান ১০০০ (এক হাজার) টাকা মাত্র। খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য দান ২০০ টাকা।

❖ তীর্থভূমিতে যেসকল উন্নয়ন কাজ করা হয়েছে

১। চ্যাপেলের পুনঃসংস্কার করা হয়েছে।

২। প্রধান বেদী মঞ্চের উপরের শেড বা টিনের চাল বড় ও পরিবর্তন করা হয়েছে।

৩। প্রধান বেদী আরো বেশি প্রশস্ত করা হয়েছে এবং বেদীর সামনের অংশ পাকা করা হয়েছে।

৪। তীর্থভূমির প্রধান গেইট তৈরী ও রাস্তার কাজ করা হয়েছে।

❖ তীর্থভূমিতে যেসকল উন্নয়ন কাজ করা চলমান আছে ও করা হবে।

১। প্রধান বেদীর দক্ষিণ পাশের জমি ভরাটের কাজ করতে হবে।

২। চারিদিকের বাউণ্ডারী করা অতীব জরুরী প্রয়োজন।

৩। চারিদিকে পানি নিষ্কাশন (ড্রেনেজ) ব্যবস্থা করা হবে।

৪। প্রধান বেদীর নিচে সামনের জায়গা ফুট টাইলস দিয়ে প্রার্থনার ও বসার আরো সুন্দর উপযোগীকরণ।

৫। এছাড়াও তীর্থভূমির পরিবেশ আরো প্রার্থনাময়, আধ্যাত্মিকপূর্ণ করার জন্য অনেক কাজ করা প্রয়োজন।

এসব চলমান উন্নয়ন কাজে আপনিও শরিক হয়ে সাধু আন্তনীর বিশেষ অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভ করুন।

নভেনা খ্রিস্টযাগ
২৪ জানুয়ারি, ২০২৪ থেকে ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ
সকাল ০৬:৩০ এবং
বিকাল ০৪:০০

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ
২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ, শুক্রবার
১ম খ্রিস্টযাগ- সকাল ৭:০০
২য় খ্রিস্টযাগ- সকাল ১০:০০

যোগাযোগের ঠিকানা
ফাদার খোকন ভিনসেন্ট গমেজ
পাল-পুরোহিত
নাগরী ধর্মপল্লী
মোবাইল নম্বর: ০১৭১২১৫৩৮৩৯

ধন্যবাদান্তে
পাল-পুরোহিত, সহকারী পাল-পুরোহিত,
পালকীয় পরিষদ ও খ্রিস্টভক্তগণ
নাগরী ধর্মপল্লী

মুছে যাওয়া দিনগুলি আমায় যে পিছু ডাকে
স্মৃতি যেন আমারই হৃদয়ে বেদনা রং বেরংয়ের ছবি আঁকে

প্রয়াত গাব্রিয়েল পেরেরা

জন্ম: ২২ ডিসেম্বর, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ১৭ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বাবা দেখতে দেখতে একটি বছর পার হয়ে গেল তুমি আমাদের মাঝে নেই। কিভাবে যে একটি বছর পার হয়ে গেল বুঝতেই পারিনি। বাবা তোমার অভাব এখন ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করছি।

বাবা, তোমার অভাব পূরণীয় নয়। তোমার অসীম ভালোবাসা কেবলই তোমার কথা মনে করিয়ে দেয় বার বার। তুমি ছিলে আমার কাছে বট বৃক্ষের মতো, যে বৃক্ষের ছায়া ছিল আমার মাথার উপর বাবা আমি বিশ্বাস করি তুমি স্বর্গধামে ঈশ্বরের কাছে ভালো আছ। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা করো এবং আশীর্বাদ করো।

পরিবারবর্গ –

স্ত্রী : হাসি দেশাই
ছেলে : পলাশ পেরেরা
নাতি : আকাশ গাব্রিয়েল পেরেরা
অনিত্য মাইকেল পেরেরা

ছেলের বউ : জেনেভি দেশাই

গ্রাম: বাগবাড়ী
মঠবাড়ী মিশন
গাজীপুর।

অনন্তধামে যাত্রার দ্বিতীয় বছর

প্রয়াত সিলভেস্টার দেশাই

জন্ম: ২৫ নভেম্বর ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর
২৫ তেজকুনিপাড়া, তেজগাঁও
ঢাকা-১২১৫

**"শান্তি মহাশান্তি মাঝে তুমি আছো,
সুন্দর ঐ রম্যদেশে তুমি আছো"**

আমার সাধ না মিটিল আশা না ফুরাইল, তবু-সকলই ফুরাইয়া গেল। বাবা বলে ডাকার সাধ, বাবাকে নিয়ে একসাথে বেঁচে থাকার আশা সবই শেষ হয়ে গেল। সেই দিন, যে দিন আমার বাবা আমাকে ছেড়ে এই ধরণী থেকে চির কালের মত পিতা পরমেশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে স্বর্গধামে চলে গেলেন। আমার বাবা শুধু বাবাই ছিলেন না বরং মায়ের মত সাড়াটা জীবন আমাদের পিতৃস্নেহ ও মাতৃস্নেহ দিয়েছেন।

বাবা তোমাকে কোন ভাবেই ভুলতে পারছি না। তোমার সেই নাম ধরে ডাকা, আমার দিকে নিরব দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা, তোমার ভালোবাসা, আদর ও ছোঁয়া আমি সারাক্ষণ অনুভব করছি।

বাবা তুমি শুধু আমার বাবা ছিলে না আমার বড় সন্তানও ছিলে তুমি। সন্তান মাকে ছেড়ে চলে গেলে যেমন কষ্ট হয় আমি ঠিক তেমনই কষ্ট পাচ্ছি তোমাকে হারিয়ে। তোমার স্মৃতি আমার সমস্ত মন জুড়ে, ঘর জুড়ে রয়েছে।

আমার বাবা সিলভেস্টার দেশাই গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সন্ধ্যা ৫:৫৫ মিনিটে আমার বাসায় মৃত্যুবরণ করেন। বাবার ইচ্ছা ছিল বাবার সবকিছু যেন আমার বাসাতে হয় এবং বাবা চেয়েছিলেন তার অবস্থা যখন খারাপ হয় সেই সময় যেন আমি বাবার সামনে থাকি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার বাবার এই ইচ্ছা পূরণ করার সুযোগ দেয়ার জন্য।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই তুমি আমাদের সকলের হাতে পবিত্র পানি পান করে, আমাদের প্রার্থনা শুনতে শুনতে, গির্জার সন্ধ্যা কালীন ঘণ্টা শুনে, দূত সংবাদ প্রার্থনা শেষে আমাদের ও পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়েছো। ওপারে থেকে তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

মেয়ে: জেনেভি দেশাই (শিপ্রা)
মেয়ে-জামাই: পলাশ পেরেরা
নাতি: আকাশ গাব্রিয়েল পেরেরা ও
অনিত্য মাইকেল পেরেরা

বাবা-মা তোমাদের স্মৃতি অমলিন

বাবা: ইলারিয়াস রোজারিও
(জন্ম: ১৯ মে, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ, মৃত্যু: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০খ্রিস্টাব্দ)

মা: বেলা মেরীস্টেল্লা রোজারিও
(জন্ম: ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ, মৃত্যু: ৮ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ)

দু'টি বছরের ব্যবধানে তোমরা সন্তানদের এই পৃথিবীতে নিঃসঙ্গ রেখে চলে গেলে স্বর্গলোকে; তবু তোমাদের স্মৃতি অমলিন। যে তরণীখানি ভাসিয়েছিলে দু'জনে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে আজ তা সপ্ত সন্তানে ভরিয়ে রেখে তোমরা সংসার সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পরমপিতার বক্ষে আশ্রয় নিলে পরম শান্তিতে। রেখে গেলে শোকাহত সন্তান-সন্ততিদের। তোমরা যে অপরিমেয় প্রেম ভালোবাসা-যত্নে গ'ড়ে তুলেছিলে আমাদের খ্রিস্টীয় মূল্যবোধে, সহনশীলতা এবং মানবিকতায় তা স্মরণীয়।

তেজগাঁও ধর্মপল্লীর এক আদর্শ পরিবার গঠন করে ইতিহাস গঠন করে গেছো। তেজগাঁওয়ের স্থানীয় পরিবার থেকে যিশুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রের পরিচর্যায় দান করলে দুই সন্তানকে। অন্যদেরও গঠন করলে যোগ্যরূপে। এই ঢাকা নগরীর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবনে কখনোই সহজ ছিলো না সাত সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষায় যোগ্যরূপে গ'ড়ে তোলার। কত সংগ্রাম, দুর্ভিক্ষ, অনাহার, অভাব, যুদ্ধ ও অরাজকতা পেরিয়ে তোমরা পরম ভালোবাসায় আমাদের আবৃত রেখে সন্তানদের নিরাপদে রেখেছো সেজন্যে কোনো কৃতজ্ঞতার ভাষাই যথেষ্ট নয়। তোমাদের স্মরণ করি বিনম্র শ্রদ্ধায়। নাজারেথের যিশু-মারীয়া-যোসেফের পুণ্য পরিবারের আদর্শে আমাদের ঐক্যবদ্ধ রেখেছো নিবিড় ভালোবাসায় তা অতুলনীয়। তাঁর প্রার্থনাশীল জীবনের ফলস্বরূপ দুই সন্তানকে মণ্ডলীকে দান করেছেন এবং অন্য সন্তানদের শিক্ষা-মানবিকতায় প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। স্বর্গ থেকে আমাদের প্রতি বর্ষণ করো আশীর্বাদের অমিয়ধারা।

সুমন পিরিজ

জন্ম: ১৪ এপ্রিল, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৭ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

পাপা, কত দ্রুত বয়ে যায় সময়! বড় অসময়ে চলে গেলে তুমি– তোমার অকাল প্রয়াণ আমাদের ভাসিয়ে গেলো শোকের সাগরে। জানি, তুমি আছো পরম পিতার আশ্রয়ে, তবু সান্ত্বনা মানে না আমাদের মন। কত স্নেহ-মমতায় তুমি লালন করেছো আমাদের তা ভাষায় কিভাবে প্রকাশ করব বলো! 'বিনামেঘে বজ্রপাতের মত'ই তুমি চলে গেলে সংসার সমুদ্রে আমাদের রেখে। আমাদের কোনো আকুতি, প্রাণান্তকর চেষ্টাই তোমাকে ফেরাতে পারেনি। তুমি চলে গেলে– রেখে গেলে ভালোবাসা, যত্ন ও প্রেমময় ব্যবহার। সবার সঙ্গে তোমার প্রেমময় ব্যবহার, সদ্ভাব আমাদের মনে আনে বেদনার মাঝে আনন্দের স্রোতোধারা। স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ করো, যেনো আমরা প্রভু যিশু খ্রিস্টের আদর্শে পরিবার গ'ড়ে তুলতে পারি। তোমার নির্মল হাসি, তোমার প্রেমময় স্মৃতি চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শোকার্ত পরিবারের সদস্যবৃন্দ

Bangladesh Christian Association Europe

Executive Committee for 2022-24

মিঃ শংকর ভাস্কর পালমা
সভাপতি

মিঃ সনেট পি. রোজারিও
সিনিয়র সহ-সভাপতি

মিঃ জুড মার্ক রোজারিও
সহ-সভাপতি

মিঃ ভিক্টর শেখর রোজারিও
সহ-সভাপতি

মিঃ সনেট ম্যানুয়েল ডি'কস্তা
সহ-সভাপতি

মিঃ মিল্টন কস্তা
সাধারণ সম্পাদক

মিসেস সুচিত্রা তেরেজা রোজারিও
সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক

মিঃ রোনাল্ড রিবেরু
যুগ্ম সম্পাদক

মিঃ অনুপ হিউবার্ট রোজারিও
সাংগঠনিক সম্পাদক

মিঃ চয়ন কস্তা
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক

মিঃ মার্ক কস্তা
কোষাধ্যক্ষ

মিঃ ম্যাগ্দালিনা গনসালভেস
সহ-কোষাধ্যক্ষ

মিঃ শাওন মাইকেল ডি'কস্তা
সহ-কোষাধ্যক্ষ

মিঃ রিকি স্ট্যানলি ডি'ক্রুজ
শিক্ষা ও তথ্য প্রযুক্তি সম্পাদক

মিঃ ক্যারল সমদার
সহ-শিক্ষা ও তথ্য প্রযুক্তি সম্পাদক

রিপা রোজারিও
সাংস্কৃতিক সম্পাদক

মিঃ বিমল কোড়াইয়া
সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদকা

মিঃ রঞ্জন কোড়াইয়া
আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক

মিঃ উজ্জ্বল রোজারিও
ধর্মীয় সম্পাদক

মিঃ অনল ক্লেমেন্ট গোমেজ
সহ-ধর্মীয় সম্পাদক

মিঃ এলভিস কস্তা
সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক

মিঃ রাফু গমেজ
সহ-সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক

মিঃ কল্যাণ কোড়াইয়া
দপ্তর সম্পাদক

মিঃ এরিক ভিয়েন
সহ-দপ্তর সম্পাদক

মিঃ বিকাশ পিউরিফিকেশন
ক্রীড়া সম্পাদক

মিঃ পাপ্পু গমেজ
সহ-ক্রীড়া সম্পাদক

মিঃ রবি যোসেফ পেরেরা
প্রচার সম্পাদক

মিঃ নিক্কন কস্তা
সহ-প্রচার সম্পাদক

মিঃ অনিক কস্তা
নির্বাচিত সদস্য

মিঃ ইমেল আর্নেস্ট ফার্নান্দেজ
নির্বাচিত সদস্য

মিঃ জিসান পালমা
নির্বাচিত সদস্য

সম্মানিত উপদেষ্টা মণ্ডলী

মিসেস হেনরী ডি'কস্তা
উপদেষ্টা

মিঃ এডওয়ার্ড গমেজ
উপদেষ্টা

মিঃ আলেক্স রোজারিও
উপদেষ্টা

মিঃ কমল চার্লস রোজারিও
উপদেষ্টা

মিঃ অজিত রোজারিও
উপদেষ্টা

মিঃ কেন্টন হেনরী কস্তা
উপদেষ্টা

মিঃ ব্রাইন ডিয়াস
উপদেষ্টা

মিঃ দীপক রোজারিও
উপদেষ্টা

মিঃ জীবন পিরিচ
উপদেষ্টা

মিঃ লিটু বৈরাগী
উপদেষ্টা

বান্দুরার রসগোল্লা ও চারা বিস্কুটের ইতিহাস

জেমস আনজুস

বান্দুরার কথা বললেই শান্তি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের রসগোল্লা ও লরেন্স বেকারীর চারা বিস্কুটের কথা চলে আসে। এই খাবার দুটি এখানকার ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। ৯১ বছর বয়সী সহদেব ঘোষ জানান, দেশের প্রধানমন্ত্রীও এই দোকানের মিষ্টি খেয়েছেন। আর লরেন্স বেকারী প্রথমে ফ্রিতে চারা বিস্কুট মানুষকে বিলিয়েছে। চারা বিস্কুটের সঙ্গে গ্রামের মানুষের পরিচয় এভাবেই ঘটে।

শান্তি মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

প্রায় ১২০ বছর ধরে মিষ্টির ব্যবসা। বিক্রমপুরের মোহন লাল ঘোষ ব্রিটিশ আমলে বিভিন্ন মেলাতে মিষ্টি বিক্রি করতেন। বান্দুরা ইউনিয়নের মোলাশীকান্দা-হাসনাবাদ গ্রামের মাদ্দররা এক মেলাতে আবিষ্কার করেন মোহনলাল ঘোষকে। তখন 'বিক্রমপুর অনন্ত দেব মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' নামে মিষ্টির ব্যবসা পরিচালিত হতো। মাদ্দররা অনুরোধ করেন ইস্টারের সময় হাসনাবাদ গির্জার মাঠের মেলাতে মিষ্টির দোকান দেওয়ার জন্য। সেই মেলায় এক নতুন স্বাদের মিষ্টি খুঁজে পেল এলাকাবাসী। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অনুরোধ করেন বান্দুরাতে স্থায়ী দোকান স্থাপনের জন্য। শুধু তাই নয়, দোকান প্রতিষ্ঠার জন্য জমিদার ফাদারকে বলে যাবতীয় ব্যবস্থাও করে দেন।

এই যে রসগোল্লা শুরুতে এক সের ১৪ পয়সা দরে বিক্রি হতো। বর্তমানে ২৮০ টাকা কেজি দরে এই রসগোল্লা বিক্রি হয়। এক সময় কাঠাল পাতার ঠোঙাতে, মাটির পাতিলে করে মিষ্টি বিক্রি করা হতো। মোহন লাল ঘোষের বড় ছেলে সহদেব ঘোষের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, 'রসগোল্লা কখন খেলে মজা লাগে- যখন তৈরি হয় গরম গরম নাকি পরে?' উত্তরে তিনি বললেন, 'গরম গরম খাওয়ার চেয়ে একদিন পরে খেলেই ভাল। তাতে মিষ্টি আরও সুস্বাদু হয়।' 'ভাল মিষ্টি চেনার উপায় কি?' প্রশ্নের উত্তরে তিনি রসিকতা করে বলেন, 'চেহারা দেখলেই চেনা যায়। মানুষ যেমন হাসি-খুশি থাকে, মিষ্টিও সেরকম।'

পরবর্তীতে মোহনলাল ঘোষের পুত্র সহদেব ঘোষ তার মায়ের নামে দোকানের নামকরণ করেন 'শান্তি মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'। বর্তমানে সহদেব ঘোষের ছোট ভাই মধুসুধন ঘোষ ব্যবসার দেখভাল করেন।

এই মিষ্টি নিয়ে অনেক মজার কাহিনী আছে। বান্দুরা এলাকার খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিয়ের আগে কথা পাকাপাকি অনুষ্ঠান- যাকে বলা হয় 'ডালা', এই অনুষ্ঠানে বরপক্ষ মিষ্টির দোকানের বড় কড়াইতে করে কনের বাড়িতে মিষ্টি নিয়ে যায়। গ্রামের যুবকরা এই অনুষ্ঠানে অনেকে পাল্লা দিয়ে মিষ্টি খেত। কেও হয়তো একাই ৩০/৪০ টি মিষ্টি খেয়ে ফেলতো। এখন অবশ্য এমন রসিক লোক দেখা যায় না।

শান্তি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে রসগোল্লা, ড্রাই রসগোল্লা, চমচম, কালো জাম, বালুশা, কমলা ভোগ, লাল মন মিষ্টিগুলো এবং রস মালাই, দই, জগা, বরফি ও চিনির সন্দেশ, আমিত্তি পাওয়া যায়।

লরেন্স বেকারী

এম এল বেকারী নামে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে বান্দুরায় প্রথম বেকারী স্থাপিত হয়। মাইকেল ডি ক্রুজ ও লরেন্স রোজারিও এই দুইজনে মিলে বেকারী চালু করেন। শুরুর এক বছরের মাথায় দুইজনে আলাদা ভাবে ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে 'লরেন্স বেকারী' নামে বান্দুরায় বেকারী চালু করেন লরেন্স রোজারিও। তার বাড়ি নবাবগঞ্জ উপজেলার নয়নশ্রী ইউনিয়নের পুরান তুইতাল গ্রামে।

ঢাকার আরজু বেকারী থেকে কাজ শিখে পরবর্তীতে বান্দুরায় ব্যবসা শুরু করেন। প্রথম টোস্ট বিস্কুট ও রুটি তৈরি করা হতো। শুরুতে চারা বিস্কুট তৈরি করা হতো না। ঐতিহ্যবাহী চারা বিস্কুট মূলত কলকাতার বিস্কুট। শুধু চারা বিস্কুট নয়, লাল ফোটা এবং খাস্তা বিস্কুটও কলকাতায় তৈরি হতো। নবাবগঞ্জের খ্রিস্টান লোকজন পূর্বে থেকেই রন্ধনশিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তখন কলকাতা ও করাচীতে এখানকার অনেক লোক কাজ করতেন। সেই সূত্রে এই বিখ্যাত চারা বিস্কুট কলকাতা থেকে লরেন্স বেকারীতে এসে পড়ে। ব্রিটিশরা যেমন ফ্রিতে চা খাওয়া শিখিয়েছেন, তেমনি এই বেকারী থেকে ফ্রিতে বিস্কুট মানুষকে দেওয়া হতো। কারণ তখন গ্রামের মানুষ এই ধরনের বিস্কুটের সঙ্গে পরিচিত ছিলনা।

লরেন্স রেকারীর বিস্কুট ও রুটির সুনাম আছে। স্থানীয়রা বাড়িতে সকাল ও বিকেলে চায়ের সঙ্গে এই বিস্কুট খেয়ে থাকে। ভাত যেমন প্রতিদিন খেতে হবে, এই বিস্কুটও যেন ঠিক তাই।

লরেন্স বেকারীতে টোস্ট, চারা, খাস্তা, লাল ফোটা, কয়েক ধরনের রুটি বানানো হয়। এছাড়া ডিসেম্বর মাসে খ্রিস্টানদের ধর্মীয় উৎসব বড়দিনের সময় দিনরাত কেক বানানো হয়। এই কেকের সুখ্যাতি আছে।

আগে দোকান ছাড়াও ঝাকায় নিয়ে বাড়ি বাড়ি বিস্কুট বিক্রি করা হতো। তবে এখন আর তা হয় না।

লরেন্স রোজারিও এর মৃত্যুর পর তার দুই ছেলে আলবিন রোজারিও এবং সুনীল রোজারিও ব্যবসার হাল ধরেন। বর্তমানে দুই ভাইয়ের পরিবার আলাদাভাবে বেকারী ব্যবসায় চালিয়ে যাচ্ছেন।

ঐহিত্যবাহী চারা বিস্কুট শুরুতে এক সের ২ টাকা দরে বিক্রি হতো। এখন সেই বিস্কুট ২০০ টাকা দরে বিক্রি হয়॥

কলাম

কালের সাক্ষ্য : পর্ব ৩৩

ফাদার দিলীপ এস. কস্তা

কাথলিক মণ্ডলীতে মূর্তি ও সাধু-সাধ্বীদের প্রতি ভক্তি

যিশু পিতরকে খ্রিস্টমণ্ডলীর দায়িত্ব দিয়ে বলেন, "আমি তোমাকে বলছি, তুমি তো 'পিতর' (অর্থাৎ, পাথর) আর এই পাথরেরই উপর আমি আমার মণ্ডলী গড়ে তুলব। অধোলোকের শক্তি তাকে কোনদিন পরাভূত করতে পারবে না। আমি স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি তোমারই হাতে তুলে দেব; পৃথিবীতে তুমি যা কিছু বেঁধে রাখবে, স্বর্গেও তা বেধে রাখা হবে; আর পৃথিবীতে যা-কিছুর বাঁধন খুলে দেবে, স্বর্গেও তার বাঁধন খুলে দেওয়া হবে" (মথি ১৬:১৮-১৯)। খ্রিস্টমণ্ডলীর বৈশিষ্ঠ্য হলো: মণ্ডলী এক, মণ্ডলী পবিত্র, মণ্ডলী প্রৈরিতিক এবং মণ্ডলী কাথলিক। আন্তিয়োক নগরের ধর্মশহীদ সাধু ইগ্নাশিউস ১০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম 'কাথলিক' শব্দটি ব্যবহার করেন। কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষার অন্যতম ভিত্তি হলো-পবিত্র বাইবেল (Holy Bible), প্রৈরিতিক ঐতিহ্য ও প্রথা (Apostolic Tradition) এবং মণ্ডলীর শিক্ষা (Church Magisterium)। 'কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা' বইয়ে বলা হয়েছে, "মণ্ডলী (লাতিন ভাষায় Ecclesia এসেছে, গ্রীক ek-kalein থেকে, যার অর্থ 'অনেকের মধ্য থেকে আহ্বান করা') শব্দটির অর্থ হচ্ছে সভা বা সমাবেশ। শব্দটি নির্দেশ করে জনগণের সমাবেশ সাধারণতঃ ধর্মীয় উদ্দেশ্যে মিলিত জনগণকেই বুঝানো হয়। Ekklesia কথাটি গ্রীক ভাষায় প্রাক্তন সন্ধিতে বারবার ব্যবহার করা হয়েছে পরমেশ্বরের সামনে তাঁর মনোনীত জনগোষ্ঠীর সমাবেশকে বুঝানোর জন্য; সর্বোপরি, সিনাই পর্বতের উপরে ইস্রায়েল জনগোষ্ঠির সমাবেশকে বুঝাবার জন্য, যেখানে ইস্রায়েলগণ তাদের বিধান লাভ করেছিল ও ঈশ্বর কর্তৃক তারা এক পবিত্র জাতি হিসেবে মনোনীত হয়েছিল। আদি খ্রিস্টবিশ্বাসীদের সমাজও তাদের সমাবেশকে 'মণ্ডলী' নাম দিয়ে নিজেদের সেই আগেকার সমাবেশের উত্তরাধিকারী বলেই বুঝিয়েছিল। মণ্ডলীতে ঈশ্বর পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকে তাঁর জনগণকে 'ডেকে এনে একত্রিত করেছেন'। সমার্থক গ্রীক শব্দ kyriake থেকে ইংরেজী শব্দ চার্চ ও জার্মান শব্দ কিরখে যার অর্থ 'প্রভু যার স্বত্ত্বাধিকারী" (ধারা ৭৫১)।

খ্রিস্টমণ্ডলীর ধারাবাহিক ইতিহাসে ৬০৪ থেকে ১০৫০ মধ্যযুগ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয় এবং এই সময়য়ের বাস্তবতাকে বিচার বিশ্লেষণ করে 'অন্ধকার যুগ' বলে চিহ্নিত হয়। 'খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাস' নামক বইয়ের বর্ণনায় বলা হয়, "মধ্য যুগ-এ খ্রিস্টমণ্ডলী নানা দিক দিয়ে বিপদ-আবর্তে পতিত হয়েছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ইসলাম বাহিনীর আক্রমণ, উত্তর দিক থেকে নতুন নতুন বর্বর ও উপজাতির ক্রমাগত আক্রমণ এবং বাইজান্টিয়ামে উদ্ভাবিত ভ্রান্তমত মণ্ডলীতে বিষাক্ত ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল। এই পল্লবিত ভ্রান্তমতকে আইকনোক্লাজম (Iconoclasm) বলে। গ্রীক শব্দ eikon (প্রতিকৃতি) এবং klaein (ভগ্ন কার) থেকে আইকনোক্লাজম্ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। এই মতানুসারে ধর্মীয় চিত্র ও মূর্তি রাখা বা শ্রদ্ধা করা নিষিদ্ধ। সুতরাং যাবতীয় ধর্মীয় চিত্র ও মূর্তির ধ্বংস সাধন আবশ্যক। এই ধ্বংসকারী মতের প্রবর্তক হলেন বাইজান্টিয়ানের সম্রাট তৃতীয় লিও (Leo III)। তিনি ৭২৬ এবং ৭৩০ খ্রিস্টাব্দে পর পর দু'টি আদেশ ঘোষণা করেন: 'যে কোন প্রকার ধর্মীয় ছবি বা মূর্তি ধ্বংস করতে হবে। যে কেউ এই অনুশাসনিক বিধির বিরোধিতা করবে, সে দণ্ডিত হবে" (পৃষ্ঠা ৮৭)। খ্রিস্টমণ্ডলীতে বিভিন্ন সময়ে মণ্ডলীর চিরাচরিত শিক্ষার মধ্যে দ্বন্দ ও বিভ্রান্ত এসেছে বিভিন্ন জনের ব্যক্তিগত মতামত ও শিক্ষার কারণে। খ্রিস্টমণ্ডলীর চিরাচরিত শিক্ষাকে বাদ দিয়ে বা বিকৃতি করে নিজস্ব চিন্তাধারার শিক্ষাকে তাকে ভ্রান্ত শিক্ষা (Heresy) বলা হয়। ভ্রান্ত শিক্ষাকে পরিহার করে মণ্ডলীকে সঠিকভাবে নির্দেশনা ও পরিচালনার জন্য ২১ বার ধর্মমহাসভার আহবান করা হয়েছে। এই ধর্মমহাসভা আহবান ও সভাপতিত্ব করার অধিকার থাকে একমাত্র পোপ মহোদয়ের হাতে। বিভিন্ন সময় ধর্মমহাসভার মধ্য দিয়ে ঐশতত্ত্ব বিধানের যথাযথ ব্যাখ্যা, যুক্তি ও আত্মিক প্রেরণার মাধ্যমে দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি ও ভ্রান্ত শিক্ষার সমাধান করে সঠিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

আদি মণ্ডলীতে সাধু-সাধ্বী, পোপ ও ধর্মগুরুদের স্মৃতি রক্ষা করে তাদের নামে স্মারক, মূর্তি, প্রতীক, প্রতিকৃতি, প্রতিচ্ছবি তৈরী ও রক্ষা করা হতো এবং পবিত্র বলে মান্য করা হতো। এছাড়া মূর্তি, প্রতিকৃর্তির মাধ্যমে প্রার্থনাও করা হতো। 'মণ্ডলীর ইতিহাস পরিচিতি', বইয়ে বলা হয়েছে, "প্রথম কয়েক শতাব্দীর খ্রিস্টানগণ কোন দেবতার প্রতীকী রূপায়নকে জোরালোভাবে বিরোধিতা করছিল, কেননা এটাকে তারা প্রতিমা বলে গণ্য করেছিল। তা সত্ত্বেও তৃতীয় শতাব্দীর পর থেকে ভূগর্ভস্থ সমাধিগুলো ধর্মশাস্ত্রের বিভিন্ন চরিত্র ও দৃশ্যাবলীর ছবি দিয়ে সুসজ্জিত করা হয় যার মধ্যে খ্রিস্টের বিভিন্ন উচ্চ আসন লাভ করে" (পৃষ্ঠা, ১২৮)। মূর্তি ও প্রতিকৃতির প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধাকে কেন্দ্র করে অষ্টম শতাব্দীতে দ্বন্দ্ব সংঘাতের সৃষ্টি হয়। এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের নিরসনের জন্য নিসিয়া নামক স্থানে ৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে ৭ম মহাসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। "বাইজান্টইন সম্রাট লিও চিত্র ও মূর্তির বিরুদ্ধে অনুশাসন ঘোষণা করা মাত্র জন ডামাসিন্ তার প্রতিবাদ করে খ্রিস্টভক্তদের ঐ অনুশাসনটি অমান্য করতে বললেন। সৎ সাহসের সঙ্গে সম্রাটের নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রচার করে জনসাধারণকে বুঝাতে লাগলেন যে, প্রভু যিশু কুমারী মারীয়া এবং সাধু-সাধ্বীদের চিত্র ও মূর্তি সন্মান ও শ্রদ্ধা কার যুক্তি সঙ্গত, কারণ এটি হল মণ্ডলীর একটি চিরাচরিত প্রথা এবং উক্ত প্রতিকৃতির প্রতি সন্মান প্রদর্শন দ্বারা তাঁদের শ্রদ্ধা করা হয়, যাঁরা ঈশ্বরের প্রীতিভাজন ও সন্মানযোগ্য, শুধুমাত্র তাঁদের আদর্শ ও স্মৃতি রক্ষার জন্য চিত্র ও মূর্তি সংরক্ষণ করা হয়, তাঁদের পূজার জন্য নয়" (পৃষ্ঠা, ৮৭)।

'খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাস' বইয়ের বর্ণনায় উল্লেখ

(১০২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

নিয়মিত কলাম

সেদিনের গল্পকথা

হিউবার্ট অরুণ রোজারিও

বাংলায় মানুষ বিক্রির দলিল

ভারতের অনেক অঞ্চলে এবং বাংলায় দাস প্রথার প্রচলন ছিল, বাংলায়ও ভারতের অনেক অঞ্চলের তুলনায় অনেক কম দামে দাস ও দাসী বিক্রি হত। বিত্তহীন মানুষ, নিঃস্ব গরীব, শিশু এবং নির্ভরশীল কিশোর-কিশোরী পণ্যের ন্যায় বেচাকেনা হত। আঠারো শতকের প্রথম দিকে মানুষ বেচা-কেনার দলিল রেজিষ্ট্রি অফিসের মহাফেজখানায় এখনো রয়েছে, এদের মধ্যে বেশিরভাগ অপ্রকাশিত দলিল আছে। সিলেট সদর সাবরেজিষ্ট্রি অফিসে অনেক বালাম বই আছে। বালাম বই থেকে মানুষ বেচাকেনার দলিল কিছু উদ্ধার করা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে গৃহস্তের ঋণ শোধ করার জন্য সন্তান সহ মা বিক্রি হত।

সিলেট অঞ্চলের ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের একটি দলিল থেকে পাওয়া যায়, ২৩২ বছর আগে জমিয়ত নামে চার বছরের শিশুকে অভাবের তাড়নায় নিজ সন্তানকে তার মা ৫ কাহন কৌড়িতে বিক্রি করতে বাধ্য হন। মা-বাবা বিত্তহীন ছিল কোন খাবার ছিল না। স্বর্ণ, রৌপ্য মুদ্রার পাশাপাশি বাংলায় তখন প্রচলন ছিল কড়ির। তখন ৫ হাজার ১২০ কড়ি ছিল ১ রুপির সমান। দলিলে দেখা যায় জমিয়ত নামের শিশুটি বিক্রি হয়েছিল ১ রুপিরও কম মূল্যে।

ঢাকার ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোষাধ্যক্ষ লিখেছেন যে, ১৮১০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম থেকে ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ১ টাকায় পাওয়া যেত এক মন আমন ধান। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ জেমস টেলর লিখে গেছেন যে, ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে ভূমিদাসী ও তার ছেলে, দু'জন মিলে নিজেদেরকে বিক্রির বিজ্ঞাপন দিয়ে বিক্রি হয়েছিল মাত্র ২৮ মণ ধানের বিনিময়ে।

সাবরেজিষ্ট্রারীর দলিলগুলোকে বলা হতো 'বালাম' বই। এক মহিলা আলিয়া বেগম বিক্রি হয়েছিল ৪০ কাহন কৌড়িতে। গণাই ভাণ্ডারী তার দামটা একটু বেশি পেয়েছিলেন তার সুঠাম শরীরের দৌলতে। ভূমিদাসীদের সে সময় মূল্য ছিল ১০ থেকে ১৫ টাকায়। দাম যাই হোক প্রায় ২৫০ বছর আগে দাস হিসেবে বিক্রির সময় তাদের সবাইকে লিখে দিতে হত নিজেদেরকে। বাংলায় সবচেয়ে কম মূল্য ছিল শিশুদের। ১ রুপিতে একটা শিশু পাওয়া সহজ ছিল।

১৮০১ খ্রিস্টাব্দে মানুষ বেচাকেনার একটি বালাম বইতে দেখা যায় ৩৫ বছরের এক দাসী আর ৯ বছরের কন্যা বিক্রি হয়েছিল সিলেটে। এটাই সবচেয়ে পুরানো দলিল। এই বালাম বই বা দলিলগুলো লেখা হত কয়েকটি ভাষায়। দলিলগুলো উদ্ধার করে বোঝা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অসমীয়া, সংস্কৃতের সাথে থাকত নাগরী লিপি। দলিলগুলোতে তিনজন করে সাক্ষী রাখা হতো। নিয়ম ছিল বেচাকেনা হওয়ার একমাসের মধ্যে নথিবদ্ধ করতে হত। বিক্রি হওয়ার পর সে নথিকে বলা হত "কবলা পত্র"। সেগুলিতে থাকত উর্দু, ফারসি, ব্রজবুলি ও সংস্কৃত ভাষা। সেখানে বিক্রির কারণ হিসেবে দেখা যায় অভাবের কারণে মানুষের দুর্দশার ইতিহাস। মানব বেঁচা-কেনার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হত। তেমনি একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল "বেঙ্গল গেজেট" পত্রিকায় ।

১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের গেজেট কনকবালা দাসীর দাম উঠেছিল ১০ রুপী, তার সুঠাম দেহের জন্য। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে "বাঙ্গালা সমাচার" পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যুবতী কন্যাদের বিক্রির বিজ্ঞাপন, ১১ অক্টোবর প্রকাশিত হয় (ভার্বা) স্ত্রী বিক্রির খবর। তুলার দাম চড়াতে অভাবগ্রস্থ তাঁতী নিজের স্ত্রীকে এক অল্পবয়স্ক যুবকের কাছে বিক্রি করে দেয়। বর্ধমানে বড় মানুষ বেচাকেনার বাজার ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় তার বইতে "সেকালের কথায়" ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের ২০০শত নরনারীর বিক্রির তালিকা রয়েছে। যুবতীদের মূল্য ছিল ২০ রুপী, ইংরেজরাও এ টাকায় যুবতীদের ক্রয় করে তাদের জাহাজে নিয়ে যেত। তবে কোনদিন তারা পর্তুগাল বা বিলেতে নিয়ে যেত না। একজন মাত্র ইংরেজ এক দাসীর প্রেমে পরে তাকে বিলেতে নিয়ে সংসার করেছিল। তবে ইংরেজ সমাজব্যবস্থা তাকে গ্রহণ করে নাই।

বালাম পত্রে লেখা থাকত "যে তাহারা অবশ্যই দাস-দাসী হিসেবে থাকবে, কাজে কোন গাফলতি করবে না, আর পালিয়ে গেলে মনিব যা বরাদ্দ করবে সেই শাস্তি মাথা পেতে নিতে হবে। মৌখিক স্বীকারোক্তির মাধ্যমে বালামপত্র কার্যকর করা হত। এক দলিলে দেখা যায়, এক দাস-দাসী সারা জীবনে মনিব বদলের ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিল। মুন্সিগঞ্জে মানুষ বেচাকেনা এক বড় হাট ছিল। সেখানে এক ছিন্নমুল বাঙালী,আগে বিক্রি হওয়া দাস-দাসীদের সন্তানরা যে কোন পণ্যের ন্যায় কেনা-বেচা হত প্রতি মাসে। সে হাটে অনেক অঞ্চলে ক্রেতারা আসত কারণ বাংলায় মানুষের দাম ছিল খুবই কম-সেটা মাত্র সোয়া দুইশো বছর আগে এই বাংলায়।

সূত্রঃ
১. জেম্‌স টেলর : বাংলার ইতিহাস।
২. আজিজুর রহমান।
৩. অধ্যাপক দিলীপ কুমার দাস চৌধুরী।
৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি বিভাগ।
৫. বেঙ্গল গেজেট পত্রিকা।
৬. আকবর আলী খান: দরিদ্রের অর্থনীতি॥

বড়দিনের উপহার

ষ্টিফেন কোড়াইয়া

বেসরকারী সংস্থায় উচ্চ পদস্থ: কর্মকর্তা হিসেবে দীর্ঘ চাকুরী জীবনে অনেকবার দেশের ভিতরে এবং বাইরে ট্যুর করেছে সুমন, কিন্তু এবারের ট্যুরটা যেন তার কাছে একটু ব্যতিক্রম মনে হয়। নভেম্বর পেরিয়ে কখন যে ডিসেম্বর এসে গেছে নানা কর্ম ব্যস্ততায় তা যেন বুঝতেও পারেনি। তবে এ সময়টায় আগের মত কন্‌কনে শীত অনুভূত না হলেও ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রকৃতির পরিবর্তনটা ঠিকই চোখে পড়ে। এবারের ট্যুরটা ছিল দিনাজপুর জেলায়। প্রতিবছরই বড়দিনের আগে আগে দেশের যেকোন একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা পরিদর্শন সুমনের চাকুরী জীবনের যেন একটি নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা হয়তো চলবে যতদিন না এ সংস্থায় তার চাকুরী থাকবে।

নিয়মিত ট্যুর কর্মসূচী শেষ করে নিরাপদে ঢাকায় ফিরলেও মনটা যেন এখনও দিনাজপুরের সেই প্রত্যন্ত গ্রামের একটি দরিদ্র পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের টানাপোড়ন, অভাব-অভিযোগ, অশিক্ষা, একজনের উপর আর এক জনের অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতনের নির্মম চিত্র সারাক্ষণ ঘুরপাক খায় সুমনের মনে। শেফালীর মলিন মুখটা বার বার মনে পড়ে তার। দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে গত তিন দিন ধরে একটানা গাড়ি চালিয়ে এতদূরে এ ঢাকায় চলে এলেও সে মুখটি যেন কিছুতেই ভুলতে পারেনা সুমন।

চোখের সামনে এখনও ভাসছে সেই এলোমেলো খোলা চুল, ভয়-বিহ্বল দুটো চোখে চিৎকার করে বলা মেয়েটির কথাগুলো, “আমাদের ছেড়ে পালিয়ে যাসনে বাবু! তোর উপর বিশ্বাস আছে আমার। আমাকে ও আমার অসহায় ছাওয়ালটাকে বাঁচা বাবু। বাঁচা! অসমাপ্ত খাবারের থালাটি সামনে নিয়ে এখনও কাঁদছে শিশুটি। অনাহারক্লীষ্ট শ্যামলা মুখমণ্ডলে তার চপোটাঘাতের চিহ্ন সুস্পষ্ট। দু গাল বেয়ে অঝোর ধারায় ঝরছে তপ্ত অশ্রু। শেফালী, শিশুটির মা, একটি উপজাতীয় পরিবারের মেয়ে। গোলগাল চেহারা। শ্যামলা গায়ের রং।

উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি মনিটরিং করতে গত দু'দিন যাবৎ এক প্রকল্প থেকে আর এক প্রকল্প ঘুরছে সুমন। সাথে যোসেফ, তার গাড়ী চালক-কাম অফিস সহকারী। গত রাতে সড়ক পথে ঢাকা থেকে রওনা হয়ে আজ সকাল আটটা নাগাদ দিনাজপুর এসে পৌঁছে গেষ্ট হাউজে ব্যাগ ব্যাগেজ রেখে মফস্বলের পথে রওনা হয়েছে। দিনাজপুর শহর থেকে সড়ক পথে মাইল বিশেক চলার পর হঠাৎ যোসেফ গাড়ীটি ব্রেক করে পিছনের সিটে বসা সুমনের দিকে তাকায়। সরারাতের আধো ঘুম আধো জাগোরনের ক্লান্তি ও গাড়ির খোলা জানালা পথে আসা মৃদু মন্দ বাতাসে দু চোখে জড়িয়ে আসা তন্দ্রাটা হঠাৎ গাড়ি ব্রেক কষার শব্দে কোথায় উঁবে যায় সুমনের। চোখ মেলে তাকাতেই দেখে, প্রশ্নাতুর চোখে যোসেফ তার দিকে তাকিয়ে আছে।

“কি এসে পড়লাম নাকি হে?” তড়িৎ প্রশ্ন করে সুমন।

“না স্যার, সামনে কিসের যেন একটা ঝটলা দেখা যাচ্ছে, পাবলিকের চেচামেচি ছাপিয়ে একটি মহিলা ও শিশুর কান্না শুনা যাচ্ছে। মনে হয় সবাই মিলে কাকে যেন মারছে।” গাড়ির গতি কমিয়ে বাইরের দিকে কান পেতে শুনে উত্তর দেয় গাড়ি চালক যোসেফ। “থামাও দেখি গাড়িটি, কি হচ্ছে একটু দেখে নেই?” বলতেই গ্রামীন কাঁচা রাস্তার পাশ ঘেসে গাড়িটি থামায় যোসেফ। থামতেই তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে পায়ে পায়ে কয়েক কদম সামনের দিকে এগোয় সুমন। কাকে ঘিরে যেন একদল লোক ঝটলা করছে। রাস্তার আশেপাশের বাড়িগুলো থেকে বেরিয়ে আসা উৎসুক মানুষগুলো এসে জটলাটা ক্রমেই বড় করে তুলছে। ভীড়ের মাঝে সুমনের স্পষ্ট চোখে পড়ে সতরো আঠারো বছরের একটি যুবতী মেয়ে মাটিতে পড়ে কাঁদছে। একটি লোক পাগলের মত দুঁ হাতে সমানে তার শরীরে আঘাত করছে।

“আমার জন্য নাকি কোন রান্না করা হয়নি। সারাদিন ক্ষুধায় কষ্ট করেছি। তাই এবার মজা দেখাবো তোকে।” বলে আবার মারতে শুরু করে লোকটি।

“এই যে- করছেন কি? মেয়েটিকে তো মেরে ফেলবেন মশাই! কে হয় সে আপনার? আর কেনই বা এভাবে মারছেন তাকে জানতে পারিকি? কান্নার শব্দে রাস্তার আশ-পাশের বাড়িগুলো থেকে বেরিয়ে আসা মানুষগুলোর আগ্রহী দৃষ্টি এবার সুমনের উপর এসে পড়ে।

“হামার মানুষ হামি মারছি, তুই কে রে বাবু কথা বলার?” আগুন ঝরা চোখে সুমনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন ছুড়ে দেয় মেয়েটিকে নির্যাতনকারী লোকটি।

“আমি ঢাকা থেকে আসছি। কি অন্যায় করেছে মেয়েটি জানতে চাই। যদি সদোত্তর না পাই, তবে এখনই সদর থানায় ফোন করে সবকিছু জানাব আমি। তখন টের পাবে বাছাধনার কত ধানে কত চাল।”

থানার কথা বলায় যেন লোকটির গলার স্বর একটু নরম হয়। এতক্ষণ যারা তার চারপাশে জটলা করে তামসা দেখছিল, তারা আস্তে আস্তে পিছিয়ে যেতে থাকে।

“কি হয়েছে মা তোমার? কেনই বা এই লোকটি তোমাকে এভাবে মারধর করছে?” ঔষধে কাজ হয়েছে ভেবে মেয়েটির আর একটু কাছে এগিয়ে এসে সস্নেহে জিজ্ঞেস করে সুমন। নরম গলায় সুমনের কথায় মেয়েটির কান্না থামে। অসহায়ত্বের অথৈ সাগরে যেন একটু মাটির সন্ধান পায় সে।

শেফালীর দুর্বল শরীরে যত্র-তত্র মা'র থামিয়ে এবার পালানোর চেষ্টা করে লোকটি। আরোও জোড়ে আর এক ধমক দিয়ে তাকে পালাতে বাঁধা দেয় সুমন। সাহস পেয়ে ক্রন্দনরত মেয়েটি এগিয়ে আসে সুমনের দিকে, তারপর কান্না জড়িত কণ্ঠে বলতে থাকে “আমার নাম

শেফালী আছে বাবু, ওটা আমার স্বামী আছে।" সুমনের মনে হয় যেন এক হারিয়ে যাওয়া সন্তান অনেকদিন পর তার বাবাকে কাছে পেয়ে তার মনের সবকথা উজার করে দিচ্ছে। এখনও মেয়েটির কথাগুলো স্পষ্ট মনে আছে সুমনের।

তাকে মারছিল যে লোকটি, তার নাম রতন। তার স্বামী। গরীব মা-বাবা অল্প বয়সে তার চেয়ে দ্বিগুণ বয়সী এই লোকটির সাথে তার বিয়ে দিয়েছিল। বিয়ের পর থেকেই শুরু হয় তার সংসারের দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে চলা। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে তারই মত এক শ্রেণীর বেকার, অকর্মণ্য আর নেশাগ্রস্ত বন্ধু বান্ধবের সাথে আড্ডা দিয়ে দুপুরে খাওয়ার সময় বাড়ি ফিরে স্ত্রী শেফালীর রেঁধে রাখা খাবার থেকে কিছু খেয়ে আবার আড্ডা দিতে বেরিয়ে যাওয়া। সে আড্ডা চলে রাত পর্যন্ত। মদ-গাঁজা থেকে শুরু করে এমন কোন নেশা দ্রব্য নেই, যা সে সেবন করেনা। এ আড্ডা চলে যে পর্যন্ত না রাত গভীর থেকে গভীরতর হয়। তারপর টলতে টলতে এক সময় বাড়ি ফিরে আসে। বিয়ের পর বছর না যেতেই রূপা, তার মেয়ে কোলে আসে। রূপা জন্মাবার পর শেফালীর উপর স্বামীর অত্যাচারের মাত্রটা যেন আরো বেড়ে যায়।

রাত পোহাতে না পোহাতেই শেফালী দুধের শিশুটিকে কয়েক টান বুকের দুধ খাইয়ে গ্রামের অবস্থাপন্ন কৃষকের বাড়িতে কাজ করতে বেরিয়ে যায়। দুপুর বেলা এসে নাকেমুখে একমুঠো চাল ফুঁটিয়ে নিজে খেয়ে, দুধের বাচ্চাটিকে খাইয়ে ও স্বামীর জন্য রেখে আবার কাজে ফিরে যায়।

যখন প্রকৃতি জুড়ে ধীরে ধীরে অন্ধকার নামে, শুরু হয় ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা ঝিল্লিরব, ঘরে ফেরা রাতের পাখিদের কিঁচির মিঁচির রব শুরু হয়ে আবার সবকিছু নিরব হয়ে আসে, তখন গ্রামের আধো আলো আধ অন্ধকারে আঁকাবাঁকা মেঠো পথে অশরীরি ছায়ামূর্তির মতই কাজ শেষ করে বাড়ির পথ ধরে শেফালী। প্রতিদিনের মত কোলের অভুক্ত শিশু বাচ্চাটি মায়ের জন্য অপেক্ষা করতে করতে এক সময় ভাঙ্গা ঢেঁড়া ঘরটার এক কোনে ঘুমিয়ে পড়ে।

হঠাৎ পিঠে রতনের মুঠো করা হাতের এক ঘুষির আঘাতে কুঁকড়ে যায় শেফালীর শীর্ণ দেহটা। নিজের দুঃখের কথা বলতে বলতে এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিল শেফালী যে, সে এখনও স্বামী নামের ঐ অত্যাচারী লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট্ট অবুঝ শিশুটি ভয়, ক্ষুধা আর যন্ত্রনায় তার সামনেই মাটিতে গড়াচ্ছে। অত্যাচারী স্বামীর নির্মম নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য শিশু বাচ্চাটিকে বুকে জড়িয়ে ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল শেফালী, কিন্তু এখানে এসেও নিস্তার পায়নি সে। স্বামী নামক দানবটি তাকে মারধর করার জন্য পিছু পিছু এ পর্যন্তও এসেছে।

"আরে করছিস কি রতৈন্যা! অনেক হয়েছে। বাচ্চাটাকে ধর এবার। মরে গেল যে।" পাশে দাঁড়ানো একজন বয়স্ক লোক হাত নেড়ে থামতে বলে রতনকে ।

"না, মানিক মাতবর কাকা, আমারে থামতে কইও না। কিভাবে বউ শাসন করতে হয়, আজ আমি তা দেখিয়ে দেব। এখনও তো মাইরের কিছুই হয়নি। ঐ ভদ্রলোক আইসা পড়লো বলে। তুমিই বল কাকা- এখন তো ভরা রোপার মৌসুম, কাজের অভাব নেই, তবু নবাবের বেটি গত দুঁদিন কাজে না গিয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘরে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। কাজে না গেলে খাওয়া আসবে কোথেকে?" হাতের মা'রটা থামিয়ে মানিক মাতব্বরের কাছে এক নিশ্বাসে অভিযোগ দায়ের করে রতন, মেয়েটির স্বামী।

"রতন তো ঠিক কথাই কইছেরে বেটি। কাজে না গেলে খাওয়া আসবো কোথেকে?" মানিক মাতব্বর রতনের কথায় সমর্থন দিয়ে এবার শেফালীর দিকে ফিরে তাকায়।

"ও আমার সম্বন্ধে মিথ্যে কইছে কাকা, বিশ্বাস করো!" কাঁদতে কাঁদতে বয়স্ক লোকটির পায়ে পড়ে শেফালী।

"না, আজ যখন তোকে হাতে পেয়েছি, শিক্ষা তোকে পেতেই হবে" বলে আর একটি শক্ত চড় কশায় রতন, মেয়েটির গালে । সয্য করতে না পেরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শেফালী। মায়ের কান্নার শব্দ ছাঁপিয়ে ছোট্ট মেয়ে শিশুটির মা মা কান্নাজড়িত চিৎকারটা যেন পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সুমনের বুক বিদীর্ণ করে।

চোখের সামনে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার ও তা সমর্থনের এ অমানবিক দৃশ্যটা নিজের অজান্তে যেন বিবধমান এই অসম বয়সী দম্পত্তি রতন ও শেফালীর আরো কাছে ঠেলে নিয়ে আসে সুমনকে। চোখের সামনে এ অনাচার দেখে আর চুপ থাকতে পারেনা সুমন। মানুষের চিৎকার ও হট্টগোলের মাঝেও তার কানে আসে শেফালীর আত্মপক্ষ সমর্থনের শেষ চেষ্টা।

"গত তিন দিন শরীরে জ্বর ও প্রচণ্ড মাথা ব্যাথার কারণে মাথা সোজা করতে পারছিলাম না মাতব্বর কাকা। তার উপর বাচ্চাটিও ডায়রিয়ায় আক্রান্ত। এক ফোঁটা পানি বা একটু ঔষধ দেবারও পাশে কেউ ছিলনা। সোয়ামীটা থাকতেও নেই। খাওয়ার সময় হলে বাড়ি এসে খাওয়া না পেলে তার শরীরের রক্ত গরম হয়ে টকবগ করে ফুটতে থাকে। সামনে যা পায়, তা দিয়েই আমাকে মারতে থাকে। বলুন মানিক কাকা, কিভাবে আমি এ অবস্থায় কাজে যেতে পারি?

"না মাইয়া, ভুইল্লা যাও কেনে- স্বামী হচ্ছে দেবতা। তার দেখ-বাল করা তোমার কর্তব্য। অসুখ-বিসুখ তো সব মানুষেরই হয়, তাই বলে কি স্বামীকে না খাইয়ে রাখে কেউ? শেফালীর সব কথা উড়িয়ে দিয়ে নিজের যুক্তি প্রদর্শন করে মানিক মাতব্বর।

মানিক মাতব্বরের কথায় এবার আর স্থির থাকতে পারেনা সুমন। "এই তোমরা জানো নারী নির্যাতনের শাস্তি কি হতে পারে?" এবার আরো একটু কাছে এগিয়ে এসে ধমকের সুরে রতন ও মানিক মাতব্বরকে জিজ্ঞেস করে সুমন। "জানি, পুলিস ধরে নিয়ে যায়।" গলার স্বর একটু নরম করে উত্তর দেয় রতন।

"তা সবই তো জান দেখছি। আর একবার স্ত্রীর উপর হাত তুললে এখনই আমি থানায় ফোন করবো।" আবার পুলিশের ভয় দেখায় সুমন।

"কি ভেবেছেন মশাই, মনে করছেন পুলিশের কথা বললে ভয় পাবো আমরা? যেখানে যাচ্ছিলেন, সেখানে যান, পরের চরকায় তেল দিতে আসবেন না।" বলে কঠিন দৃষ্টিতে সুমনের দিকে তাকায় মানিক মাতব্বর। মানিক মাতব্বরের কথায় অভয় পেয়ে আর একটু ঘেঁসে তার পাশে এসে দাঁড়ায় রতন।

একটু আগেও যে পরিস্থিতিটার সমাধান সহজ হবে বলে মনে হয়েছিল সুমনের, মানিক মাতববরের কথা ও আস্ফালনে তা যেন অসম্ভব মনে হয় সুমনের কাছে। বুঝতে পারে এই লোকটিই মহিলার স্বামী রতনকে ইন্ধন যোগাচ্ছ। প্রমাণও পাওয়া গেল সাথে সাথেই যখন সে তাকে সমর্থন করার জন্য রতনকে কিছু যোগাড়-যন্ত্র করার কথা বলে। সুমন বুঝতে পারে কি যোগারের কথা বলছে মানিক মাতব্বর।

সঙ্গীর এক তরফা সমর্থন পেয়ে লোকটিকে কিছু বলার আগেই এক হাতে শেফালীর চুলের মুঠি ও অন্য হাতে বাচ্ছটিকে তুলে নিয়ে বাড়ির দিকে পাঁ বাড়ায় রতন। অকস্মাৎ হাতে হেঁচকা টানে ব্যাথা পেয়ে আবার কঁকিয়ে কেঁদে উঠে শিশুটি। কোন দিকে না তাকিয়ে শেফালীকে টানতে টানতে সামনের দিকে এগোয় রতন। ঘটনার আকস্মিকতায় মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে পড়লেও সাথে সাথেই সম্বিত ফিরে পায় সুমন।

"কোথায় যাচ্ছ? তোমার সাথে যে আমার কথা এখনও শেষ হয়নি ভাই। এই যে বলছিলে না- গত দু'দিন তোমাদের কারো পেট খাবার পরেনি? একবার কি ভেবেছ, তোমাদের এই নিষ্পাপ শিশু সন্তানটিও তোমদের জন্য না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে?" চিৎকার করে বলা সুমনের কথাগুলো এত উগ্রতার মাঝেও রতনের কানে আঘাত করে। স্ত্রী শেফালীর চুলের মুঠি ছেড়ে দিয়ে শিশুটিকে দু' বাহুতে জড়িয়ে ধরে তার শুকনো মুখের দিকে তাকায়। তারপর পিছন ফিরে সুমনের দিকে এগিয়ে যায়। শেফালীও তাকে অনুসরণ করে। "তা কি করতে বলেন আমাদের?" সুমনের কাছাকাছি এসে অতি বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করে রতন। শেফালী

স্বামীর এ পরিবর্তনে অবাক হলেও সুমনের কথায় সেও যেন কেমন ভরসা খোঁজে পায়। মলিন শাড়ীটার ছেঁড়া আচলে চোখ দুঁটো মুছে মিট্ মিট্ করে তাকায় সুমনের দিকে। কি বলার জন্য যেন তার পাতলা দুটো ঠোঁট একবার কেঁপে উঠে। ভয় ভয় চোখে আবার স্বামীর দিকে তাকায়। কোমল দৃষ্টিতে স্বামী রতনও তাকায় তার দিকে। মুহূর্তের জন্য স্বামী-স্ত্রীর চার চোখের দৃষ্টি বিনিময় হয়। স্বামীর চোঁখের ভাষা বুঝতে অসুবিধা হয়না শেফালীর। তার অপকর্মের কথা যেন সুমনকে না বলে দেয় সে।

এতক্ষণে গাড়ি পার্ক করে যোসেফও সুমনের পাশে এসে দাঁড়ায়। যোসেফের দিকে ফিরে গাড়িতে রাখা প্রকল্পের উপকারভোগীদের জন্য বড়দিনের উপহার হিসাবে আনা দ্রব্যসামগ্রী থেকে কিছু উপহার সামগ্রী নিয়ে আসার কথা বলে রতন ও শেফালীকে ডেকে নিয়ে রাস্তার পাশেই একটি গাছের নীচে বসে সুমন।

ইতোমধ্যে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রীতে ভরা একটি বাক্স নিয়ে যোসেফ আসে। সুমন সে বাক্স থেকে বড়দিনের মনোগ্রাম আঁকা একটি কেক নিয়ে শেফালীর হাতে দিয়ে কাটতে বলে পাশে বসা তার স্বামী রতনের পিঠে হাত বুলায়। কেক কাটা হলে নিজ হাতে রতন ও শেফালীর হাতে দিয়ে আগে উদর পূর্তি করতে বলে শিশুটির দিকে তাকায় সুমন। এতক্ষণে শিশুটিও কান্না থামিয়ে অশ্রুসজল চোখে সুমনের দিকে তাকিয়েছে। ডায়াবেটিসের ভাব থাকায় যে কোন সময় দরকার হতে পারে ভেবে পকেটে দুঁ একটি লজেন্স রাখে সুমন, কথাটি মনে হতেই পকেটে হাত দিয়ে কয়েকটি লজেন্স বের করে শিশুটির হাতে দেয়। কান্না ভুলে ছুঁ মেরে লজেন্সগুলো হাতে নিয়ে কৃতজ্ঞতা ভরা চোখে সুমনের দিকে তাকায় সে।

গাড়ীতে রাখা খাবার পানির বোতলের মজুদ থেকে একটি বোতল নিয়ে আসে যোসেফ। নিজ হাতে দুটো গ্লাসে পানি ঢেলে স্বামী ও স্ত্রী দুজনের হাতে তুলে দেয় সুমন। বাচ্চাটির হাতেও এক টুকরো কেক তুলে দিতেই ঝাঁপ দিয়ে সুমনের কুলে এসে আশ্রয় নেয়। নিজের সন্তানের মতই সুমন শিশুটিকে জড়িয়ে ধরে তার গালে কিস করে। সুমনের মনে হয় নবজাত শিশু যিশুই নবরূপে তার কোলে এসে অবস্থান নিয়েছে। চোখ বুঝে নীরবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায় সুমন।

সকালের সূর্যটা উপরে উঠতে উঠতে কখন মাথার উপর উঠে এসেছে। ডন্ ডন্ ডন্ করে কাছেই কোন গির্জার মিনারে দুপুর বারটার ঘন্টা ধ্বনি হচ্ছে। খোলা আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত কয়েকটি চিল মনের আনন্দে উড়ছে। পাতা ভরা ঝাকড়া গাছটির আগ ডালে বসে একটি দোয়েল পাখি যি-ই-শু, যি-ই-শু বলে শিস দিয়ে গান ধরেছে।

গাছের নীচে বসে অলসভাবে দিন কাটিয়ে, আড্ডা দিয়ে, অসৎ মানুষের কথায় নিজেদের মধ্যে অশান্তি, মরামারি, ঝগড়া-বিবাধ, নেশা করে নিজেদেরই কি ক্ষতি হতে পারে, সে সম্বন্ধে রতন ও শেফালীকে বুঝাতে বুঝাতে কখন যে তিন জনেরই চোঁখ অশ্রুশিক্ত হয়ে পড়েছে কেউ বুঝতে পারেনি। কৃতকর্মের জন্য অনুতাপের দাবানলে দুজনেই পুড়ে খাক হয়।

খপ্ করে সুমনের হাত ধরে রতন ও শেফালী, দু স্বামী-স্ত্রী দু'জন মিলে প্রতিজ্ঞা করে, আর কোনদিন কেউ নিজেদের তথা পরিবারের ক্ষতি হয়, এমন কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকবে। রতন আর কোনদিন নেশা করবেনা। শেফালীর উপর নির্যাতন করবেনা। দুজন মিলে কাজ করে এই ছোট্ট শিশুটিকে একজন মানুষের মত মানুষ করার দায়িত্ব নিয়ে জীবন পথে এগিয়ে যাবে।

বিদায় বেলা পকেটে হাত দিয়ে মানিব্যাগ বার করে সুমন। এতে যা টাকা আছে, তাতে ট্যুর চলাকালীন গাড়ীর জ্বালানী খরচ ও দু'জনের খাওয়া-দাওয়ার খরচ হবে। সেখান থেকেই তিনটি এক হাজার টাকার নোট বের করে শেফালীর হাতে দিয়ে সস্নেহে উচ্চারণ করে, " এই নে মা, তোর চিকিৎসা ও সামান্য খাবার খরচ। রাখ, কাজে লাগবে।" প্রথমটায় টাকাগুলো ধরতে চায় না শেফালী। পরে সুমনের বার বার অনুরোধে কাঁপা কাঁপা হাতে টাকাগুলো নিজ হাতে তুলে নেয়। "তুই মানুষ নস্ রে বাবু, তুই মানুষ নস, তুই দেবতা আছিসরে বাবু।" আপন মনে উচ্চারণ করে শেফালী। "ঠিক বলেছে শেফালী বাবু! ঠিক বলেছে।" বলে রতনও দুহাতে সুমনকে জড়িয়ে ধরে ফুপিয়ে কেঁদে উঠে। "এই অধম ছাওয়ালদের দেখার জন্য আবার আসবি বাবু! আবার আসবি।" কান্না জড়িত কণ্ঠে অনুরোধ জানায় একটু আগের সেই স্ত্রী নির্যাতনকারী মানুষটি। আর দেরী করে না সুমন। পায়ে পায়ে গাড়ীতে উঠে বসে। একটু আগে বিদায় নেওয়া মানুষগুলোর জন্য এক অব্যক্ত কান্নায় বুকটা যেন ভারী হয়ে উঠে সুমনের। হাত নেড়ে শেষ বিদায় জানায় শেফালী ও রতনকে।

যোসেফ এতক্ষণে গাড়ী ষ্টার্ট দিয়েছে। গাড়ীতে বসে মানি ব্যাগ বার করে কত টাকা আছে গুনে দেখে নেয় একবার। যে টাকা আছে তাতে হয়তোবা সম্পূর্ণ ট্যুর এর সময়টা আধ পেট খেয়ে বা না খেয়ে কাটাতে হবে। তবু এক প্রকার মানসিক শান্তি যেন পেট পুড়ে খাওয়ার চেয়েও বড় আনন্দ হয়ে সুমনের মনে বিরাজ করতে থাকে।

এতক্ষণে গাড়ীটা চলতে শুরু করেছে। ক্ষণিকের জন্য গাড়ীর জানালা দিয়ে পেছন দিকে চায় সুমন। কৃতজ্ঞতা ভরা দুই জোড়া চোখ তখনও তাকিয়ে আছে ধীরে ধীরে অপসৃয়মান তার গাড়ীটির দিকে॥

শুভ বড়দিন

টুটুল রড্রিকস

তাক ধিনা ধিন ধিন
আজকে বড়দিন
তেরে কেটে ধা
পিঠা খেয়ে যা।
ধা ধা ধিন না
কক পিঠা সব খা
সা রে গা মা পা
আনন্দে হাস সবে হা-হা-হা।
হাতে হাতে ধরি ধরি
এসো সবে গান করি,
তবলায় শুনি সুর দাদরা কাহারবা
তাল শুনে বলি মোরা বাহ্বা বাহ্বা।
ছোট ছোট বাবুরা
হাটি হাটি পা পা
গাও সবে দিয়ে মন
কর সবে কীর্তন।

ছোট ছোট শিশুরা
গিয়ে দেখ গোশালায়,
শিশু যিশু শুয়ে আছে
খড়ের ছোট বিছানায়।
খড়ের বিছানাতে শুয়ে
ছোট শিশু হাসে
নাচ গান করি মোরা
যিশুর চারিপাশে।
দাদরা কাহারবা তেওরা ত্রিতাল,
বোতলেরে পানি পানে হয়োনা মাতাল
ঝগড়া বিবাদ নয়
মিলে যাও সবে
তবেই বড়দিন
সার্থক হবে।

সুখ-অসুখ

খোকন কোড়ায়া

২৫ ডিসেম্বর সকাল এগারটায় লিজা ফোন করলো। শান্তা ভেবেছিলো বড়দিনের শুভেচ্ছা জানাতে ফোন করেছে লিজা। শুভেচ্ছা বিনিময় করলো ঠিকই কিন্তু তারপর যা বললো, তার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলো না শান্তা। লিজা বললো, আজকের দিনটা আমি তোর সঙ্গে কাটাতে চাই, আমি আসতে চাই তোদের বাসায়। একটি ইংরেজী মাধ্যম স্কুলের ক্লাস টেন এ পড়ে ওরা দুজন। তবে দুজনের পারিবারিক অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন। লিজারা অনেক ধনী আর শান্তারা সাধারণ মধ্যবিত্ত। লিজার বাবা গার্মেন্টস ব্যবসায়ী, লিজার মা এনজিওতে চাকরি করে, আবার একজন সামাজিক নেত্রী, অপরদিকে শান্তার বাবা ওদের স্কুলেই লাইব্রেরিয়ান হিসেবে কাজ করে, আর ওর মা ঘরে থেকেই কিছু বুটিকের কাজ করে। বারিধারায় লিজাদের আলিশান বাড়ি। কি নেই সেই বাড়িতে, সুইমিং পুল, ব্যাডমিন্টন কোর্ট, জিম আরো কত কি। ফার্নিচার আর ফিটিংস-এর দিকে তাকালে চোখ ঝলসে যায়। বাড়িতো নয়, যেন পাঁচ তারকা হোটেল। লিজা একবার ওর ক্লাসের বন্ধুদের নিয়ে গিয়েছিলো ওদের বাড়িতে। অপরদিকে শান্তারা থাকে ফার্মগেট রাজাবাজারে দুই বেডরুমের একটি বাসায়। যে স্কুলে লিজাদের মতো ধনীর দুলালীরা পড়ে সেখানে আসলে শান্তাকে মানায় না। শান্তার বাবা-মাও কখনো এ স্বপ্নটি দেখেনি যে তাদের মেয়ে ওরকম একটা নামী দামি স্কুলে পড়বে। কিন্তু দৈব বলে একটা কথা আছে না। শান্তার পাঁচ বছরের জন্মদিন, শান্তার বাবা দাওয়াত করেছিলো স্কুলের প্রিন্সিপালকে। তিনি ছিলেন একজন ইন্ডিয়ান অবাঙ্গালী সিস্টার। শান্তার সঙ্গে কথা বলে সিস্টারের খুব ভালো লাগে। যাওয়ার আগে তিনি বললেন, জন, তোমার মেয়েটা খুব বুদ্ধিমতি, ওর ফিউচার খুব ব্রাইট হবে যদি তোমরা ওকে গাইড দিতে পার। শোন শান্তাকে আমাদের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দাও। শান্তার বাবা বলেছিলো, এটা কি করে সম্ভব সিস্টার, স্কুলের এত বেতন, তার উপর আবার বিশাল অংকের এ্যানুয়াল ফি, আমার ইনকাম কতো আপনিতো জানেনই। সিস্টার বলেছিলেন, তোমার ভার আমি একটু লাঘব করে দেবো। টিউশন ফি অর্ধেক মওকুফ করে দেবো আর এ্যানুয়াল ফির এক টাকাও তোমার দিতে হবে না। জানি তারপরও তোমার একটু কষ্ট হবে কিন্তু মেয়েটার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এইটুকু চাপ নিতে হবে তোমার। শান্তার মা অর্থাৎ অনিতার একটু আপত্তি ছিলো, তার যুক্তি ছিলো যারা ইংলিশ মিডিয়মে পড়েনি তারা কি জীবনে বড় হয়নি, প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তাদের ভবিষ্যৎ কি উজ্জ্বল হয়নি? তবে জনের ভেতরে একটা স্বপ্ন মাঝে মাঝে উঁকি দিতো যদিও সে জানতো এ স্বপ্ন পূরণ হবার নয়। স্কুলের ফর্সা, স্বাস্থ্যবান, স্মার্ট ছেলেমেয়েদের ভেতর নিজের মেয়ে শান্তার মুখটা ও দেখতে পেতো। তাই অনিতাকে বুঝিয়ে শান্তাকে ওদের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয় জন। সেই সিস্টার চলে গেছেন কিন্তু যাওয়ার আগে পরবর্তী প্রিন্সিপালকে বলে গেছেন যেন শান্তা যতদিন এ স্কুলে আছে, এ সুবিধাটা ভোগ করে।

শান্তা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। লিজাকে বললো, আমি বাবা-মার সঙ্গে কথা বলে তোকে জানাচ্ছি। বাবা-মা দুজনই বললো, আসতে বল। শান্তা বললো, তোমরা জান ওরা কত বড়লোক। ওকে কি খাওয়াবো, কোথায় বসতে দেবো, শেষে ক্লাসের সবাইকে বলে বেড়াবে আমাদের দৈন্য দশার কথা। মা বললো, তুই এত ভাবিসনাতো, আমাদের ঘরে কি বসার জায়গা নেই? আমরা যা খাই ও তাই খাবে, তাছাড়া আজ বড়দিন, আমরাওতো আজ শাকভাত খাবো না। বাবা বললো, স্কুলে গিয়ে যদি বলে বলবে, আমরা ধনী নই, এটাতো আমাদের অপরাধ নয়। বরং ওকে আসতে নিষেধ করলে তাতে আমাদের মনের দৈন্যতা প্রকাশ পাবে। শান্তা ফোন করে বললো, ঠিক আছে লিজা চলে আয়। লিজা বললো, আসছি, তোদের ঠিকানাটা আমাকে টেক্সট করে দে।

সাড়ে বারটায় লিজা ফোন দিলো, শান্তা, তোদের বাসাটা খুঁজে পাচ্ছি না, তুই একটু বাইরে আসবি! কান্তা বাইরে গিয়ে দেখে ওদের বাসা থেকে একটু দূরে মেরুণ রংয়ের একটি ঝকঝকে সেভেন সিটার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আর ঐ গাড়িটার কারণে সরু রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। শান্তা বুঝলো, ওটাই লিজার গাড়ি। ও দ্রুত হেঁটে গাড়ির কাছে চলো গেলো, ওকে দেখেই লিজা নেমে এলো। ড্রাইভারও নেমে পেছনের ডালা খুলে একটা কেকের বাক্স দিলো লিজার হাতে। লিজা বললো, আংকেল আপনি চলে যান, আমি রওনা হওয়ার একঘন্টা আগে আপনাকে ফোন দেবো। বাসায় পৌঁছতেই এগিয়ে এলো শান্তার বাবা-মা, আর দশ বছর বয়সী ছোট ভাই বর্ণ। লিজা সবার সঙ্গে বড়দিনের শুভেচ্ছা বিনিময় করলো। তারপর কেকের বাক্সটা বর্ণ'র হাতে দিয়ে বললো, এটা তোমার জন্য, ক্রিসমাস কেক।

শান্তার মা অনিতা বললো, ঠাণ্ডা খেতে তোমার সমস্যা নেইতো লিজা। লিজা বললো, না আন্টি সমস্যা নেই। অনিতা বরফ দিয়ে এক গ্লাস টক দইয়ের সরবত এনে লিজার হাতে দিয়ে বললো, বসে আগে এটা খেয়ে নাও, তারপর তোমাকে কেক পিঠা দিচ্ছি। সরবতে চুমুক দিয়ে লিজা বললো, ডেলিশাস আন্টি। অনিতা আর শান্তা তিন রকমের পিঠা, কেক, চটপটি আর চা এনে ওদের ছোট ডাইনিং টেবিলে রাখলো। অনিতা বললো, লিজা এখানে আসো, একটু কেক-পিঠা খাও। লিজা বললো, আপনারাও আমার সঙ্গে খান আন্টি। শান্তা লিজার সঙ্গে বসে বললো, তুই খা, আমরা খেয়েছি, আমি দিয়ে দিচ্ছি তোকে। একটি দুটি করে সব ধরনের পিঠাই খেলো লিজা। একটি পিঠা ও চিনতে পারলো না, বললো, এটা কি পিঠারে শান্তা। শান্তা বললো, এটার নাম ফিলিস পিঠা, বাকি দুটোর নাম জানিস? লিজা বললো, হ্যাঁ, কাটাকুলি আর পাকন। আমার দিদা একবার নিয়ে এসেছিলো গ্রাম থেকে। লিজা বললো, চটপটি আর কেকও নে, সব ঘরের তৈরী। চটপটি মা বানিয়েছে আর কেক বাবা। আমাদের অবশ্য ওভেন নেই, বাবা বাসা থেকে প্রিপেয়ার করে একটা বেকারি থেকে বেক করে নিয়ে এসেছে। সবকিছুই অল্প অল্প করে খেলো লিজা। অনিতা বললো, পিঠা কিন্তু আমি একা বানাইনি লিজা, তোমার আংকেল, শান্তা, বর্ণ সবাই আমাকে সাহায্য করেছে। শান্তা বললো, পিঠা বানানো একটা টিমওয়ার্ক। জানিস পিঠা বানানোর সময় আমরা অনেক মজা করি। সবাই যার যার মজার অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করি। খুব আনন্দ হয়। অনিতা বললো, তোমাদের বাসায় পিঠা হয় না লিজা? লিজা বললো, না আন্টি, আমার মা খুব ব্যস্ত থাকে, চাকরি করে, আবার সোশ্যাল ওয়ার্ক করে। আমাদের বাবুর্চি আংকেল ভালো রান্না করে কিন্তু পিঠা বানায়নি কখনো। আপনার চটপটি কিন্তু খুব মজা হয়েছে আর আংকেলের কেকটাও। জন বললো, তোমরা কত নামীদামি বেকারীর কেক

খাও, তার তুলনায় এটা কিছুই না। লিজা বললো, তা অবশ্য খাই তবে আপনার তৈরী কেকটা একদম ভিন্ন স্বাদের।

শান্তা লিজাকে নিয়ে ওর ঘরে গেলো। শান্তা বললো, আজকের এ আনন্দের দিনে তুই যে আংকেল আন্টিকে রেখে এখানে চলে এলি তাদের মন খারাপ হবে না? লিজা ম্লান হেসে বললো, ছাই হবে। তারা আছে তাদের মত। বাবা কাল রাতে রেডিসন হোটেলে তার ব্যবসায়ী বন্ধুদের জন্য ক্রিসমাস পার্টির আয়োজন করেছিলো, সারারাত সেখানেই ছিলো, সকালে বাসায় এসে ঘুমিয়ে পড়েছে, বিকেলের আগে মনে হয় উঠবে না। আর মা গেছে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বড়দিনের শুভেচ্ছা বিনিময় করতে। বাসায় আমি একা, খুব বোর লাগছিলো ,তাই তোর এখানে চলে এলাম। শান্তা বললো, খুব ভালো করেছিস, আচ্ছা তুই না বলেছিলি তোরা ক্রিসমাসের দিন সোনারগাঁও হোটেলে যাস, ওখানে ছোটদের বড়দিনের পর্টি হয়, খুব মজা করিস তোরা। লিজা বললো, যেতাম আমার কাজিনদের সঙ্গে, ওরা আমেরিকা চলে গেছে, তাই দুবছর ধরে যাওয়া হয় না। অনেক গল্প করলো দুজন। শান্তাদের জীবন যাপন নিয়ে লিজার অনেক কৌতুহল। শান্তার কাছ থেকে অনেক কিছু জেনে নিলো ও। শান্তাও অনেক কিছু জানতে চাইলো লিজার জীবন সম্পর্কে। লিজা অকপটে বললো সব। শান্তা এটাই বুঝতে পারলো যে লিজা একজন নিঃসঙ্গ রাজকন্যা।

শান্তার মা দুপুরের খাবার খেতে ডাকলো। ছোট টেবিলে সবাই একসঙ্গে বসলো। শান্তার বাবা আজকের এ আনন্দময় দিনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে সুন্দর প্রার্থনা করলো। প্রার্থনায় এটাও উল্লেখ করলো যে লিজা আসায় তাদের আনন্দ আরো পরিপূর্ণ হয়েছে। খেতে খেতে কত গল্প করলো ওরা, বর্ণও অনেক মজার মজার কথা বললো। লিজার চোখে জল এসে গেলো, ওদের বিশাল ডাইনিং টেবিলে প্রায় প্রতিদিনই একা বসে খেতে হয় ওর। কখনো সখনো তিনজন বসে, তবে যার যার মত সেলফোনের দিকে তাকিয়ে খেতে থাকে। ওদের গল্প হয় না, তবে বাবা-মার সঙ্গে ঝগড়া হয় মাঝে মাঝে, তখন অর্ধেক খাবার খেয়েই উঠে যায় ও। অল্প কয়েকটি পদ। পোলাও, মুরগীর ঝোল, বিফ ভুনা, সবজী আর সালাদ। অনেক তৃপ্তি নিয়ে খেলো লিজা, এতটা তৃপ্তি নিয়ে বাসায় বাবুর্চি আংকেলের তৈরী বাদশাহী খানাও খায় না। আসলে মায়ের হাতের রান্নার স্বাদই আলাদা। অনেক দিন হয়েছে লিজা মায়ের হাতের রান্না খায় না।

খাওয়ার পর শান্তা বললো, বিকেলে আমরা আমাদের মাসীর বাসায় বেড়াতে যাবো, তুইও চল আমাদের সাথে। লিজা বললো, নারে তোরা যা, আমি বরং বাসায় চলে যাই। শান্তার মা বললো, কেন মা, তুমিও চল আমাদের সঙ্গে, কোন সমস্যা নেই, এই কাছেইতো, মনিপুরিপাড়া। শেষে রাজি হলো লিজা। দুটো রিক্সা নিলো ওরা। একটায় বাবা-মা বসলো, আরেকটায় ওরা তিনজন। শান্তা বললো, লিজা তুই আর বর্ণ সিটে বোস, আমি তোদের দুদিকে পা দিয়ে উপরে বসবো। বসার পর লিজা বললো, পড়ে যাবিতো! শান্তা হেসে বললো, নারে আমার অভ্যেস আছে। অনেকদিন পর রিক্সায় উঠলো লিজা। খুব ভালো লাগছে ওর, নিজেকে মুক্ত মনে হচ্ছে, কত কিছু দেখার আছে রাস্তার দুদিকে। অথচ গাড়িতে নিজেকে কেমন যেন বন্দি বন্দি মনে হয়।

শান্তার মাসী-মেসো অনেক খুশি হলো ওদের পেয়ে। লিজাকেও অনেক আপন করে নিলো অল্প সময়ের মধ্যেই। তাদেরও দুটি ছেলে মেয়ে শুভ আর শুভ্রা। ছেলেটি বড়, শান্তাদের বয়সী। আর মেয়েটি ছোট প্রায় বর্ণ'র বয়সী। শুভ ওর ঘরে নিয়ে গেলো ওদের। সবাই মিলে অনেক গল্প করলো, শুভ গিটার বাজিয়ে গান করলো। তারপর শান্তার মাসীর ডাকে ডাইনিং টেবিলে গেলো সবাই। দুরকম পিঠা, দুরকম কেক, ভেজিটেবল পাকোরা, চানাচুর আর চা। এখানে দুধ চিতই নামে একটি সুস্বাদু পিঠা খেলো লিজা যেটা আগে কখনো খেয়েছে বলে মনে পড়ে না। পাটিসাপটা পিঠাটাও অসাধারণ লাগলো ওর। ফেরার সময় রিক্সায় উঠে লিজা বললো, এবার আমি উপরে বসবো। শান্তা বললো, নারে, তোর অভ্যেস নেই , তুই পড়ে যাবি। লিজা শান্তার কথা না শুনে উপরেই বসলো। রিক্সা ব্রেক করার সময়, উঁচু নিচু জায়গা পার হওয়ার সময় পড়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিলো লিজা, তবে সামলে নিচ্ছিলো নিজেকে। ওর মনে হলো নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে বেঁচে থাকার চেয়ে একটু ঝুকির মধ্যে বেঁচে থাকার আনন্দ অনেক।

সন্ধ্যা সাতটার সময় চলে গেলো লিজা। সবাই অনেক বললো, রাতে খেয়ে যেতে। লিজা বললো, সারাদিন যা খেলাম, পেট একদম ফুল, রাতে বাসায় গিয়েও কিছু খাবো না। শান্তার মা তার কাজ করা একটি থ্রিপিস দিলো লিজাকে। বললো, জানি তুমি অনেক দামি দামি ড্রেস পর, এটা তুমি পরবে কি না জানি না কিন্তু নিলে আমি খুশি হবো। লিজা বললো, আপনি যখন দিচ্ছেন, অবশ্যই পড়বো আন্টি।

রাত দশটায় লিজা ফোন দিলো। শান্তার মনে হল ও কাঁদছে। লিজা বললো, আসলে তুইই সুখী শান্তা। শান্তা যখন ছুটির পর ওর বাবার সঙ্গে টেম্পুর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে, আর ওর বন্ধুরা গাড়ির জানালা দিয়ে ওকে বাই বাই দিয়ে চলে যায় তখন ওর মনে হয় ওর চেয়ে দুঃখী এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। এখন ওর মনে হচ্ছে গাড়ির ভেতরের হাসি খুশি চেহারার ছেলে মেয়েগুলোর সবাই আসলে সুখী না॥

চিন্তা বাবুর ভাবনা

ছনি মজেছ

চিন্তা বাবুর মাথা জুড়ে, বড় বড় সব ভাবনা;
দেশটা যে যাচ্ছে গোল্লায়, সময় নষ্ট আর না।
কিছু একটা করতে হবে,
এখনই করা দরকার;
প্যালান করে-প্রজেক্ট ধরে,
কাগজে কলমে একাকার।
উদ্ভ্রান্ত চোখে-মুখে,
চায়ের দোকানে নিত্যদিন;
দেশের খবর কে রাখে আর,
চিন্তা বাবুর খবর নিন।
পুরোনো সব খবর কাগজ,
সাথে আছে ম্যাগাজিন;
দেশটা যে যচ্ছে গোল্লায়,
তারই টেনশনে সারাদিন।
গ্রীষ্ম গেলো-বর্ষা গেলো,
হেমন্তের পর শীতকাল;
বছর ঘুড়ে ব্যর্থ সবাই,
বাবু একাই করে দেখ-ভাল।
বছর বছর এমপি আসে,
মন্ত্রীরা ভাই চমৎকার;
চিন্তা বাবু আক্ষেপ করে,
তাহলে ভাই দেশটা কার?
মিটিং মিছিল অনেক হলো,
এখনও শোনে বক্তিমা;
কাজের কাজ কেউ করেনা,
সবাই দেখায় চন্দ্রিমা।
বার বার তার প্রস্তুতি সব,
যায় কেন যে ভেস্তে ;
মাঠে নামবে একাই এবার,
নিয়ে লাঠি আর কাস্তে।
নমিনেশন আর মার্কা নিয়ে,
চলছে সবার মাঠ গরম;
চিন্তা বাবু একাই লড়ছে,
লাগেনা আর লাজ শরম।
ফলাফল যাই আসুক ভাই,
নেই তাতে আর ভাবনা;
দেশটা যে যচ্ছে গোল্লায়,
চেয়ারটাই যে সব না।
লেবাস গায়ে-গলায় মালা,
নিজেই নিজের সরকার;
দেশ বাঁচাতে আর কারো নয়,
চিন্তা বাবুরই দরকার॥

সিগারেট

সাগর কোড়াইয়া

বৃষ্টি মাথায় বের হবো না ভেবেও বের হলাম। বৃষ্টি একটু ধরে এসেছিলো তখন। দূর গ্রামে যেতে হবে। আলমারী থেকে রেইনকোট বের করি। প্রায় তিন বছর আলমারীতে পড়েছিলো। প্রয়োজন পড়েনি বিধায় বের করাও হয়নি। শরীরে গলিয়ে দেখি ঢুকে না। শরীরটা বেড়ে গিয়েছে। অগ্যতা কি আর করা। রেইনকোট না নিয়েই বেরিয়ে পড়ি। অর্ধেক রাস্তায় শুরু হলো প্রচণ্ড বৃষ্টি। গ্রামটি দেখা যাচ্ছে। ভাবলাম মোটরসাইকেলে দ্রুত পৌঁছানো যাবে। তবে বৃষ্টি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। বৃষ্টি আরো জোরে পড়তে থাকে। উপায় নেই বিধায় চায়ের স্টলে দাঁড়ালাম।

ইতিমধ্যে আমি ভিজে একাকার। পকেটে রাখা মোবাইল বের করলাম। হালকা ভিজেছে মোবাইল। পানির প্রলেপ সরিয়ে ব্যাগের মধ্যে রাখলাম। মাথায় হেলমেট থাকাতে বৃষ্টি থেকে মাথা বেঁচেছে। জমিতে কাজ করা কয়েকজন এসে স্টলের বেঞ্চিতে বসে আছে। নানা গল্পের পাশাপাশি অনেকে বলছে, বর্ষা শুরু না হতেই এমন বৃষ্টি আগে কখনো দেখা যায়নি। স্টলে প্রবেশ করতেই একজন বসার জায়গা করে দিলো।

ভেজা শরীরে এককাপ চা হলে মন্দ হয় না। বরাবর আমি দুধ চা পছন্দ করি। ভাবলাম দুধ চা পাওয়া যাবে না হয়তো। অবাক করে দোকানদার প্যাকেট দুধ দিয়ে চা বানিয়ে দিলো। বৃষ্টিভেজা অবস্থায় খেতে বেশ ভালোই লাগছে। মাঝে মাঝে সিগারেটে আগুন জ্বালানোর অভ্যাস আছে আমার। তবে একটি নির্দিষ্ট ব্রাণ্ডের যদি হয়। সেই ব্রাণ্ডের আছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে দোকানদার আবারো অবাক করে দিলো। রাস্তার পাশে এমন একটি ছোট্ট দোকানে পাওয়া যাবে ভাবিনি।

সিগারেটে আগুন জ্বালিয়ে টানছি তখনই বাবার কথা মনে পড়ে গেল। স্ট্রোক করে বাবা তখন দ্বিতীয় দিন হাসপাতালে ভর্তি। ছোটবেলা থেকেই বাবাকে সিগারেট খেতে দেখতাম খুব। সিগারেটের নামগুলো এখনো মনে পড়ে। বাবাকে বরাবর কেটু, নেভি ও স্টার সিগারেটই খেতে দেখতাম। কতবার সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিবে বলেও শেষ পর্যন্ত পারেনি। দুই একদিন না খেয়ে থেকেছে ঠিকই তবে বহু কষ্টে। পণ ভঙ্গ করে সিগারেটেই ফিরে যেতে হয়েছে আবার।

হাসপাতালের দ্বিতীয় দিন সকাল থেকেই বাবা সিগারেট খাবার আবদার শুরু করে। ডাক্তারের নিষেধ ছিলো সিগারেট খাওয়া যাবে না। মায়ের সাথে সে কি রাগ বাবার। তাকে সিগারেট এনে দিতে হবেই। সিগারেট আনার জন্য পারলে বাবা একাকী বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ে। কফি খাওয়ার অভ্যাসও বাবার ছিলো খুব। তবে কফি খাওয়ার ক্ষেত্রে ডাক্তারের নিষেধ না থাকায় বাহির থেকে কফি এনে বাবাকে দিতাম।

একদিনের একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। কর্মস্থলের উদ্দেশে বাড়ি থেকে ফিরছি। পথিমধ্যে একটি নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে যেখানে গাড়ি থামাই। দুধ চা খাই। পাউরুটির সাথে দুধ চা খেতে ভারি স্বাদ লাগে। অনেকটা অমৃতের মতো। যদিও অমৃত কখনো খেয়ে দেখিনি। দোকানটির নামডাক পুরো এলাকা জুড়ে। আমার মতো অনেকেই গাড়ি থামিয়ে সেখানে চায়ের স্বাদ আস্বাদন করে। দোকানদার সারাদিনই ব্যস্ত চা তৈরীতে। চায়ের সাথে পাউরুটির অর্ডার দিলাম। চায়ের কাপে পাউরুটির একটি অংশ যখন গোসল করার পর আমার মুখে এসে প্রবেশ করে সে স্বাদ অবর্ণনীয়। চা খাওয়ার পর্ব শেষ করে সিগারেট ধরিয়েছি। মনের সুখে ধোয়া উদগীরণে ব্যস্ত।

একটি লোককে খেয়াল করলাম। অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ভাবলাম হয়তো পরিচিত কেউ হবে। কিন্তু এই চেহারার কারো সাথে তো আমার কোনদিন দেখা হয়নি। চোখে চোখ পড়তেই এগিয়ে এলো লোকটি। জিজ্ঞাসা করলো, ভাই ভালো আছেন? অগ্যতা কি আর করা। উত্তর দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। ভদ্রতা রেখে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলাম। ভাই বাড়ি কি রাজশাহী? লোকটি বললো।

এবারো হ্যাঁ বলতেই বললো, সিগারেটটি ফেলে দিয়েন না। অনেকদিন হলো দামি সিগারেট খাই না। ফেলে দেবার আগে দিয়েন; কয়েক টান মারবো। মনে মনে ভাবলাম লোকটি পাগল নাকি! লোকটির কথা শুনে নিজেকে কেমন যেন ছোট মনে হলো। কি বলবো ভেবে পাচ্ছিলাম না।

অবশেষে বললাম, সিগারেটের ফেলে দেওয়া অংশে কোন স্বাদ পাবেন না। বরং আপনাকে আমি কিনেই খাওয়াচ্ছি।

আমার কথা শুনে লোকটি ইতস্ততবোধ করতে লাগলো। এবার যেন পালাতে পারলে বাঁচে। লোকটির অমন অবস্থা দেখে বললাম, লজ্জার কিছু নেই। আমি আপনাকে এমনিতেই খাওয়াবো। এবার বুঝি একটু স্বস্তি পেলো। লোকটিকে সাথে নিয়ে দোকানে গেলাম। সিগারেটের অর্ডার দিলাম। দুঃখের বিষয়; সিগারেট ততক্ষণে শেষ। আসলে শেষ কিনা জানি না; হয়তো লোকটিকে দেখেই দোকানদার সিগারেট দিতে চাইলো না বোধহয়। লোকটি বললো, থাক ভাই। সিগারেট খাবো না।

লোকটির মুখটি দেখে খুব মায়া হলো। দামি সিগারেট খাওয়ার বায়না ধরেছিলো খাওয়াতে পারলাম না। বাবার কথা মনে পড়লো, হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে কতবার সিগারেট খেতে চেয়েছিলো। খাওয়াতে পারিনি। মনে পড়ে ছোটবেলায় বাবাকে কতবার দোকান থেকে সিগারেট কিনে এনে দিয়েছি। সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে তাও আমার দায়িত্ব। চুলা থেকে সিগারেট ধরিয়ে আনতে আনতে নিভে যেতো। আবার আগুন ধরানোর জন্য ভোঁ দৌড়!

মনে পড়ে মামা বাড়ির দাদু প্রতিদিন আমাদের বাড়িতে থাকতে আসতো। দাদুরও বিড়ি-সিগারেট খাবার নেশা ছিলো খুব। এক সময় দাদুর যক্ষা রোগ ধরা পড়ে। চিকিৎসা করিয়ে সুস্থও হয়। ডাক্তারের নির্দেশ ছিলো একদম ধুমপান করা যাবে না। বাড়ি থেকেও জারি ছিলো একশত চুয়াল্লিশ ধারা। তবে বিড়ি-সিগারেটের নেশা দাদু ছাড়তে পারেনি।

আমাদের বাড়িতে থাকতে এসে দাদু আমাকে সঙ্গে নিয়ে পাশের রাস্তার তে-মাথায় বসে থাকতো। ইচ্ছা বাজার থেকে ফেরা লোকজনের কাছে সিগারেট-বিড়ি চেয়ে খাওয়া। দাদু কখনো নিজে সিগারেট চাইতো না। লোকজনকে আসতে দেখলে দাদুর জন্য আমাকেই সিগারেট-বিড়ি চাইতে হতো। দাদুর কড়া নির্দেশ ছিলো এই কথা যেন বাড়িতে কেউ না জানে। আমি দাদুর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করি। একদিন আমি যেন কোথায় বেড়াতে গিয়েছি। দাদু আমার বড় ভাইকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তার তে-মাথায় গিয়ে বসে। কয়েকদিন পর ঠিকই বাড়িতে সবাই সে কথা জেনে যায়।

দাদু আর আমাদের বাড়িতে আসবে না বলে গো ধরে বসে। কিন্তু সে পণ দাদু রাখতে পারেনি। ঠিকই পরদিন বিকালবেলা সময়মতো আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। তবে আর কোনদিন আমাদের দু'ভাইকে সঙ্গে নিয়ে দাদু বিড়ি-সিগারেট খাওয়ার আশায় রাস্তার তে-মাথায় বসেনি।

কর্মস্থলে প্রবেশের পর বন্ধুদের আর একসাথে বসা হয় না। একবার সময় করে আমাদের এক বন্ধুর বাসায় আমরা চারজন একসাথে হলাম। বন্ধু বিয়েসাদি করে পুরোদমে সংসারী। একটিমাত্র ছেলে; সবে স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে। সন্ধ্যায় গেলাম বন্ধুর বাসায়। অতীতের কত স্মৃতি রোমন্থন হলো।

আমাদের একজন বন্ধু আবার সিগারেট না খেলে থাকতে পারে না। এই সিগারেট খাওয়া নিয়ে কলেজ জীবনে কত ঘটনা আছে। যাকে বলে চেইন স্মোকার; বন্ধুটি অনেকটা সেই রকম।

সবেমাত্র বন্ধু সিগারেট ধরিয়েছে। বন্ধুর ছেলে অন্য ঘর থেকে দৌড়ে এলো। মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করে দৌড়ের মাঝেই বললো, তুমি সিগারেট খাও? বলেই যেভাবে এসেছিলো আবার সেভাবেই চলে গেলো। আমরা চারজনই হতভম্ব! কেউ কোন কথা বলতে পারলাম না।

বন্ধুটি হাতের সিগারেটটি আলগোছে টেবিলের ছাইদানিতে রেখে বললো, পণ করলাম; আজ থেকে আর কোনদিন সিগারেট খাবো না। শেষ পর্যন্ত আমাদের সেই বন্ধু কথা রাখতে পেরেছে। তিন বছর আগে করোনায় মারা গিয়েছে বন্ধুটি॥

ফিরে আসুক সেলুলয়েড!

রবীন ভাবুক

আমরা আর হয়তো বেঁচে নেই! রয়েছে কয়েকটি প্রশ্ন! কী হবে? তাই তো ছুটছি। এপার-ওপার ফেরে টিকে থাকার জাদুর নেশায় ছুটছি। শিশু, কৈশর, যুব, মাঝবয়সী এবং বৃদ্ধা। বয়সের স্তরে বিস্তর অভিজ্ঞতার সুযোগ। তা-ও তালগোল পাকিয়ে বিস্তর ছোটাছুটি।

পাশের বাসার সুন্দরী বৌদির একটা চার বছরের মেয়ে রয়েছে। মা-মেয়ে এক সাথেই সাজে। সাজতে তাদের বেজায় ভাল লাগে। দাওয়াত খেতে আরো। কোথায় না কোথাও তারা দাওয়াত ঠিক করে রাখেই। চেয়ে হোক বা আবদারে। সাজার অজুহাতে বা নিজেকে উজার করে দিতে। বৌদি একদিন বললো, মেয়েটা তার আল্ট্রামডার্ন। ধাতে ধাক্কা খেলাম। বলে কী! তাহলে কী শিশুকাল উধাও হলো! মেয়েটার চটপটে কথাতে প্রমাণও পাওয়া গেল। মায়ের সাথে মেয়ে জিম-এ যান, স্পা করান। মোড়ল দেখেছি, কিন্তু তার আল্ট্রামডার্ন মেয়েটার মধ্যে ছোটকালেই মোড়ল ভাব ঢুকিয়ে দিয়েছে। এটা আমার, ওটা আমার, কিছু দিতেই হবে, আবার মায়ের চোখ রাঙাণি দেখে ছুড়ে ফেলে দেওয়া। মা বললো, বেশ বেশ, মেয়ে আমার ভদ্রসভ্য আল্ট্রামডার্ন হয়েছে। কিন্তু আমার হাসি পেল। অন্যদের অপমান করে মেয়ে হয়ে গেল আল্ট্রামডার্ন। কেমন যেন ভাড়ের মতো আচরণ। মা আরেকটু যোগ করেন, আমার মেয়েটা সত্যিই অনেক টেলেন্ট এবং জ্ঞানী। সে সবকিছু বুঝে। নাভিশ্বাস উঠে গেল! এ কি করে হয়। এতটুকুন মেয়ে, যে কিনা এখনো একটা অ, আ, ক, খ-এর বই পর্যন্ত ধরলো না, তেমনকিছু জানলো না, দেখলো। বসে বসে মা-নানীর সাথে সিরিয়াল দেখে, সে এখনই কিভাবে টেলেন্ট এবং জ্ঞানী হলো। ঈশ্বর কি তাহলে তাকে সুপার পাওয়ার দিয়ে দিলো? এতটুকুন বাচ্চাকে আমরাই তো ছোটবেলা থেকে ভাড়ামো শিখিয়ে দিচ্ছি। সন্ধ্যার পর আল্ট্রামডার্নের ইয়ং মায়ের ইয়ং বরটা আসবে। গো-বেচারা চুপচাপ ফ্রেস হয়ে দুই পেগ নিয়ে সংসারের ফরমাল কথা। বউয়ের কথা, তুমি আগের মতো আর নেই!

আগের মতো কী করে থাকবে। উড়ে গেছে বক পাখি। ফিরে এসে দেখে যে পাথারে মাছ ধরেছে, সেখানে ডেভলপারদের বিল্ডিং এর কাজ চলছে। আমরা আজকাল ভাঁড় হয়ে গেছি। আমাকে যদি কেউ বলে, তুমি বড্ড সেকেলে। আমার ভাল লাগে। মনে হয় বেঁচে আছি।

এখন তো আর আগের প্রেম নেই। সেই সিনেমার মতো দেখা! আগে প্রেম হতো সন্ধ্যা বা রাতে। নায়িকা গাছের পাতা ধরে, বিস্তর চাহনী দিয়ে অপলকভাবে তাকিয়ে গান করতো। নায়কের প্রাণভ্রমরা ছুটোছুটি করতো। এখন সিনেমায় নায়ক একটা এ্যাকশন ড্রামা করবে, একটু পরই নায়িকাকে নিয়ে দূর পাহাড়ে বা নদী-সমুদ্রের মাঝে অথবা জঙ্গলে নিয়ে যাবে। দুজনে ঝাপাঝাপি করবে, একে-ওকে কোলে তুলবে, দুজনে বাদর নাচন নাচবে এরপর সেখান থেকে আবার ট্রমায় চলে যাবে। ব্যাস, উড়ে গেল বকপাখি! কিন্তু আগেকার প্রেমে নায়িকার খোপায় ফুলের গন্ধ, টিপের গোলাপী আলো নায়ক ফিরে এলেও অনেক সময় পেত! এসব এখন সেলুলয়েড!

হৃদয়কেশ আজকাল বড্ড জেদি। হয়নি তো কি হয়েছে! শুভস্য শিঘ্রম! আরেকটি পথ খুলে নেও। যদি হৃদয়ে হৃদয় মিলে যাস, বাহ্ বাহ্ বেশ। ধোঁয়াটে রাস্তায় ফুলের গন্ধ। আর যদি না মেলে, তাহলে আর আজকাল আকাশ কালো হয় না, হালকা বৃষ্টিও পড়ে না। কোনো তাড়নার ঝুঁকি নেই। মিনা গেছে তো টিনা আছে। সুমিত গেছে তো হিমেল আছে। চলে রেল গাড়ি, এতে চড়েই আমি এবার যাব প্রেমের বাড়ি!

আগে সংঘ ছিল। তরুন সংঘ, উদয় সংঘ, অরুণ সংঘ। রাস্তা ঘাটে সারি বেধে ছেলে-মেয়েরা সাদা-কালো জামা-প্যান্ট-শাড়ি পড়ে সচেতনতার কথা বলতো। রক্তদান কর্মসূচি, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, শিল্পমঞ্চে তুলির আচরে দোলনচাঁপার নাটক। এখন সংগঠন রয়েছে। ডোনেশনের সংগঠন। অনুষ্ঠানের অবশিষ্ট দিয়ে সন্ধ্যার আড়ালে ভেরুপেটক হার্ড জল। পেটে পড়লেই শরীর টইটুম্বুর। মান্না দে'র কফি হাউজের আড্ডা উবে গেছে। এখন চাইনা মেয়ে তুমি অন্য কারো.....! আর যদি হৃদয়বিচ্ছেদ হয়, তখন ইন্টারনেট সন্ত্রাস। কি ছেলে, কি মেয়ে!

সংগঠনের শেষে বাকি পথটায় রাস্তা খোড়া হয় একেক জন ভাড় হওয়ার জন্য। চেয়ারকপাল যার, সে টিকে থাকবে না হয় সোচ্চার নেটদুনিয়ায়। চেয়ারে বসে ভাড়ের কাজ, আর নেটদুনিয়ায় মস্তবড় বিশ্লেষক।

সমাজ, দেশ উন্নয়নের কথা ভাবছি! এক গাদা খবরের কাগজ মেলে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ভাবছি, দেশটা উচ্ছন্নে গেল। সরকার ভাবছে দেশ উন্নয়ন করতে হবে, বিরোধী দল ভাবছে সরকার নিজস্ব বলয় তৈরি করে দেশ লুটেপুটে খাচ্ছে, সমাজনেতারা ভাবছে সমাজ উন্নয়ন করতে হবে, একশ্রেণি রয়েছে, ওদের ইথিকস্ ঠিক নাই নিজেরা পেট গরম করছে। তারচেয়েও একটি নির্দোষ স্বার্থপর শ্রেণি রয়েছে, যা হচ্ছে হোক, আমি ভাল আছি। কেউ ভাবছে না দেশে মানুষ, সমাজের মানুষের মন-মানসিকতার উন্নতি হোক। গায়ে পারফিউম ছড়িয়ে, মনে বিষ নিয়ে বক্তৃতা দিয়ে জনসাধারণকে গাজাখুরি স্বপ্ন দেখাচ্ছি ভাড় সেজে। আর আমরা নির্দোষ স্বার্থপরেরা গরুর মুখে ঢুলি আজ নিজে মুখে এটে বসে রয়েছি!

'চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী' খনার বচনটি এখন গর্ব করে বলতে পারে, আমি বাস্তবসম্মত সত্য। জয় আমারই হয়েছে! যে মানুষটি এই খনারবচনটি শুরু করেছিল, তাকে সংবর্ধনা দিয়ে বরমাল্যে ভূষিত করা উচিত। চেয়ার থেকে রাজ দরবার, আর এই ফর্মূলায় চলে। মাঝে মাঝে মনে হয়, আইনষ্টাইনের বল প্রয়োগ থিয়োরির চেয়েও এই খনারবচন থিয়োরিটি বেশি কার্যকর ও ব্যবহার্য। চোর তো বানানো হয় না, এখন গড়ে দেওয়া হয়। এখন গোমস্থার চেয়ে ভাড়ের ক্ষমতা বেশি। হোক সে দলীয় অফিস, কর্মক্ষেত্র বা সমাজ! টেটা যুদ্ধ সেলুলয়েড হয়ে গেছে, প্রতিষ্ঠা পেয়েছে চতুর যুদ্ধ।

দেবীর আসনে যদি পেঁচাকে রং-তুলিতে বেশি শুভাস্ত্রি করে তুলি, তাহলে ভক্তরা তো দেবীর সাথে নয়, পেঁচার সাথেই সেলফি তুলবে। ভিডিও ব্যাকগ্রাউন্ড তো ভাল হতে হবে। আমাদের রাষ্ট্রকর্তা, সমাজপতি, ধর্মনেতারা তো তাই-ই করছে। ভক্তরাও ভুলে মজে পেঁচার চরণে ফুল দিয়ে ধুয়ো দিচ্ছে।

এতকিছুর পরও কি মনে হয়, আমরা বেঁচে আছি? আমরা আমাদের নিজের মধ্যে আছি। ভাড়ামি এখন আমাদের পেশা, আর নেকাব পড়ে ঘুরে বেড়ানো আমাদের নেশা। তাই তো মানুষের মনটাই আজ সেলুলয়েড। মনটাই যখন হারিয়ে গেছে, তখন সেলুলয়েডও বিতাড়িত হলো জীবন থেকে!

অনিরুদ্ধ

প্রদীপ মার্সেল রোজারিও

এ জগৎ-সংসারে এমন কিছু লোক আছে যারা অন্যদের চেয়ে আলাদা। এ লোকগুলোর চিন্তা-ভাবনা আলাদা। কাজ-কর্ম আলাদা। জীবন-পথে চলার লড়াইয়ের ধরণও আলাদা। এরা লড়তে জানে, গড়তে জানে, পথ চিনে চলতে জানে । কিন্তু, থামতে জানে না।

আমার বন্ধু অনিরুদ্ধ তেমনই একজন। প্রথম শ্রেণিতে পড়ার সময় অনিরুদ্ধ'র সাথে আমার পরিচয়। পাশাপাশি গ্রামে আমাদের বাড়ি। গ্রাম আলাদা হলেও আমরা ভর্তি হই একই স্কুলে। কারণ আশে-পাশের চার-পাঁচ গ্রামে কোন স্কুল ছিলো না। যাদের সামর্থ্য ছিলো, ছেলেকে পড়ানোর ইচ্ছা ছিলো, তারা তাদের ছেলেকে এ স্কুলটিতে ভর্তি করতো। আমি স্কুলে আসি দুই মাইল দূর থেকে পায়ে হেঁটে। অনিরুদ্ধ আসে তিন মাইল দূর থেকে। তখন মাইলের হিসাব চলতো। কিলোমিটারের হিসাব শুরু হয়নি।

আমাদের পরিবারের আর্থিক সামর্থ্য ছিলো। অনিরুদ্ধদের ছিলো না। অনিরুদ্ধ'র বাবার ইচ্ছে ছিলো না ছেলে পড়াশুনা করুক। অনিরুদ্ধ'র বাবার ইচ্ছে, ছেলে তার সাথে জমিতে কাজ করবে। হাঁট-বাজারে যাবে। কিন্তু ছোট্ট অনিরুদ্ধ'র ইচ্ছে, সে স্কুলে যাবে। অনিরুদ্ধ অনেক কষ্টে স্কুলে যাওয়ার বিষয়ে মাকে রাজি করায়। অনিরুদ্ধ'র স্কুলে যাওয়া নিয়ে মা-বাবার মধ্যে ঝগড়া নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বাবাকে খুশি করার জন্য স্কুল থেকে ফিরে দিনের বাকি সময়টুকু অনিরুদ্ধ বাবার সাথে জমির কাজে সহযোগিতা করে। প্রথম শ্রেণিতে পড়া একটি ছোট ছেলে জমিতে কি-ই-বা কাজ করবে। কিন্তু তখনকার সময়ে এটাই স্বাভাবিক ছিলো।

শুরুতেই বলেছি অনিরুদ্ধ অন্যদের চেয়ে আলাদা। কিছু দিনের মধ্যেই আমরা ক্লাসের সকলে এ'র প্রমাণ পেতে শুরু করি। আমাদের ক্লাস-টিচার এবং আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করি অনিরুদ্ধ'র হাতের লেখা চমৎকার ছাঁপা অক্ষরের মতো। তখন প্রথম শ্রেণিতে খাতা-কলম ব্যবহার করা হতো না। চক দিয়ে স্লেটে লেখা হতো। ক্লাস-টিচার অবাক হয়ে অনিরুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলো-

- কিভাবে তোমার হাতের লেখা এতো সুন্দর হলো।

- আমি প্রতিদিন সময় পেলেই বইয়ের লেখাগুলোর মতো করে লেখার চেষ্টা করি । প্রথম দিকে এলোমেলো হয়ে যেত। এখন কিছুটা ভাল হচ্ছে, অনিরুদ্ধ উত্তর দেয়।

- এত সুন্দর ঝক্‌ঝকে লেখা। ব্যাটা বলে কিনা কিছুটা ভাল হচ্ছে! আমরা অবাক হই। আমরাতো হাতের লেখা নিয়ে ভাবিই না। কিন্তু অনিরুদ্ধ ভাবে। কারণ ও' তো অন্যদের চেয়ে আলাদা।

তখন প্রাথমিক পর্যায়ে বছরে একটি মাত্র পরীক্ষা হতো। বার্ষিক পরীক্ষা। পরীক্ষার রেজাল্ট দেয়ার পর দেখা গেল অনিরুদ্ধ রেকর্ড নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছে। আমরা পাস করেই খুশি। কিন্তু প্রথম হওয়ার পরও অনিরুদ্ধ'র মধ্যে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া নেই। যেন জীবনের প্রথম কোন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে প্রথম হওয়াটা তেমন কোন ব্যাপারই না। আমাদের অনিরুদ্ধ এমনই ছিলো।

অভাবের সংসার। অনাহারে-অর্ধাহারে বাবার সাথে জমিতে কাজ করা অনিরুদ্ধ দ্বিতীয় শ্রেণিতেও প্রথম হলো। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণির রেজাল্ট হওয়ার পরের ঘটনাটা ছিলো একটু অন্যরকম। তৃতীয় শ্রেণিতে অনিরুদ্ধ এতো ভাল রেজাল্ট করলো যে, ক্লাস-টিচার অনিরুদ্ধকে স্কুলের প্রতিটি শ্রেণি-কক্ষে নিয়ে গিয়ে ও'র রেজাল্টের কথা বললো। ও'র প্রশংসা করলো। কিন্তু তাতে কি? রেকর্ড নম্বর পেয়ে প্রথম হওয়া, টিচারের প্রশংসা পাওয়া, অনিরুদ্ধ'র নিকট যেন কোন ঘটনাই না। এগুলো যেন ঘটারই কথা ছিলো। কোন রকম উচ্ছাস বা আনন্দের বহিঃপ্রকাশ অনিরুদ্ধ'র মধ্যে দেখা গেল না।

পঞ্চম শ্রেণিতে অনিরুদ্ধ সরকারী বৃত্তি পরীক্ষায় থানা পর্যায়ে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তির জন্য নির্বাচিত হলো। তখন পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে বৃত্তি পরীক্ষা হতো। ক্লাসের হাতে-গোনা কয়েকজন ভাল ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারতো। আমাদের স্কুলে অনিরুদ্ধই প্রথম ছাত্র যে বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো।

পঞ্চম শ্রেণি পাস করার পর আমরা প্রায় সকল সহপাঠী একই স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হলাম। কিন্তু অনিরুদ্ধ চলে গেল অন্য একটি স্কুলে। খ্রিস্টান মিশনারীগণ স্কুলটি পরিচালনা করেন। ও'র বাড়ি থেকে স্কুলটির দূরত্ব বর্তমান স্কুলের তুলনায় বেশি। তদুপরি পড়াশুনার ব্যয়ও বেশি। শিক্ষকদের মান ভাল থাকায় স্কুলটির এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট বরাবরই ভাল। বেশ বুঝতে পারি, ভাল স্কুলে পড়ার আকাঙ্খা থেকেই অনিরুদ্ধ ঐ স্কুলটি বেছে নিয়েছে। কিন্তু যেটা বুঝতে পারি না তা হলো ও' পড়াশুনার ব্যয় মেটাবে কিভাবে? সরকারী বৃত্তির টাকায় কি পড়াশুনার সকল ব্যয় নির্বাহ করা যাবে? আমরা বুঝতে না পারলে কি হবে? অনিরুদ্ধ বুঝে। অনিরুদ্ধ না বুঝে কোন কাজ করে না।

হঠাৎ এক রবিবারে পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর অনিরুদ্ধ'র সাথে দেখা। ও'র পরণে একটি হলুদ শার্ট। শার্টটি পুরানো কিন্তু সুন্দর। খুব মানিয়েছে ও'কে। অনিরুদ্ধকে এরকম ভাল শার্ট পরা অবস্থায় কখনো দেখিনি। ভাল শার্ট পরা অনিরুদ্ধকে দেখে যতটা অবাক হলাম তার চেয়ে বেশি অবাক হলাম ও'কে তৃতীয় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতে দেখে। ভাল শার্ট-প্যান্ট না থাকার কারণে অনিরুদ্ধ কখনো তৃতীয় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতো না। পাছে সম-বয়সীরা ও'র পুরানো মলিন শার্ট-প্যান্ট দেখে হাসাহাসি করে। ও' অংশ নিতো প্রথম খ্রিস্টযাগে, অনেকটা লুকিয়ে। কারণ প্রথম এবং দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগে শুধুমাত্র বড়রা অংশগ্রহণ করতে পারতো।

অনিরুদ্ধ'র সাথে কুশল বিনিময়ের পর আমি অনিরুদ্ধকে বলি-

- অনিরুদ্ধ, তোর নিকট আমার একটি বিষয়ে জানার ছিলো।
- বল্, কি জানতে চাস্?
- তোর পড়াশুনার খরচ কিভাবে যোগাড় হচ্ছে? সরকারী বৃত্তির টাকায় কি পড়াশুনার সকল খরচ মেটানো যাচ্ছে?

আমার প্রশ্ন শুনে অনিরুদ্ধ হাসে। হাসতে হাসতে বলে- তুইতো জানিস আমার বর্তমান স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুদূর মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র

থেকে আগত একজন ব্রতধারী ব্রাদার। তিনি গরীব ছাত্রদের জন্য একটি ফান্ডের ব্যবস্থা করেছেন। এ ফান্ড থেকে কেউ ফ্রি সাহায্য পায় না। সকলকে কায়িক শ্রমে অংশগ্রহণ করতে হয়। কায়িক শ্রমের অংশ হিসেবে আমি বর্তমানে রেল-লাইন থেকে স্কুল পর্যন্ত যে রাস্তাটি গিয়েছে তা মেরামতের কাজ করছি। স্কুলে যাওয়ার পূর্বে দৈনিক দুই ঘন্টা কাজ করতে হয়। আমরা মোট ১০ জন দরিদ্র ছাত্র এ কাজটি করি। কর্ম-ঘন্টা হিসাব করে আমাদের প্রাপ্য টাকা স্কুলের হিসাব বিভাগে জমা হয়। প্রয়োজনীয় বই-খাতা-কলম, স্কুল-ফি যার যার নামে জমানো টাকা থেকে ব্যয় হয়। পড়াশুনার ব্যয় মেটানোর জন্য অদ্যাবধি আমাকে বাড়ি থেকে কোন টাকা নিতে হয়নি। আর নিতে হলে তো বিপদেই পড়তাম। তুই তো জানিস্ আমাদের অবস্থা। বাবার পক্ষে এক টাকাও দেয়া সম্ভব না। এমনটা হলে তো আমার পড়াশুনাই বন্ধ হয়ে যেত। আর আমার গায়ে যে হলুদ শার্টটি দেখছিস্ এটা আমার বাবা রেল-লাইনের পাশ থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে। বাবা-মা অনেক দিন অপেক্ষা করেছে। খুঁজাখুঁজি করেছে। কিন্তু শার্টের মালিককে পাওয়া যায়নি। নতুন স্কুলে পরে যাওয়ার মতো আমার কোন শার্ট ছিলো না। শার্টের মালিক না পেয়ে প্রথম দিন স্কুলে যাওয়ার সময় মা বললো- ঈশ্বরই তোর জন্য এ শার্টটি পাঠিয়েছে। শার্টটি পরে স্কুলে যা, বাবা। আর প্যান্টটি দেখছিস্ না। এ প্যান্টটি আমার পিসাতো ভাইয়ের। আমার পিসা-পিসি অনেক অর্থ-বিত্তের মালিক। আমার পিসাতো ভাইয়ের এ প্যান্টটি পছন্দ হয়নি। তাই ব্যবহার করবে না। পিসি হয় তো বা কোন ভিক্ষুককে দিয়ে দিতো। মা জানতে পেরে আমার জন্য নিয়ে এসেছে।

- আচ্ছা অনিরুদ্ধ, তুই তো সকালে দুই ঘন্টা কাজ করে স্কুলে যাস্, ক্লাসে মন বসে তোর? ঐ স্কুলে তোর রেজাল্ট কেমন হচ্ছে?

- এখনও বার্ষিক পরীক্ষা হয়নি। প্রথম এবং দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার রেজাল্ট ভাল। আমি ৬ষ্ঠ শ্রেণির তিন সেকশন-এর মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছি। আমি তো প্রথম শ্রেণি থেকেই নিজেদের জমিতে কাজ করার পাশাপাশি পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছি। তাই কাজের কারণে আমার লেখা-পড়ার ক্ষতি হচ্ছে না।

এতক্ষণে মাকে দেখতে পাই। মা অন্য-পাশে কার সাথে যেন কথা বলছিলো। আমাকে দেখে আমাদের নিকট আসে। আমি মা'র সাথে অনিরুদ্ধ'র পরিচয় করিয়ে দিই।

-মা, ও' অনিরুদ্ধ। আমি তোমাকে ও'র কথা অনেকবার বলেছি। আমরা একসাথে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছি। অনিরুদ্ধ এখন অন্য স্কুলে পড়ে। অনিরুদ্ধ অনেক ভাল ছাত্র। সব সময় ক্লাসে প্রথম হয়। পঞ্চম শ্রেণিতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে।

- হ্যাঁ, আমার মনে আছে। অনিরুদ্ধ কেমন আছো তুমি? তোমার পড়াশুনা কেমন চলছে? সময় পেলে আমাদের বাড়িতে এসো।

- আসবো মাসিমা। আপনারা আমার জন্য প্রার্থনা করবেন যেন আমি ভালভাবে শিক্ষাজীবন শেষ করতে পারি এবং ভাল মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারি।

- অবশ্যই প্রার্থনা করবো, বাবা। আজ আমরা আসি বাবা। সময় পেলে আমাদের বাড়িতে এসো কিন্তু।

আমি হাত নেড়ে অনিরুদ্ধকে বিদায় জানাই। অনিরুদ্ধও হাত নাড়ে।

বাবার বদলীর চাকুরী। বাবা চট্টগ্রামে বদলী হওয়াতে আমরা চট্টগ্রামে চলে আসি। চট্টগ্রাম বাবা-মা'র নিকট ভাল লেগে যাওয়াতে বাবা চট্টগ্রামে জমি ক্রয় করে বাড়ি করে। আমরা চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাই। অনিরুদ্ধ'র সাথে আমার যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

শিক্ষাজীবন শেষ করে আমি চট্টগ্রামের একটি কলেজে শিক্ষকতা শুরু করি। সকালে ঘুম থেকে উঠে এক কাপ চায়ের সাথে দৈনিক পত্রিকা পড়া আমার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। একদিন পত্রিকার ভিতরের পাতার একটি শিরোনামে আমার চোখ আটকে যায়। "প্রবাসী অধ্যাপক ড. অনিরুদ্ধ'র ছোঁয়ায় একটি গ্রামের পাল্টে যাওয়ার গল্প" শিরোনামে পত্রিকাটি একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন ছেঁপেছে। শিরোনামে লেখা অনিরুদ্ধ নামটি আমার হৃদয়ে এক আশ্চর্য অনুভূতির জন্ম দেয়। আমি প্রতিবেদনটি পড়া শুরু করি।

প্রত্যন্ত এক গ্রামের হত-দরিদ্র পরিবারের সন্তান অনিরুদ্ধ। প্রতিনিয়ত দারিদ্র এবং দারিদ্রের কারণে সৃষ্ট অন্যান্য প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করতে করতে বেড়ে উঠেছেন। কিন্তু কখনো হাল ছাড়েননি। প্রবল ইচ্ছাশক্তির বদৌলতে তিনি দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ থেকে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে পাস করে স্কলারশীপ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান। সাফল্যের সাথে পড়া শেষ করে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। অতি অল্প সময়ে তিনি শিক্ষকতায়ও সাফল্য পান এবং বিশ্ববিদ্যালয়টির উচ্চতর আসনে আসীন হন। এতসব অর্জনের পরও অনিরুদ্ধ কখনো যে গ্রামে তার জন্ম, যে গ্রামের আলো-বাতাসে তিনি বেড়ে উঠেছেন, সে গ্রামের কথা ভুলে যাননি।

তিনি সর্বদা গ্রামের মানুষের সাথে যোগাযোগ রেখেছেন। বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনেছেন। সমস্যাগুলো নিয়ে ভেবেছেন এবং অবশেষে সমস্যাগুলো সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। গ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের সাথে কথা বলে তিনি জানতে পেরেছেন, মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি গ্রামের দীর্ঘদিনের সমস্যা। গ্রামের সর্বত্র মাদকের বিস্তার সাম্প্রতিক সমস্যা।

গ্রামের মানুষকে সংগঠিত করার মাধ্যমে তার আয়ের একটি অংশ দিয়ে অনিরুদ্ধ গ্রামে একটি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন স্কুল এবং একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের তিনি বিনা-বেতনে পড়ার সুযোগসহ স্কুল-ইউনিফর্ম এবং লেখা-পড়ার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিনামূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। স্কুলের জন্য দক্ষ, অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এবং দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগেরও ব্যবস্থা করেন তিনি।

গ্রামের দারিদ্র বিমোচনের জন্য তিনি আয়মূলক কাজে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং পুঁজি সরবরাহের মাধ্যমে বেকার যুবকদের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করেন । গ্রামকে মাদকমুক্ত করার প্রয়াসে তিনি শর্ত আরোপ করেন যে, কোন পরিবারের একজন সদস্যও যদি মাদক গ্রহণ করে তাহলে সে পরিবার উপরে উল্লেখিত সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত হবে। তাছাড়া মাদক গ্রহণের কুফল সম্পর্কে জানানোর জন্য এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তিনি গ্রামে সেমিনারের আয়োজন করেন।

গ্রামবাসীদের সচেতন করার পাশাপাশি কৃষি বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে তিনি গ্রামের কৃষি জমিসহ পতিত জমিগুলোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করেন। স্থানীয় সরকারের সহযোগিতা এবং নিজস্ব উদ্যোগে গ্রামের রাস্তাগুলোর উন্নয়ন সাধন করেন। প্রতিটি বাড়ির সাথে রাস্তার সংযোগ ঘটান। গ্রামের মধ্যদিয়ে বয়ে যাওয়া নোংরা নালায় পরিণত

হওয়া খালটি সংস্কার করে দুই-ধার বাধাইয়ের ব্যবস্থা করেন। দিনের পর দিন ময়লা পানি এবং আবর্জনা পড়ে খালটি অকেজো হয়ে গিয়েছিলো। দুর্গন্ধে পাড় দিয়ে হাঁটা যেত না। গ্রামবাসীর সহযোগিতায় খালটি পরিষ্কার করে ময়লা-আবর্জনাগুলো জৈব-সারে পরিণত করার ব্যবস্থা করা হয়। যথাযথ ড্রেনেজ-সিস্টেমের মাধ্যমে ময়লা পানি অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়। খাল এবং খালের পাড়টি বর্তমানে বিনোদন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। খালের পাশে বিভিন্ন ধরনের ফুল এবং ফলের গাছ লাগানো হয়েছে। খালের পাড়ে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বচ্ছ, টলমলে পানিতে টইটম্বুর খালটিতে ছোট ছোট নৌকা বাঁধা আছে। যে কেউ ইচ্ছা করলে খানিক সময় নৌকায় ঘুরতে পারে।

গ্রামের রাস্তাগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নির্ধারিত স্থানে ময়লা ফেলার ব্যাপারে গ্রামবাসী যে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাস্তাগুলো তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। গ্রামের কোথাও কোন অপ্রয়োজনীয় ঝোপ-ঝাড় নেই। প্রতিটি গাছই প্রয়োজনীয় এবং পরিকল্পিতভাবে গাছগুলো লাগানো হয়েছে। গ্রামের ধনী-গরীব সকলের বাড়ির আঙ্গিনা এবং আশ-পাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। গ্রামের সকল পরিবার স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করছে।

গ্রামের মাঝামাঝি স্থানে একটি বড় ক্রয় এবং বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। কেন্দ্রটির নাম "আমাদের সততা স্টোর"। সততা স্টোরটিতে কোন বিক্রয়-কর্মী নেই। গ্রামে উৎপাদিত পণ্য এখানে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। আশে-পাশের বাজার যাচাই করে প্রতিদিন সকালে পণ্যের ক্রয় এবং বিক্রয়ের আলাদা দু'টো মূল্য তালিকা সততা স্টোরের সামনে নির্দিষ্ট স্থানে টানিয়ে দেয়া হয়। গ্রামের মানুষ তাদের নিজস্ব জমিতে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য সততা স্টোরে নিয়ে আসে এবং মূল্য তালিকা অনুযায়ী পণ্যের দাম নির্ধারণ করে স্টোরে সাজিয়ে রেখে সঠিক পরিমাণ অর্থ নিয়ে চলে যায়। আবার ক্রয়ের জন্য আসা গ্রামবাসী টানানো মূল্য তালিকা অনুযায়ী তার প্রয়োজনীয় জিনিসটির দাম নির্ধারণ করে নির্ধারিত স্থানে সঠিক পরিমাণ অর্থ রেখে মালামাল নিয়ে চলে যায়। দিন-শেষে স্টোর পরিচালনার জন্য গঠিত কমিটি উদ্বৃত্ত মালামাল এবং জমা হওয়া নগদ টাকার হিসাব মিলিয়ে স্টোরটি বন্ধ করে। একাধিক গ্রামবাসীর সাথে কথা বলে জানা যায় সততা স্টোরটির কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে কখনো হিসাবের গর-মিল পাওয়া যায়নি।

সততা স্টোরের পাশেই আরও একটি বড় ঘর রয়েছে। ঘরটির উপরে সাইনবোর্ডে সুন্দর করে লেখা "মানবতা চর্চা কেন্দ্র"। এখানে কারও যদি এমন কোন দ্রব্যাদি থাকে যা তার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি সে সেই দ্রব্যটি নির্ধারিত স্থানে রেখে যায়। আবার এমন অনেকেই আছেন যাদের নিজের বা পরিবারের প্রয়োজনীয় জিনিসটি ক্রয়ের সামর্থ নেই তারা মানবতা চর্চা কেন্দ্র থেকে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসটি বিনামূল্যে সংগ্রহ করেন। শাক-সব্জি, মুদি-সামগ্রী এবং নিত্য-ব্যবহার্য সামগ্রীসহ পরিধাণের জামা-কাপড় এ মানবতা চর্চা কেন্দ্রটিতে পাওয়া যায়। প্রতিদিন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রামবাসী তাদের উদ্বৃত্ত পণ্যটি আনন্দ-চিত্তে মানবতা চর্চা কেন্দ্রে রেখে যাচ্ছে পক্ষান্তরে অর্থের অভাবে ক্রয় করতে ব্যর্থ হওয়া গ্রামবাসী তার প্রয়োজনীয় পণ্যটি এখান থেকে বিনামূল্যে সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে। এ কেন্দ্রে নিত্য-প্রয়োজনী দ্রব্যাদি দেয়া-নেয়ার ক্ষেত্রে অদ্যাবধি কোনো রকম অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটেনি।

গ্রামের স্কুলের সীমানা ঘেসে চলে যাওয়া রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় লাইব্রেরীটির দিকে যে কারও নজর যাবে। লাইব্রেরীটি চেনার জন্য এটির সাইনবোর্ড দেখতে হবে না। রাস্তা থেকেই লাইব্রেরীর ভেতরে বইয়ে ঠাসা বুক-সেলফগুলো দেখা যায়। প্রত্যন্ত গ্রামটিতে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা অনিরুদ্ধ'র আরও একটি মহতী এবং সৃজনশীল উদ্যোগ। এ লাইব্রেরীতে গ্রামবাসীর পড়ার উপযোগী অসংখ্য বই সংরক্ষিত আছে। দেশের হাল-নাগাদ সংবাদ জানার জন্য লাইব্রেরীতে নিয়মিত দু'টো দৈনিক পত্রিকা রাখা হয়। সকাল নয়টা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত লাইব্রেরীটি খোলা থাকে। এ সময়ের মধ্যে যে কেউ বই বা পত্রিকা পড়তে পারে। বই পড়ার জন্য লাইব্রেরিটির পাশের রুমে একটি লম্বা টেবিল এবং বিশটি চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পড়ার রুমের এক পাশে চা-কফির মেশিন বসানো আছে, যে কেউ মূল্য পরিশোধ করে চা বা কফি নিয়ে বসে পড়তে পারে। এ লাইব্রেরী থেকে কেউ বই বাড়িতে নিয়ে যেতে পারে না। পছন্দের বইটি লাইব্রেরীর পড়ার রুমে বসেই পড়া শেষ করতে হয়। শুধুমাত্র চা-কফি পানের উদ্দেশে লাইব্রেরীতে আসা যাবে না। কেবল বই পড়লেই চা-কফি পানের অধিকার পাওয়া যাবে। লাইব্রেরীতে অনর্থক আড্ডা দেয়া যায় না। প্রতিদিন বিভিন্ন বয়সের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রামবাসী বই এবং দৈনিক পত্রিকা পড়ার জন্য লাইব্রেরীতে আসে। এ লাইব্রেরীর কারণে প্রতিদিনই নতুন নতুন পড়ুয়া তৈরী হচ্ছে। তৈরী হচ্ছে সৃজনশীল. মানবিক এবং জ্ঞান-সাধক মানুষ।

খোঁজ নিয়ে জানা যায় বিগত তিন বছরে এ গ্রামে কোনো চুরির ঘটনা ঘটেনি। মাদক গ্রহণ এবং ঝগড়া-বিবাদের ঘটনাও শূন্যের কোটায়। স্কুলে যাওয়ার বয়সী শতভাগ ছেলে-মেয়ে স্কুলে যায়। স্কুল থেকে কেউ ঝরে পড়েনি। বাল্য বিবাহের কোনো ঘটনা ঘটেনি। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি এবং পরিকল্পিত এবং আধুনিক কৃষি-পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি কাজ করার ফলে পরিবারগুলোর আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাস্থ্য-সচেতনতার কারণে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

অধ্যাপক অনিরুদ্ধ'র যাদুর কাঠির ছোঁয়ায় অতি অল্প সময়ে গ্রামটি আমূল বদলে গেছে। পুরো গ্রামটি পরিণত হয়েছে একটি সুখী পরিবারে। পরিবারের প্রতিটি সদস্য আবদ্ধ হয়েছে সম্প্রীতির বন্ধনে। হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে পারস্পরিক সহযোগিতায় তারা এগিয়ে যাচ্ছে সম্মুখ পানে। একজন মাত্র ব্যক্তির আন্তরিক উদ্যোগ এবং নেতৃত্বে পুরো একটি গ্রামও যে বদলে যেতে পারে প্রবাসী অধ্যাপক অনিরুদ্ধ তা দেখিয়ে দিয়েছেন।

প্রতিবেদনটি পড়া শেষ করে নির্বাক বসে আছি। পাশে চায়ের কাপের চা কখন ঠাণ্ডা পানিতে পরিণত হয়েছে বুঝতে পারিনি। হঠাৎ স্ত্রীর ডাকে সম্বিৎ ফিরে পাই- কি হলো, পেপার হাতে মূর্তির মতো বসে আছো যে? কলেজে যাবে না?

তাড়াহুড়ো করে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়ি। ড্রাইভারকে বলি আন্দরকিল্লাহ্ মোড়ে যেতে। ড্রাইভার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে- কলেজে যাবেন না স্যার?

ড্রাইভারের প্রশ্নের উত্তর দিই না। উত্তর দেওয়ার ইচ্ছে হয় না। আমাকে আন্দরকিল্লাহ্ মোড়ে দৈনিক পত্রিকাটির জেলা প্রতিনিধির অফিসে যেতে হবে। জেলা প্রতিনিধি সুমন হাসানের মাধ্যমে পত্রিকাটির ঢাকা অফিস থেকে অনিরুদ্ধ'র সাথে যোগাযোগের নম্বর যোগাড় করতে হবে। ড্রাইভারকে তাড়া দিই। প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে ড্রাইভার যথ াসম্ভব দ্রুত গাড়ি চালায় আন্দরকিল্লাহ্ মোড় অভিমুখে॥

নব জীবনের আয়োজন

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

(এক)

ফাদারের ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে টেংরা জন। এসেছিল ঘণ্টাখানেক আগে। যদু নিজেই দরজা খুলে দিয়েছিল। বাগানে কাজ করছে মালী যদু। সে বার বার দেখছে টেংরা জনকে। মাথায় এলোমেলো জটবাধা লম্বা চুল। পরণে কোঁচকানো শার্ট আর ময়লা সাদা পাজামা। সে ভাবছে, লোকটার মাথায় ছিট আছে। বেটে, রোগাটে চেহারা। প্রতিদিন গাঁজার কল্কী টানলে যা হয় আর কি! তবে বেশ ফর্সা! চলনে বলনেও চটপটে। দেখলে মনে হয়, বাতাসের আগে দৌড়ায়। ততক্ষণে নির্মীয়মাণ গির্জার প্রাঙ্গণ পেরিয়ে বড় গেইট দিয়ে রাস্তায় উঠে গেছে সে। ওদিকে জেরন বাবুর্চি রান্নাঘরে ব্যস্ত। আচ্ছা! ফাদারের সাথে তার এত কী কথা? প্রায়ই এভাবে আসে! কিন্তু, রবিবারে গির্জায় আসে না! বিষয়টা যদু মালীর কাছে অস্বাভাবিক ব'লেই মনে হল। বেলা এগারটার দিকে টেংরা উদ্ভ্রান্তের মত ছুটে এসে ফাদারের কথা জিজ্ঞেস করল, 'এই! ফাদার কি আছে?'

-হ আছে। কিছু দরকার?

-না কিছু না। খালি, দেখা করুম।

'খাঁড়াও' ব'লে যদু দরজা ঠেলে ফাদারের রুমে ঢোকে। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এসে বলে, 'যাও। ফাদার যেতে বলেছে।'

'আইছা' ব'লে টেংরা জন এগিয়ে গিয়ে দরজা ঠেলে ফাদারের রুমে প্রবেশ করে।

ফাদারের সাথে কথা শেষ করে, আধা ঘণ্টার মধ্যেই টেংরা জন চলে গেছে। যদু মালী বাগানে তার কাজে মনোনিবেশ করে। কিছুক্ষণ পর সে, রান্নাঘরে প্রবেশ করে। সামনের খাঁচি থেকে বরবটির কিছু অংশ মুখে গুঁজে চিবুতে চিবুতে জেরন বাবুর্চিকে প্রশ্ন করে, আইছা দাদা। কও তো টেংরা জন আইল ক্যান? ফাদারের লগে তার ইমুন কী দরকার? এর আগেও সে এ রকম এসেছে! ফাদার চা দিতে কইল। সে চাও খাইলো না। চা খাইবো না কইল।

-কী কমু ভাই! তবুও ভালা। টেংরা জন তো গির্জায় আসে না সেই কবে থেইকা, মনেও নাই!

চামচ দিয়ে জ্বলন্ত চুলার উপর উত্তপ্ত ফেনায়মান হাঁড়ি থেকে ভাত উঠান জেরন বাবুর্চি। ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে ভাত টিপতে টিপতে বলেন, তবুও তো ফাদারের কাছে আইলো। আমি তো মনে করি এটাও অনেক ভালা। মনে হইল পাপস্বীকার কইরা গেছে।

-কী কও! পাপস্বীকার করলে, ফাদার তো গির্জায় যাইতো!

অবাক হয় যদু মালী। সে মাথা নেড়ে বলে, আগেও সে এরকম এসেছে! বুঝি কম!

-আরে! ফাদার চাইলে, তার নিজের ঘরেও বইসা পাপস্বীকার দিতে পারে। পারে না?

-তবুও ভালা। তার মন পরিবর্তন হোক, আমরা চাই। হ। কোনদিন ঠিকই দেখব, সে গির্জায়ও আসা শুরু করেছে।

-তাই যেন হয়। জেরন বাবুর্চি বলেন, ঈশ্বর তারে আশীর্বাদ করুন।

টেংরা জনের উচ্ছন্ন জীবনযাপন। মুখ ভর্তি খোঁচা দাঁড়ি। মাথা ভর্তি উসকো খুসকো চুলের জট। পরণে জীর্ণ ময়লা পাজামা শার্ট। একবার গায়ে চড়ালে, সহজে নামায় না! কত দিন পর পর গা ধোয় তা সে নিজেও জানে না। প্রতি

বুধবার শনিবার উলুখোলা হাটে ভাঙ্গা হাঁড়ি বাসনকোসন, হারিকেন, বালতি ইত্যাদি ঝালাইয়ের কাজ করে। আবার, সেই টঙ্গি বাজারেও যেয়ে এ কাজ করে নিয়মিত। বিশেষভাবে রবিবার দিন। তা থেকে যা আয়-রুজি হয়ে, কায় ক্লেশে কোন মতে সংসার নির্বাহ করে। ঘরে দু'টি মেয়ে ও একটি ছেলে। জমি-জিরাত বলতে অবশ্য কিছু আছে।

পরিবারের চারটি মুখের জন্য উৎপন্ন ধান থেকেই বৎসরের চাল হয়ে যায়। ঘরের আশেপাশেও যা চালা জমি আছে তাতে লাউ, টমেটো, বেগুন এটা সেটা ক'রে চলেই যায়। তো, টেংরা গির্জায় না গেলেও তার বউ পোলাপান সকলেই গির্জায় যায়। পাপস্বীকার করে। কমুনিয়ন নেয়। তবুও ভাল। ধর্মকর্মের বিষয়ে, সে তার পরিবারকে মানা করে না। ছেলেমেয়ে তিনটা মিশনের স্কুলেই যায়।

জেরন বাবুর্চি বলেন, দেখেছ যদু। টেংরা গির্জায় না আইলেও, হেয় কিন্তু কবরস্থানে যায়। প্রার্থনা করে।

-হ দাদা! কথা কিন্তু সত্য! তুমি কি জানো, মৃতলোকের পর্বের আগের রাইতে পামলাইট জ্বালাইয়া সারা রাইত কবরস্থানে ঘুইরা ঘুইরা, বইসা, হাঁটু দিয়া প্রার্থনা করে? আচানক কারবার!

-হ। আমিও দেখছি। আইছা অর ভিতর ডর ভয়, কিছুই নাই নাকি! তুমি কও, কোনো সাধারণ সুস্থ মানুষ কি পারে কবরস্থানে একা একা সারারাত কাটাইতে? চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মইধ্যে, তা সে প্রার্থনা করুক, আর যাই করুক! কেউ কি পারে?

-হ টেংরা জন পারে। আমার এই মাথায়, বুঝি না কিছু। তবে হ, তাও ভালা। মৃত লোকের পর্বের দিনে তার বাড়িতে ধর্মীয় কবিগাণের আসর বসায়। বাড়ি বাড়ি যাইয়া চাল, ডাল আর টাকাপয়সা উঠায় এই উপলক্ষে। প্রতি বছর সে এই কাজটা করে। দিন দিন কিন্তু মানুষের সংখ্যা বাড়তেছে! অনেক মানুষ আসতেছে এই আসরে! আবার দেখ তার কিন্তু দিলটা ভালা। একেবারেই সহজ সরল মানুষ।

-আরে! হেয় তো গাঞ্জা খাওয়া পাবলিক! দেখছ? অই মাইকেল কাকা, পাগলা যোসেফ কাকা, কান্দা দাদা, আবার অই দক্ষিণ পূর্বপাড়া থেইকা মরিনা দাদা, পিয়প কাকার বাড়িতে কেমন গাঞ্জার মজমা বসায়! আহ! কী তাদের গানবাজনার আসর! আচানক কারবার!

-তো ফাদার কি জানে এসব?

-জেরনদা, তুমি কি মনে কর ফাদার জানে না?

-কিন্তু বাকি তারা তো গির্জায় আসে!

-হ। খালি এই টেংরা জনই আসে না।

টেংরা জন বেরিয়ে যাওয়ার খানিক পর ফাদার বেরিয়ে এলেন। তিনি এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন। মিশনের নতুন গির্জা হচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ার, লেবার সকলেই সেই সাতসকাল থেকে মহাযজ্ঞে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এটা এখন নিত্যকার চিত্র। খেলার মাঠের উত্তর প্রান্তে পুরনো গির্জা ভেঙ্গে একই জায়গায় নির্মিত হচ্ছে নতুন গির্জা। তিনি পায় পায় কর্মযজ্ঞের পরিসরে এগিয়ে যান। কর্মব্যস্ত সকলের সাথে নিজেও হাত লাগান। সকলের সাথে হাসি, ঠাট্টা, তামাশায় মসগুল হন প্রাণবন্ত উচ্ছ্বাসে! তাই দেখে, ধর্মপল্লীর সকল খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে একধরণের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আবেগ কাজ করছে।

ফাদার সুব্রত মিশনবাসিদের বলেছেন, বাইরের ফাণ্ডে নয়। তিনি দেশী বিদেশী সবাইকে আহ্বান করেছেন; নতুন গির্জা নির্মাণের কাজে সকলের সাধ্যমত একাত্ম হতে। উদার মনে এগিয়ে আসতে। তিনি বরাবরই বলে আসছেন, আমাদের এই মিশনের খ্রিস্টভক্তদের অর্থেই আমরা নির্মাণ

করবো এই গির্জা। মিশনের গ্রামে গ্রামে যেয়ে ফাদার প্রতি পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করছেন। বলছেন, আমরা বাইরে থেকেও কিছু অর্থ পাচ্ছি। তবে, তাতে এত বড় কাজ সামাল দেওয়া যাবে না। কাজ তো শুরু হয়ে গিয়েছে। আমাদের মিশনের লোকজন বাইরে যারা আছেন, তাদের কাছ থেকে আমরা আশা করি বেশি।

গির্জার কাজ প্রায় শেষ। দেখতে দেখতেই তিন বৎসরের মাথায় পুরনো গির্জার জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে সুনসান নতুন গির্জা! দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক ফাদার, সিস্টার, সেমিনারিয়ান যেমন আসছেন তেমনই আর্চবিশপ নিজে এবং অন্যান্য বিশপগণ ঘন ঘন এসে দেখে যাচ্ছেন এ মহাযজ্ঞ। জেরম বাবুর্চি এবং যদু মালী তারা লক্ষ্য করল, একই সাথে টেংরা জনের আনাগোনাও বেড়েছে। সে নিজেও নির্মাণকর্মী এবং মিশনের যুবকদের সাথে হাত লাগিয়েছে! এ চিত্র দেখে সকলেই অবাক হয়েছে। আমোদিত হয়েছে। সকলে তারা সুব্রত ফাদারের প্রশংসার করছে। 'আসোলেই তার পক্ষে সবই সম্ভব!'

টেংরা জনের স্ত্রী মালতী লক্ষ্য করল, সময় পেলেই জমিজমার কাগজ পত্র ঘাটাঘাটি করে তার স্বামী। আবার, সব বগলদাবা করে ব্যস্ত হয়ে বাইরে দৌড়াদৌড়িও করছে। দেখে তার মনে একই প্রশ্ন ঘোরপাক খায়, 'বিষয়টা কী?'

তাই একদিন সে জিজ্ঞেস করল, 'কী করছো তুমি?'

-না! কিচ্ছু না।

-তোমার ওই 'কিচ্ছু না' আবার কী? আমি তো দেখতাছি, তুমি কী জানি করছো! আমারে কও না। তা আমারে কইলে ক্ষতি কী?

-পরে কমু। এই শেষ।

অনেক দিন পর মালতী লক্ষ্য করল, তার স্বামী ব্যস্ত হয়ে একটা কাপড়ের ব্যাগ বগলদাবা করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। সে নিজেকে নিজেকে আবারও প্রশ্ন করল, 'বিষয়টা কী?'

সন্ধ্যাবেলা স্বামীকে মওকা মত পেয়ে জিজ্ঞেস করল, আইছা! অই ব্যাগে কইরা কী নিয়া গেলা তুমি? আমি দেখলাম!

-আরে ধেত! বেহুদা চিন্তা কর।

বিরক্ত হয় টেংরা জন। সে হাত নেড়ে বলে, কী নিমু আবার? ইমুন কী আছে আমার?

-আমারও তো একই কথা।

-কিছুই না। ব্যাস।

ত্রস্ত নগ্নপায়ে বেরিয়ে যায় সে। দরজার কাছে প'ড়ে রইল তার শত জোড়াতালি মারা চামড়ার 'শতবর্ষী' পাদুকা যুগল। আক্ষেপের দৃষ্টিতে তা দেখে বিড়বিড় ক'রে বলে মালতী, মানুষটার পায়ের তলায় কড়া আছে। তা সে জুতা নিতে ভুলেই গেছে! কতদূর যাবে খালি পায়ে? এবার বুঝুক মজা!

(দুই)

তিন বছর পর এল; মিশনবাসী সকলের আকাঙ্খিত সেই দিন। নতুন গির্জা উদ্বোধনের উৎসবমুখর সেই দিন। পুরো মিশন জুড়ে সাজ সাজ রব! পার্শ্ববর্তী ধর্মপল্লী, দেশের বিভিন্নজেলা এমনকি বিদেশ থেকেও এলাকার লোকজন, আত্মীয়স্বজন এসেছে নতুন গির্জা উদ্বোধনের আয়োজনকে উপলক্ষ ক'রে। বাড়িতে বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনদের সমাগম। খাওয়া দাওয়ার ধুম লেগেছে। সকলেই দলে দলে ছুটে চলেছে মিশনবাড়িতে। দূর থেকে মাইকে শোনা যাচ্ছে অনুষ্ঠানের ধারা বর্ণনা। বাদ্যবাজনাও বাজছে। ওদিকে প্রাইমারী স্কুলের পাশে সুনীল ডেকোরেটরের লোকজন বড় বড় ডেকচিতে রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত। আমন্ত্রিত সকলের জন্য খাবার তৈরি করছে তারা। পুকুর পাড়ের এলাকা জুড়ে ধোঁয়ার কুণ্ডুলি আচ্ছন্ন করে রেখেছে সব। নতুন গির্জা কমিটির চেয়ারম্যান নিমাই মাতবর ও খাবার কমিটির সভাপতি সিমন মাতবর ঘন ঘন এসে সচক্ষে তদারকি করছেন এবং সময়মত কাজ সারার জন্য তাগাদা দিচ্ছেন। সুরেন, চঞ্চল, বকুল, দুলাল, সঞ্চয় এবং মিশনের যুবসমিতির অন্য ছেলেরাও এসে দেখে যাচ্ছে। তারা আবার মূল অনুষ্ঠান নিয়েও ব্যস্ত। জ্বলন্ত চুলার উপর টগবগে খাবারের উপাদেয় গন্ধ পেয়ে মিশনের বিভিন্ন গ্রামের পরিচিত, অপরিচিত কুকুররা এসে ভিড় জমিয়েছে। তারা সকলেই সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে আনাগোনা করছে। আবার অহেতুক বিবাদে জড়িয়ে একজন আরেক জনকে ধমক দিয়ে শাসাচ্ছে। আকাশেও পাতি কাকের বাড়তি উড়াউড়ি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যুবসমিতির সদস্যরা বাঁশের লাঠি উঁচিয়ে 'হেই দুর হ! দুর হ!' ব'লে তাদের তাড়া করছে। নতুন গির্জার উদ্বোধনী উপলক্ষে গ্রাম পর্যায় পর পর তিন রাত্রির নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রথম দু'রাতে মঞ্চস্থ হবে সামাজিক নাটক এবং শেষ রাতে যাত্রাপালা। এ নিয়ে এলাকায় রয়েছে টান টান উত্তেজনা! নতুন গির্জা কমিটির পক্ষ থেকে যেমন রয়েছে লটারির ড্র, তেমনই নাট্যদলগুলোর জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কারের ব্যবস্থা।

মিশনবাড়িতে তিল ধারণের জায়গা নেই। পুণ্যপিতা পোপের প্রতিনিধি, আর্চবিশপ, বিশপ, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার সহ রাজধানী থেকে এসেছেন গণ্যমান্য আমন্ত্রিত অতিথিরা। এ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক ও প্রকাশনা উপকমিটির নিবিড় তত্ত্বাবধানে বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশ করেছে প্যারিস কাউন্সিল। আজ হবে তার মোড়ক উন্মোচন।

ঘড়ির কাঁটার সাথে মিল রেখে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গিয়েছে। আকাশের অবস্থাও বেশ মনোরম। ঝরঝরে মোলায়েম রোদ উঠেছে। চারদিক ঝলমল করছে। ওদিকে মাইকে শোনা যাচ্ছে সবকিছু। মূল মঞ্চকে ঘিরে, অনেকগুলো মাইক উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম দিকে মুখ ক'রে সেট করা হয়েছে, যেন সব গ্রামের মানুষ শুনতে পায়। মিশনবাড়ির পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজনদের অনেকেই বাড়িতে অবস্থান করেও অনুষ্ঠানের ঘোষণা, বাদ্য-বাজনা, গান শুনতে পাচ্ছে।

মালতী তৈরি হচ্ছে। তার তিন সন্তান নিজেদের পছন্দমত; ভালো জামা পরে বেরিয়ে গিয়েছে অনেক আগেই।

-তুমি তো আর যাইবা না। নাকি?

-কী কও আবার তুমি?

বিছানায় শুয়ে রয়েছে টেংরা জন।

-তো আমি গেলাম। তুমি নাস্তা খাইয়া নিও। মীসা শুরু অইয়া যাইবো গা।

-যাও তো! খালি খালি পেঁচাল পাড়ে!

বেরিয়ে যায় মালতী।

ও দিকে মাইকে ঘোষিত হচ্ছে বিভিন্ন জনের নাম। যারা আর্থিক অনুদান করেছে, একে একে সকলের নাম মাইকে শোনা যাচ্ছে। যারা মিশনের আশেপাশে রয়েছেন, বিলম্ব না ক'রে অতি সত্ত্বর তারা যেন মিশনবাড়িতে উপস্থিত হন। আসন নেন সামিয়ানার নিচে।

-এই হুনছো।

উঠানে মালতীর কণ্ঠ। 'এই। মাইকে তো তোমারে ডাকতেছে!' দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে মালতী।

-কী কও?

-কইতাছি মাইকে তোমার নাম ডাকতাছে তো! তুমি আবার কী করলা?

-না! আমি আবার কী করুম! কী করতে পারি আমি?

-ওই যে, মাইকে তোমার নাম ডাইকা বলতাছে অনুষ্ঠানে যাইতে।

-তুমি পাগল নাকি? কার না কার নাম ডাকতাছে! আন্দাজেই কইতাছো আমার নাম! খাইয়া আর কাম নাই!

-ওই হুনো বলতেছে 'জন রোজারিও! মাইকে তো আর টেংরা বলবো না! এইটা তো আর তোমার আসল নাম না! তা কও তো, ইমুন কী আকাম আবার তুমি করছো? না জানি কী ভেজাল লাগাইছ! ঈশ্বর রক্ষা কর!

-হ! আমি আকাম করলে আর ভেজাল লাগাইলে, আজকার ওই অনুষ্ঠানে আমারে ডাকবো? বিশ্বাস কর তুমি? যাও! তুমি ভেজাল কইরো না তো!

-ওই হুনো! তুমি নাকি গির্জায় টাকা দিছো! তোমারে সম্মান জানাইবো।

-আরে মর জ্বালা! তুমি যাও তো! ফাদার যদি কিছু কয়, তুমি বইলো তার সঙ্গে তো এই চুক্তি ছিল না। আমার নাম তো ডাকার কথা না।

-আইছা বুঝলাম। এখন কও, কত টাকা তুমি দিয়েছ?

-যাই দিয়েছি।

-ভালা কথা। আজকের এই শুভ দিনে কও, তুমি টাকা কোথায় পাইলা? ঈশ্বর দিয়েছে?

-হ! ঈশ্বর দিয়েছে!

-আইছা! ঈশ্বর দিয়েছে, বিশ্বাস করি। তো, ঈশ্বর যখন দিয়েছে, তোমারে একটা কথা কই। শুনবা তো?

-কও!

-না। আগে কও, শুনবা তো? ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস কইরা কও।

-হ। শুনুম।

-তুমি ভালা জামা পর।

-কেন?

-আগে পর। ওই যে তোমার সাদা পাঞ্জাবি আর কালো লম্বা পেন্ট আছে আলনায়। আমি ধুয়ে রেখেছি। পর।

-কী যে কও!

-তুমি পর। ঈশ্বর তোমারে ডাকতেছে।

-তুমি তো জানো। আমি গির্জায় যাই না।

-কিন্তু আজ যাইতে হইব। হ!

-কী জ্বালা! আইছা। ঠিক আছে। খাঁড়াও কিছু একটা মুখে দিয়া লই।

- রান্ধন ঘরে চুলার পাশে, তোমার ওই বাটিতে চিতই পিঠা ঢাকা দেওয়া আছে। পাশের বাটিতে চেপাকষানি দিয়া খাইয়া লও। তাড়াতাড়ি কর!

-পাঁচ মিনিট!

গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে সাদা শার্ট আর কালো পেন্ট পরিহিত টেংরা জন দু'হাতে দরজা টেনে শিকল এঁটে দেয়। নিজেদের ছোট্ট উঠান পেরিয়ে, কদবেলতলার নিচ দিয়ে মূল রাস্তায় ওঠে তারা।

টেংরা জন ও মালতী গির্জার মাঠে পা রাখে। তারা দেখতে পায় অগণিত রঙিন মানুষজন! গির্জার সামনে টাঙ্গানো হয়েছে বিরাট আকারের সামিয়ানা। সর্বত্র ঝালর ঝুলছে। ভিতরে রঙিন আলোর বাল্ব ও টিউব। সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে সবগুলো জ্বলে উঠবে। বাইরে চলমান জেনারটরের শব্দ হচ্ছে। নতুন গির্জা উদ্বোধনের অনুষ্ঠানকে ঘিরে, পুরো মিশনবাড়িতে টানা বিদ্যুৎ সরবরাহের সুব্যবস্থা। আবার, পানির বড় বড় জার স্থাপন করা হয়েছে। এখানে অভ্যাগত অতিথিদের জন্য সুপেয় পানীয়জল নিশ্চিত করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, লোকজন অনবরত পানি পান করছে। আবার প্রাইমারি স্কুলের পাশে টয়লেটের দিকে যাতায়াত করছে। এদিকে, মাইকে বিভিন্ন বক্তব্য শোনা যাচ্ছে। কলকাকলি মুখর শিশুরা, পুরো মাঠ জুড়ে ছুটাছুটি করছে।

টেংরা জনকে দেখতে পেয়ে অনেকেই অবাক হয়। সেতো গির্জায় আসে না! তাকে দেখে তারা খুশি হয়। অনেকেই এগিয়ে আসে।

বুড়া মরিনা দাদু এবং কান্দ্রা দাদুও এগিয়ে আসে।

-কি ভাই। তুমি আইছ? মরিনা দাদু বলে, ভাই তুমারে দেইখা, অনেক খুশী হইছি!

-হরে ভাই! ফোকলা হাসি হেসে দাঁতের ফাঁকে জিভ সামলে কান্দ্রা দাদু বলে, আহা! দেখিতে কী সোন্দর! সব ঈশ্বরের লীলা!

ওদিকে ফেরু দাদু ও জুজা দাদু হা হা করে হাসছে!

-হ দাদা! আইজকা না আইসা কি আর পারি?

-ভালা! ভালা! যিশু তুমারে আশীর্বাদ করুন। মরিনা দাদুর সাথে কান্দ্রা দাদুও দু'হাত উপরে তুলে আশীর্বাদ করেন।

ততক্ষণে মালতী মিশে যায় সমাবেশে।

টেংরা জন দেখতে পায় ফাদার সুব্রত এগিয়ে আসছেন তার দিকে। মুখে তাঁর অনাবিল হাসি।

-তুমি এসেছো! চল চল। মিসা শুরু হয়ে যাবে। সবাই আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

-নমস্কার ফাদার! যিশুতে প্রণাম!

-যিশুতে প্রণাম! ভালো আছো তো?

-হ ফাদার। ভালা না থাইকা কি উপায় আছে?

-সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা!

-হ ফাদার। মাইকে আমার নাম ডাকলেন শুনলাম। কেন ফাদার?

-কী বল! আজ তোমার নাম ডাকবো না কেন? তুমি যে বড় কাজ করেছ, তাতে ঈশ্বর তোমারে অনেক আশীর্বাদ করেছেন। বিশ্বাস কর?

-বিশ্বাস করি ফাদার।

-যারা এই গির্জা করার জন্য টাকা দিয়েছে, নানা ভাবে সাহায্য করেছে তাদের সবার নাম বলা হয়েছে। মিসায় উপস্থিত থাকতে ডাকা হয়েছে তাদের। উপস্থিত হয়ে তারা যেন, সামিয়ানার নিচে মঞ্চের কাছে চেয়ারে বসে।

-না! না! কী বলেন ফাদার! আমি তো ছোট একটা মানুষ!

-কে বলে তুমি ছোট? মানুষের কাছে ছোট হলেও, ঈশ্বরের কাছে তা নও। আজকে যে গির্জা আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা তো তোমাদের মত মানুষের দ্বারাই হয়েছে। আমি সব সময় বলতাম, আমাদের এই গির্জাঘর হবে এই মিশনের সকল মানুষের নিজেদের অনুদানে। তাই হয়েছে এখানে!

-হ ফাদার। আপনের কারণেই এইটা সম্ভব হয়েছে। যে ভাবে আপনে মানুষের বাড়িতে বাড়িতে গেছেন। সবাইকে উৎসাহ দিয়েছেন! তার ফল এই গির্জা ঘর।

-হতে পারে। এসো। তুমি এসো। আমার সঙ্গে প্যাণ্ডেলের নিচে, ওই মঞ্চের কাছে।

-ফাদার। আর একটা আবদার আপনার কাছে।

-কী আবদার আবার?

-ফাদার! আমাদের মিশনের দূরের গেরামে যদি একটা কইরা চ্যাপেল হয়, তো যে কোন সময় মানুষ ইচ্ছা মত সময় কইরা ওখানে যাইয়া প্রার্থনা করতে পারবে।

-প্রার্থনা তো নিজেদের ঘরেই করা যায়। নাকি? তুমিও রবিবারে এবং সপ্তাহের যে কোন দিন, যখন সময় পাও এখানে এই গির্জায় এসে প্রার্থনা করবে। কি করবা না?

-তা করা যায়। কিন্তু যারা বুড়া মানুষ। অসুস্থ। তারা তো চাইলেই গির্জায় আসতে পারে না দূরের পথ পাড়ি দিয়া। গেরামে একটা চ্যাপেল থাকলে, তারা যে কোন দিন সেখানে যাইতে পারে। মিশনের ফাদারও আইসা মিসা দিতে, পাপস্বীকার-কমুনিয়ন দিতে পারে। গেরামের মানুষ সকলে এক সাথে প্রার্থনা করতে পারে। পারে না?

-বাহ! তুমি তো সুন্দর কথা বললে!

-হ ফাদার আমি শুনেছি। অনেক মিশনে তা আছে। আমাদের এই মিশনে কি হইতে পারে না।

-নিশ্চয় পারে। কিন্তু চ্যাপেল করতে তো গ্রামে গ্রামে সুবিধামত জমির দরকার। টাকার দরকার।

-সবই হবে ফাদার। ঈশ্বর দেবে।

-কী ভাবে?

-আমার গ্রামে চ্যাপেল করার জন্য আমি জমি দেব।

-তাই নাকি? তোমার কি জমি আছে?

-যতটুকু আছে। ওই সুকুমার মাতবরের বাড়ির কাছে রাস্তার পাশে একটা গাব গাছ আছে। তার উল্টা দিকেই আমার এক টুকরা জমি আছে। আপনে বললে, সেটা আমি দেব। সাথে টাকাও কিছু, যা পারি দেব।

-তোমার এত কিছুর দরকার হবে না। তুমি শুরু করলে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তা হয়েও যাবে। তা তোমার পরিবার কী দেবে?

-ফাদার। আমার জমি বিক্রি কইরা এই গির্জার টাকা দিয়েছি, তা আমার পরিবার কিন্তু জানে না।

-কী বল তুমি! এইটা তো ভালো কথা না। তুমি ঈশ্বরের কাজে, জমি বিক্রি করে টাকা দিয়েছ, অথচ তোমার পরিবার তা জানে না। তা হতে পারে না। তুমি আমার সাথে চল। এক্ষুণি! তোমার স্ত্রীকে আমি নিজেই সব খুলে বলব।

-হ ফাদার। আমারও ইচ্ছা তাই। আমি না। আপনে, এই কথাটা আমার বউরে বলবেন। এটা আমার পরিকল্পনা।

-শোন তুমি। আজ আমাকে কথা দিতে হবে। তুমি অনেক ভালো মানুষ। ঈশ্বর তোমাকে অনেক ভালোবাসেন।

-হ ফাদার। তা আমি বিশ্বাস করি। তবে আমি কিন্তু ভালা মানুষ না! অনেক বড় পাপী! কথা কিন্তু সত্য!

-শোন জন। আজ এই দিনে তুমি আমাকে কথা দাও, অন্ততঃ প্রতি রবিবার গির্জায় আসবে তুমি। নিয়মিত পাপস্বীকার, কমুনিয়ন নেবে। কথা দাও।

-চেষ্টা করব ফাদার!

-হ্যাঁ চেষ্টা থাকবে, নিয়মিত থাকতে। কথা দাও। আমি কিন্তু খোঁজ নিব তোমার।

-ঠিক আছে! চলেন ফাদার। আমরা সামনের দিকে যাই!

- দেখি তোমার স্ত্রী কোথায়। তাকে আগে বলতে হবে। ধন্যবাদ দিতে হবে। হ্যাঁ। চল সামনের দিকে এগিয়ে যাই। সময় বেশি নাই!

সামিয়ানার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে জেরন বাবুর্চি ও যদু মালী। তারা দেখতে পায়, সুব্রত ফাদারের সাথে হাস্যোজ্জ্বল টেংরা জন এগিয়ে যাচ্ছে। তারা, একজন আরেক জনের চোখে চোখ রাখে।

-বুঝলা যদু?

জেরনের প্রশ্ন শুনে যদু মাথা নাড়ায়। মানে, সেও বুঝেছে।

-কী বুঝলা?

-তুমি যা বুঝেছ। আমিও তাই। যদু মালীর প্রাণবন্ত মন্তব্য, এখন বুঝতেছি! কেন সে ফাদারের কাছে যাইত!

-তা, গির্জার জন্যি তুমি কী দিলা?

জেরন বাবুর্চির প্রশ্ন।

-হ! জানি। তুমিও দিয়েছ। যা পেরেছি, আমিও দিয়েছি। মাইকে তোমার নাম বলেছে। আমারও নাম বলেছে। আবার টেংরা জনের নামও বলেছে। তবে সুব্রত ফাদারের জয়টা কিন্তু এখানেই। উনি টেংরা জনকে গির্জায় আনতে পেরেছেন। আমাদের ভাগ্য, সুব্রতর মত একজন ফাদারকে আমরা পেয়েছি!

-সবই যিশুর মহিমা! ঈশ্বরের গৌরব!

-ঠিক বলেছ। দেখ কত সোন্দর গির্জাঘর! অত্র এলাকার মইধ্যে সব চেয়ে বেশি সোন্দর!

-যেমন সৌন্দর! তেমন বড়! জয় যিশু!

-বল, জয় যিশু!

জেরন বাবুর্চি ও যদু মালী দেখতে পায়, ফাদারের সাথে টেংরা জন এগিয়ে যাচ্ছে সুশোভিত অনুষ্ঠান মঞ্চের দিকে। তাদের দু'জনকেই দেখা যাচ্ছে বেশ হাস্যোজ্জ্বল!

টেংরা জন তাকিয়ে দেখে, রঙিন সামিয়ানার উপর দিয়ে নতুন গির্জার আকাশছোঁয়া ক্রুশ দেখা যাচ্ছে। তার মনে হচ্ছে, আজ এখানে, তাদের এই মিশনবাড়িতে নতুন জীবনের উৎসবের আয়োজন চলছে! উপস্থিত সকল মানুষ এক এককাতারে সামিল হয়েছে এই আয়োজনে শরীক হতে। সেও সুব্রত ফাদারের সাথে এগিয়ে যাচ্ছে মুখরিত এক সামিয়ানার নিচে অবস্থান নিতে।

সবশেষে তার মনে হল, দু'হাত বাড়িয়ে যেন যিশু তাকে ডাকছেন। আমন্ত্রিত অভ্যাগতদের অনেকেই টেংরা জনকে দেখে পুলকিত হয়। ওদিকে মাইকে বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে গায়ক-গায়িকাদের সমবেত সুরেলা কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে, 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ, সত্য সুন্দর হে!'॥

হিলিং হার্ট কাউন্সেলিং ইউনিট

ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন মানসিক সমস্যার সমাধান অনলাইন ও সরাসরি কাউন্সেলিং সেবা নিন।

সিস্টারস অব আওয়ার লেডী অব সরোস্ দ্বারা পরিচালিত একটি মানসিক সেবাদান প্রতিষ্ঠান।

যোগাযোগ করুন:
+৮৮০ ১৭৫২-০৭৪ ৪৯৭
(মোবাইল ও হোয়াটস্অ্যাপ)।

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

'তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম'

প্রয়াত ডেভিড রড্রিক্স

জন্ম: ২৪ জানুয়ারি, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৯ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

প্রিয় পাপা,

দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল একটি বছর, ফিরে এলো সেই বেদনা বিভুর, শোকাবহ স্মরণীয় দিন ১৯ ডিসেম্বর, যে দিন তুমি ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে এই জগৎ সংসারে মোহমায়া ত্যাগ করে ঈশ্বরের আনন্দের রাজ্যে স্থান করে নিয়েছ। তোমার এই হঠাৎ চলে যাওয়াটা প্রথমে আমরা কেউ মেনে নিতে পারিনি, তারপরও ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েছে।

স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের জন্য আশীর্বাদ করো, যেন তোমার আদর্শে আমরা পথ চলতে পারি।

শোকার্ত পরিবাবের পক্ষে
ছেলে ও ছেলে বৌ: রনি-লিপি, ডনি-সুদিপ্তা
নাতী ও নাতনী: ওয়েন, ভিভিয়ান, স্টেড্রা ও অলিভিয়া।
স্ত্রী: ফ্লোরা রড্রিক্স
তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।

অপেক্ষা

শিউলী রোজলিন পালমা

তাহের স্যারের লেবার স্টাডিস্ ক্লাশ থেকে সোমা কিভাবে বেড়িয়ে এল, কিভাবে তিনতলা থেকে নীচে নেমে গাড়িতে উঠল, কখন তাদের 'কনকর্ড পার্কের' বাসায় ঢুকল তার কিছুই সোমা টের পায়নি, যতক্ষণ না হাজেরা ও মরিয়ম বুবু বারান্দায় এসে তাকে ধাক্কা দিল।

হাজেরা বুয়া ধাক্কা দিয়ে বলল, "সোমা আপা আপনের কি হইছে? ঘরে ঢুকলেন, কোন কথা বললেন না, বারান্দায় দাঁড়াইয়া এক ধ্যানে কি দেখতাছেন।"

সম্বিত ফিরে পেয়ে সোমা বলে, "বুবু কৃতিকে স্কুল থেকে আনার সময় হয়েছে?"

- না, আরো দুই ঘন্টা বাকী।
- ও। বুবু তোমরা ঘরে যাও, সময় হলে কৃতিকে আনতে যেও।

সোমা আবারো হারিয়ে যায় ভাবনার সাগরে- ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটি ক্লাশে বসে, ক্লাশ করবে বলে, কি মরণপণ প্রতিজ্ঞাই না ছিল তার! অথচ সে ক্লাশ থেকেই বেরিয়ে এল প্রায় জ্ঞানহীন অবস্থায়! লিবিয়ার ত্রিপোলিতে শোয়েবের জন্মদিনে যখন ডাক্তার মাহিনের স্ত্রী জয়াভাবী সোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন-

- কি সোমা ভাবী আপনার পড়াশুনা কোথায়? বুয়েট, মেডিকেল নাকি ঢাকা ইউনিভার্সিটি? কতভাবেই না তাকে সেদিন ব্যাখ্যা করতে হয়েছিল কেন সব রকম যোগত্যা থাকা স্বত্ত্বেও বুয়েট, মেডিকেল বা ইউনিভার্সিটিতে তার পড়া হয়নি।

ভিকারুননেসা নুন স্কুল এন্ড কলেজে বরাবরই ভাল ছাত্রী ছিল সোমা, ইন্টারমিডিয়েটের পরেই বুয়েট, মেডিকেল বা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষা দিবে এটাই নির্ধারিত ছিল। কিন্তু ভিকারুননেসা স্কুলের প্রিন্সিপালকে সাথে নিয়ে যেদিন শোয়েবের মা বাসায় আসলো সেদিনই সবকিছু ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছিল। প্রিন্সিপালের দৃষ্টিতে তার কলেজে যত মেয়ে আছে তার মধ্যে সোমাই সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত শোয়েবের জন্য। সুন্দরী, মেধাবী, ভদ্র অর্থাৎ সব মিলিয়ে সেরা। সোমাকে দেখে হাফ ছেড়ে বেঁচেছিল শোয়েবের মা। আ! কত জায়গায়ই না গিয়েছে মেয়ে দেখতে, একদিক হয়-তো, আরেকদিক হয় না। তাইতো অবশেষে কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে একটি ভাল মেয়ে দেখিয়ে দেয়ার জন্য ধর্ণা দিতে হয়েছিল। ছেলেও সেরাদের সেরা, ইঞ্জিনিয়ার, থাকে লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলি, ছয়মাস পর আসবে, তখনই বিয়ে।

শোয়েব '৭৫ সালে বুয়েট থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং- এ গ্র্যাজুয়েশন করেই অনেক উচ্চ বেতনে চাকুরী নিয়ে চলে যায় লিবিয়া। অনেক অনেক তেল ও গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হওয়া, তেল-গ্যাস উত্তোলন ও বিক্রির সুবাদে বৃহৎ আয়তনের ও ক্ষুদ্র জনসংখ্যার একটি দরিদ্র আফ্রিকান দেশ লিবিয়া তখন ধনী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। তেল বিক্রির বিরাট আয় থেকে সারা দেশেই চলছে তখন উন্নয়ন যজ্ঞ। কনস্ট্রাকশন, পরিবহন, বিদ্যুতায়ন, টেলিযোগাযোগ, স্বাস্থ্যসেবা সব সেক্টরে চলছে উন্নয়ন। বাংলাদেশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, নার্স তখন লিবিয়ায়। শোয়েব তাদেরই একজন।

সোমার মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন খোঁজ খবর নিয়ে দেখলেন সোমার জন্য এরচেয়ে উপযুক্ত ছেলে আর হয়না। ছয়মাস পর ছেলে দেশে আসলে বিয়ে, আর বিয়ের একমাস পর ছেলে সাথে করেই সোমাকে নিয়ে যাবে ত্রিপোলি।

বন্ধুদের সবাই যখন ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত, তখন সোমার সময় কাটছে তার স্বপ্নের নায়ক ও পরবাসে তার স্বপ্নের সংসারের অপেক্ষায়। উ! এ অপেক্ষার যেন শেষ নেই! ছয় মাস নয়তো যেন ছয় যুগ!

কি অদ্ভুত সুন্দর দিনই না কাটছিল ত্রিপোলিতে! '৭৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে যখন সোমার বিয়ে হয় তখন সোমাদের বাসায় একটি সাদাকালো টিভি ছাড়া কিছুই নেই, ল্যান্ড ফোন ও গাড়ি তো দূরের কথা। আর ত্রিপোলিতে ইঞ্জিনিয়ারদের কোয়ার্টারগুলি কতই না আধুনিক! বড় ফ্রিজ, টিভি, এসি, ফোন, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওভেন আরো কত কি, গাড়ী তো আছেই। দুজনের রান্না সেরে সোমার সারাদিনই কাটে টিভি দেখে, গান শুনে, বই পড়ে আর শোয়েবের অফিস থেকে ফেরার অপেক্ষা করে করে।

শোয়েব বাসায় ফিরে নাস্তা করেই সোমাকে নিয়ে বের হয় কাছাকাছি থাকা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারদের বাসায়, আড্ডা দেয়, খাওয়া দাওয়া করে। ছুটির দিনগুলো কয়েক পরিবার মিলে চলে যায় লং ড্রাইভে। ঝকঝকে প্রশস্ত রাস্তায় ছুটে চলে তাদের গাড়ি। এক উইকেণ্ডে যদি যায় দক্ষিণের সাহারা মরুভূমি তো অন্য উইকেণ্ডে উত্তরের ভূমধ্যসাগর, বাদ যায় না লিবিয়ার প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন বহন করা গ্রীক ও রোমান সব স্থাপনা পরিদর্শন।

এমনই নির্ভেজাল আনন্দের মাঝেই জয়াভাবী যেন একটা কাঁটা ফুটিয়ে দিলেন। ভাবী ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে এপ্লাইড ফিজিক্সে অর্নাস ও মাস্টারস্ কমপ্লিট করে ডাঃ মাহিনকে বিয়ে করেছেন। ভাবীর সাথে পরিচয় হওয়ার পর থেকেই সোমার ঘুরে ফিরে কেবলই মনে হয়, এমন তাড়াহুড়া করে বিয়ে না করলে তারও ভাবীর মত একটা সম্মানজনক অবস্থান থাকতে পারতো! নতুন মানুষের সাথে পরিচয়ের সময় সোমা আড়ষ্ট হয়ে থাকে, পাছে তার পড়াশুনা নিয়ে জয়াভাবীর মতন প্রশ্ন করেন! তাছাড়া শোয়েবের মত একজন তুখোর ছাত্র ও বড় ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী হিসেবে তার আরো একটু পড়াশুনা থাকা দরকার ছিল। সেই থেকে মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও দীর্ঘ অপেক্ষা দেশে ফিরেই আবার পড়াশুনা শুরু করবে সোমা।

ত্রিপোলি আসার দুই বছরের মাথায় শোয়েব সোমার কোলে আসে কৃতি। বই পড়ে আর ফোনে মা ও শ্বাশুরি মায়ের পরামর্শ নিয়ে একা একাই মেয়েকে বড় করে সোমা। ভাগ্যিস সোমা দেশ থেকে আসার তিনমাসের মধ্যেই সোমাদের বাসায় ল্যান্ডফোন লাগানোর ব্যবস্থা করতে পেরেছিল শোয়েব। এ এক আনন্দময় অভিজ্ঞতা! নিজের আদরের সন্তানের সাথে সময় কাটানো, একেবারে নিজের মত করে তাকে বড় করা!

প্রায় দশ বছর লিবিয়ায় চাকুরীর পর, বিরাট এক সঞ্চয় নিয়ে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারদের অনেকেই পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে সেটেল হতে ব্যস্ত হয়ে গেল। অনেকেই আমেরিকান ও ব্রিটিশ তেল কোম্পানিতে চাকুরী নিয়ে চলে গেল ইংল্যান্ড অথবা আমেরিকায়। গিয়েই কিনে ফেললো এক অত্যাধুনিক আলিশান বাড়ি। অনেকে আবার দেশে ফিরে অনেকটা ঝুঁকি নিয়েই বিরাট বিনিয়োগ করলো বিভিন্ন ব্যবসায়। শোয়েব ও সোমা সিদ্ধান্ত নিল ঢাকায় ফেরার।

শোয়েবের ইয়ারমেট জাভেদ ও আরও দুইজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার মিলে বিরাট বিনয়োগ করলো রিয়েলএস্টেট ব্যবসায়। ঢাকার মানুষের তখনও ফ্ল্যাটে বসবাস করার অভিজ্ঞতা নেই। তবুও ঢাকায় জমির সংকট ও ঢাকাবাসীদের ঢাকায় স্থায়ী আবাস গড়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে টার্গেট করে জাভেদ ও তার

পার্টনারেরা বিরাট বিনিয়োগ করলো আবাসন খাতে। বিনিয়োগকারীদের বিস্মিত করে দিয়ে হুড়মুড় করে বিক্রি হয়ে গেল তাদের প্রথম প্রজেক্ট কাকরাইলের 'কনকর্ড পার্কের' ষোলটি ফ্ল্যাট। যদিও ঢাকার সিদ্ধেশ্বরীতে শোয়েবদের নিজেদের একটি টিনশেড বাড়ি আছে তবুও শোয়েব আধুনিক সুযোগ সুবিধাসম্পন্ন 'কনকর্ড পার্কের' অষ্টম তলায় একটি ফ্ল্যাট কিনল। খ্যাতনামা ইনটেরিয়র ডিজাইনার নিয়োগ দিয়ে, সিগ্ধ, সুন্দর ও সুচিশীল করে সাজানো হল ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাটের উত্তরের বারান্দায় দাঁড়ালে চোখের সামনে ভেসে উঠে অবারিত সবুজের মেলা। সামনের জাজেস কমপ্লেক্সের গাছ, প্রধান বিচারপতির বাড়ির গাছ, তারচে উঁচুতে মাথা উঁচিয়ে আছে রমনা পার্কের সব গাছ। বেলী রোডের ভিকারুননেসা নুন স্কুল ও সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ প্রাঙ্গণের সুউচ্চ গাছগুলোও আছে দৃষ্টিসীমানায়। এই সবুজের সাগরের ফাঁকে ফাঁকে অল্প অল্প দেখা যায় ইট পাথরের দালানের অংশবিশেষ। এ সবুজের সামনে দাঁড়ালে জীবনের সব ক্লান্তি, হতাশা, নিরাশা দূর হয়ে জেগে উঠে সজীবতা ও আশা।

জনবহুল বাংলাদেশের শ্রমিকের সহজলভ্যতাকে পুঁজি করে ঢাকায় ফিরে শোয়েব বিরাট বিনিয়োগ করলো গার্মেন্টস ব্যবসায়। এ ব্যবসার খুঁটিনাটি বুঝতে শোয়েব কয়েক দফা ভ্রমণ করেছে কোরিয়া ও চায়না। কোরিয়া থেকে প্রশিক্ষিত করে এনেছে বিভিন্ন পর্যায়ের একদল কর্মী। বাড়ি তৈরি, মেশিনারিস আমদানী, লোক নিয়োগ, ক্রেতাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া সব সম্পন্ন করে পুরোদমে 'কৃতি গার্মেন্টস' চালু হতে লেগে গেল প্রায় দুই বছর।

শোয়েব চরম ব্যস্ত ব্যবসা নিয়ে, সোমাও বসে নেই, ঢাকায় ফিরেই সোমা বি.এ. পাস কোর্সে ভর্তি হয়ে যায়, পড়াশুনায় বড় গ্যাপ হওয়াতে অর্নাস পড়া সম্ভব হল না। কৃতিকে নিয়ে এখন তেমন চিন্তা নেই, মা-বোন-শ্বাশুড়ি মা কেউ না কেউ আছে ওকে দেখার। কাজকর্মের জন্য লোক তো আছেই। গ্র্যাজুয়েশনের পর মাস্টার্সের জন্য ভর্তি হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে।

ব্যবসা যতটা কঠিন ভেবেছিল শোয়েব, ব্যবসা আসলে তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। পদে পদে সরকারী নানা জটিল নিয়মকানুন তো আছেই, শ্রমিকদের কন্ট্রোল করাও কম দূরূহ নয়। বাথরুমের নামে, ধূমপানের নামে সময়ক্ষেপন করতে এরা ওস্তাদ, কাপড়চোপড়ের নিচে লুকিয়ে বাইরে নিয়ে যায় কাপড়, সুতা, বোতাম, মেশিনের ববিন আরো ছোটখাট জিনিস। এসব নিয়ন্ত্রন করতে হাতে নিতে হয় অনেক কঠিন কঠিন বিধিনিষেধ। কর্মসময়ে বাইরে যাওয়া বন্ধ করতে গেটে লাগানো হয় তালা, বেঁধে দেয়া হয় বাথরুমের সময়, ছুটির সময়ে বের করা হয় দেহ তল্লাশি করে। এতে ব্যবসার মালামাল চুরি বন্ধ ও যথাসময়ে কাজ শেষ করা সম্ভব হলেও পত্রিকায় মানবাধিকার কর্মীদের লেখালেখি শুরু হয়ে গেল পুরোদমে- শ্রমিকদের দাসের মত খাটানো হচ্ছে, বাথরুম ব্যবহারে কড়াকড়ি আরোপ করায় শ্রমিকদের কিডনী রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে গেছে, দেহতল্লাশির নামে শারিরীক নিপীড়ন হচ্ছে। যদিও খেয়ে না খেয়ে, মানবেতর জীবনে থাকা মানুষের কর্মসংস্থানের উদ্যোগ কোন মানবাধিকার সংস্থা নেয়নি।

নানামুখি চাপে মাঝে মাঝেই হতাশ হয়ে পড়ে শোয়েব- 'ভুলই হলো দেশকে ভালোবেসে'। দেশের আর্থিকখাতে একটি নতুন সেক্টরের দ্বার উন্মোচনের পিছনে যে কতটা ভালোবাসা, মেধা, শক্তি ও ঝুঁকি থাকে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবার যেন কেউই নেই এখানে। অথচ লিবিয়ায় বসে স্বপ্ন দেখেছিল দেশে বিনিয়োগ করবে, দেশের দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান হবে, তারা খেয়ে পরে বাঁচবে, তাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করবে, পোশাক রপ্তানি থেকে রেমিট্যান্স আসবে দেশে, দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে, উন্নত হবে দেশ। এখন মনে হচ্ছে সঞ্চিত টাকা নিয়ে একটি উন্নত দেশে চলে গেলে কত নিশ্চিন্তেই না বাকিটা জীবন কাটানো যেত!

সব ঝড়ঝঞ্ঝা, অসহযোগিতা মোকাবেলা করে দৃঢ় মনোবলে যখন ব্যবসা এগিয়ে নিচ্ছে শোয়েব তখনই এল, সব তছনছ করে দেয়া আঘাত। আগুন লাগলো 'কৃতি গার্মেন্টসে'। মারা গেল শত শত শ্রমিক, সেসাথে শোয়েব। সব পত্রিকার পাতায় শিরোনাম হল এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা - 'কৃতি গার্মেন্টসে অগ্নিকাণ্ড: লোভী মালিকদের নিষ্ঠুর সিদ্ধান্তে পুড়ে ছাই হলো জীবন্ত শ্রমিক।' পুরো জাতি 'কৃতি গার্মেন্টস' মালিক পক্ষকে ধিক্কারে ধিক্কারে ভরিয়ে দিল। এ ধিক্কার সইবার শক্তি সোমা বা কৃতির ছিল না। তারা চলে গেল গভীর ট্রমায়। অসহনীয় মানসিক আঘাত তাদেরকে শারিরীকভাবে এমন অসুস্থ করে তুলল যে তারা হাত দিয়ে খাবার খাওয়ার বা নিজ পায়ে দাঁড়াবার শক্তিও হারিয়ে ফেলল। অনেক ডাক্তার, থেরাপিস্ট ও সাইকিয়াট্রিস্টের চিকিৎসা ও কাউন্সেলিং-এ মাস তিনেক পর সোমা যখন কিছুটা স্বাভাবিক, তখনই সে সিদ্ধান্ত নিল ঢাকা ইউনির্ভাসিটিতে ক্লাশে যোগ দেবার।

ক্লাশে যোগ দেবার প্রথম দিনেই লেবার স্টাডিস্ ক্লাশে তাহের স্যার যখন শ্রমিকদের অধিকারহীনতা সম্পর্কে পড়াতে গিয়ে কৃতি গার্মেন্টসের উদাহরণ টেনে বলছিলেন-এটা নব্য দাসত্বের যুগ, এ দাসত্ব যুগের বলি হয়েছে শতাধিক শ্রমিক, তালাবদ্ধ করে করানো হত অমানুষিক পরিশ্রম, বাথরুমে যাওয়ার সুযোগ পেত না শ্রমিকেরা। ছাত্রছাত্রীদের কাছে স্যারের কথাগুলো শিক্ষণীয় হলেও সোমার কাছে স্যারের প্রতিটি শব্দ এতই নির্মম মনে হচ্ছিল যে কথাগুলো নিতে পারছিলনা সোমা। কষ্টে, ব্যথায়, লজ্জায় সোমা স্বাভাবিকভাবে চিন্তাও করতে পারছিল না। নিজের অজান্তেই ক্লাশ থেকে বেরিয়ে এল সোমা।

বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সোমার মনে হচ্ছে -বিয়ের আগে, বিয়ের পরে, লিবিয়ার বাসায় থাকাকালে, এ কনকর্ড পার্কের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কত সময়ই না সে শোয়েবের জন্য অপেক্ষা করেছে। তার ব্যাকুল প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে শোয়েব ফিরে আসতো! কতই না আনন্দ ছিল সে ফিরে আসায়! শোয়েবের পথ চেয়ে সোমার আর অপেক্ষা করতে হবে না। কিন্তু মন মানে শোয়েবের জন্য অপেক্ষা করতে সোমার ইচ্ছে করে আজীবন, প্রিয় মানুষের জন্য অপেক্ষা করার চেয়ে মধুর যে আর কিছু নেই॥

দামাল বাঘিনী
সংগ্রামী মানব

বীর বাঙ্গালির দামাল কন্যা
হৃদয় ভিজেছে অশ্রু বন্যায়,
মৃত্তিকা অবাক তাকিয়ে রয়
বাঙ্গালি জাতির আজ গর্ব হয়;
তোমাদেরই এই বিজয়।
সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছে
বেড়া জালে ঘেরা সবুজ মাঠে
হাজারো কণ্ঠস্বর হিতের বিপরীতে,
তবুও সাহস ছিল বুক জুড়ে।
দাপিয়ে বেরিয়েছে দুর্বার গতিতে
বিজয় এনেছে দেশে
বর্ণ জাত ভুলে
মিলিত হয়েছে আবেশে।
১৮ কোটি বাঙ্গালীর হৃদয়।
আবেগে আপ্লুত
স্যালুট জানাই
সদা সর্বদা রবে বীরত্বে
মাতাকে সম্মানিত করতে
প্রতিনিয়ত নিজেকে গড়বে।

God is with you!

জেরী জুলিয়াস রোজারিও

বড়দিনের ছুটিতে চট্টগ্রাম থেকে বাড়িতে এসেছে প্রবাল। পেশায় একজন এনজিও কর্মী। ইদানিং তেমন ছুটি পাওয়া যায় না বললেই চলে; সারা বছরের জমানো ছুটিসহ মোট ১৫ দিন বাড়িতে থাকা হবে। এর মধ্যে আবার আসা যাওয়া তো আছেই। গ্রামের বাড়িতে কেউই নেই প্রবালের। বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান সে। এতদিন বাবা আর মা থাকতো বাড়িতে, কাজের লোকও ছিল একজন কিন্তু ৭ মাস আগে বাবা স্বর্গবাসী হওয়ার পর মাকে নিয়ে গিয়েছিল তার সাথে। বাবা চলে যাওয়ার ২ মাস পর মা-ও চলে যায় তার সাথে। এখন বাড়িতে আর কেউই থাকে না। বড়দিনের ছুটিটা কাটানোর জন্য প্রবাল কিছুদিন থাকে। এরপর আবার তালাবন্দী বাড়ি অপেক্ষায় থাকে ইস্টারের। আর এমনিতে কাকাতো ভাই প্রবীর আপাতত বাড়ির বাহ্যিক দিক দেখেশুনে রাখে।

কাঁধে ব্যাগ, হাতে বাজারের থলে নিয়ে গ্রামের একমাত্র চায়ের দোকান পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার সময় তালইয়ের ডাক, "কেডা রে প্রবাল নাকি-রে?"

বলে রাখা ভালো চায়ের এই আড্ডাস্থান তালইয়ের দোকান বলেই পরিচিত। যদিও আজও জানা যায়নি সিধু জেঠার 'তালই' নামকরণের ইতিহাস কী!

- হ্যাঁ তালই, আমিই। কেমন আছো?

- হ রে ছোড়া এহন তোরা কি আর তালইরে চিনস না-কি? সবাই তো গেরাম ছাইড়া গেছস। আছি রে কোনো মতন। তোর কী খবর বার্তা?

- তোমাগো আশীর্বাদে ভালো আছি।

- মাত্র আইতেছস?

- হ্যাঁ তালই।

- থাকবি কতদিন?

- ১৫ দিনের ছুটি পাইছি এইবার।

- এইবার দেখ বিয়াশাদী কইরা ফেল। গেরামে তো থাকবি না, ওইখানে তোরে লগে থাকনের লেইগাও তো একজন লাগবো নাকি!

- আর বিয়া.....!

অপ্রস্তুত হাসি দেখে তালই আর কথা বাড়ালো না।

- অনেক দূরেত্তে আইছস যা, গিয়া কাপড় ছাইড়া আমার লগে দুইটা খানা খাবি আইজ।

- আরে না তালই, আমি খেয়ে নিবো। তোমার আর কষ্ট করতে হবে না। আমি না-হয় চা খেয়ে যাবো একসময় এসে।

ইতস্তত দৃষ্টিতে তালইয়ের দিকে তাকালো প্রবাল। ক্লান্তির চাহনিতে অসহায় লাগছে ওকে। খুব বেশি দেরী করলো না আর।

পুকুরের পাশ কাটিয়ে রাস্তার শেষ প্রান্তে ওর বাড়ি মানে ওর পৈত্রিক নিবাস। বাড়িতে পা দিতেই কেমন জানি বিষাদের গন্ধ ছুঁয়ে গেল। অবসাদের রঙে রাঙানো এমন বাড়িটার একমাত্র ভরসা প্রবাল নিজেই। ঘরের দরজা খোলার শব্দ পেয়ে পাশের বাড়ির কাকাতো ভাই প্রবীর। এই যে বাড়িটা এখনও টিকে আছে প্রবীর আর তার অর্ধাঙ্গিনীর সদয় অনুগ্রহে। মাসে দু-একবার বাড়িটার বাহির দিকটা পরিষ্কার করে রাখার জন্য টাকা পাঠায় প্রবাল যেন কাজের লোক দিয়ে আঙ্গিনা ঠিকঠাক রাখে। আবার মাঝে মধ্যে প্রবীরের স্ত্রী নিজে ঝাঁট দেয় যেদিন সুমতি হয় আর-কি।

- আজকে যে আসবি তা তো বলিসনি একবারও!

- ভাবলাম হুট করে এসে চমকে দিবো...

- বলে এলে বেশ অসুবিধে হতো নাকি? হাত-মুখ ধুঁয়ে খেতে চল। আগে বললে আয়োজন করে রাখতাম, এখন খেয়ে নে রাতেরটা দেখছি।

- না রে রাতের আয়োজনের আর ঝামেলা করতে হবে না। পথে খেয়ে এসেছি আর এখন গির্জায় যাবো। মৃতলোকের পর্ব গেল, আসা হলো না। সেখান থেকে এসে দুই ভাই গল্প করবো। তাছাড়া রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করি না। এসবের দরকার নেই।

- ঠিক আছে ফের্। রাতেরটা দেখা যাবে। ভালোভাবে ঘুরে আয় আগে।

অস্পষ্ট হাসি দিয়ে প্রবাল দরজা খুলে ঘরে ঢোকার সময় মৃত্যু, পরিবার আর ভালোবাসার বদ্ধ গন্ধ পেল, যেন ঘরটা প্রাণ ফিরে পেল বহুদিন পর। আশেপাশের বাড়িগুলোতে বাঁশের আগায় বাঁধা তারা দেখা যাচ্ছে। ছোটবেলায় কী একটা আগ্রহ ছিল তারা ঝোলানোর আর গোশালা ঘর বানানোর। কোথায় গেল সে-সব অনুভূতি, সেই আনন্দ, প্রতিযোগিতা, পর্বের আমেজ! নিজের অজান্তেই চোখের কোণায় পানি চলে আসলো।

ঘরটা ঝাঁট দিয়ে অন্য সব কাজ ফেলে রেখে গির্জায় এসে পৌঁছালো প্রবাল। সামনের দোকান থেকে মোমবাতি, আগরবাতি নিয়ে কবরস্থানের দিকে এগিয়ে গেল। শৈশবে কতো বাবা মায়ের হাত ধরে মোমবাতি নিয়ে মৃতদের আত্মার কল্যাণে প্রার্থনা করতে আসতো। আর আজকে বাবা মাকে কবরে স্মরণ করতে এসেছে।

বাবা মাকে ছাড়া কোথাও একা থাকতে পারতো না। এর জন্যই হয়তো ঈশ্বর পাশাপাশি রেখেছেন দুইজনকে। একই সাথে বাবা-মা শুয়ে আছেন পাশাপাশি। কবরের উপর মোমবাতি সাজাতে সাজাতে হঠাৎ মনে পড়লো মা তো আগরবাতির গন্ধ সহ্য করতে পারতো না। বলতো, 'প্রবাল কেমন জানি মৃত্যুর গন্ধ পাওয়া যায় এসব থেকে!'

কী জানি এখন আর সমস্যা হয় নাকি। এসব ভাবতে ভাবতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো প্রবাল। ঘন্টাখানেক বসে থেকে সন্ধ্যা ঘন্টা পড়ার পর বাড়ি এসে পড়লো।

গোসল সেরে যখন ঘরে এসে বসলো তখন আবার বাবার আর মায়ের কথা মনে করে অনেক মন খারাপ হতে লাগলো। গতবছরও বাবার সাথে বসে বাড়ি নিয়ে গল্প হচ্ছিল। মা গরম গরম চিতই পিঠা নিয়ে আসছেন আর গরুর দুধের চা। বাবার চায়ে চিনি খাওয়া নিষেধ ছিল কিন্তু এই যে-কয়দিন প্রবাল বাড়িতে আছে সেসব নাকি বন্ধ থাকে। এসব নিয়ে তুমুল রাগারাগি চলতো তাদের। বাবাও বলছিলেন বিয়ের কথা। মা হয়তো বুঝতে পেরেছিল যাবার কথা, বারবার বলছিল যে আমরা না থাকলে কে করাবে তোকে বিয়ে? এই তো সেদিনের কথা। আর আজকে বাবা-মা কেউই সাথে নেই, কীভাবে হারিয়ে যায় মানুষ!

মা সবসময় মন খারাপ হলে বা দুঃখ পেলে রোজারিমালা নিয়ে বসে পড়তেন প্রার্থনায়। এমনিতে প্রার্থনা করা হয়না কিন্তু মায়ের কথা মনে পড়তে কেন যেন মনে হচ্ছে মনে শান্তি পাওয়া যাবে। বিছানায় যেদিকটাতে মা মাথা দিয়ে ঘুমাতেন সেদিকে খুঁজে পাওয়া গেল মার রোজারিমালাটা।

রোজারিমালা নিয়ে প্রার্থনা করতে করতে এমন ধ্যানমগ্ন হয়ে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করছিল যেন সেই ছোটবেলার সেই বিশ্বাস আবার ফেরত এসেছে। প্রার্থনা শেষে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে কাঁদতে কাঁদতে সেটা আর খেয়াল নেই।

মাটিতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল প্রবাল, ঘরে একজন সুদর্শন পুরুষ এলো আর আসার সাথে সাথে ঘর আলোকিত হয়ে গেল সাথে সাথে। আলোর তেজ এটতাই ছিল যে প্রবাল ঘুম থেকে উঠে যায়। হঠাৎ উনাকে দেখে ঘাবড়ে

যায় প্রবাল। প্রবালকে আশ্বাস দিয়ে সে এমন একটা ভাষায় তাকে সম্ভাষণ জানালো যেটা তার বোধগম্য হচ্ছিল না। কিন্তু ঐশ্বরিক কৃপায় প্রবাল সেই ভাষা না জানা সত্ত্বেও ঠিক বুঝতে পারছিল।

- 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ভয় পাও কেন? আমার কী আসার কথা ছিল না? আমি যা বলছি তা তুমি বুঝতেই পারছ আবার তুমি যা ভাবছো সেটা বুঝবার ক্ষমতা আমাকে দেওয়াই হয়েছে। সুতরাং আমার সাথে চলো!'

প্রবাল বুঝতে পারলো তার বাকশক্তি নিয়ে নেওয়া হয়েছে। সে শুধু ভাবতে পারছে আর কিছু বলার প্রয়োজন হচ্ছে না।

তিনি প্রবালকে নিয়ে গেল মেঘবাহনে করে সপ্তমেঘের আড়াল করে যেখান থেকে সমস্তই দেখা যায় কিন্তু কোনকিছুই তাদের দেখতে কিংবা স্পর্শ করতে পারবে না। বেশ কিছুক্ষণ পর তাকে অচেতন করে নিয়ে যাওয়া হলো শাশ্বত নগরীতে।

প্রবালের যখন চেতনা এলো তখন সে নিজেকে আবিষ্কার করলো একটা চারণভূমিতে যেটা ছিল এক আকাশের নীচে যেই আকাশ ছিল স্বচ্ছ, প্রশান্ত। সে নিজেকে খুঁজে পেল একপাল মেষের সাথে। সে তার চারপাশটা দেখে নিল। কোনভাবেই চোখ ফেরানো যাচ্ছে না এমন সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল চারপাশ। তারপর সেখানে এলো সেই সুদর্শন পুরুষটি যিনি ছিলেন ঈশ্বরের দূত। সেই দূত কোলে তুলে নিলেন একটা মেষশাবক আর প্রবালকে নিয়ে গেল সামনের বাগানে। বাগানে সাদা রঙের পোশাক পড়া অনেককে দেখতে পেলো সে।

- দেখ তো কাউকে চিনতে পারছো কি-না?

- আমি কীভাবে চিনতে পারবো, সবাইকে একই রকম লাগছে।

প্রবাল ভাবলো মনে মনে।

- পরম পবিত্র পরমেশ্বরের কাছে সবাই সমান; তাই এমনটা লাগছে। ওই যে দেখ তোমার বাবা-মা দেবশিশুর হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

প্রবাল দৌড়ে তাদের কাছে যেতে চাইলো কিন্তু তার পা যেন স্থির হয়ে রয়েছে। কোনভাবেই সে ডাকতে পারলো না তাদের।

- বৃথা চেষ্টা করছো! তারা তাদের ভালেবাসার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। তারা পরম পিতার কৃপা স্নেহে শান্তিতে আছে। সকলের বিচার করা হয় তারা কতটুকু ভালোবাসতে পারে সেটার উপরে। যে ব্যক্তি বিশ্বাসী তার কোন প্রকার রক্ষাকবচের প্রয়োজন হয় না। স্বয়ং ঈশ্বর তার ঢাল হয়ে থাকেন। তোমার বাবা মা তোমাকে পালক সন্তান হিসেবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ভালোবেসে গিয়েছেন এর জন্যই তারা তাদের পুরষ্কার পেয়েছেন। তারা শান্তিতে পরম জীবন লাভ করেছে। আমি কেবল পিতা ঈশ্বরের একজন দূত মাত্র যে সর্বশক্তিমানের আশীর্বাদ পৌঁছে দিতে নিযুক্ত। অতএব তুমি ভেঙ্গে পড়বে না। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখবে। তোমার বিশ্বাসই তোমাকে রক্ষা করবে। তুমি ভয় করবে না কেননা ঈশ্বর তো তোমার সঙ্গেই আছেন। সকলের মধ্যে, সবার সাথে, সব জায়গায় তিনি সঙ্গেই থাকেন। দুঃখ, ভয়, রোগ, শোক, অপরাধ, অসহায়বোধ, অশান্তি, একাকিত্ব যে কোন পরিস্থিতিতে পরমেশ্বর তোমার জন্য সাহায্য প্রেরণ করবেন। এই যে উপহারস্বরূপ কৃপা লাভ করেছ তার জন্য ঈশ্বরের ধন্যবাদ করো। তিনি সবসময় আমাদের সাথেই আছেন। GOD IS WITH YOU! তুমি যেটা দেখেছ কিংবা দেখছ, শুনেছ কিংবা শুনতে পারছো, অনুভব করলে কিংবা অনুভব করছো সে সমস্তই ঈশ্বরের মহিমা, কৃপা, আশীর্বাদ আর উপহারস্বরূপ। এখন তুমি তোমার আগের জায়গায় ফিরে যাবে বিশ্বাস ও ভালোবাসা নিয়ে! তোমার শান্তি হোক!

এবার চোখ খুলে প্রবাল নিজের ঘর দেখতে পেল। আর তখনও মাথায় ঘুরছিল সেই এক কথা GOD IS WITH YOU!

বিদেশে উচ্চশিক্ষা/ভিজিট ও ওয়ার্ক-পারমিট ভিসা

সবাইকে বড়দিনের প্রীতি ও শুভেচ্ছা!

Student Visa: Canada, Australia, USA, UK, Schengen Countries, Japan, South Korea, Malaysia তে Study Visa প্রসেস করছি।

Schooling Visa: Canada, Australia & USA তে আমরা Schooling Visa প্রসেস করছি।

Visit Visa: আমরা অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে Canada, Australia, USA, UK, Japan ও ইউরোপের সেনজেন ভুক্ত দেশ সমূহের ভিজিট ভিসা প্রসেস করছি (No Visa, No Payment চুক্তি ভিত্তিতেও আমরা কাজ করি)।

Work Permit Visa: ইটালি, মাল্টা, পোল্যান্ড, চেক প্রজাতন্ত্র, ক্রোয়েশিয়া, লিথুনিয়াসহ আরো বেশ কয়েকটি সেনজেন ভুক্ত দেশের Work Permit ভিসা প্রসেসিং করা হয়।

আমরা Student Visa ও Visit Visa-র জন্য Financial Sponsorship ও Bank Support-র বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকি।
বি. দ্র.: বর্তমানে স্বপরিবারে Canada-Australia ও USA যাবার সুবর্ণ সুযোগ চলছে।

খ্রিস্টান মালিকানা দ্বারা পরিচালিত আমরাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাদের Foreign Admission & Visa Processing-এ দুই দশকের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে।

Global Village Academy
STUDY ABROAD CONSULTANTS

Head Office:
House-11 (2nd Floor), Road-2/E,
Block-J, Baridhara, Dhaka-1212

+88 01894-767125
+88 01688-944200

globalvillageacademybd
info@globalvillagebd.com

আতিথেয়তায় অতিথি আপন

ভ্যালেন্তিনা অপর্ণা গমেজ

প্রতিদিন মিরান্ডা তার বরের সাথে বিকেলে হাঁটতে বের হয়। প্রবাসের কর্মব্যস্ত জীবন তবুও স্বাস্থ্যের কথা ভেবে নিয়ম করে হাঁটার অভ্যাসটা রেখেছে। ছেলে মেয়েরা বড় হয়েছে তাদের জন্য যতটা করার তা করেছে এখন বাকিটা জীবন নিজেদের খেয়ালে, যত্নে কাটানোর ইচ্ছে। সূর্যটা ডুবে যেতেই হাল্কা ঠাণ্ডা অনুভব হয় তাই মিরিন্ডা তার বরকে বলছে -

হ্যাগো, শুনছো?

তুমি পাতলা সোয়েটারটা পরে আসো বাইরে হালকা বাতাস তোমার ঠান্ডা লাগতে পারে। তাদের প্রতিবেশি যদিও ভিনদেশী কিন্তু মিরান্ডা আর জনির মধ্যে এত হৃদ্যতা দেখে অবাক হয়। আরো বেশি অবাক এদের দীর্ঘ বছরের বিবাহিত জীবনের মধুরতা, কেয়ারিং দেখে। দুঃখের বিষয় এদের প্রতিবেশির প্রথম বিয়েটা টেকেনি আর দ্বিতীয় বিয়ের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই হাজবেন্ড ক্যান্সারে মারা গেছে। মনে মনে সেও ভাবে তার হাজবেন্ড বেঁচে থাকলে বার্ধক্যের শেষ বেলাটা ঠিক এমনটাই হতো যেমনটা মিরান্ডা আর জনির। মিরান্ডা গ্যারেজ এর ভেতর থেকে গার্বেজ বিনটা বাইরে রেখে দিলো প্রতিবেশিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কুশলাদি জিজ্ঞেস করল। ততক্ষণে জনি চুলটা ব্রাশ করতে করতে বেরিয়ে এলো।

মিরান্ডা মুচ্‌কি হেসে বলল, আমি মেয়ে মানুষ হয়ে কত ঝটপট বের হলাম আর তুমি কত সময় নিলে বলতো।

এইতো হল চল এবার। আমার চশমাটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না তাই দেরি হল। তোমার আরেকটা এক্সা চশমা দরকার মাঝে মাঝেই দেখি খুঁজে পাওনা। কিছুদূর হাঁটতেই মিরান্ডা স্থির দাঁড়িয়ে গেল।

কি হলো থামলে কেন?

তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ? কোথায় যেন ঢাক বাজছে।

এখানে ঢাক আসবে কোথা থেকে?

হয়তো মিউজিক বাজছে আজ শনিবার কারো বাড়িতে হয়তো পার্টি করছে। আমিতো ঢাকের আওয়াজই পাচ্ছি না।

হতে পারে পূজো এসেছে, আমাদের এরিয়াতে দু-একটা হিন্দু পরিবার আছে। হতে পারে পূজার অনুষ্ঠান চলছে।

- হ্যা গো চলনা গিয়ে দেখি।

- কি বলো, চেনা নেই জানা নেই।

- আরে আমরা তো প্রতিবেশি, তাছাড়া যখন দেশে ছিলাম তখনতো আমরা হিন্দু পাড়ায় পূজোর সব অনুষ্ঠানে যেতাম। আমাদের এক বৌদি ছিল তার নাম ছিল বিন্দু, বিন্দু শর্মা। বৌদি সব সময় নেমন্তন্ন করতো আমরা দল বেঁধে যেতাম।

বৌদি পায়েস করত, চিড়ের মোয়া, নারিকেলের নাড়ু বানাত। আমরা মজা করে খেতাম তারপর বৌদিকে সাথে করে পুরো পাড়ায় চক্কর দিতাম। কার বাড়ির ঠাকুর কত সুন্দর বানিয়েছে তা নিয়ে চর্চা করতাম। আর সবচেয়ে মজার কি ছিল জান!

সব বাড়িতেই প্রসাদ খেতে দিত। আমরা রুমালে পেচিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসতাম। ঢাকের আওয়াজ বেজেই চলত।

কি যে ভাল লাগত চারপাশে উৎসবের আমেজ, ইস কি দিনই না ছিল।

-তখন তুমি ছোট ছিলে এখন আর নও।

তাই হুট করে যাওয়া যাবে না।

চলনা গো। আমরা তো আর খেতে যাচ্ছি না শুধু দেখবো। জনিকে এমন ভাবে অনুরোধ করল মিরান্ডা যে সে তার কথা আর ফেলতে পারল না।

হাঁটতে হাঁটতে দু'জন সেই বাড়িটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। পুরো ড্রাইভ ওয়ে জুড়ে তাবু টানানো। বেশ লোকজন দেখা যাচ্ছে। দু' একজন মহিলা শাড়ি পড়েছে। একটু কাছে এগিয়ে যেতে চাইছে মিরান্ডা কিন্তু জনি বারবার নিষেধ করছে। তাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একজন শাড়ি পরা মহিলা এগিয়ে জিজ্ঞাসা করলো-

- আপনারা কি কাউকে খুঁজছেন? মিরান্ডা নিঃসংকোচে জবাব দিল ঠিক তা নয়।

আমরা একটু দেখতে এসেছি।

কথাগুলো ইংরেজীতেই বলল। মিরান্ডা জানতে চাইল -

Are you from Bangladesh?

মহিলার জবাব হ্যাঁচ শুনতে মিরান্ডা খুশিতে জনিকে বলল-

দেখলে তো আমাদের দেশের মানুষ।

- ও আচ্ছা আপনিও বাঙালি?

- হ্যাঁ গো মা আমরা এই পাড়াতেই থাকি। ঢাকের শব্দটা শুনে খুব দেখতে ইচ্ছে হলো তাই এলাম।

-আচ্ছা তাই বুঝি খুব ভালো লাগল। আপনারা আসুন আমি মাকে ডাকি।

তারা দু'জন চারিদিকের সুন্দর সাজসজ্জা দেখতে থাকলো। ঘরের ভেতর থেকে মধ্যবয়সী লাল শাড়ি পরা এক মহিলা বেরিয়ে এলো সাথে ওই মেয়েটাও। -নমস্কার আপনারা এসেছেন আমরা খুব খুশি হয়েছি। বাবা প্রদীপ এখানে দু'টো চেয়ার দাও। আপনারা বসুন। চেয়ার এগিয়ে দিতেই মিরান্ডা বসে পড়ল। জনির কিছুটা সংকোচ হল। ফিসফিস করে বলল, কি হল বসলে যে। দশ পনেরো মিনিট বসার পর বাড়ির কর্ত্রী একটা কাঁসার প্লেটে কিছু মিষ্টি, নারকেলের নাড়ু এনে দু'জনের হাতে ওয়ান ইউজ প্লেট ধরিয়ে তাদের যেটা ভালো লাগে নিতে বলল। মিরান্ডার তখন ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল যদিও এখন সেই বয়স নেই খুব মিষ্টি খাওয়া বারণ তবুও তাদের মন রাখতে অল্প কিছু নিল। তাদের আতিথেয়তায় যেন খুব আপন মনে হল। হতে পারে ধর্ম যার যার তবে উৎসব সবার। মনের আদান প্রদানটাই আসল। তাই অচেনা মানুষও কাছের মানুষ হয়ে যায় সহজে॥

জুম ঘরে পূর্ণিমার চাঁদ

গৌরব জি. পাথাং

হ্যাফোং, শহর থেকে একদল লোক এসেছে। তোমাকে তাদের সাথে যেতে হবে। তুমি প্রস্তুত হয়ে থাকো।

স্যার, কেন আমাকেই যেতে হবে? অন্য কেউ গেলে হয় না? একটু বিরক্তি হয়েই বললাম।

হাফোং, তুমি এমন ক'রে বলছ কেন?

কারণ শহর থেকে আসা লোকেরা ট্যুরিস্ট গাইডের কথা শুনতে চায় না। আমাদের কথা, দিক নির্দেশনা মানতে চায় না। খুব বিরক্ত লাগে। পরে তারা বিপদে পড়লে আমাদের জবাবদিহি করতে হয়, শাস্তি পেতে হয়, জরিমানা দিতে। আবার অনেকেই আমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে না। তারা আমাদের অবজ্ঞা করে। পাহাড়ী বলে গালি দেয়, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। পাহাড়ী বলে আমরা কি মানুষ নই?

দেখো হাফোং, এভাবে রাগ করলে কি আমাদের চলবে? কাজ করে খাওয়া এত সহজ নয়। অনেক ধৈর্য লাগে। হাফোং, তুমি যেহেতু বাংলা ও ইংরেজিতে কথা বলতে পারো। তাই আমি তোমাকে তাদের সঙ্গে পাঠাতে চাই।

ঠিক আছে, স্যার। আমি যাব।

মিনিট দশেকের মধ্যেই আমি প্রস্তুত হয়ে গেলাম।

দশ জনের একটি দল ঢাকা শহর থেকে এসেছে। তাদের মধ্যে ছয়জন ছেলে আর চারজন মেয়ে। দেখে মনে হচ্ছে কলেজ ভার্সিটির স্টুডেন্ট। তাদের কাঁধে ব্যাগ, কারো হাতে গিটার, কারো হাতে উকুলেলে, হাত বায়া, বাঁশি, খঞ্জনি। শহরের ইটের দেয়াল ভেঙে পাহাড় দেখবে বলে বান্দরবানের চিম্বুক পাহাড় পেরিয়ে থানচি এসেছে।

নমস্কার। আমি হাফোং ত্রিপুরা। আমিই ট্যুরিস্ট গাইড। আপনাদের সঙ্গে এই কয়েকদিন থাকব।

একজন একটু বিকৃত করে বললেন, হাপুং... হাপুং মানে কি?

বললাম, হাপুং নয় হাফোং। হাফোং মানে পাহাড়। অনেকেই এই নামে ডাকতে পারে না। তাই অনেক বাঙালিই আমাকে হাফিজ, হাফু এরকম নানা নামে ডেকে থাকেন।

আরেকজন বললেন, এসব শুনে, আপনি কিছু বলেন না?

বলে আর কি হবে? শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

আচ্ছা, আমরা যদি আপনাকে গিরিন্দ্র বলে ডাকি...?

বাহ্! চমৎকার নাম! ডাকুন না। এ নামে ডাকতে চান, ডাকুন না। কোন সমস্যা নেই।

না না, এই নামটি বড় হয়ে যায়। একটু কেটে ছোট করে গিরি বলেই ডাকব। তাতে নাম ও অর্থ দু'টোই অপরিবর্তিত থাকবে।

আপনাদের যা ইচ্ছে ডাকুন না, কোন অসুবিধা নেই।

এই নাম নিয়ে রবি ঠাকুর কি লিখেছেন আপনার কি মনে আছে?

হ্যাঁ। তিনি লিখেছেন, "নামের দূরত্ব ঠিক করতে গেলে মেপে দেখতে হয় শব্দটা কানের সদর থেকে মনের অন্দরে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগে।"

হ্যাঁ। ঠিক বলেছেন। আপনার তো বেশ মনে আছে দেখছি।

তাহলে কানের সদর থেকে মনের অন্দরে পৌঁছার মত দ্রুতগামী নামটা কি হবে শুনি?

দ্রুতগামী নামটা হবে গিরি।

আর আপনাকে কি নামে ডাকব, বলুন না?

ঝর্ণা।

তাহলে তো আবার অমিতের মত ক'রে কবিতায় আমাকেও বলতে হয়;

গিরি-পর্বত হতে ঝর্ণা হয়ে
কত পাথরের আঘাত সয়ে
ছুটে চলো নিরবধি
হে সাঙ্গু নদী।

ঝর্ণা এই দলের দলনেতা। তারা বাংলা সাহিত্যের স্টুডেন্ট। আদিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি, প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করার উদ্দেশে এসেছেন। তাদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে খুব ভাল লাগল। তটিনী, মায়া, রিক্তা, বকুল, খলিল, আকবর তারা একে একে পরিচয় দিতে লাগলেন। তাদের ব্যবহারে আমার বিরক্তি ভাব মন থেকে কর্পুরের মত উড়ে গেল।

থানচি বাজারের বিজিবি ক্যাম্পে আনুষ্ঠানিকতা ছেড়ে সাঙ্গু নদীর নৌকায় তাদের নিয়ে উঠে গেলাম। সাঙ্গু নদীর দু'পাশে বড় বড় পাহাড়, বড় পাহাড়ের ভিতর দিয়ে সাঙ্গু সর্পের ন্যায় সাঙ্গু নদী এঁকে বেঁকে ছুটে চলেছে। আমাদের ইঞ্জিনচালিত নৌকাটিও সাঙ্গু নদীর সচ্ছ জলে উজানের দিকে ছুটে চলছে।

কিছুদূর এগিয়ে যেতেই পাহাড়ের গান, নদীর গান সবার কণ্ঠে বেজে উঠল। যুবকেরা গেয়ে উঠলেন,

"আমার মন বসে না শহরে
ইট পাথরের নগরে
তাই তো আইলাম সাগরে।"

থামো, থামো। এটা তো সাগরের গান। ঝর্ণা সবাইকে থামিয়ে দিয়ে গেয়ে উঠলেন,

"পাহাড়ের কান্না দেখে তোমরা তাকে ঝর্ণা বলো
ওই পাহাড়টা বোবা বলেই কিছু বলে না
তোমরা কেন বোঝো না যে
কারো বুকের দুঃখ নিয়ে কাব্য চলে না।"

না না, এ গানও চলবে না। এই গান সেকালের, পুরনো দিনের। আরেকজন ঝর্ণার গান থামিয়ে দিয়ে গাইলেন,

"দূরে ওই পাহাড় মিশেছে নীল আকাশে
দেখে মন আকাশ ছুঁতে চায় ও আহারে
অচেনা কত না পাখি ওড়ে বাতাসে
দেখে মন ভেসে যেতে চায় ও আহারে।"

এই গান শেষ হতে না হতেই আরেকজন গলা বাড়িয়ে গান ধরলেন

"ও পাহাড়িয়া মন, ও বাগানিয়া মন..."

ঝর্ণা সকলকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, এবার আমাদের গান গেয়ে শোনাবেন, গিরি।

সকলেই করতালি দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করলেন। আমি গেয়ে উঠলাম,

"আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ওই
ওই পাহাড়ের ঝর্ণা আমি, ঘরে নাহি রই গো,
উধাও হ'য়ে বই।" সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত আমার গানে হারিয়ে গেলেন।

গান করতে করতে আমরা তিন্দুতে এসে পড়লাম। 'বড় পাথর' দেখার জন্য সবাইকে নামতে অনুরোধ করলাম। অনেকেই অবাক হয়ে 'বড় পাথর' দেখতে লাগলেন, আবার কেউ কেউ ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। রাজা পাথরের উপর ফুল দেখিয়ে বললাম, স্থানীয়দের বিশ্বাস এটি শুধু পাথর নয়, তাদের কাছে এটি রাজা পাথর, দেবতা পাথর। তাই তারা এটিকে পূজা অর্চনা করে থাকে।

তিন্দু থেকে রেমাক্রি আসতে আসতেই সন্ধ্যা নেমে এলো। তবু তাদের মধ্যে কোন ক্লান্তির ভাব দেখিনি। তারা প্রাণচঞ্চল, প্রাণবন্ত, তারুণ্যে ভরপুর। রেমাক্রি রিসোর্টে ব্যাগ রেখে তারা জলপ্রপাত দেখতে নেমে গেলেন। জলপ্রপাতের গর্জন, সচ্ছজল তাদেরকে ক্লান্তি দূর করে দিল।

পাহাড়ে বিদ্যুতের আলো নেই। আছে জোনাকির আলো। রাত্রি নেমে এলেই জোনাকিরা জঙ্গল থেকে বেড়িয়ে আসে। মিট মিট করে চারিদিক ঘুরাফেরা করতে থাকে তারা। মাথার উপর আছে চাঁদের আলো। আর সেই আলোয় নদীর তীরে বসে কেউ কেউ গল্পগুজব করে, কেউ কেউ গান বাজনা করে। আমরাও রির্সোট থেকে বেড়িয়ে নদীর তীরে মাচাং ঘরে বসে গান করতে শুরু করলাম। দলনেতা হিসেবে ঝর্ণা প্রথমেই শুরু করলেন,

"আধো রাতে যদি ঘুম ভেঙে যায়
মনে পড়ে মোরে প্রিয়
চাঁদ হয়ে রবো আকাশের গায়
বাতায়ন খুলে দিও।"

সকালের নাস্তা বিন্নিধানের ভাত তার সাথে এই এলাকার নাপ্পীর ভর্তা, মারফার তরকারী। দেখলাম এই বিন্নিধানের ভাত খেয়েই তারা সবাই আনন্দিত, সবাই পুলকিত। সকালের নাস্তা সেরে ঝিরির পথ দিয়ে নাফাখুম জলপ্রপাতের দিকে যাত্রা শুরু করলাম। দুয়েক ঘন্টা পেরিয়ে নাফাখুম জলপ্রপাত এসে পৌঁছলাম। বাংলার নায়াগ্রা জলপ্রপাত বলে পরিচিত এইখানে এসে তাদের জীবন ধন্য হল। তাদের এই আনন্দ ভাষায় বর্ণণা করা যায় না।

এখানে স্নান সেরে আমিয়াখুম জলপ্রপাতের দিকে যাত্রা শুরু করলাম। পাহাড়, পাথর, ঝর্ণা পেরিয়ে দেবতা পাহাড়ের কাছে চলে এলাম। আমিয়াখুম জলপ্রপাত দেখতে হলে খাড়া পাহাড় বেয়ে নিচে নামতে হবে। এই এ্যাডভেঞ্চার আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সবাই তারুণ্যের শক্তি, উৎসাহ উদ্দীপনার জোরে নিচে নেমে গেল কিন্তু ঝর্ণা একা হয়ে গেল। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, আসেন। আমি আছি।

ঝর্ণা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, হাত ধরেন। আমায় নিয়ে চলেন।

তখনই বুকের মধ্যে গান বেজে উঠল, "তুমি হাতটা শুধু ধরো/আমি হব না আর কারো।"

না, ভুল ভাবছি, আমি ভুল স্বপ্ন দেখছি। এ হতে পারে না। কোন কালেই না।

অনেক কষ্টে পাহাড় বেয়ে এক ঘন্টা পর নিচে নেমে এলেন। এসেই চিৎকার দিয়ে বললেন, আমি সব দেবতারে ছেড়ে আমার প্রাণের কাছে চলে এসেছি।

আমিয়াখুম জলপ্রপাত প্রকৃতির এক অপূর্ব দান। জল গড়িয়ে পড়ায় দৃশ্য দেখে মন হারিয়ে যায়, উদাসী হয়ে যায়। নীরব নিস্তব্ধ চারিদিক। দুই পাশে উঁচু পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। উজানে একটু এগিয়ে গেলেই ভেলাখুম, সাতভাইখুম জলপ্রপাতের দেখা মেলে। এমন জলধারা, পাহাড়, ঝর্ণা আর এমন ছায়াসুনিবিড় প্রকৃতিই সত্যিই আকৃষ্ট করে। তবু রবার্ট ফ্রস্টের মত আমাকেও বলতে হয় "এন্ড মাইলস টু গো বিফর আই স্লিপ।" দূরে যেতে হবে অনেক দূরে, অঙ্গীকার করেছি ভাই;/ দূরে যেতে হবে, সে অনেক দূরে, ঘুমানো যাবে না ভাই।

আমাদের শেষ গন্তব্য এবার দোতং পাহাড়। দোতং পাহাড়ের ত্রিপুরা পাড়াতেই হবে আমাদের রাত্রিযাপন।

দোতং পাড়ার কারবারী এসে আমাদের স্বাগতম জানালেন। শিশু-ছেলে মেয়ে সকলে নেচে গেয়ে আমাদের বরণ করে নিলেন। বাঁশের মগ দিয়ে আমাদের জল পান করতে দিলেন। পাহাড়ী খাবার, মারফা, বিন্নিধানের ভাত, পিঠা, শিমূল ফুল কত কি আয়োজন করলেন তারা। অনেকেই বাংলায় কথা বলতে না পারলেও আন্তরিকতার অভাব ছিল না। মুখের ভাষার চেয়ে মনের ভাষাই প্রকাশ পেয়েছিল তাদের।

আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। আসে পাশের গ্রাম থেকে বৌদ্ধদের ফানুস আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। ঝর্ণার অনুরোধেই ফানুস ওড়ানোর আয়োজন করা হল। জানতে পারলাম তারা কোনদিন ফানুস ওড়াইনি। তাই তাদের আগ্রহের শেষ নেই। পাহাড়ে এসে তাদের এই সুযোগটা হল। ফানুস ওড়ানোর উৎসব শুরু হয়েছে। আগুন জ্বালিয়ে ফানুস ওড়ানোর চেষ্টা চলছে। গ্রামের ছোট-বড় সবাই এসে ভিড় করছে। পর্যটকেরা ক্যামেরা নিয়ে প্রস্তুত। ফানুস ধোয়া দেওয়া শুরু হল। আর দেখতে দেখতে একটা দুইটা ক'রে ফানুস আকাশে উড়তে শুরু করল। করতালিতে গ্রাম মুখরিত হয়ে উঠল।

আমিও ওড়াবো। ঝর্ণা ফানুস ওড়ানোর আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

বললাম, আসেন।

ঝর্ণা আমার কাছে এলেন। ভাবতে লাগলাম, এই রাতটিই আমার জীবনের হাজার রাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রাত। মনে মনে বললাম, সে আরো কাছে আসুক। সব বাধা পেরিয়ে আমার সাথেই থাকুক। আমার সাথে একটা ফানুস ধরে রাখলেন। আর লোকেরা ধোয়া দিতে লাগলেন। দেখতে দেখতে ফানুস ফুলে উঠে দূর আকাশে উড়ে গেল। ঝর্ণার মনে তখন কি আনন্দ!

ফানুস ওড়ানো শেষে জুম ঘরের খোলা বারান্দায় আমাদের বসার ব্যবস্থা করা হল। সেদিন ছিল পূর্ণিমা রাত। চাঁদের আলোয় পাহাড় জেগে উঠেছে। এমন একটি রাত্রির জন্যই অপেক্ষায় ছিলাম আমরা। গ্রামের সবাই এসে জড়ো হল। ত্রিপুরাদের গড়াই নৃত্য, থালা নৃত্য, বোতল নাচসহ তাদের কৃষ্টি সংস্কৃতির নানা নাচে গানে এবং আমাদের নৃত্য-গীতিতে সেদিন 'বড়দিন' হয়ে উঠল। সকলের অনুরোধে ঝর্ণা গেয়ে উঠলেন,

"চল দোতং পাহাড় জুম ঘরে
পূর্ণিমা রাত বর্ষা জুড়ে জীবন জুয়ার আসর বসাবো।
আমি মারফা রেঁধে দেবো পাতে
বিন্নিচালের ভাত সাথে।
দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে তৃপ্তির আলিঙ্গন
পুবের হু হু বাতাস বইলে পরে
পাঁজর ভাঙা গান ধরে
আয়েশ করেই কাটুক এ যৌবন।"

পিনপতন স্তব্ধতা। অন্তরে বাহিরে নীরবতা। বন থেকে শুধু ঝিঁঝিঁ পোকা আর তক্ষকের আওয়াজ ভেসে আসছে। রাত অনেক হল বিশ্রাম নিতে হবে। মনে উৎসাহ আছে বটে কিন্তু রক্ত মাংসের মানুষ বড়ই দুর্বল।

সকাল হল কিন্তু ঝর্ণা ঘুম থেকে উঠেননি।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কী হল?

ভাল লাগছে না। হয়তো পাহাড়ী খাবার আর এই পরিবেশ শরীরে সইছে না।

বিশ্রাম করুন। অনেক হেঁটেছেন। রাত জেগেছেন।

তাকে নিয়ে সকলে চিন্তিত। কিন্তু আমি মনে মনে খুব খুশি। কারণ তাকে আরো একটা দিনের জন্য কাছে পেলাম। তাকে সেবা করার একটা সুযোগ পেলাম। বনৌষধি খেয়ে এবং লোকদের সেবাযত্নে ঝর্ণা কিছুটা নিরাময় হল। সকাল সকাল দোতং পাহাড় ছেড়ে থানচির দিকে রওনা হলাম। ঝর্ণা এখনও অনেক দুর্বল, হাঁটার মত শক্তি নেই গায়ে। গ্রামেও রাখা যাবে না। দুর্গম পথ, ডাক্তার নেই। যদি বেশি কিছু হয়ে যায়। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম যে করেই হোক তাকে থানচি নিয়ে যেতে হবে। হলও তাই। লোকেরা তাকে বহন করে নিয়ে এলেন।

অসুখে ঝর্ণার হাসি-আনন্দ, উচ্ছাস-উল্লাস হারিয়ে গেল। প্রার্থনা করি, ও ভাল হয়ে উঠুক।

ধন্যবাদ। আবার আসবেন।

আপনাকেও ধন্যবাদ। আপনার মত ট্যুরিস্ট গাইড পেয়ে আমরা খুব আনন্দিত। আবার দেখা হবে। ভাল থাকবেন।

ঝর্ণা হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার হাত ধরলেন। যার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। বললেন, ভাল থেকো। মনে রেখো। আবার দেখা হবে, গান হবে, পূর্ণিমা রাতে জুম ঘরে।

ঝর্ণা চলে গেল কিন্তু মনে এখনও গান বাজছে,

"পাহাড়ের কান্না দেখে তোমরা তাকে ঝর্ণা বলো
ওই পাহাড়টা বোবা বলেই কিছু বলে না...।"

ঝর্ণা আসলে কি বলতে চেয়েছিল?

তুমি এসেছিলে তাই

মালা রিবেরু

দীর্ঘ ১৪ বৎসর পরে যখন প্রাক্তন প্রেমিক আকাশের এলাকা তথা নিজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে তার বিশ্ববিদ্যালয় এর লেখাপড়া করেছে যেই জায়গায় আকস্মিক বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ হলো, ৪০ বৎসরের মধ্যবয়স্ক এক নারীর ভিতর তখন একশটা হাতুড়ীর আওয়াজ শুরু হয়ে যায়। আর সাংসারিক কাজ ও রান্না করতে গিয়ে অতিরিক্ত অস্থিরতার জন্য বারবার শুধু ভুল করেই যাচ্ছিলো। বারবার মেঘলার মনে হচ্ছিলো তার এই অস্থিরতা ও বুকের ভিতরেরে শব্দ স্বামী হয়তো শুনতে পাচ্ছে।

এইচ.এস.সি পাশ করার জন্য খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পড়াশুনা করার সুযোগ পেয়েছিলো তখন মেঘলার মনটা খুবই আনন্দিত হয়েছিলো যে নতুন জায়গায় নতুন বন্ধুবান্ধবদের সাথে পরিচয় হবে, স্বাধীনতা পাবে। আবার মন খারাপ হচ্ছিলো এই ভেবে বাবা মা, ভাইবোনদের রেখে নতুন পরিবেশে কতটা মন টিকবে। সময়ের সাথে সাথে পরিবেশের সাথে মানুষ একসময় আস্তে আস্তে মিশে যায়। মেঘলা ও সময়ের সাথে সাথে পরিবেশ ও বন্ধুবান্ধবদের সাথে মিশে ভালোই পড়াশুনা ও দিন কাটা ছিলো।

মার্স্টাসে ফাইনাল বর্ষে এসে মেঘলার জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটলো যা মেঘলার জীবনটা পুরোটায় পাল্টে দিলো। বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই গ্রুপের মধ্যে গণ্ডগোল করে মারামারি চলছে, পরিবেশ খুবই উত্তেজনাপূর্ণ, আর এর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পুলিশ, সাংবাদিক চলে এসেছে। পুলিশকর্মীরা পরিবেশ শান্ত করার চেষ্টা করছে আর সাংবাদিকরা বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে গণ্ডগোলের কারণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছে। মেঘলা দোতলা বারান্দা থেকে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছিলো। হঠাৎ করে কানের কাছে "আপনি খুব সুন্দর" কথাটা শুনে পিছন দিকে ফিরে দেখে সুদর্শন এক যুবক মিটিমিটি হাসছে। ঘটনায় মেঘলা এতবেশি বিস্মিত হয়েছে ও রাগ হয়েছে যে তার মুখ দিয়ে বের হয়ে আসলো "আমি সুন্দর আমি জানি"। এই কথাটা বলে সে আস্তে করে দোতলা থেকে নেমে হোস্টেলে চলে গেলো। আর ঘটনায় অবাক হয়ে ছেলেটি হাঁ হয়ে মেয়েটির যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সোহেল হলো সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডগোলের উপর রিপোর্ট করতে এসে হঠাৎ করে দোতলায় তার চোখ আটকে যায়। প্রথম দেখায় নিস্পাপ চেহারার মেঘলাকে দেখে তার ভালো লেগে যায়। তাই সে দোতালায় চলে আসে। এবং মনের অজান্তে তার মুখ থেকে বাক্যটা বের হয়ে আসে। আর তার প্রতিত্তুরে এই নিস্পাপ চেহারার মেয়ে তাকে টেক্কা দিয়ে কথা বলে চলে যাবে সোহেল ভাবতেও পারছেনা। সে সাংবাদিক মানুষ কাজের খাতিরে অনেক মানুষের সাথে পরিচয় হয়েছে, অনেক মেয়ে মানুষের সাথেও কথা হয়েছে, কিন্তু এত শান্ত স্বভাবের মেয়েটির কথা যেন তার চোখের ঘুম হারাম করে দিচ্ছে। সারাক্ষণ শুধু এই কথাটা কানে প্রতিধ্বনি হচ্ছে "আমি সুন্দর আমি জানি"। মেয়েটি যেন চোখের ঘুম কেড়ে নিলো। সারা-রাত না ঘুমিয়ে সকালেই মোটরসাইকেল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত, যেকোন ভাবেই হোক ঘুম হারামী মেয়েটার সাথে কথা বলতেই হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে একটু দূরেই বিশ্ববিদ্যালয় হেঁটে আসতে প্রায় ১০মিনিট লাগে, আর রিক্সায় আসতে ২/৩ মিনিট সময় লাগে। মেঘলা প্রায়ই সময় চারিপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে হেঁটে আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি এসে দূর থেকে গতকালের সেই সুদর্শন সাংবাদিককে দেখে হাত-পা কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে যায়। কারণ গতকাল যখন ছেলেটা "আপনি খুব সুন্দর" তাকে কথাটা বলেছে তখন সে দুষ্টামি করেই "আমি সুন্দর আমি জানি" প্রতিত্তুর দিয়েছে। তাই বলে এই সকালবেলা, সাংবাদিক মানুষ না জানি আজ আবার কি বলে।

মেঘলা যখন আকাশের কাছাকাছি আসলো তাকিয়ে দেখে যে তারদিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মেঘলা সেই চোখের তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিলো। মনে হচ্ছে একসাথে একশোটা ঢাল উঠছে। বুকের ভিতরটা যেন হাহাকার করে উঠলো। আকাশের দিকে আর তাকাতেই পারছিলোনা। সে দৌড়ে ক্লাশে ঢুকে গেলো। সারা ক্লাশে স্যারের কোন কথাই গেলোনা। ক্লাশ শেষে হোস্টেলে আসার সময় দেখলো সেই ছেলেটি সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। এইবার আর সেইদিকে না তাকিয়ে হনহন করে চলে গেলো। আর হোস্টেলে গিয়ে মনে মনে খুব খুশী হলো যে কালই তো বড়দিনের ছুটিতে বাড়ী যাবো। পনেরো দিনে সেও ছেলেটাকে দেখবেনা আর না দেখলে ভুলে যাবে।

মেঘলা পনেরটা দিন খুবই আনন্দে কাটিয়ে যখন বাড়ী থেকে এসে বাসস্ট্যাণ্ডে নামলো, সামনে তাকিয়ে তো থ বনে গেলো, দেখে যে সেই ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। মেঘলার কাছে গিয়ে বলে, প্লিজ যেওনা, তোমার সাথে আমার

অনেক কথা আছে? তুমি আমাকে না বলে কেন ছুটিতে গেছো? পরেরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে তোমাকে না পেয়ে তন্ন তন্ন করে তোমাকে খুজেঁছি মেঘলা? আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। তোমাকে ছাড়া বাঁচবোনা। আমাকে তুমি ফিরিয়ে দিত্ত না। মেঘলা ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব, কি করবে কিছুই বুঝতে পারছেনা। শুধু হা করে তাকিয়ে থাকে। আর একটু সময় নিয়ে বলে "আপনি কি জানেন আপনি কি বলছেন, আমাদের দুইজনের সর্ম্পকটা কোন দিন মেনে নেওয়ার মতো না। আমি আরেকজনকে ভালোবাসি আর পারিবারিকভাবেই আমাদের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। আমার পরীক্ষা শেষ হলেই বিয়ে হবে। আর সবচেয়ে বড় বাঁধা হলো আমরা দুইজনই আলাদা ধর্মের, আপনার বা আমার পরিবারের কেউ আমাদের সর্ম্পকটা মেনে নিবেনা। আর ঐদিনের কথাটা প্লিজ ভুলে যান, কথাটা আমি মজা করেই বলেছিলাম, এতে যদি আপনি আঘাত পেয়ে থাকেন, আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আকাশ মেঘলার কথা শুনে কিছুক্ষণ কোন কথাই বললোনা, চুপ করে থাকলো। কিছুক্ষণ পরে করুন মুখে শুধু বললো, ঠিক আছে তোমার কথাই ঠিক থাকুক, আমরা কি ভালো বন্ধু হতে পারিনা। তুমিতো কিছুদিন পরে চলে যাবে, মাঝে মাঝে আমার সাথে একটু কথা বলো, দেখা করো, এই অনুরোধটা তো রাখতে পারবে। প্লিজ আমার এই অনুরোধটা না করোনা। এই কয়েকদিন আকাশকে দেখে, কথা বলে মেঘলার আকাশের প্রতি একটু মায়া হয়ে গিয়েছে, তাই বললো "আচ্ছা আমি চেষ্টা করবো বন্ধুত্বটা ধরে রাখতে। এখন আমি আসি।

বন্ধুত্বটা যেন মেঘলার জীবনে কাল হয়ে গেলো। একটু একটু দেখা করা, ফোনে কথা বলা কখন যে গভীর ভালোবাসায় পরিণত হলো তা বুঝা গেলো যখন মেঘলার সাথে অমিতের বিয়ের জন্য সামাজিকভাবে মেঘলার বাড়ীতে বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো হলো। মেঘলার মনে অমিতের জন্য কোন উত্তেজনা নাই। এতদিনের সম্পর্ক অমিতের প্রতি আর্কষণও নাই। সেইদিন অমিতরা মেঘলাদের বাড়ীতে যাবে সেইদিনই সে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষ করে আকাশের কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ী এসেছে। রাতে বিছানায় একটুও ঘুমাতে পারে নাই, শুধু আকাশের মলিন মুখটাই ভেসে আসছে।

পরেরদিন যখন অমিতদের বাড়ীতে গেলো, সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে মেঘলা অমিতের কাছে গিয়ে বললো "অমিত আমাদের বিয়েতো পাকাপাকিই হয়ে গেলো, তুমি আমাকে কিছুদিন সময় দাও, তুমিতো জানো বাবা-মা আমার জন্য কষ্ট করেছে আমার পড়াশুনার জন্য, আমারও দায়িত্ব আছে বাবা-মার জন্য কিছু করতে হবে। অমিত খুবই ভালো ছেলে ছিলো। আচ্ছা আমি অপেক্ষা করবো আর আমার পরিবারকে ও বুঝাবো।

রাতে যখন ফোনে ফোনে আকাশকে খবরটা দেওয়া হলো, খুশিতে সে আটখানা হয়ে গেলো। এরপর ঢাকা এলো শুরু হলো জীবন যুদ্ধে নেমে চাকুরী খোঁজা আর প্রতিটি ধাপেই ছিলো আকাশের অসীম সহযোগিতা। এর মাঝে কখন যে বুদ্ধ প্রেমিক হয়ে গেলো, মেঘলা বুঝতেই পারলোনা। প্রতিটি কাজে যেন আকাশের সহযোগিতা মেঘলার জীবনে হয়ে উঠে। দিন দিন তাদের সর্ম্পকটা গভীর থেকে গভীর হতে থাকে।

এরমধ্যে অমিতের সাথে মেঘলার সর্ম্পকটা কেমন যেন ক্ষীন হয়ে আসছে। আর মেঘলার প্রতি আকাশের সর্ম্পকটা গাঢ় হতে। আকাশের অধিকারের পরিমাণ বাড়তে থাকে বেশি। প্রতিটি কাজের জন্যই মেঘলাকে আকাশের কাছে জবাবদিহিতা করতে হচ্ছে, যা একসময় মেঘলা বিরক্ত হয়ে যায়। মেঘলার মনে হচ্ছিলো আকাশের সাথে সর্ম্পকটা না থাকায় যেন ভালো, কারণ প্রতিটি কাজের জবাবদিহিতা, আকাশ অন্য ধর্মের যা তার পরিবার কখনোই মেনে নিবেনা।

মেঘলার একটা ভালো অভ্যাস হলো প্রতিদিন প্রার্থনা করা আর চাকরিজনিত সমস্যা না থাকলে শনিবার অথবা রোববার গির্জায় যাওয়া। আকাশের সাথে সম্পর্ক শুরু থেকে এই পর্যন্ত একই প্রার্থনা ছিলো যে যিশু আমার জন্য যা কিছু মঙ্গল ভালো তুমি তাই করো। যিশু হয়তো মেঘলার কথা দেরীতে হলেও শুনেছে।

একদিন খুলনা থেকে আকাশ মেঘলার সাথে দেখা করতে আসবে, তাই আকাশের বলা নির্ধারিত স্থানে দাঁড়িয়ে আছে আর সেই সময়ে তার গ্রামের একটা ছেলে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো। মেঘলাকে দেখে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো আর সেইসময় আকাশ চলে আসে। আকাশ দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখে, তারপর সেই ছেলেটা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেঘলার কাছে জোরে গালে থাপ্পড় দেয়। আকাশের হাতে আংটি ছিলো, থাপ্পড় জন্য আংটি দিয়ে গাল কেটে রক্ত পড়তে থাকে। আকাশ মেঘলাকে হাসপাতালে নিয়ে কাটা জায়গায় সেলাই দেওয়া ও অন্যান্য চিকিৎসা করে হোস্টেলে নিয়ে যায়। রাস্তায় অনেকবার সরি বলে, মেঘলা কোন কথারই জবাব দেয়না।

সারারাত মেঘলা অনেক কান্না করে। বাবা-মার অনেক আদরের একমাত্র সন্তান সে, বাবা-মা কোনদিন গায়ে হাত তোলেনা। আর এই সম্পর্কের মধ্যে কোন কারণ ছাড়া যে গায়ে হাত তোলে, তার সাথে বিয়ে তো দূরের কথা কোন কথাই বলা ঠিক না। রাতেই মোবাইলে সুইচ অফ করা ছিলো। সকালে অফিসে চাকরি ইস্তফাপত্র দিয়ে বাড়ীতে গিয়ে বাবা-মাকে অমিতের সাথে বিয়ের তারিখ ঠিক করতে বলে।

অমিতের সাথে বিয়ে করে মেঘলা অনেক ভালো আছে। অমিতরা দুই ভাইবোন। অমিতের একমাত্র বোন সুইটি আমেরিকার নাগরিক হওয়াতে তাই তাদের আমেরিকা যাওয়াটা সহজ হয়ে ছিলো। তাই বিয়ের দুইবৎসর পরে আমেরিকায় চলে যায়। অমিতের সাথে বিয়ের আগে আকাশ অনেকভাবে দেখা করতে চেয়েছিলো। মেঘলার আকাশের সাথে দেখা করা বা কথা বলার কোন মানসিকতাই ছিলোনা।

বৃদ্ধ বাবা-মাকে একবারে আমেরিকা নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছে। মেঘলা তাই দুই সন্তান এলিজা ও কলিন্সকে নিয়ে এসেছে। আবার কবে দেশে আসা হয়। ছেলে-মেয়েদেরকে দেশের কথা তার স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক গল্পই করা হয়েছে। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গল্প, প্রতিটি গল্পই শুরু হতো আনন্দমনে আরশেষ হতো অব্যক্ত এক কষ্টের মধ্যদিয়ে।

দেশে আসার পরে স্বামী, ছেলেমেয়ের চাওয়া চল তোমার সেই স্মৃতি বিজড়িত জায়গায় যাওয়া। সারারাতই ভাবনা আকাশকে ফোন করবে কিনা, সকালে ট্রেন ১০টায় খুলনায় পৌছনো কথা। ভোরেই অমিত বললো এতবৎসর খুলনায় ছিলে, তোমার পুরোনা কোন বন্ধু থাকলে ফোন করো, তাহলে আমাদের ঘুরতে ভালো লাগবে। অমিতের কথা শুনে বুকের শব্দটা আরো বেড়ে গেলো। অনেক কষ্টে আকাশের নাম্বারটা মনে করে ফোন দিতেই ওপাশ থেকে সেই চিরচেনা কণ্ঠস্বর "কে বলছেন প্লিজ? " আমি মেঘলা, আমরা খুলনার খুব কাছাকাছি, আজ সারাদিন থাকবো, আপনি কি আজ আমাদের সময় দিবেন?

ফোন করার পরে ১০মিনিট পরপর শুধু আকাশের কল আর এখন কোথায়? অবশেষে যখন স্বপ্নের জায়গায় স্বপ্নের মানুষের দেখা হলো। রেলস্টেশনে সানগ্লাস পরিহিত সেই ১৪ বৎসরের আগের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সবচেয়ে ভালোবাসার, সবচাইতে ঘৃনার মানুষটা, কোন কিছুই পরিবর্তন নেই, আছে শুধু গাড়ীতে আগে অপেক্ষায় থাকতো মোটরসাইকেল নিয়ে আর এখন প্রাইভেটকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে॥

অনিচ্ছুক

ব্রাদার অয়ন ম্যাথেডিওস গমেজ সিএসসি

নভেম্বরের শুরু, মৃদু শীত পড়তে আরম্ভ করেছে। মা তো আর এখন কাছে নেই। তাই ইট-পাথরের এ নিষ্ঠুর শহরে মায়ের কাপড়ে মায়ের হাতে সেলাই করা কাঁথা গায়ে দিয়েই আমি মায়ের স্নেহের স্পর্শ অনুভব করি। কিন্তু এই অনুভূতিটা অনুভব করার মত সময় আমার জীবনে এখন আর তেমন নেই। কারণ আমি এমন এক চাকরি করি যেখানে ছুটি হয় মাঝরাতে। রাতের সাড়ে বারটা বা একটা বেজে যায় অফিস থেকে বের হতে। যখন রাস্তায় নামি তখন আশেপাশে তাকালে মনে হয় পৃথিবীটা কী আসলেই এমন? কোথাও কেউ নেই- এমন অনুভূতির পাশাপাশি মনে হয় এমন কোন এক ভিন্ন গ্রহ থেকে আমি এসেছি যেখানের সঙ্গে এই বাস্তবতার কোন মিল নেই। এতক্ষণ বিশ্বে কি ঘটে গেছে কিছুই জানি না। এতরাত হয়ে গেছে আজ তারপরেও ঘরে ফিরার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা যেন মনে নেই। ফুটপাত দিয়ে হাঁটছি মনে ভয় আছে কিন্তু নিজের সাথে কথা বলতে বলতে একাই পথ চলছি। অনেক সময় পর মনে হল অফিস থেকে বের হয়ে বেশ অনেকটা পথ চলে এসেছি তো। দেখে তো নিজেই অবাক হয়ে গেলাম।

হঠাৎ এক ছেলের কথা মনে পড়ে গেল। আমার হাঁটা পথেই দেখেছিলাম, রাস্তার পাশে বসে ছিল। কেমন যেন ছেলেটির তাকিয়ে থ াকা। ছেলেটার কোন বিপদ হয় নি তো? না এটা কোন চক্র? কী যে এক মন আমার, কখন যে কী মনে পড়ে। কী যেন কী ভেবে আমি আবার সেই ছেলেটির কাছে ফিরে গেলাম। ভালভাবে তাকিয়ে দেখলাম চারিদিকে কেউ নেই। ছেলেটিকে বললাম, এই নির্জন এক রাস্তায় এত রাতে কেন একা বসে আছ?

ছেলেটি নির্বাক, কিন্তু আমার মুখটার দিকে তাকিয়ে আছে। কেমন যেন এক নিস্পাপ তার সেই তাকিয়ে থাকা। ঘরে ফিরার তো ইচ্ছা আজ আর নেই। তাই ছেলেটির পাশে সেই বেঞ্চেই বসে পরলাম। এইবার ছেলেটি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল," আমার পাশে বসলেন যে? কেউ তো থাকে না আমার পাশে, সবাই চলে যায়। সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনাও মনে হয় আমার সাথে এমনই, আমাকে সবসময় একাই থাকতে হবে।"

কেন, কেন, কেন? কী হয়েছে তোমার?

শুনবেন? কেন আমি বলছি এই কথা। তাহলে শুনুন, আমার বাড়ি চট্টগ্রামে, সীতাকুণ্ডে খৈয়াছড়া ঝর্ণার নাম শুনেছেন মনে হয়। আমার বাড়ি তার কাছেই। বুঝতেই পারছেন কেমন প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাড়ি। আমি আমার পরিবারের একমাত্র সন্তান। আমার বাবা মারা যান যখন আমার বয়স মাত্র ৬ বছর। গ্রামের একটি স্কুলে আমার শিক্ষাজীবন শুরু হয়। মা আমার বহু কষ্টে সংসার চালানোর পাশাপাশি আমার পড়ালেখার টাকার ব্যবস্থা করতেন। সারাদিনের হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির পরও মা আমাকে যত্নে রেখেছেন। কখনও অভাব বুঝতে দেননি, পড়াশুনার কোন জিনিসের কমতি রাখেন নি। আমার মায়ের একটাই ইচ্ছা তার ছেলে অনেক দূর পড়াশুনা করে শিক্ষিত এবং ভাল মানুষ হবে। সেই ভাল মানুষ হয়ে ওঠা আমার আজীবনের সাধনা। মায়ের স্বপ্ন আমাকেই পূরণ করতে হবে, তাই আমিও পড়াশুনার প্রতি মনোযোগী ছিলাম। মা সারাদিন মানুষের বাড়িতে না হয় বাগানে কাজ করতেন তারপর নিজের বাড়ির কাজ করতেন তাই আমি তাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করতাম কিন্তু মা আমাকে কোন কাজ করতে দিতেন না। আমি ক্লাস সেভেনে উঠে ভাবলাম নিজের পড়াশুনার খরচ চালানোর জন্য টিউশনি শুরু করি। দু-একটা টিউশনি শুরু করে দিলাম। দিন যায় মাস যায় বছর যায় আমিও আমার এস.এস.সি পরীক্ষা দিলাম। এই দিন গুলোতে বিভিন্ন প্রয়োজনে বাবার রেখে যাওয়া ভিটে জমিও বন্ধক রাখা হয়ে গেছে। আমার পড়াশুনা খরচ চালাতে গিয়ে মা যখন অনেক হিমশিম খেয়েছেন বাধ্য হয়ে এই জমি বন্ধক রেখেছেন। মা আমার ভেবে রেখেছেন তার ছেলে পড়াশুনা করে চাকরি করবে সব জমি আবার ফিড়িয়ে আনবে। আমিও ভেবে রেখেছি এমনই হয়তো হবে। কিন্তু এস.এস.সি-র পর বিভিন্ন জায়গায় চাকরির সন্ধান শুরু করি কিন্তু কোথাও চাকরি পেলাম না। মা আমাকে বললেন, বাবা তোমাকে আরও পড়াশুনা করতে হবে, যেন এই মানুষগুলো এসে তোমাকে চাকরির জন্য অনুরোধ করে। মা আমাকে বলে দেন তোমাকে ঢাকা যেতে হবে বড় কলেজে পড়তে হবে তোমাকে। আমি মাকে বললাম, সে অনেক টাকার ব্যাপার। মা আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন সেই চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। আমি প্রস্তুতি নেই ঢাকায় কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য। ভাল কলেজে চান্স পেয়ে গেলাম, বাড়ি ছেড়ে চলে আসলাম ঢাকা কিন্তু থাকব কোথায় জানিনা। আসার সময় মা আমার হাতে পাঁচশত টাকা দেন। মায়ের হাতে দেখলাম তার হাতের সেই যে একটি বালা ছিল সেইটা আর নেই। বুঝতে বাকি রইলো না যে তা বিক্রি করে দিয়েছেন। ঢাকায় এসে প্রথম রাত ট্রেন-স্টেশনেই রাত কাটিয়ে দেই। অচেনা এক শহর, সব অপরিচিত লোকের ভিড়ে আমি হাঁটতে শুরু করি। সারাদিন খোঁজার পর আমার কলেজ খুঁজে পেলাম। আগামীকাল থেকেই আমার ক্লাস শুরু। চোখ পড়লো আমার মত আর একজন দাঁড়িয়ে আছে কলেজের মেইন গেইটের কাছে। কিন্তু দারোয়ান তাকে ঢুকতে দিচ্ছে না, ঢুকতে দেওয়ারও কথা না। এতো রাতে তো আর কলেজে যে কাউকে ঢুকতে দেওয়া যায় না। আমি এগিয়ে যাই তার কাছে। সে আমাকে খেয়াল করেছে আমি তার কাছে এগিয়ে আসছি। আমি তার দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম, "আমি রাহুল"। সে বললো, "আমি ভিবেক"। হাত মিলালো আমার সাথে। সাথে সাথে বললো, "ভাই, পিতৃহীন দরিদ্র পরিবারের সন্তানরাই জানে বাস্তবতা কতো কঠিন"। আমিও তার কথায় সম্মতি দিলাম। দুজনই এই শহরে নতুন, কিছুই চিনি না। শুরু হয় দু'জনের স্বপ্নপূরণের পথচলা। সেই রাতেই আমরা একটি বাসার খোজ শুরু করি। কিন্তু আমরা দু'জনই তো পিতৃহীন দরিদ্র পরিবারের ছেলে আমাদের স্বপ্ন কী এতো সহজেই পূরণ হবে? স্বপ্ন পূরণ করা অনেক কষ্টের ব্যাপার এই শহরে। বাসা-মেস কিছুই না পেয়ে একটা পার্কের বেঞ্চেই আমরা রাত কাটিয়ে দেই। শুরু হয়ে যায় দু'জনের লড়াই। সকালে কলেজের গেইটে সব ব্যাগ রেখে প্রথম দিনের ক্লাস শুরু করি। আশ্চর্যের বিষয় আমরা দু'জনেই একই ক্লাসে, তাই আমরা একসাথেই বসে ক্লাস শুরু করি। প্রথম দিন তাই তেমন একটা ক্লাস হলো না। বাইরে বের হয়েই দেখি কারো বাবা, কারো মা, কারো বাবা-মা উভয়ই গাড়ি নিয়ে গেইটের কাছে দাঁড়িয়ে তাদের অতি আদরের সন্তানকে নিয়ে যেতে। আর আমরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে একটা কষ্টের হাসি দিলাম। দু'জনের পারিবারিক পরিস্থিতি যেমন এক তেমনি স্বপ্নও এক। কপালের কি মিল যে একসাথেই শুরু করলাম এই স্বপ্ন পূরণের লড়াই।

কলেজ থেকে বের হয়ে আবার দুজনে চলে গেলাম মেস খোঁজার জন্য যত অল্পখরচে সম্ভব। অনেক খোঁজাখুজির পর বহু কষ্টে পেয়ে গেলাম। বাড়ি থেকে যা টাকা নিয়ে ঢাকা এসেছিলাম তার অনেকটাই প্রায় শেষ। দু'জনেই বের হলাম পার্ট-টাইম চাকরির জন্য। খুব অল্প হলেও একটা হোটেলে কাজ পাই, দিনে একবেলা খাবারও দিবে। পড়াশুনার চাপ বাড়তে থাকে। পাশাপাশি পড়াশুনার খরচ বই কেনা আরও অনুষাঙ্গিক খরচ। যেই চাকরি ছিল ঐটা দিয়ে আর খরচ চালানো সম্ভব হচ্ছে

না। তাই কাজ নিলাম একটি গ্যারেজে, সকালে কাঁচাবাজারে কুলির কাজ শুরু করি। কিন্তু সব খরচ চালিয়ে তিন বেলা খাবারের ব্যবস্থা করা কোন ভাবেই সম্ভব হচ্ছিল না। তাই দিনে দু'বেলা খেয়ে একবেলা না খেয়ে থাকতাম। দুপুরে কোন রকম চা খেয়ে পার করে দিতাম। কিন্তু ভিবেক পড়াশুনার প্রতি বেশি উৎসাহি ছিল, অনেক বই কিনত আর পড়ত। সে বেশিরভাগ দিনই একবেলা খেয়ে থাকত, ঐটাকা জমিয়ে বই কিনত। অনেক বলতাম আমার সাথে ভাগ করে খাওয়ার জন্য কিন্তু খেত না। একটি বছর এমন করেই ঢাকায় কাটিয়ে দিলাম। টাকার স্বল্পতার জন্য বাড়ি যাওয়া হচ্ছে না। বাড়ি গেলে চাকরি হারানোর ভয়ও আছে। এতদিনে বুঝার বাকি ছিল না যে, পড়াশুনার জন্য একবার বাড়ি ছাড়লে আর কখনো বাড়ি ফিরে যাওয়া হবে না। তাই মাকে এক বছর পরে একটা ফোন করতে চেষ্টা করলাম। মায়ের তো নিজের ফোন নেই। গ্রামের মহাজনকে ফোন দিয়ে বললাম, মায়ের সাথে একটু কথা বলব। আমি আমার গ্রামের প্রথম কেউ যে কিনা ঢাকায় পড়তে এসেছি তাই সে মহাজন বললো এখন তো পারবো না তুমি আগামীকাল আবার একই সময়ে কল দিও এই বলে ফোন কেটে দেয়। সময় স্বল্পতা আর কাজের চাপে আমি পরের দিন ঐ দোকানে যেতে ভুলে যাই। হয়ত ফোন এসেছিল কিন্তু আমি যেতে পারিনি। এরই মধ্যে না খেয়ে থাকতে থাকতে ভিবেক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পরে। ডাক্তার কিছু ঔষধ দিয়ে বলেন যেন ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করে। এইভাবেই দিন চলছিল ভিবেক নিজের কোন যত্ন না নিয়ে পড়াশুনার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকে। শুরু হয় টেষ্ট পরীক্ষা। পরীক্ষার চলছিল হঠাৎ দেখলাম ভিবেক পরীক্ষার হলের মধ্যে কেমন যেন করছিল। আমার কেমন যেন ভয় হচ্ছিল। কারণ সারারাত জেগে পড়াশুনা করেছে আবার সকালে না খেয়ে পরীক্ষা দিতে এসেছে। আমি নিজের পরীক্ষা রেখে তার কাছে গেলাম। কিন্তু শিক্ষক আমাকে ভিবেকের কাছে যেতে দিল না। স্কুলের কয়েকজনের সহযোগীতায় তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলো। পরীক্ষা শেষে আমি সোজা হাসপাতালে গেলাম। এক মধ্য বয়স্কা মহিলা বসে আছে ভিবেকের রুমের বাইরে। বুঝার বাকি রইলো না উনি ভিবেকের মা। অশ্রুসিক্ত তার চোখ দুটি। ভিবেকের কথা জিজ্ঞেস করতেই কান্না বিজরিত কণ্ঠে তিনি বললেন, "ভিবেক আর নেই বাবা! আলসারের আরও কী যেন রোগের কারণে নাকি শরীরের ভিতরের সব কিছু নষ্ট হয়ে গেছে।" আমার পৃথিবীটা কেমন করে যেন থেমে গেল হঠাৎ করে। যে ছেলে নিজের স্বপ্ন পূরণের জন্য ঢাকায় এসেছিল সে আজ হাসপাতালের বেডে মৃত অবস্থায় শুয়ে আছে। নিজের স্বপ্ন বুনতে গিয়ে আজ আসার এক দেহ হয়ে গেল। তার বিধবা মা তাকে নিয়ে চলে গেল তাদের গ্রামের বাড়ি। পরের দিন আমার পরীক্ষা ইচ্ছে থাকা সত্বেও আমি যেতে পারলাম না আমার এক বছরের বন্ধুর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে। ভিবেককে হারানোর পর নিজেকে অনেক অসহায় মনে হতে লাগলো। যেই স্বপ্ন নিয়ে আমরা পথ চলা শুরু করেছিলাম আমার সেই সঙ্গী আজ আমাকে একা রেখে চলে গেছে। সব স্বাভাবিক চলছিল কিন্তু আমি ভিবেক-এর স্মৃতি কোন মতেই ভুলতে পারছিলাম না। হঠাৎ মনে পড়ল আমি আমার স্বপ্ন থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছি মনে হয়। আবার মনে পড়ল মায়ের সাথে একটু কথা বলি। দোকান থেকে আবার ফোন করি কিন্তু এই বার অনেক ফোন করার পরেও মহাজন ফোন ধরেনি। ভাবলাম হয়ত ব্যস্ত আছে। আমার এইচ.এস.সি পরীক্ষা চলে আসলো। আমার মায়ের এতদিনের এত শ্রমের অর্থ ব্যয়ের পর সেই সময় আসলো যখন আমি মায়ের স্বপ্ন পূরণের জন্য হলেও নিজের সর্বস্ব দিয়ে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছি যেন ভাল পরীক্ষা লিখতে পারি। যেন ভাল রেজাল্ট করে মায়ের বন্ধক রাখা সেই জমি, হাতের বালা ছাড়ানোর মতো চাকরি পেতে পারি। কেননা সমাজ তো কার কতটুকু জ্ঞান আছে তার ভিত্তিতে না বরং ডিগ্রি দিয়েই বিচার করে। এই ডিগ্রি দিয়েই সমাজে কারো স্থান নির্ধারণ করে দেয়। যেই হলে আমার সিট পরে আমার পাশের সিটে যে বসে সে হচ্ছে সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ছেলে। স্কুলের শিক্ষকরা এসে বলে গেলেন যেন আমার খাতা লেখার পর যেন তাকে সব দেখাই না হয় আমার পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়া হবে। স্বপ্নের এত কাছে এসেও এই ভাবে তো আর হাল ছেড়ে দেওয়া যায় না। আমি ঐ ছেলেটিকে যথাসাধ্য সাহায্য করি, কিন্তু ছেলেটির বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা বোধ নেই যে একটু ধন্যবাদ দিবে। সব পরীক্ষা শেষ হল, ভাবলাম এতো দিন ঢাকা থেকেছি খালি হাতে কীভাবে বাড়ি ফিরবো। তাই আরও বিভিন্ন কাজ করে যতটুকু টাকা উপার্জন করা যায় চেষ্টা করলাম। জীবনে প্রথমবার ঢাকা থেকে বাড়ি যাব। মায়ের জন্য একটা সুন্দর শাড়ি কিনলাম। প্রায় দু'মাস এভাবে কাজ করে কিছু টাকা আসলো হাতে। এইবার আমি বাড়ি ফেরার জন্য উঠে পরলাম রাতের ট্রেনে। সকালে বাড়ির কাছাকাছি যখন প্রায় পৌঁছে গেছি খেয়াল করলাম পরিচিত মানুষজন কেমন করে যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ভাবলাম অনেক দিন পর এসেছি তাই হয়তো। বাড়ির কাছে এসে মনে হল চারিদিকে কেমন যেন একটা পরিবেশ। দেখলাম অনেক মানুষের ভীড় আমাদের বাড়িতে। ভীড় ঠেলে গিয়ে যা দেখলাম তা দেখে মনে হল পুরো পৃথিবী আমার মাথার ওপর ভেঙ্গে পরে গেল। সাদা কাপড়ে মোড়ানো আছে আমার মা একটি শবাদারে। সবাই মায়ের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমি নির্বাক হয়ে মাটিতে বসে পড়লাম। যার স্বপ্নপূরণ করতে আমার এতো চেষ্টা আজ সেই স্বপ্নদ্রষ্টা আর আমার সামনে আজ সাদা কাপড়ে মোড়ানো, আমি কিছুতে যেন মানতে পারছিলাম না। গ্রামের মানুষ স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অনেকে বললো, তোমার অসুস্থ মা শেষ দিনগুলোতে তার প্রাণ প্রিয় ছেলেকে একটি দেখার জন্য অনেক আকুতি-মিনতি করেছে আমাদের কাছে। যেই নম্বর থেকে তুমি ফোন করেছিলে অনেক বার সেখানে কল করে এই কথা বলা হয়েছে। কিন্তু দোকানি বলেছে রাহুল নামে সে কাউকে চিনে না। গতকাল রাতে তোমার মা ইহলোক ত্যাগ করেছে আর আজ তুমি বাড়ি ফিরে এসেছ। তোমার মায়ের অনেক ইচ্ছে ছিল তার ছেলেকে একটিবার দেখবে। গ্রামের সকলকে গর্বের সাথে বলত আমার ছেলে ঢাকায় পড়াশুনা করে।

মনকে আমি কিছুতেই বুঝাতে পারলাম না আমার প্রাণ প্রিয় মা আমার পাশে আর নেই, কোন দিন আর মা বলে কাউকে ডাকতে পারব না। ঢাকায় এক বন্ধু ছিল তাকেও কিছুদিন হয় হারিয়েছি। আর আজ মাও আমার পাশে নেই। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আর কোন আশা আমার রইল না।

মায়ের শেষকৃত্তি অনুষ্ঠান শেষ করলাম। শুনলাম মা নাকি ভিটে বাড়ি বন্ধক থেকে ছুটিয়ে রেখেছেন। মহাজন মায়ের হাতের বালা দু'টি আমার হাতে দিয়ে বললেন, তোমার মায়ের শেষ স্মৃতিটুকু রাখ তোমার কাছে। ব্যাগ থেকে মায়ের জন্য কেনা সেই শাড়ি বের করলাম। হাতে নিয়ে ভাবলাম যার জন্য এটা কেনা হয়েছে সেই আজ পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে গেছে। এটার জন্য টাকা যোগাড় না করে যদি আর কিছুদিন আগে আসতাম হয়তো মাকে জীবিত এক পলক দেখতে পারতাম। আনুষাঙ্গিক কার্য সম্পাদন করে আবার আমি ঢাকায় চলে আসলাম। পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে একবারে বাড়ি চলে যাব। পরীক্ষার রেজাল্ট দেখতে কলেজে গেলাম। দেখলাম আমার পাশের ছেলেটি এ-প্লাস পেয়েছে সে খুশিতে আত্মহারা হয়ে আছে। আমি আমার রেজাল্ট দেখলাম, মুহূর্তের মধ্যে অনুভব করলাম পায়ের তলার মাটি যেন সরে গেছে। আমি অকৃতকার্য!

ঠিক এই সময় হঠাৎ এলার্মের শব্দ হল, এলার্ম বন্ধ করলাম। আমার ঘুম ভেঙে গেল। মানতে কষ্ট হলেও বুঝতে পারছিলাম এতক্ষণ আমি স্বপ্ন দেখছিলাম। রাহুলের কঠিন বাস্তবতার কথা শুনছিলাম। কিন্তু কে এই রাহুল ? সত্যি বলছি, আমি রাহুল নামে কাউকে চিনি না॥

পথহারা প্রবাসী

সামুয়েল মানিক রোজারিও

ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বহির্গমনের উদ্দেশে চেক-ইন সেরে নিজের ডিপার্চার কার্ড (বহির্গমন কার্ড) পূরণ সহ গুটিকয়েক প্রবাসী ভাইয়ের মানবিক অনুরোধ রক্ষা করেই ইমিগ্রেশন লাউঞ্জে ঢুকে দেখি, অনেকগুলো দীর্ঘ লাইন সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। তাই একেবারে কাছের লাইনটির পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। পারিপার্শ্বিক চিত্র দেখে মনে হল, যাত্রীদের অধিকাংশই ছাপোষা প্রবাসী চাকুরিজীবি এবং এদের মধ্যে অনেকেই যে জীবনে প্রথমবারেরমত বিদেশ যাচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অজ্ঞাত কোন কারণে অপেক্ষারত এমন যাত্রীদের চেহারায় উৎকণ্ঠা আর ভীতসন্ত্রস্তভাবটা যেমন স্পষ্ট তেমনি অন্য প্রান্তে হটসীটে বসা ইমিগ্রেশন অফিসারগণও বেশ তটস্থ এবং বিরক্ত। যদিও পত্রিকায় দেখেছি এয়ারপোর্ট বা কাষ্টমসে পোষ্টিং এর জন্য কত তদবির আর তেল নিয়ে ছুটতে হয় উনাদের। কিন্তু এখানে অফিসারদের ভাবখানা দেখে মনে হচ্ছে, গরু-ছাগল যাচাইয়ের দায়িত্ব দিয়ে সরকার তাদের এ পদে বসিয়েছেন। কর্তব্যরত অফিসারদের এহেন হম্বিতম্বি আর আচরণ দেখে আমার আগে দাঁড়ানো যাত্রী ভাইদের মানসিক অবস্থা বেশ বেগতিক। তাদের একজন পকেটে করে মামের বোতল নিয়ে এসেছে, ভয়ে আর আতঙ্কে ক্রমাগত চুক চুক করে পানি পান করেই যাচ্ছে। বুক পকেটে থাকা মুঠোফোনটিও তার বার বার বাগড়া দিচ্ছে, হয়তবা এয়ারপোর্টের বাইরে কোন নিকট আত্মীয় না জানি কী উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছে। মনোবিদরা বলেন, মানুষ যখন অতিরিক্ত স্নায়ুবিক চাপে ভোগে তখন অনেক কিছুই মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে, এছাড়াও ভুলে যাওয়া, ঘন ঘন তেষ্টা পাওয়া এবং মনসংযোগে বিঘ্ন ঘটা ইত্যাদি অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়।

বিদেশী পাসপোর্টধারীদের লাইন ব্যতিত প্রত্যেকটি লাইন যেন স্থবির দাঁড়িয়ে আছে। এই স্থবিরতার অন্যতম কারণ, অফিসার তার কম্পিউটারের সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়ানো যাত্রীর পাসপোর্ট চুলচেরা পরীক্ষা করে কী কী যেন জিজ্ঞাসা করে ভড়কে দিচ্ছেন গোবেচারা যাত্রীকে, আবার উত্তর মনপুত না হলে ধমকও দিচ্ছেন। এমনকি একটু পর পর যাত্রীর কাগজ পত্র নিয়ে উঠে যাচ্ছে হয়তবা সাহায্যের জন্য সিনিয়র অফিসারদের পরামর্শ নিচ্ছেন।

আমার সামনে দাঁড়ানো লোকটি পিছন ফিরে আমাকে উদ্দেশ্য করে মিন মিন করে কি যেন একটা জানতে চাইলেন, কিছুটা অন্যমনস্ক ছিলাম বিধায় উনার কথা বুঝতে না পেরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিছু বললেন ভাই? উনি এক ঢোক পানি খেতে খেতে আমার কাছে জানতে চাইলেন, আমি কি উনাদের সাথে একই বিমানে যাচ্ছি কী না? এবং আমি বেড়াতে যাচ্ছি কী না? বেশভুষণে লোকটিকে দরিদ্র ঘরের সন্তান বলেই মনে হচ্ছিল, আর বয়সটা পঁচিশের কোঠায় হবে হয়তো। আমি তার প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বলার পর পরেই উনার হাতে থাকা পানির বোতলটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নেন ভাই একটু গলাটা ভিজিয়ে নেন, ভেতর থেকেই কিনছি দাম ডাবল। পানির বোতলটি যখন আমার দিকে এগিয়ে দিলেন, আমিতো অবাক! ওরে সখি, ভালোবাসা কারে কয়! টুরু লাভের যুগের ভালোবাসায়, এখনো কি এমনটি হয়? ভাইটি পরম মমতায় নিজের হাত চিরে ইংরেজি হরফের দুজনের নামের প্রথম দুটি অক্ষর লিখে তার মাঝে সযত্নে প্লাস চিহ্ন দিয়েছেন। এখনো রক্তের দাগ ভালো করে শুকায়নি। আমি না দেখার ভান করে সবিনয়ে পানি খাব না বলে, সৌজন্য বসত এই ভাইটির নাম জানতে চাইলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম ভাই আপনি কি কোন কারণে ভয় পাচ্ছেন? ভাইটি তাড়াহুড়ো করে পানির বোতলের ছিপি লাগিয়ে বোতলটি প্যান্টের পকেটে রেখে দেওয়ার পর, ক্ষোভের সাথে আমাকে জানালেন তার স্মার্টকার্ডটি কর্তৃপক্ষের অবহেলায় যথাসময়ে হাতে না পাওয়াতে আজ কার্ড ছাড়াই তাকে আসতে হয়েছে। (স্মার্টকার্ড বলতে উনি বোঝাতে চেয়েছেন, বাংলাদেশের সরকারের জনশক্তি রপ্তানীবুরো প্রদত্ত এ কার্ডটিতে একজন প্রবাসী শ্রমিকের প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য সংরক্ষিত থাকে যাহা একটি ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স কার্ড বা বিএম ইটি স্মার্ট কার্ড নামে পরিচিত) বুঝতে আর অসুবিধা হলো না এই প্রবাসী ভাইটির শঙ্কার মূল কারণ এবং তার পরিণতি। তবুও আমি তাকে অভয় দিয়ে বললাম, ভয়ের কিছু নেই, মনে হচ্ছে আপনার মত অনেকেই এ অবস্থার সম্মুখীন এবং সমাধান নিশ্চই রয়েছে। একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আসলে কী আর বলব ভাই অনেক কষ্ট করে জীবনে প্রথম বিদেশ যাচ্ছিতো তাই এতদূরে এসে যদি কোন অঘটন ঘটে যায়, বাঁচুমনা ভাই। আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখেন, যদি আপনার পাসপোর্ট, ভিসায় সমস্যা না থাকে তাহলে বড় কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়। এখন নির্ভয়ে সামনে আগান। এই কথা শেষ করতেই পাশের ডেস্কে অফিসারের সুউচ্চ ধমকে আমিও কিছুটা চমকে উঠলাম, সেখানে যে ভাইটির এখন অফিসারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাকে দেখলে মনে হবে এখনি তার ফাঁসির রায় হতে যাচ্ছে। বোঝাগেল লোকটি ভয় আর আতংকে তার জন্মদাতা পিতার নামটিও ঠিকঠাক করে বলতে পারছে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে অফিসার যা বললেন, "মফিস, তুই বিদেশ যাবি কি করতে, বাড়ি গিয়া কালা ছাগল চাষ কর গিয়া" তবে লোকটি এ যাত্রায় বেঁচে গেলেন। তার ভাগ্যরেখায় আজ কালা ছাগল চাষ করার সম্মুখ পরিণতির কথা লেখা ছিল না। গালমন্দ করলেও অফিসার মানুষ হিসেবে এতটা খারাপ নয়! ডিপার্চার সিল দিয়ে ছেড়ে দিলেন। এ অবস্থা দেখে আমার সামনের লোকটি তাড়াহুড়ো করে আরেক ঢুক পানি খেয়ে নিলেন। কারণ তার ধারণা আর মাত্র একজন পরই তাকে বধ করা হবে। মালয়েশিয়াগামী আমাদের ফ্লাইট ছাড়তে এখনো যথেষ্ট সময় আছে। এবারে আমার গন্তব্য যদিও মালয়েশিয়া নয় তবে কুয়ালালামপুর ইন্টারন্যাশানাল এয়ারপোর্টে দু'ঘন্টা অপেক্ষার পর ব্রুনাই এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটের চড়ে গন্তব্য ব্রুনাই সিটি। যা হোক দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এবার আমি লাইনের সবার আগে চলে এলাম, অনেকেই জানেন পৃথিবীর ব্যস্ততম এয়ারপোর্টগুলোর ইমিগ্রেশন লাইনের দৈর্ঘ্য যতই বড় হোক না কেন কত দ্রুতবেগে এই স্পর্শকাতর কাজটি সম্পূর্ণ হয়। অবশ্য জাতি হিসেবে আমরা গর্ব করে বলতেই পারি, একুশ শতকে এসেও একমাত্র শাহাজালাল আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টই পরম মমতায় পরতে পরতে সেই প্রাচীন ঐতিহ্য আজও ধরে রেখেছে।

আমার আগের ভাইটি যিনি স্মার্ট কার্ড নিয়ে আসেনি তিনি এখন অবলীলায় অফিসারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু একি অবস্থা তার! প্যান্টের পকেটের নিচে ভিজে যেন একাকার। তবে কী ভয়ে ইন্টারনাল পানির ট্যাঙ্কির সিষ্টেম ফেল? কিন্তু তাকে দেখেতো মনে হচ্ছে সবকিছুই স্বাভাবিক। বিপত্তি ঘটলো বোধহয়! অফিসার সাহেব দাঁড়িয়ে তাকে পাশের একটি কক্ষে যেতে নির্দেশ করলেন। খুব খারাপ লাগলো ভাইটির এ অবস্থা দেখে। যদিও আমার দৃঢ়বিশ্বাস ভাইটির এ সমস্যা এখনই মিটে যাবে। দেখতে দেখতে আমার অপেক্ষার প্রহর শেষ হল। একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মনে মনে ভাবলাম, কী দেখে যে উঠেছি

আজ। (বি:দ্র: আমি তখন অবিবাহিত ছিলাম) নির্ভয়ে অফিসারের সামনে দাঁড়িয়ে, আমার পাসপোর্ট, বোর্ডিং কার্ড, বর্হিগমণ কার্ড ডেস্কের উপর রাখলাম এবং তিনি তা সাদরে তা গ্রহণ করলেন। এরপর দু তিন মিনিট নিঃশব্দে কেটে গেল, বিড়বিড় করে কিছু যেন একটা বলছে, হ্যাঁ এবার তিনি চশমার উপর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে, প্রথমে আমার নাম জানতে চাইলেন, কিন্তু নাম বলার কোন সুযোগ না দিয়েই, তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী ফরেনার? আমি বিনয়ের সহিত উত্তরে বললাম, না আমি বাংলাদেশি। এরপর একটু চড়াস্বরে বললেন, তাহলে কেন আপনি বর্হিগমণ কার্ডটি ইংরেজীতে পূরণ করছেন? দুঃখিত; আমি কী আবার পূরণ করে দিব? কিছু না বলেই আবার কিছুটা সময় চুপ থেকে জানতে চাইলেন, এর আগে কোন কোন দেশে গিয়েছিলেন এবং কত তারিখে? জবাবে আমি বললাম; সঠিক তারিখ গুলো এখন ঠিক মনে করতে পারছিনা, তবে প্রায় পৌনে সাত মাস আগে সিঙ্গাপুর গিয়েছিলাম এটা নিশ্চিত, উত্তরটি মনপুত হল কিনা বোঝা গেলনা কারণ মাথা নিচু করে কম্পিউটারে কিছু লিখছিলেন। একটু পরে আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার উপজেলা নবাবগঞ্জে খ্রিস্টান ধর্মীদের সংখ্যা কেমন হবে? অপ্রাসঙ্গিক এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। তাই আমিও মনগড়া উত্তরে বললাম, সম্ভবত পৌনে এক লাখের কিছু কম হবে। পুনরায় আর কোন প্রশ্ন না করে পাসপোর্টে সিল দিয়ে, পাসপোর্ট সহ সবকিছু ডেস্কের উপরে রেখে, ঘুমের লম্বা হাই তুলে অপেক্ষারত পরের জনকে এগিয়ে আসার ইসারা করলেন। ইমিগ্রেশন শেষ করে এখন বোর্ডিং রুমে প্রবেশের অপেক্ষা। হাতে এখনো প্রায় একঘন্টা বিশ মিনিট সময় রয়েছে। কোথাও নিরিবিলি বসলে সময় কেটে যাবে নিশ্চয়ই। ঢাকা এয়ারপোর্টে বর্হিগমণ টার্মিনালে ঘুরেফিরে সময় কাটানোর জন্য আহামরি তেমন কিছু নেই। সিমিত পরিসরে রয়েছে, কফিসপ, রেষ্টুরেন্ট এবং কেনাকাটার জন্য রয়েছে ছোট ছোট কিছু ডিউটি ফ্রি সপ। এছাড়াও রয়েছে আকর্ষণীয় লিকার শপ বা মদের দোকান। এসবের প্রতি তেমন আগ্রহ না থাকায়, নির্ধারিত বোর্ডি লাউঞ্জের পাশে বসব ভেবে এগিয়ে যাচ্ছিলাম এমন সময় হঠাৎ যার অবয়ব দেখতে পেলাম তিনি আর কেউ নয়, সেই ভাইটি! তিনি বসে আছেন তার আরও দুজন সহযাত্রির সঙ্গে। কাছে যেতেই আমাকে দেখে হাসি মুখে উঠে দাঁড়িয়ে হাত উঁচু করে ও ভাই বলে ডাকলেন। আমিও সহাস্য দ্রুত পায়ে ভাইটির কাছে যেতেই আমাকে জড়িয়ে ধরে তিন বার কোলাকুলি করে জানালেন, ভাই! জীবনে পড়ালেখায় বড় কোন পাশ দেই নাই সত্য, তবে আইজ মনে হইতাছে, আল্লাহ্‌র রহমতে অনেক বড় একটা পরীক্ষায় পাশ দিছি। ভাইটিকে দেখে বেশ ক্লান্ত শ্রান্ত মনে হলেও দুচোখ জুড়ে খুশির জোয়ার যেন উছলে পড়ছে। সহজ সরল এ ভাইটির সাথে পুনরায় সাক্ষাতে আমিও বেশ খুশী হলাম। সত্যি বলতে কী, লোকটির এত আনন্দ দেখে আমি নিজেও একটু আপ্লুত হলাম। আমাকে জানালেন, স্মার্টকার্ড নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তায় ছিলাম, কিন্তু আল্লাহ্‌র রহমতে ঝামেলা এখানেই মিটে গেছে ভাই। ভাইটিকে অভিন্দন জানিয়ে একটু টিপ্পনি কেটে বললাম, এয়ারপোর্টের বাইরে থাকলে অবশ্যই মিষ্টিটিষ্টি খাওয়ার আবদার করতাম। যাক এখন শুধু একঢুক পানি খাওয়ালেই চলবে! আর হ্যাঁ! পানির বোতলটি সাবধানে পকেটে রাখবেন। ভাইটি অট্ট হাসি দিয়ে বললেন, কান্দে শনি ভর করলে যা যা হয় আরকি, আমারও তাই হইছিল। তাড়াহুড়া করতে গিয়ে পানির বোতল উল্টো করে পকেটে ভরছিলাম, তারপর সব ইতিহাস! আমি আসলে অনেক ভয় পাইছিলাম ভাই। আমি তাকে বললাম, ভিসা পাসপোর্টে কোন জটিলতা না থাকলে সাধারণত বড় কোন সমস্যা হয় না। ভাইটি তার দু-বন্ধুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেও নিজের পরিচয় যখন বলতে যাবে ঠিক তখনি তার মোবাইলের রিংটোনে- "যেওনা সাথী চলেছো একা কোথায়" গানটি বেজে উঠলো। দ্বিধা না করে বুক পকট থেকে ফোনটি বের করে রিসিভ করলেন, স্পিকারে দেওয়া না থাকলেও ওপাস আসা কথা গুলো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। মেয়েলি কণ্ঠে কেউ একজন বলছিল, "কী অহনো অয় নাই? আমি হেই কতক্ষণ ধইরা ফোন বুকে নিয়া বইয়া রইছি, আমার যে আর ভালা ঠেকতাছ্যা না"! ফিস ফিস করে কিছু একটা বলেই ফোনটা কেটে দিয়ে, আমাকে জানালেন যে, তার বড় চাচী ফোন দিয়েছিলেন। পয়লা বিদেশ যাইতাছিতো আত্মীয় স্বজন সবাই খুব টেনশন করতেছে। আমি ভাইটিকে বললাম, হাতে আর খুব বেশি সময় নেই তাই প্রিয়জনদের সাথে কথা বলে নিন, কারণ একটু পরেই আমরা নেটওয়ার্কের বাইরে চলে যাব। তখন আপনি শত চাইলেও ফোন করা সম্ভব হবে না, আর আমরা যেহেতু একই বিমানে যাচ্ছি আশা করি আবারও দেখা হবো। খোদা হাফেজ।

ধুমপানের মত বদভ্যাস থাকায় স্মোকিং রুমের উদ্দেশে ছুটে চললাম, সেখানে পৌছে দেখি, ছোট্ট পরিসরে সম্ভবত আমাদের রান্নাঘরের সমান একটি ঘরে গাদাগাদি করে, মনের সুখে ধুমপান করছে বেশ কিছু ধুমপায়ী। এ অবস্থা দেখে আমার ইচ্ছেটিকে মাটি চাপা দিয়ে আর দেরি না করে যথারীতি বোর্ডিং এবং চূড়ান্ত সিকিউরিটি চেক আপ সেরে সোজা প্লেনের দরজায়। সেখানে একটু অপেক্ষার পর সৌজন্য অভ্যর্থনা গ্রহণ শেষে, আমার নির্ধারিত সিটে গিয়ে দেখি, ইতিমধ্যেই এক ভদ্রলোক টাইপ বাংলাভাই আমার সিটে বসে আছেন। আমি আরেক বার আমার বোর্ডিং কার্ডে উল্লেখিত সিট নাম্বার মিলিয়ে দেখলাম, সব ঠিক আছে, ত্রিপল রোর সিটে আমি জানালার পাশে, মাঝের সিটে দেশী ভাই এবং আইল সিটে এক চাইনীজ ভদ্রলোক বসে আছেন। পরক্ষণেই আমি দেশী ভাইটিকে তার নির্দিষ্ট সিটে বসার বিনীত অনুরোধ করলাম। দেশি ভাই আমাকে জানালেন, ভাই দেশ ছাইড়া যাইতাছিতো, আবার কয় বছর পর দেখুম ঠিক নাই তাই পরাণ ভইরা একটু দেইখা লই। বিমান উড়লেই আমি আমার সিটে গিয়ে বসুম। আমি দেশি ভাইটির এই শেষ ইচ্ছা পূরণ করার প্রয়াসে অনিচ্ছা সত্যেও আমি মাঝের সিটেই বসে পরলাম। সত্যি বলতে কি; ব্যাপারটি আমিও বেশ উপভোগ করি, দেশে থেকে দেশের যতই দোষ ধরার চেষ্টাই করিনা কেন, দেশের মাটি ছেড়ে যাচ্ছি চিন্তা করলেই এক লহমায় দেশপ্রেম যেন গ্যাস বেলুনের মত ফুলে যায়। কে যেন দরজায় কড়া নেড়ে মনে করিয়ে দেয় জন্মভূমি কবিতাটি,"আমি ফিরে আসতে চাই; প্রতিদিন ভোরের কুয়াশায় সাদা বক হয়ে ঘুম ভাঙা সবুজ ফসলের মাঠে, যেখানে আমি শেষবার হেঁটেছিলাম" অন্যমনষ্কতায় সম্বিত ফিরে দেখলাম এয়ারহোস্টেজ আমার ডানপাশের বাংলাভাইকে তার সিট বেল্ট বেঁধে মোবাইল ফোনটি সুইচঅফ করার বিনিত অনুরোধ করে গেলেন। হু কেয়ার ! বরং তিনি সিটের উপর একপা তুলে আরো আয়েশ করে বসলেন। উড্ডয়নের সকল প্রস্তুতি শেষে বিশাল আকৃতির বিমানটি এক পা দু পা করে এগিয়ে যাচ্ছে রানওয়ের শেষ সীমানার দিকে। এসময় নিরাপদ উড্ডয়নের স্বার্থে সকল প্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে, বার বার সতর্ক বাণী উচ্চারণ করলেও এখনো অধিকাংশ বাংলাদেশী ভাই টেলিফোনে কথা বলেই যাচ্ছেন। আমার পাশের ভাইটিতো ভিডিও কলে তার আবেগের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে গিয়েছেন।

রানওয়ের মাটি ছুঁয়ে চলতে চলতে বিমানটি হঠাৎ থেমে গেল! ভাবলাম যাত্রীরা অতিমাত্রায় আবেগে মূর্ছা যাওয়ার কারণেই বিমানটি থেমে গেল কিনা! তা কখনো হতে পারে না, আসলে এয়ারপোর্ট কন্ট্রোল রুম থেকে টেকঅফ সিগন্যালের অপেক্ষা, যেন দৌঁড় প্রতিযোগিতার বাঁশির অপেক্ষা। ঠিক তাই সবুজ সংকেত পাওয়ায় এক মুহূর্তেই প্রবল গতিতে বিমানটি ছুটে চলছে নীল আকাশ পানে। মুক্তবিহঙ্গ মেলে নিমিষেই বিমানটি নীল আকাশের উপরে মেঘেদের সাথে ভেসে চলছে। ভিডিও স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি ভূমি থেকে প্রায় ছয় হাজার ফিট উপরে উঠে বিমানটি তার প্রতিদিনের চেনা পথে উড়ে চলেছে, সাধারণত এ মুহূর্তে বিশেষ কোন সতর্ক বার্তা না আসা না পর্যন্ত

সৌজন্যতা বজায় রেখে প্রয়োজনে সিট থেকে উঠাবসা করা সহ যাত্রীদের খাবার পরিবেশন করা হয়ে থাকে। কোন কিছু প্রয়োজনে সিটে বসে কল বাটন চাপলেই সহসা চলে আসবে এয়ারহোস্টেজ। কিন্তু এই বিমানটি যেহেতু বাংলাদেশ থেকে যাচ্ছে তাই ভেতরের পরিবেশটা অন্য আদর্শটি আন্তর্জাতিক রুটের বিমানগুলোর থেকে অনেকটাই ভিন্ন। বিশেষত এই বিমানের যাত্রীদের টয়লেটের চাপ দৈবকারণে বেশি হয়ে থাকে, অনেক যাত্রী আছেন যারা কমোডের উপর পা উঠিয়ে বসতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন, যে কারণে এটি একটি বিদেশী বিমান হওয়া সত্ত্বেও ওয়াসরুমে বাংলা হরফে লেখা থাকে, "কমোডে পা উঠিয়ে বসা নিষেধ" সহ এমন অনেক অলিখিত নিয়ম কানুন। আরেকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশ ব্যতিত পৃথিবীর অন্যান্য রুটের বিদেশী ফ্লাইটের এয়ার হোস্টেজগণ, যেমনি বয়সে তরুণ, সুশ্রী, কমনীয় তেমনি যাত্রী সেবায় যারপর নাই নিবেদিত প্রাণ। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেন ঠিক তার ব্যতিক্রম। এই রুটে মজুদ করা হয়, বাতিলের লিষ্ট থেকে যারা দেখতে বেডপ খিটখিট মেজাজের এমন বয়স্ক পুরুষ মহিলাদের। আসলে যেমন যাত্রী তেমন এটেন্ডডেন্স।

ইতিমধ্যেই আমর নিকটবর্তী ওয়াশরুমের সামনে জটলা তৈরি হয়ে গেছে। কিছু যাত্রী সিট ছেড়ে এলোমেলো ভাবে ঘোরাফেরা করে পরস্পরের খোঁজ খবর করছেন। অন্যদিকে বিশৃঙ্খল যাত্রীদের নিয়ন্ত্রণের জন্য সিটে বসার অনুরোধের পাশাপাশি যারা সিটে বসে আছেন, তাদের ট্রেতে করে একটি করে বাদামের প্যাকেট পরিবেশন করা হচ্ছে। কিন্তু সেখানেও এক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির উদয় হল। বেশিরভাগ যাত্রীরা ট্রে থেকে একের অধিক প্যাকেট তুলে নিচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু এই সামান্য বাদাম নিয়ে কাড়াকাড়ীতে লিপ্ত হয়ে পরস্পর বাগবিতন্ডায় জড়াতে হবে? অনঅভিপ্রেত এই পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে এয়ারহোস্টেজ অকস্মাৎ অবশিষ্ট বাদামগুলো সবার উদ্দেশ্য ছুঁড়ে দিলেন, এ আকস্মিকতায় আমি নির্বাক চেয়ে দেখলাম নির্বোধ কিছু যাত্রী ঐ বাদামের প্যাকেটগুলো ক্রিকেটের বলের মত ধরতে যেন আরো মরিয়া হয়ে উঠলো। কত বিচিত্র ! কত বিরল এমন প্রতিযোগিতা সাক্ষী হতে পেরে, ক্ষোভেও যেন আমার হৃদয়ে গেয়ে উঠলো আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাশে। এবার খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে, ক্ষিদে পেয়েছে বটে! ট্রেতে খাবার পরিবেশনের আগে এয়ারহোস্টেজ জানতে চাচ্ছে, কোনটা পছন্দ? চিকেন/মাটন/ফিস এবং ড্রিঙ্কস কি নেব, প্রসঙ্গত যে কোন আন্তর্জাতিক বিমানের খাবারের ট্রলিতে মেইন ম্যানুর সাথে কেক,স্প্রাইট, ফ্রুটজুস সহ বিয়ার বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মদ সাজানো থাকে এবং যাত্রীদের পছন্দ অনুযায়ী তারা তা পরিবেশন করেন আমি চিকেন এবং আইসটির অনুরোধ করলাম। আমার পাশের দেশিভাইও আমার মত চিকেন নিলেন কিন্ত ড্রিংসে সফ্ট ড্রিংস না নিয়ে, নিলেন হুইস্কি।

পরিবেশিত খাবারের তালিকায় চিকেন বিরিয়ানি ছাড়াও আছে লাইট এ্যাপিটাইজার সহ ডেজার্ট। বেশ চটকদার ম্যানু বটে! আহ! বিরিয়ানি থেকে এখনো ধুয়া উড়ছে, মোদ্দা কথা পেটে ক্ষুধা থাকলে যা হয় আর কি! আমি এক নিমিষেই আমার খাবার শেষ করে, খেয়াল করলাম ডান পাশের ভাইটি এখনো পরম তৃপ্তি ভরে খাচ্ছে, যেন মায়ের হাতে দেওয়া খাবার। খাবারে তার মন্থর গতি হলেও ইতিমধ্যেই কিন্তু মদের গ্লাসে তিন নম্বর শেষ। পুনরায় কল বাটন টিপলেন সম্ভবত ৪নং প্যাগের আবদার করবেন। পরিস্থিতি দেখে আন্দাজ করতে পারছি এয়ারহোস্টেজগণ এ মুহূর্তে ভীষণ ব্যস্ত, প্রতিটি সিট থেকে খাবারের অবশিষ্টাংশ সংগ্রহের পর্ব চলছে। তবুও কালক্ষেপণ না করে পাশের ভাইটির কলিং এ সারা দিয়ে বান্দা হাজির। এয়ারহোস্টেজের রুগ্নমূর্তি দেখেই মনে হল তিনি প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন, তাই যেমন কর্ম তেমন কাজ! দেশিভাই চার নম্বর পেগের অনুরোধ করার পর এয়ারহোষ্টেজ তার প্রতিক্রিয়ায় শুধু ওয়েট বলেই চলে গেলেন।

সাধারণত খাবার পর্ব শেষ হলে দূরত্বভেদে ল্যান্ডিং পযর্ন্ত বিশ্রামের জন্য হাতে যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়, এসময় বাতি নিভিয়ে দেওয়া হয়, কেউ ঘুমায়, কেউ বা পছন্দের মুভি দেখে থাকেন। আগেই বলেছি এই ফ্লাইটের কথা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বুকে এক মণ পাথর চাপা দিলে যেমন অনুভূতি হয়, দেশি ভাইটিও একবুক ব্যথায় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আমাকে বললেন, এই বিমান কোম্পানি আগের থেকে বিমান ভাড়া বেশি নিলেও সার্ভিস আর আগের মত দেয়নারে ভাই। তার ক্ষোভ আর বিরক্তির কারণ বুঝতে পেরে আমিও তার কথায় সায় দিয়ে বললাম, একদম ঠিক বলছেন ভাই! তবে ধৈর্য্য ধরেন। আর ধৈর্য্য! ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে; ৪র্থ প্যাগ এখনো না আসায় আবারও কল বাটন চাপলেন। পরক্ষণেই রুগ্নমূর্তিধারণ করে এয়ারহোষ্টেজ আসলেন তবে কোন গ্লাস হাতে নিয়ে নয়, তিনি দেশী ভাইটির সামনে একটি স্লিপ সেঁটে দিয়ে দ্রুতবেগে আবার ফিরে গেলেন কিন্তু তাতে কি লেখা আছে ঠিক বোঝা যাচ্ছেনা। দেশি ভাই দ্বিধা না করে স্লিপটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, দেখেন ভাই দেখেন এরা কত খারাপ! যা লেখা তাতে অপমান বোধ হওয়াটাই স্বাভাবিক। নোটটি বাংলায় প্রকাশ করলে অর্থ দাঁড়াবে, বাবু খাইছো? তাহলে এবার ঘুমাও।

ল্যান্ডিং করতে এখনো যথেষ্ট সময় বাকী আছে, একটু বিশ্রামের প্রয়োজন কারণ মালয়েশিয়া এয়ারপোর্টে দু ঘন্টা অপেক্ষার পর আরও প্রায় দু ঘন্টা উড়তে হবে ব্রুনাই পৌঁছাতে। তাই দীর্ঘ ভ্রমনজনিত ক্লান্তি আর অবসাদের মাত্রা কমিয়ে আনতে একটু ঘুমের বিকল্প নেই। চেয়ারটাকে একটু নামিয়ে দু চোখ বন্ধ করে ঘুমের চেষ্টা করছি। আসলে ঘুমের সাথে কখনো আপোষ হয়না, তাই শত চেষ্টা করলেও, আজ আর ঘুমকে বসে আনা যাবেনা নিশ্চিত, যতক্ষণ না মাথা থেকে বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলো দূর হবে।

বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশের উদ্দেশে প্রতিদিন অনেকগুলো ফ্লাইট ছেড়ে যায়, এই ফ্লাইটগুলোতে সিকি ভাগের অধিক থাকেন যারা অদক্ষ শ্রমিক বা প্রবাসী নামে পরিচিত। সরকারী হিসেব মোতাবেক বিদেশে কর্মরত বৈধ প্রবাসীর সংখ্যা প্রায় এক কোটি বিশ লাখের উপরে। এমন অনেক দেশ রয়েছে যেখানে বৈধ বাঙালী কর্মজীবি অপেক্ষা অবৈধদের সংখ্যা বেশি। বৈধ অবৈধ মিলে প্রবাসীদের সংখ্যায় বর্তমানে বিশ্বে পঞ্চম স্থানে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। অন্যদিকে বিদেশী একটি সংস্থার তথ্য মতে প্রবাসী আয়ে বিশ্বে সপ্তম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। ধরে নেই, একজন প্রবাসীর আয়ের উপর দেশে যদি পাঁচ জন নির্ভরশীল হয় তাহলে মোট জনসংখ্যার প্রায় ছয়কোটি লোক এই আয়ের উপর নির্ভরশীল।

আজকের এই যাত্রাপথে ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে এ বিমান বহর পর্যন্ত যে সকল সহজ সরল তরুণ ভাইদের আমি দেখেছি, এই অর্জন তাদেরই এবং এই সহজ সরল প্রবাসীরাই কিন্তু সুবিশাল প্রবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। কিন্তু এই বিপুল সম্ভবনার জনশক্তি, সরকারের উদাসীনতায় আজও যেন তিমির অন্ধকারে পথ হাতরে বেড়াচ্ছে। একমাত্র অদক্ষতার কারণেই এই রেমিটেন্স যোদ্ধারা কখনো কখনো হাসির খোরাক হয়ে নিজের অজান্তেই দেশের জন্য চরম অসম্মানের কারণ হয়ে থাকেন। দেশের এই অভাবনীয় অগ্রগতির চাকা চলমান রাখতে প্রয়োজন, অর্থনীতির ভিত্তিগুলো দৃঢ় ও মজবুত করা। শুধু গামেন্টস শিল্পের দিকেই সুনজর নয়, সরকারের উচিৎ দক্ষ জনশক্তি গড়তে ফ্রিতে দেশের আনাচে কানাচে এমনকি দেশের বাইরেও বিভিন্ন ট্রেনিং ইনিষ্টিটিউড চালু করা। যেখানে থাকবে ভাষা শিক্ষা, বিভিন্ন ধরনের কাজের ট্রেনিং, বৈধ পথে টাকা পাঠানোর উপায় এমনকি আচার আচরণ সহ মনস্তাত্বিক বিষয়সমূহ॥

কৃতজ্ঞতা: *দিশারী ম্যাগাজিন*

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

জীবনের শেষ দিনগুলি

জীবনের শেষ তুলির চিহ্নটা এঁকেছিলাম
হাসপাতালের এই ছোট রুমে,
এডভান্টেজ হাসতাপালের আকাশে তখন ছিলো
চাঁদনী পশর রাত, মাঝে মাঝে টুকরো মেঘের ভেলা,
মনে পড়ে আমাদের দেশের খোলাকাশে
মেঘের ভেলায় সাঁতার কেটেছে অজানা মন!

মাথার শিয়রের কাছে রাখা পুরনো বাইবেল
এক একটি পাতা, এক একটি পদ
যিশুর ভালোবাসার অমৃত বাণী।
মাঝে মাঝে অবসাদের ছায়া
শঙ্কিত মনে অজানার ডাক,
সময় বুঝি গেছে এসে দূরপাল্লার ট্রেনে

কিভাবে তোমাকে ছাড়া একটি বছর চলে গেলো। তোমার শূন্যতা বার বার অনুভবের দরজায় কড়া নাড়ে। তোমার ফেলে যাওয়া ছোট ঘর, আঙ্গিনা, বাগান এবং আমরা সেভাবেই আছি। তোমার উপদেশ, আদর্শ এবং শৃঙ্খলিত জীবন-যাপন আমাদের পথ চলার শক্তি। একজন প্রার্থনাশীল মানুষ ছিলে তুমি। আমাদের বিশ্বাস তুমি আছ পিতার পাশে।
স্বর্গ থেকে তোমার আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।
অনেক ভালো থেকো তুমি পরপারে।

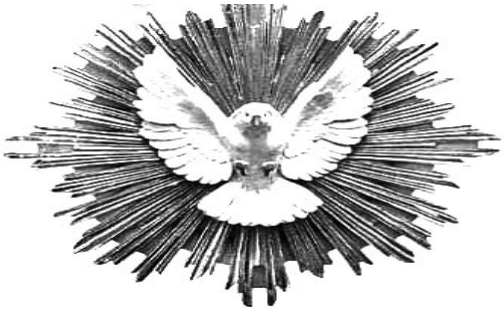

প্রয়াত ওয়াল্টার রোজারিও

পিতা: রোডল্ফ রোজারিও
মাতা: আগ্নেস রোজারিও
জন্ম: ২৯ জুলাই, ১৯৪২ (কলকাতা)
মৃত্যু: ০৩ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
(সিলভার স্প্রিং, মেরিল্যান্ড, আমেরিকা)
গ্রাম: নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে-

রেবেকা রোজারিও (স্ত্রী)
সিজার রোজারিও (ছেলে)
ডিনা রোজারিও (ছেলে বৌ)
উমা রোজারিও (মেয়ে)
গ্রেগরী শীতল পেরেরা (মেয়ে জামাই)
শার্লি, স্টেফি, ক্লেয়ার ও কার্ল (আদরের নাতনি ও নাতি)
সিলভার স্প্রিং, মেরিল্যান্ড, ইউএসএ

JOB VACANCY ANNOUNCEMENT

Fida International Bangladesh is a registered INGO working in Bangladesh since 2010. It is funded by the Fida International Finland. Our main goals and objectives are to work for the disadvantaged slum dwellers, poor and needy people in the field of health, education and economic sustainable development. Most of our activities are in urban based areas in Dhaka district, Bangladesh.

We would like to hire an **Assistant Accountant** under the Fida International Bangladesh. The applicant should have knowledge in MS Word, MS Excel, MS Power Point and Motorcycle driving experience with valid driving license from the BRTA. His salary will be as per the salary scale of Fida International Bangladesh.

Applications are invited from the experienced Bangladeshi citizen as follow positions:

Name of Post	Positions	Responsible to	Qualifications	Experiences	Age Limit
Asst. Accountant	01	FIB Finance Manager	M.Com and major in Accounting/ Finance	3-5 years	25-35 years

Interested candidates are hereby requested to submit their application along with their CV on or before 31st December 2023. Please apply with your recent Passport size photograph, National ID's photocopy, Mobile Phone number and a recommendation letter needed from your Church Pastor/ Priest and former employers. Please write the position's name on the top of the envelope.

Please note that Fida International Bangladesh authority retains the right to accept or to reject any or all applications, if it is not submitted according to the above requirements.

Mail your application to:

The Executive Director
Fida International Bangladesh
346 East Padardia
Satarkul Road
North Badda, Dhaka -2941
B A N G L A D E S H

Dated: 29.11.2023

E-mail: george.boidya@fida.fi

বা! কী অপরূপ?

সিস্টার মিলন স্কলাষ্টিকা ক্রুশ এলএইচসি

"আহা কী অপরূপ সৃষ্টি তোমার
ভাবি যখন বারে বার?
মুগ্ধ নয়নে হেরিয়া তাহার
জুড়াই প্রাণ আমার।"

উক্তিতে লেখক উল্লেখ করেছেন সত্যিই অপরূপ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। যার কোন তুলনা নেই। এর নেই কোনো দ্বিতীয়! এমন বিশ্ব কোন মানব তৈরি করতে পারবে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আছে প্রাণের স্পন্দন। জীব বৈচিত্রের সমাহার। এমনই সুন্দর, মনোহর পরিবেশে বাসকরে বিশ্বাস ও আশা। পরস্পরকে ভালোবেসে দু'জনে পাড়ি জমায় অজানা-অচেনা পরিবেশ তন্দ্রায়। এই তন্দ্রাতেই তারা তাদের ভালোবাসার কুটির স্থাপন করেন। চলছে তাদের দৈনন্দিন জীবনচিত্র। কোনো কোনো সময় বিশ্বাস, আশার উপর আস্থা স্থাপন করে। আবার আশা বিশ্বাসের উপর আস্থা স্থাপন করে চলছে তাদের জীবন-চাকা।

জীবনের চাকা ঘুরে তাদের কোল আলো করে এলো ফুটফুটে এক পুত্র সন্তান। বিশ্বাস ও আশা মহা আনন্দিত। ভালোবেসে তার নাম রাখলো সমুদ্র। তাদের ভালোবাসায় ও যত্নে সমুদ্র বেড়ে উঠতে লাগলো। বিশ্বাস প্রতিদিন কাজ শেষ করে ঘরে ফিরে এসে ফ্রেশ হয়ে আশা ও সমুদ্রকে নিয়ে প্রার্থনায় বসে। সারাদিন তারা অনেক মানুষের সাহায্য ও ভালোবাসা পেয়েছে, সেই জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন। ছেলে সমুদ্রের বয়স যখন পাঁচ, তখন বিশ্বাসের কোম্পানিতে আশা কাজ পেয়ে যায়। তখন একটি সমস্যা দেখা দিলো। তাদের দু'জনেরই আপন বলতে এই পৃথিবীতে কেউ নেই। তারা দু'জনে কাজে চলে গেলে সমুদ্রকে কে দেখাশুনা করবে?

বিশ্বাস ও আশার পরিবারকে স্থানীয়রা সবাই অনেক ভালোবাসে। অনেকেই তাদের পরিবারের আদর্শ অনুসরণ করে। তাদের বাড়ীর খুব কাছে যাদের বাড়ী তারা হলেন আনন্দ ও করুণার পরিবার। তাদের পরিবারেও একটি মেয়ে আছে সমুদ্রের বয়সের, তার নাম নম্রতা। তারা দুই পরিবার একে অপরের বিপদে-আপদে সহযোগিতা করে। বিশ্বাস যখন আনন্দের সঙ্গে তার পরিবারের সমস্যার কথা সহভাগিতা করে। আনন্দ এক বাক্যেই রাজি হয়ে যান সমুদ্রের দায়িত্ব নিতে। আনন্দ বাড়ীতে এসে করুণাকে বিষয়টি বলে, সব শুনে করুণা ও নম্রতা মহাখুশি। নম্রতা বললো ভালোই হয়েছে আমরা একসাথে স্কুলে যেতে পারব ও একসাথে খেলতে পারব। সমুদ্র ও নম্রতা খুব ভালো বন্ধু হয়ে উঠলো। দুই পরিবারের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি হলো। সকালে উঠে আশা ও বিশ্বাস সংসারের কাজ-কর্ম শেষ করে সারাদিন সমুদ্রের যা কিছু লাগবে তা প্রস্তুত করে দিয়ে তারা অফিসে চলে যায় এবং সমুদ্রকে আনন্দের বাড়ীতে রেখে যায়।

সমুদ্র ও নম্রতা সময় হলে স্কুলে যায়। তাদের স্কুল খুব কাছে। তারা দুই বন্ধু খুবই ভালো ও ভদ্র। প্রতিবেশিরা, শিক্ষকগণ ও সহপাঠিরা তাদের খুব ভালোবাসে। তারাও সবাইকে খুব ভালোবাসে এবং সহজেই সবার সাথে মিশতে পারে। দু'জনে পড়াশুনা, খেলাধূলা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতাগুলোতে একবার সমুদ্র প্রথম হলে, পরেরবার নম্রতা প্রথম হবে, এভাবে দু'জনের মধ্যে সব সময় প্রতিযোগিতা লেগেই থাকে।

এভাবে কয়েক বছর পর প্রাথমিক বিদ্যালয় শেষ করে তারা এখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। একদিন তাদের স্কুলে পরিবেশ সুরক্ষার জন্য একটি শিক্ষা সেমিনার হয়। সেখানে একজন বক্তা পরিবেশের উপকার, পরিবেশ ধ্বংস, মানব জীবনের বিপর্যয় এবং বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন। তারা মনোযোগ দিয়ে বিষয়গুলো সম্পর্কে শুনে ও নিজেরা কীভাবে পরিবেশকে এই বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করবে; তা নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করলো।

বাড়ীতে ফিরে বাবা-মাকে বিষয়টি বললো। তাদের পিতা-মাতাগণ গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি শোনেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাদের এ কাজে সব ধরণের সাহায্য ও সহযোগিতা দিবে। বিশ্বাস ও আনন্দ মিলে সিদ্ধান্ত নেয় তারা দুই বন্ধু তাদের সন্তানদের মনের আশা পূরণ করবে। যেই কথা, সেইকাজ। তারা তাদের বাড়ীর যে অনাবাদি জমি ছিলো তা পরিষ্কার করে বিভিন্ন ধরণের ফুল-ফলের গাছ, ঔষধি গাছ ও অন্যান্য গাছ লাগিয়ে বাড়ীর পরিবেশ রক্ষার কাজ শুরু করে দিয়েছে। তাদের বাড়ীতে গাছ লাগানোর পর আশেপাশের রাস্তার দুইপাশে গাছ লাগাতে শুরু করেছে। তা দেখে গ্রামের লোকেরা অনেক হাসাহাসি করেছে, কয়েকজন গাছ তুলে ফেলে দিয়েছে। তবুও তারা থেমে যায়নি। লোকেরা একটি গাছ তুলে ফেলে দিলে তারা আরো তিনটি গাছ লাগিয়ে দিচ্ছে।

এক কান দু'কান করে এই কথা প্রশাসনের কানে যায়, তা শুনে পরিদর্শন করতে তারা আসেন। এসে, তারা অবাক হয়ে যান। এরপর থেকে প্রশাসন তাদের নানাভাবে সাহায্য করতে শুরু করে। সরকারিভাবে পরিবেশ রক্ষার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেন। জনগণ এখন তাদের সঙ্গে এক হয়ে কাজ করছেন। অনেক মানুষের কর্ম সংস্থান হয়েছে। মানুষ সাবলীলভাবে জীবন-যাপন করছে। কোন বিপদ হলে নিজের গাছ বিক্রি করে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার পাচ্ছে। তাদের গ্রামটি প্রকৃতির লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। অনেক মানুষ তা দেখতে আসে। যে গ্রামটিকে কেউ চিনতোনা সবার মুখে এখন একটিই নাম তন্দ্রা।

প্রকৃতির লীলাভূমি ও সৌন্দর্য্যের জন্য পুরস্কারপ্রাপ্ত আদর্শ একটি গ্রাম। তন্দ্রা এখন প্রকৃতির জন্য এলাকার মডেল। প্রত্যেকজন ব্যক্তি, ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিশ্বাস ও আশাভরা অন্তরে নম্র হৃদয়ে অকূল সমুদ্রে করুণার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে প্রকৃতির যত্ন ও প্রকৃতি রক্ষা করে প্রকৃতির লীলাভূমি যেন তৈরি করে এবং মানব জীবনে স্বস্তি ফিরে আসে॥

ফুগো ফিস

জয়ন্ত ভিক্টর গমেজ

অত্যন্ত বিষাক্ত এই মাছটি খেয়ে প্রতি বছর জাপানে প্রায় ছয় জন মানুষ মারা যায়। তার পরেও জাপানীরা কেন অনেক দাম দিয়ে কিনে এই ফুগু নামক (fugu or puffer) মাছটি খাবার জন্য পাগল? স্বল্প ও অসম্পূর্ণ তথ্যের ভিত্তিতে যখন মানুষ ভুল উপসংহারে পৌঁছায় (jumping into conclusions), এতে যে কি বড় বিপদ হতে পারে সে ব্যাপারে এ বিষাক্ত মাছটি আমাদের কি শিক্ষা দিতে পারে? চলুন দেখা যাক।

আমেরিকায় আসার আগে TOEFL পরীক্ষার বইয়ে পড়েছিলাম এ মাছের কথা। এ মাছটির লিভার ও কিছু অঙ্গে থাকে টেট্রোডোটক্সিন (tetrodotoxin) নামক এক মারাত্নক বিষ, যা কিনা সায়ানাইড থেকে ১,২০০ গুণ শক্তিশালী। একটি আলপিনের মাথায় যতটুকু এ বিষ ধরে তা একজন মানুষ মেরে ফেলার জন্য যথেষ্ট। এ বিষয়টি মানুষের শরীর ও মাংসপেশী অবশ করে দেয়। মানুষের ফুসফুস চালনার মাংশপেশীও অবশ হয়ে যায় এবং ফুসফুস আর চলতে পারে না। ফলশ্রুতিতে মানুষের মৃত্যু হয়।

যে কোন শেফ এ মাছ রান্না করতে পারে না। এ মাছ রান্না করার জন্য বিশেষ লাইসেন্সধারী উচ্চপ্রশিক্ষিত শেফ লাগে। উচ্চপ্রশিক্ষিত শেফরা অতি সাবধানে মাছের বিষাক্ত অংশগুলি ফেলে মাছটি রান্না করে। তারপরেও বছরে প্রায় পঞ্চাশ জন মানুষ ফুগু মাছের বিষে আক্রান্ত হয় এবং প্রায় ছয় জন প্রতি বছর মৃত্যুবরণ করে। তারপরেও জাপানীরা এ মাছ খেতে পছন্দ করে কারণ মাছটি অত্যন্ত সুস্বাদু এবং সৌভাগ্যের প্রতীক। শেফদের মধ্যে যারা খুবই দক্ষ, তারা রান্না করার সময় ছুঁড়ির ধারালো মাথা দিয়ে খুবই অল্প পরিমাণ বিষ এ মাছে দেয় যাতে মানুষ মরে না কিন্তু মাছটি খেলে শরীরে যেন কিছুটা ঝিম ঝিমানী ভাব আসে।

অনেক সময় এরকম ঘটনা ঘটেছে যা ফুগো মাছ খেয়ে মানুষ মারা গেছে। মৃত মানুষটির পরিবার ও প্রিয়জনরা যখন মানুষটির দাফন করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন মানুষটি আবার জ্ঞান ফিরে কফিনে উঠে বসেছে কারণ তখন মানুষটির বিষের ক্রিয়া কেটে গিয়েছিল। তাই পরে জাপানে একটি রীতির প্রচলন হয়েছিল যে ফুগু মাছ খেয়ে কেউ মারা গেলে সাথে সাথে কবর না দিয়ে ক্যাসকেট বা কফিনের পাশে মৃতদেহটি কয়েকদিন রেখে দেবার। এতে করে মানুষটি যদি আসলে মারা না যায় কিন্তু প্রিয়জনরা যদি ভুলবশত মনে করে মনে করে মানুষটি মারা গিয়েছে, সেক্ষেত্রে মানুষটির বিষক্রিয়া কাটানোর জন্য যথেষ্ঠ সময় দিয়ে মানুষটিকে তার অজ্ঞান অবস্থা থেকে জ্ঞান ফেরার পর্যাপ্ত সময় দিয়ে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হয়।

বুদ্ধিমান পাঠক কি ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছেন স্বল্প ও অসম্পূর্ণ তথ্যের ভিত্তিতে দ্রুত উপসংহারে আসলে কি বড় বিপদ হয়েছিল এখানে কিছু ক্ষেত্রে? হ্যাঁ, আপনার অনুমান সঠিক। এখানে কিছু ক্ষেত্রে সম্ভবত মানুষরা ভুল বুঝে তাদের ভালোবাসার প্রিয়জনকে জ্যান্ত কবর দিয়ে ফেলেছে বা জ্যান্ত দাহ্য করে

বড়দিনে

তার্সিসিউস পালমা

বড়দিনে আমরা সবাই
পিঠা কুলি খাই
শহর থেকে পোটলা নিয়ে
গ্রামের বাড়ী যাই।
বড়দিনে গ্রামের বাড়ী
পিড়ায় তোলে ফুল
বৌ ঝিয়েরা চুড়িতে রাঙ্গায়
কানে বাহারি দুল।
বড়দিনে বাবা ব্যস্ত
বৌ সন্তানের জামা ছলে
দু'হাত ভরে বাজার সদাই
গুড় পাটালী ভরা থলে।
বড়দিনে রাত জেগে মায়
ঢেঁকিতে কোটে গুরি
গরম পিঠায় হাত পুড়ে
খেতে নাই তার জুড়ি।
বড়দিনে সাজে সবাই
নতুন কাপড় দিয়ে
চারিদেকে ধূম পড়ে যায়
ঢোল তালে যে বিয়ে।
বড়দিনে ছোটরা মাতে
প্রজাপতির ডানা মেলে
মুহূর্তে মিটে বন্ধুর বিবাদ
হাওয়াই মিঠাই খেলে।
বড়দিনে সবার বাড়ি
আলোকিত ঝিকিমিকি সাজে
বীর দর্পে উজ্জ্বল তারকা
নব বারতা ভাসে গগন মাঝে।
বড়দিনে সবার বাড়ি
নানান পিঠার মৌ
পোলাও মাংশে মেহমানদারী
বেজায় খুশী জামাই-বৌ।
বড়দিনে যুবারা ছোটে
সাংগঠনিক নেতা সেজে
কালো চশমা গলায় টাই
পারফর্ম যে আজ স্টেজে।
বড়দিনে অনেকে ব্যস্ত
সমাজ সেবার ব্রতে
অনেকে আবার সুযোগ খোঁজে
নেশায় মাতে দিনে-রাতে।
বড়দিনে চারিদিক মাতাল
খোল্ ঢোল্ কাঁশির তালে
আত্মীয় স্বজন দেখা স্বাক্ষাৎ
গির্জা চত্বরে কীর্তন বোলে।
বড়দিনে আসে নেতা কর্মী
একে অন্যে সাদর সম্ভাষণ
বিভিন্ন ধর্মের মিলন মেলায়
পিঠা-কেকে সৌজন্য আপ্যায়ন।
বড়দিনে আনে শান্তি একতা
ধরণীতে স্বর্গ সুধা পান
বাহ্যিক আচারে সাজাই মোরা
অন্তরে নাহি প্রেমের বাণ।
বড়দিনে প্রভু যিশু ত্রাতা হয়ে
ধরায় নেমে এলেন
সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার চলন
মর্যাদায় সমান হলেন।
বড়দিনে আমরা জানাই
যিশুরে প্রণাম শত
দূর হবে অনাচার-কালিমা
শত্রুতা-বিভেদ ভুলি যত দ্রুত।
বড়দিনে ছোট বড়
নেই ভেদাভেদ কোন
খ্রিস্ট জ্যোতির আলোর আভায়
মিলিত থাকি সবাই যেন।
বড়দিনে পাই শিক্ষা-দীক্ষা
জাগ্রত করো সবার বিবেক
ঈশ্বর ভগবান আল্লাহ সবার
আলোর শিক্ষার বাণী যে এক।
বড়দিনে তাই সবারে আহ্বান
এসো ভাই বোন হাত ধরি
খ্রিস্টান, মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ মিলে
গড়ি পৃথিবী স্বর্গ সোনার তরী॥

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

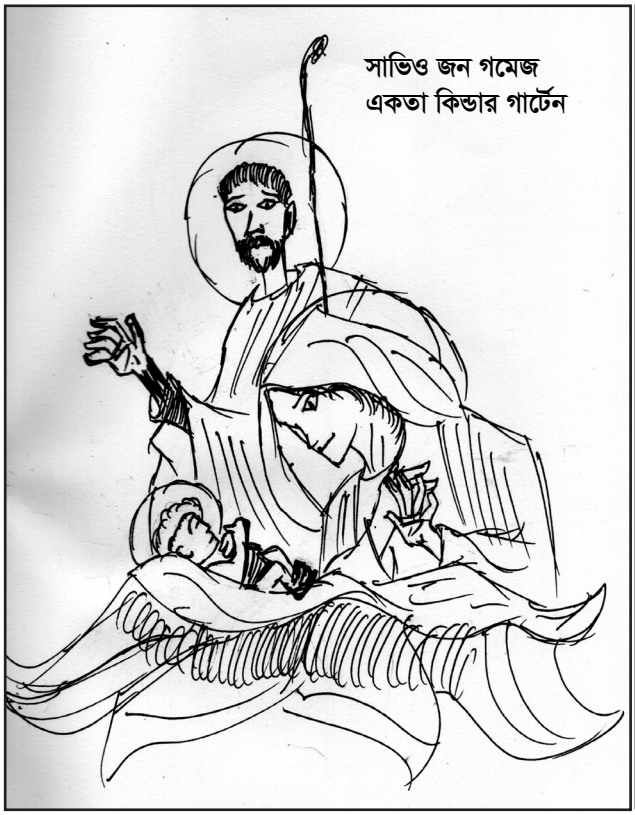

সাভিও জন গমেজ
একতা কিন্ডার গার্টেন

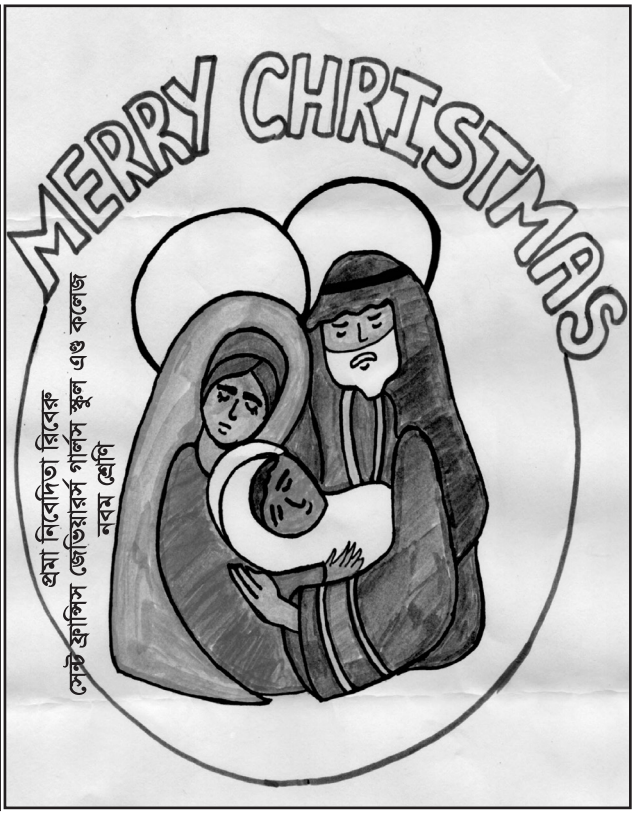

প্রমা নিবেদিতা রিবেরু
সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস স্কুল এণ্ড কলেজ
নবম শ্রেণি

অদ্রি রোজারিও
ইউফ্রেজীস্ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এণ্ড কলেজ
৭ম শ্রেণি

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

পোপ ফ্রান্সিসের পোপীয় দায়িত্ব পালনের দশম বর্ষ পূর্তিতে তাঁর শাসনামলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

একজন পোপ এ জগতে যিশুর প্রতিনিধি এবং প্রেরিতদূত সাধু পিতরের উত্তরাধিকারী। পোপ ফ্রান্সিস সময়ের পরিক্রমায় সাধু পিতরের ২৬৫তম প্রতিনিধি। তিনি ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ পোপ হিসেবে নির্বাচিত হয়ে বিভিন্ন ঘটনা, প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যদিয়েও মণ্ডলীকে সম্মুখপানে এগিয়ে চলতে ও দরিদ্রদের পাশে থাকতে শক্তি যুগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর পোপীয় শাসনামলের ১০ বর্ষপূর্তিতে অভিনন্দন জানিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে এবারের বড়দিনের বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ।

২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

মার্চ ১৩: পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের পদত্যাগের দুই সপ্তাহের পর কার্ডিনাল জর্জ হোসে বেরগ্লোলিও পোপ হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের নামানুসারে নিজের নাম ফ্রান্সিস নেন। সাধু পিতরের বাসিলিকার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেন, রোমের বিশপ ও ভক্তজনগণ, এসো দয়াময় ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ভালোবাসা, পারস্পরিক আস্থায় যাত্রা শুরু করি। এসো আমরা সকলে একজন আরেকজনের জন্য সর্বদা প্রার্থনা করি।

মার্চ ১৪: পোপ ফ্রান্সিসের পোপীয় শাসনকাল শুরুর পরের দিন। তিনি তাঁর হোটেলে ফিরে যান টাকা পরিশোধ করতে ও তাঁর লাগেজ বহন করতে।

জুলাই ৮: পোপ ফ্রান্সিস ইতালির লামপেদোজা দ্বীপে ৫০জনের একটি অভিবাসীদের দলের সাথে সাক্ষাৎ করেন। লামপেদোজা অনেক অভিবাসীদের ইউরোপে প্রবেশ পথ। এটিই পোপ মহোদয়ের রোমের বাইরে প্রথম পালকীয় সফর।

জুলাই ২৩-২৮: বিশ্ব যুব দিবস পালনের উদ্দেশে পোপ মহোদয় ব্রাজিলে অবস্থান করেন। ৩০ লক্ষ তীর্থযাত্রী এখানে অংশগ্রহণ করে।

জুলাই ২৯: ব্রাজিল থেকে ফেরার পথে সংবাদ সম্মেলনের সময় "যদি একজন ব্যক্তি গে এবং ঈশ্বরকে অন্বেষণ করে এবং যার সদিচ্ছা আছে তাহলে আমি কে, বিচার করার" বিবৃতি দানের মধ্যদিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়।

নভেম্বর ২৪: পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস তাঁর প্রথম প্রৈরিতিক পত্র ' মঙ্গলসমাচারের আনন্দ' (*Evangelii Gaudium*) প্রকাশ করেন।

২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

ফেব্রুয়ারি ২২: পোপ মহোদয় প্রথম পোপীয় কনসিসটারী করে ১৯জন নতুন কার্ডিনাল মনোনীত করেন যাদের মধ্যে অনেকে আছেন উন্নয়নশীল দেশ থেকে।

মার্চ ২২: শিশুদের সুরক্ষাকল্পে পোপীয় কমিশন গঠন করেন পোপ ফ্রান্সিস। কমিশনটি শিশুদের ও ভঙ্গুর বয়স্কদের মর্যাদা রক্ষায় কাজ করবে।

অক্টোবর ৫: পরিবার বিষয়ক সিনড শুরু হয়। বিশপগণ একক পিতৃত্ব-মাতৃত্ব, একসাথে থাকা, হোমোসেক্সুচুয়ালদের শিশু দত্তক নেওয়া এবং আন্তঃমাণ্ডলিক বিবাহ বিষয়গুলো নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন।

২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

জানুয়ারি ১৮: এশিয়া সফরের শেষদিনে পোপ মহোদয় ফিলিপাইনের ম্যানিলাতে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। প্রচণ্ড বৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও যেখানে রেকর্ড সংখ্যক উপস্থিতি (৬০/৭০ লক্ষ) পরীলক্ষিত হয়।

মে ২৪: বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ও প্রকৃতির যত্ন দানের বিষয়ে সচেতনতা দানের লক্ষ্যে পুণ্যপিতা প্রকাশ করেন 'লাউদাতো সি' নামক সর্বজনীন পত্রটি।

সেপ্টেম্বর ১৯-২৭: ১৯-২২ তারিখ পর্যন্ত পোপ মহোদয় কিউবাতে পালকীয় সফওে থাকেন যেখানে সাধু পোপ ২য় জন পলও ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে গিয়েছিলেন এবং ফিদেল কাস্ত্রোর সাথে দেখা করেছিলেন। ২২-২৭ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফর করেন। পোপ হিসেবে এটিই প্রথম সফর।

অক্টোবর ৪: পরিবার বিষয়ক সিনড শুরু করেন পোপ মহোদয়।

অক্টোবর ১৮: ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার পিতামাতা লুইস মার্টিন ও মারী আজেলিকে সাধুশ্রেণিভুক্তকরণ করেন পোপ মহোদয়। উনারা হলেন প্রথম বিবাহিত দম্পতি যারা সাধু ঘোষিত হয়েছেন।

ডিসেম্বর ৮: দয়ার জুবিলী বর্ষ শুরু। পোপ মহোদয় প্রত্যেকটি ডায়োসিসে নির্দিষ্ট পুরোহিতদের দয়ার মিশনারী হিসেবে দায়িত্ব দেন যারা পুণ্যপিতার হয়ে নির্দিষ্ট পাপের ক্ষমা দিতে পারেন।

২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

মার্চ ১৯: পরিবারে আনন্দ : *Amoris Laetitia* নামে একটি প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্র প্রকাশ করেন, যেখানে বর্তমান সময়ের পরিবারগুলো যে সমস্যা মোকাবেলা করছে পরিবার সিনডের মধ্যদিয়ে তা শুনে লিপিবদ্ধ করা হয়।

এপ্রিল ১৬: গ্রিসের লেজবোস দ্বীপের উদ্বাস্তুদের পরিদর্শন শেষে তিনটি মুসলিম পরিবারকে নিয়ে বিমানে চড়ে রোমের উদ্দেশে যাত্রা করেন। পোপ মহোদয় জানান, তা কোন রাজনৈতিক উদ্দেশে করেননি।

জুলাই ২৬-৩১: বিশ্ব যুব দিবসের উৎসবমুখরতায় অংশ নিতে পোলাণ্ডের ক্রাকাও সফর করেন। সারা বিশ্ব থেকে ৩০ লক্ষ কাথলিক তীর্থযাত্রীরা উপস্থিত হয় এই উৎসবে।

সেপ্টেম্বর ৪: সর্বজন পরিচিত মাদার তেরেজাকে সাধ্বী শ্রেণীভুক্ত করে ঘোষণা দেন কলকাতার সাধ্বী তেরেজা বলে।

সেপ্টেম্বর ৩০-অক্টোবর ২: রোমের বাইরে পোপ মহোদয়ের ১৬তম সফরে তিনি জর্জিয়া ও আজারবাইজানে যান। এ সফরে তিনি অর্থডক্স ও মুসলিমদের সাথে কাথলিকদের সম্পর্কের উপর মনোযোগ দেন।

২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

মে ১২-১৩: এ বছর ফাতেমাতে মা মারীয়ার দর্শনদানের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে পোপ ফ্রান্সিস পর্তুগালের ফাতেমাতে অবস্থিত ফাতেমা রাণীর তীর্থস্থান পরিদর্শনে যান

জুলাই ১১: 'জীবন নিবেদন' বিষয়টিকে পোপ মহোদয় সাধুতার জন্য বিবেচনা করার একটি বৈশিষ্ট্য বলে খ্রিস্টীয় জীবনে যোগ করেন। আগে শুধুমাত্র সাক্ষ্য মৃত্যুবরণ করলে পরেই সে বিবেচনা করা হতো।

নভেম্বর ১৯: বিশ্ব দরিদ্র দিবস প্রতিষ্ঠা করেন পোপ ফ্রান্সিস। এইদিনে পুণ্যপিতা রোমে ৪ হাজার দরিদ্র ও অভাবী ব্যক্তিদের সাথে দুপুরের আহার গ্রহণ করেন।

নভেম্বর ২৭-ডিসেম্বর ২: এশিয়ায় পোপ ফ্রান্সিসের আরেকটি প্রৈরিতিক সফর মিয়ানমার ও পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে। তিনি কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করেন এবং সরকারী কর্মকর্তা, কাথলিক পুরোহিত এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করেন এবং ঐ এলাকায় শান্তি স্থাপনের জন্য উদাত্ত আহ্বান রাখেন।

২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

জানুয়ারি ১৫-২১: লাতিন আমেরিকার চিলি ও পেরুতে পোপ মহোদয়ের প্রৈরিতিক সফর। সরকারী কর্মকর্তা ও পুরোহিতদের সাথে সাক্ষাতের সময় তিনি বিশ্বাসীবর্গকে আহ্বান করেন পুরোহিতদের কাছাকাছি থাকতে ও জাগতিকতাকে পরিহার করতে।

আগস্ট ২৫: আমেরিকাতে পোপ মহোদয়ের প্রাক্তন প্রতিনিধি কার্ডিনাল কার্লো ভিগানো ১১ পৃষ্ঠার একটি চিঠি লিখেন পোপ মহোদয়কে পদত্যাগ করতে এবং যৌন নির্যাতন ঢেকে রাখার জন্য পোপ ও ভাটিকান অফিসিয়ালদের প্রতি অভিযোগের তীর বিদ্ধ করেন। পোপ মহোদয় সরাসরি কোন উত্তর দেননি।

আগস্ট ২৫-২৬: পরিবারসমূহের বিশ্ব সভায় যোগ দিতে পোপ ফ্রান্সিস আয়ারল্যাণ্ডের ডুবলিনে যান। সভার প্রতিপাদ্য বিষয়টি: পরিবারে মঙ্গলসমাচার, বিশ্বের জন্য আনন্দ।

অক্টোবর ৩-২৮: যুব জীবন, বিশ্বাস এবং জীবন পথ অবধারণ নিয়ে বিশেষ যুব সিনড অনুষ্ঠিত হয়। যুবদের বিশ্বাস শিক্ষাদানের সর্বোত্তম অনুশীলনীসমূহ এবং যুবদেরকে ঈশ্বরের ইচ্ছা অবধারণ করতে সহায়তা দানের উপর সিনডে বিশেষ নজর দেওয়া হয়।

২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

জানুয়ারি ২২-২৭: পোপ ফ্রান্সিসের পোপীয় শাসনামলের ৩য় বিশ্ব যুব দিবস পানামা সিটি, পানামাতে। সারা বিশ্ব থেকে আসা ৩০ লক্ষ যুবদের সাথে পোপ মহোদয়ের সাবলীল উপস্থিতি।

ফেব্রুয়ারি ৪: 'বিশ্ব শান্তি ও সহাবস্থানের জন্য মানব ভ্রাতৃত্ব' শিরোনামে একটি দলিলে আবুধাবীর গ্র্যাণ্ড ইমাম শেখ আহমেদ এল-আয়েবের সাথে পোপ মহোদয় একটি যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন। দলিলটি বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস সত্ত্বেও একসাথে শান্তিতে থাকা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার সংস্কৃতির উপর জোর দিয়েছে।

ফেব্রুয়ারি ২১-২৪: মণ্ডলীতে শিশুদের সুরক্ষা

বিষয়ক সামিট অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাটি মণ্ডলীতে যৌন হয়রানির স্ক্যাণ্ডালের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে এবং দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার উপর জোরারোপ করে।

অক্টোবর ৬-২৭: প্যান-আমাজান অঞ্চলের বিশপদের সভা যা আমাজন সিনড বলে আখ্যায়িত হয় সেখানে পোপ মহোদয় গর্ভবতী আমাজানিয়ান একজন নারীর খোদাই ছবি দেখে পাচামামা বললে তা সিনডের বেশ কয়েকটি ইভেন্টে উচ্চারিত হয়।

অক্টোবর ১৩: এ্যাংলিকান মণ্ডলী থেকে কাথলিকে আসা কার্ডিনাল হেনরী নিউম্যানকে পোপ ফ্রান্সিস সাধু শ্রেণিতে ভূষিত করেন। সাধু নিউম্যানের লেখাগুলো আমেরিকার স্বাভাবিক শিক্ষাধারার কাথলিক ছাত্রদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে।

২০২০ খ্রিস্টাব্দ,

মার্চ ১৫: পোপ ফ্রান্সিস পায়ে হেঁটে রোমে বিশেষ তীর্থ করে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর চ্যাপেলে যান এবং মহামারী যেন শিঘ্রই দূর হয় তার জন্য প্রার্থনা করেন। ক্রুশবিদ্ধ যিশুর প্রতিকৃতিটি ১৫২২ খ্রিস্টাব্দে রোমে প্লেগের সময়ও বহন করা হয়েছিল।

মার্চ ২৭: বৃষ্টিস্নাত জনশূণ্য সাধু পিতরের চত্বরে পোপ ফ্রান্সিস করোনা মহামারী থেকে বিশ্বকে মুক্ত করার জন্য প্রার্থনা করেন এবং জনগণকে 'বিশেষ আশীর্বাদ উরবি এদ উরবি (urbi et orbi) দান করেন।

২০২১ খ্রিস্টাব্দ

মার্চ ৫-৮ : কোভিড ১৯ এর পরে প্রথম পোপীয় সফর। পোপ ফ্রান্সিস প্রথম পোপ যিনি ইরাক সফরে যান। এই সফরে তিনি গ্রাণ্ড আয়াতুল্লাহর সাথে উগ্রবাদকে অভিযুক্ত করে এবং শান্তির স্বপক্ষে একটি যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন।

জুলাই ৩: পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক কার্ডিনাল কলেজে উন্নীত হওয়া কার্ডিনাল জোভান্নি বেকিউ আত্মসাৎ, অর্থ পাচার এবং অন্যান্য অপরাধের জন্য ভাটিকানের আদালতে অভিযুক্ত হন। পোপ মহোদয় অভিযোগ গঠনের অনুমোদন দেন।

জুলাই ৪: প্রবীণ ব্যক্তিদের স্বাভাবিক ড্রাইভার্টিকুলাইটিসের জন্য কোলন সার্জারি করেন পোপ ফ্রান্সিস। ভাটিকান জানায়, পোপ মহোদয় অস্ত্রোপচারের জন্য সম্মত। ১০দিন পর পোপ মহোদয়কে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

জুলাই ১৬ : পোপ ফ্রান্সিস 'ঐতিহ্যবাহী রীতি' (*Traditionis Custodes*) শিরোনামে একটি মোটো প্রোপ্রিও জারি করেন। দলিলটি ঐতিহ্যবাহী ল্যাটিন খ্রিস্টযাগ সম্পাদনের উপর সবিশেষ বিধি-নিষেধ আরোপ করে।

ডিসেম্বর ২-৬: পোপ সাইপ্রাস ও গ্রিস সফরে যান। গ্রিসের একটি দ্বীপ লেসবসে তিনি অভিবাসীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

২০২২ খ্রিস্টাব্দ,

জানুয়ারি ১১: স্টেরিওসাউণ্ড নামে এক সাউণ্ডস্টোরে অকস্মাৎ এক পরিদর্শনে যান পোপ ফ্রান্সিস। ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতপ্রিয় পোপ নতুনভাবে সংস্কারিত ভবনটি আশীর্বাদিত করেন।

মার্চ ১৯ : মঙ্গলসমাচার প্রচার' নামক একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয় যার মধ্য দিয়ে রোমান কুরিয়ার সংস্কার সাধন হয়। এই সংস্কারগুলি মঙ্গলসমাচার প্রচার ও খ্রিস্টভক্তদের নেতৃত্বের সুযোগ দানের বিষয়ে জোর দেয়।

মে ৫ : প্রথমবারের মতো পোপ ফ্রান্সিস হুইলচেয়ারে প্রকাশ্যে আসলেন এবং তা প্রায়শই ব্যবহার করা শুরু করলেন। বেশ কয়েকমাস যাবতই তিনি হাঁটুর সমস্যায় ভুগছিলেন।

জুলাই ২৪-৩০ কানাডাতে তাঁর প্রথম পোপীয় সফরে পোপ ফ্রান্সিস কানাডার আদিবাসীদের সাথে কঠোর আচরণের কারণে ক্ষমা চেয়েছেন। কেননা এ ধরণের আচরণে অনেক খ্রিস্টান এবং কাথলিক মণ্ডলীর সদস্যরা জড়িত ছিলেন।

২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

জানুয়ারি ৩১-ফেব্রুয়ারি ৫: পোপ মহোদয় গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো ও দক্ষিণ সুদানে সফরে যান। এই সফরের সময় তিনি রাজনৈতিক সহিংসতাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেন এবং শান্তি বৃদ্ধি করার আহ্বান রাখেন। একই সময়ে তিনি ক্যান্টারবেরীর এ্যাংলিকান আর্চবিশপ জাস্টিন ওয়েলবি এবং স্কটল্যাণ্ডের মডারেটর ইয়েইন গ্রিনশিল্ডের সাথে আন্তঃমাণ্ডলিক প্রার্থনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। ৫ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ সুদানের যুবায় খ্রিস্টযাগের সময় একজন কিশোরকে শুভেচ্ছা জানান।

মার্চ ২৯-এপ্রিল ১ : পোপ ফ্রান্সিস শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার সংক্রমণের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হন। রোমের জেমেল্লি হাসপাতালে থাকার সময় তিনি পেডিয়াট্রিক ক্যান্সার ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন এবং একটি শিশুকে দীক্ষাস্নান দেন।

এপ্রিল ৫ : স্প্যানিস ভাষায় নির্মিত ডকুমেন্টারী 'দ্য পোপ: অ্যানসারস' (The Pope: Answers) এ উপস্থিত হন পোপ ফ্রান্সিস। এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে জেনারেল জেড এর সদস্যদের ছয়টি তুমুল আলোচ্য (hot-button) সমস্যার উত্তর দান করা হয়। দলটি অভিবাসন, হতাশা, গর্ভপাত, যাজক কর্তৃক যৌন ও মানসিক নির্যাতন, ট্রান্সজেণ্ডারিজম, পণ্যোগ্রাফি এবং বিশ্বাস হারানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

এপ্রিল ২৮-৩০: পালকীয় ও প্রৈরিতিক সফরে পূর্ব ইউরোপের দেশ হাঙ্গেরীতে গিয়ে পোপ মহোদয় সরকারী কর্মকর্তা, সুশীল সমাজ, বিশপ, পুরোহিত, সেমিনারীয়ান, জেজুইট, উৎসর্গীকৃত নর-নারী এবং পালকীয় কর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ৩০ এপ্রিল সফরের শেষদিনে তিনি রাজধানী বুদাপেস্টের কোসুথ লাজোস স্কয়ারের উন্মুক্ত স্থানে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন; যেখানে পার্লামেন্টের বাইরে একটি বেদি স্থাপন করা হয়েছিল।

জুন ৭: ভাটিকান জানায়, পোপ ফ্রান্সিস অনেকদিন ধরেই বেদনাদায়ক হার্নিয়াতে কষ্ট পাচ্ছেন এবং যা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। তাই আজ বিকালে জেনারেল এনেসতেসিয়া সেরে তিনি পেটের অস্ত্রোপচারে যাবেন। সার্জারীর পূর্বে সকালে তীর্থযাত্রীদের সাথে নিয়মিত সাধারণ সমাবেশে তিনি জানান, মিশন দেশের প্রতিপালিকা লিজুর ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার ১৫০তম জন্মদিনে তিনি একটি প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্র প্রকাশ করার চিন্তা করছেন।

জুন ১৫: সফল অস্ত্রোপচার ও নিরাময়ের জন্য ১ সপ্তাহের বিশ্রামের পর পোপ ফ্রান্সিস রোমের জেমেল্লি হাসপাতাল থেকে গৃহে ফিরেন।

আগস্ট ২-৬: বিশ্ব যুব দিবস পর্তুগালে যোগ দিতে পোপ মহোদয় লিসবনে যান এবং ১-৬ আগস্ট সেখানে অবস্থান করেন। উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ ও ক্রুশের পথে পৌরহিত্য করার আগে তিনি রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বেশ কয়েকজন তীর্থযাত্রীর পাপস্বীকার শুনেন। ৫ আগস্ট পোপ মহোদয় ফাতেমা রাণীর তীর্থস্থান ও তীর্থমন্দির পরিদর্শনে গিয়ে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবদের সাথে রোজারিমালা প্রার্থনা করেন। ঐদিন সন্ধ্যাতে নিশি জাগরণী প্রার্থনা পরিচালনা করেন এবং ৬ আগস্ট সকালে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসা ১৫ লক্ষ যুবাদের নিয়ে বিশ্ব যুব দিবসের সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগে তিনি আবারো যুবদেরকে 'ভয় পেয়ো না' বলে উদাত্ত আহ্বান রাখেন; যে আহ্বান বিশ্ব যুব দিবসের প্রতিষ্ঠাতা সাধু পোপ ২য় জন পল রেখেছিলেন। ১৫ লক্ষ যুবকের উপস্থিতিতে যে যুব তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল পোপ ফ্রান্সিস হাত বাড়িয়ে সে তরঙ্গে ঢেউ তুলেছিলেন।

আগস্ট ৩১ সেপ্টেম্বর ৪: বিশ্বের সবচেয়ে কম জনবহুল সার্বভৌম দেশ মঙ্গোলিয়া সফরে যান পোপ ফ্রান্সিস। তিনিই প্রথম পোপ যিনি মঙ্গোলিয়া সফরে যান যা চীনের ২৮৮০ বর্গমাইল দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং চীনের ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক পার্টনার। মঙ্গোলিয়াতে ৩ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ১,৩০০ জন কাথলিক রয়েছে। পোপ ফ্রান্সিস মঙ্গোলিয়ার যাজকশ্রেণি ও সন্ন্যাসব্রতীদের সাথেও সাক্ষাৎ করেন। এখানে মোট ২৫ জন যাজক রয়েছে; যাদের মধ্যে ১৯ জন সন্ন্যাসব্রতী এবং ৬ জন ধর্মপ্রদেশীয়; ৩৩জন নারী সন্ন্যাসব্রতী এবং জর্জ মারেনগো নামে একজন বিশপ -যিনি সম্প্রতি কার্ডিনাল হয়েছেন। উলানবাতার সাধু পিতর ও পলের ক্যাথিড্রালে তারা মিলিত হয়েছিলেন।

সেপ্টেম্বর ২২-২৩: ফ্রান্সের মার্সাই এ দুইদিনের এক সফরে পোপ ফ্রান্সিস সরকারী ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ এবং ভূমধ্যসাগরীয় সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন, যেখানে ১২০ জনের বিভিন্ন বিশ্বাসের যুবারা ৩০টি দেশের বিশপদের সাথে অংশগ্রহণ করেছিল।

অক্টোবর ৪-২৯: এ বছর অক্টোবর মাসে ভাটিকানে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশপদের সিনড; যার কার্যক্রম শুরু হয়েছিল ২০২১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে। অক্টোবর মাসে কার্ডিনাল, বিশপ, কিছু সংখ্যক পুরোহিত, ব্রতধারী ও ব্রতধারিণী, খ্রিস্টভক্ত ও অন্য মণ্ডলীর ৩৫০ জন প্রতিনিধি নিয়ে এই সিনড সভাটি ভাটিকানে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের প্রায় ২০০ কোটি কাথলিকদের মধ্যে মাত্র ৩৩৫ জন এখানে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে।

৮ ডিসেম্বর: দূত সংবাদ প্রার্থনার পর পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস তীর্থযাত্রীদের বলেন, আনন্দের সাথে আমি ঘোষণা করছি ১ম শিশু দিবস ২৪ মে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে পালিত হবে। বিশ্ব যুব দিবস পালনের প্রাক্কালে ২৫-২৬ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ রোমে শিশু দিবস উদযাপিত হবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:
https://www.ncregister.com/cna/a-timeline-of-pope-francis-10-years-as-pope
News va

লক্ষীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই শুভ বড়দিন ও নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।
খ্রিস্টীয় প্রেমে সবার জীবন হোক আনন্দময়।

লক্ষীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

ব্যবস্থাপনা কমিটি (২০২১-২০২৪)

মি. দীপক আগষ্টিন পিউরীফিকেশন
চেয়ারম্যান

মি. সজল জেমস্ রোজারিও
ভাইস-চেয়ারম্যান

মি. রিপন জেমস কস্তা
সেক্রেটারী

মি. দোলন প্লাসিড গমেজ
ম্যানেজার

এড. মৃণাল কান্তি বাড়ৈ **(মাইকেল)**
ট্রেজারার

এড. রেবেকা পলিনা গমেজ
ডিরেক্টর

মি.রিন্টু থিওটোনিয়াস গমেজ
ডিরেক্টর

মি. মাইকেল অনিমেষ গমেজ
ডিরেক্টর

মি. সুমন গ্রেগরী গমেজ
ডিরেক্টর

মি. অপু বার্নাড গমেজ
ডিরেক্টর

মি. হিউবার্ট গমেজ
ডিরেক্টর

মি. সিলভেষ্টার পালমা
ডিরেক্টর

ক্রেডিট কমিটি ২০২১-২০২৪

মি. সুমন লেনার্ড রোজারিও
চেয়ারম্যান

মি. চার্লস নিকোলাস গমেজ
সেক্রেটারী

মি. তুষার কস্তা
সদস্য

সুপার-ভাইজরী কমিটি ২০২১-২০২৪

মি. প্রদীপ আগষ্টিন গমেজ
চেয়ারম্যান

মি. প্রদীপ খান
সেক্রেটারী

মি. আগষ্টিন বার্ণাড গমেজ
সদস্য

স্মারক নংঃ lcccultd./বিজ্ঞপ্তি/২১২/২৩ তারিখঃ ১২ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

লক্ষ্মীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

স্থাপিত :৪-৪-২০০২ খ্রিস্টাব্দ, রেজি. নং-১৯৮/২০০৮
৬১/১, সুবাস বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।

১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
(১ জুলাই, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

এতদ্বারা লক্ষ্মীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে, অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২১শে জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, রোজ রবিবার, বিকাল ৬.৩০ ঘটিকায় আর্চবিশপ টি.এ.গাঙ্গুলী মেমোরিয়াল হল-এ (৬১/১ সুবাস বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০) অনুষ্ঠিত হবে।
সকল সদস্য/সদস্যাদের ক্রেডিট পাস বই সহ ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সভার কর্মসূচী ঃ

১. ক) উপস্থিতি।, খ) উদ্বোধনী প্রার্থনা।, গ) আসন গ্রহণ।
ঘ) জাতীয় পতাকা ও সমবায় পতাকা উত্তোলন।
২. সভাপতির স্বাগত বক্তব্য।
৩. ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পেশ ও অনুমোদন।
৪. ম্যানেজিং কমিটির কার্যবিবরণী পেশ ও অনুমোদন।
৫. হিসাব বিবরণী পেশ ও অনুমোদন।
ক) প্রাপ্তি-প্রদান হিসাব; খ) লাভ-ক্ষতি হিসাব;
গ) লাভ-ক্ষতি আবন্টন হিসাব; ঘ) উদ্বৃত্তপত্র।
৬. বাজেট (আয় ব্যয়) পর্যালোচনা ও অনুমোদন।
৭. নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন।
৮. ক্রেডিট কমিটির কার্যবিবরণী পেশ ও অনুমোদন।
৯. সুপারভাইজরী কমিটির কার্যবিবরণী পেশ ও অনুমোদন।
১০. বিবিধ।
১১. সহ-সভাপতি কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপ্তি ঘোষণা।
১২. লটারী ড্র (কোরামপূর্তি লটারী)।
১৩. জলযোগ ।

দীপক আগষ্টিন পিউরীফিকেশন
চেয়ারম্যান
লক্ষ্মীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

রিপন জেমস কস্তা
সেক্রেটারী
লক্ষ্মীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ সমবায় সমিতি আইন ২০০৪ এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য/সদস্যা সমিতিতে শেয়ার ও ঋণ খেলাপী হলে বা সদস্য পদ সংক্রান্ত অন্য কোন পাওনা বকেয়া থাকিলে উহা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য/সদস্যা সাধারণ সভায় তাহার অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবে না।

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা
THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD., DHAKA
(স্থাপিত ঃ ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজিঃ নং-৪২/১৯৫৮/ Estd. 1955, Regd. No. 42/1958)

সূত্র নং ঃ সিসিসিইউএল/সেক্রেটারি/২০২৩/০১/১০০৩ তারিখ ঃ ১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর ৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর সম্মানিত সদস্যদের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ১৯ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, সকাল ১০ টায়** সময় বটমলী হোম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকায় **অত্র** সমিতির **৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা** অনুষ্ঠিত হবে। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সকাল ৮ টায় হতে শুরু হবে।
উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের নিজ নিজ পরিচয়পত্র অথবা ছবি যুক্ত পাশ বহি এবং বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ যথা সময়ে উপস্থিত থাকার জন্যে বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

উল্লিখিত বিষয়ে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত কামনা করছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
প্রেসিডেন্ট
দি সিসিসিইউলি:, ঢাকা।

মাইকেল জন গমেজ
সেক্রেটারি
দি সিসিসিইউ লি:, ঢাকা

অনুলিপি ঃ
০১। যুগ্ম নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
০২। জেলা সমবায় অফিসার, ঢাকা জেলা, ঢাকা।
০৩। মেট্রোপলিটান থানা সমবায় অফিসার, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৪। সমিতির নোটিশ বোড

In Loving Memory of our Beloved Mother

Margaret Gomes

(1937-2021)

Quietly remembered everyday…
No Longer in our life to share, but in our hearts, dear Mother you are always there.

Your Loving Family
Ripon Gomes, Tina Felobina Costa, Rayana Margaret Gomes, Watson Patrick Gomes & Family

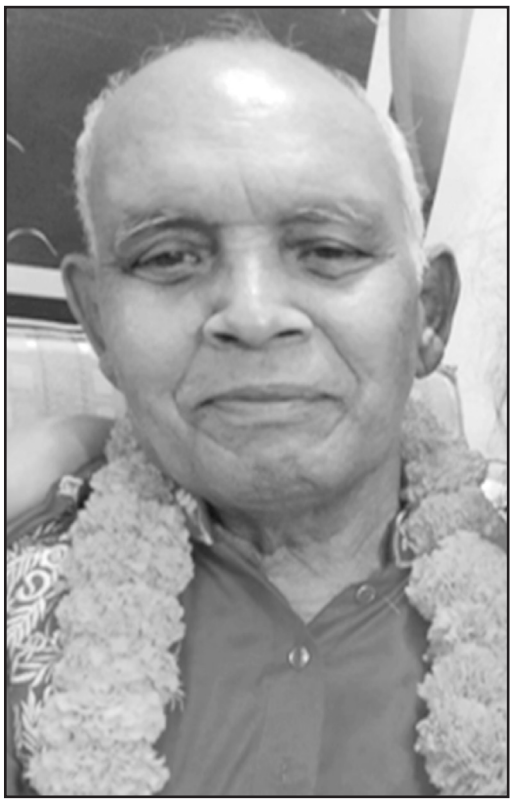

In loving memory of our Deloved Baba

Patrick Costa

Born: 25/2/1947

Died: 7/5/2023

"We'll always remember that special smile,
that caring heart, that warm embrace,
you always gave us.You being there
for Mom and us through good and bad times,
no matter what.We'll always remember
you Baba because they'll never be another one
to replace you in our hearts, and the love we will
always have for you."

Your Loving, Suktara Costa, Tulip Palma and Family, Tina Costa and Family

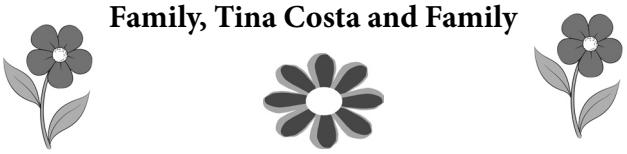

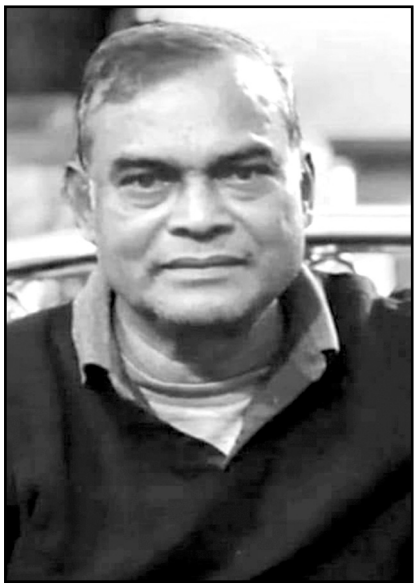

প্রয়াত বাবলু আলেসিয়াস পিউরীফিকেশন
জন্ম : ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
হোবির বাড়ি
তিরিয়া (দ্বার্কাভাঙ্গা) নাগরী
কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

**"সংসারের মায়া ছেড়ে, আজিকে গেল জন,
দাও প্রভু দাও তারে অনন্ত জীবন"**

প্রিয় বাবা,

ঈশ্বরের পরম করুণাধামে আমাদের সকলকে অসহায়ের মতো কাঁদিয়ে গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ ঈশ্বর তোমাকে ডেকে নিয়েছেন। তুমি ছিলে আমাদের মাথার উপর ভরসার হাত। বটগাছের মতো সারাক্ষণ তোমার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততী, ভাই-ভাতিজা, বোন-ভাগিনী, শালা-শালীদের আগলে রেখেছিলে। সকল দিকে ছিল তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। মৃত্যুর আগে তুমি তোমার অসমাপ্ত সকল কাজই সমাপ্ত করেছিলে। এজন্য ঈশ্বর যখন তোমায় ডেকে নিলেন তাঁর অনন্তধামে, তুমি সম্পূর্ণ তৈরি হয়েই তাঁর কাছে নিজেকে উৎসর্গ করেছো।

তুমি ছিলে প্রভুর একজন প্রার্থনাশীল ভক্ত। পরিবারের সকলকে নিয়ে প্রতি রবিবার গির্জায়ে যাওয়া ও প্রতি সন্ধ্যায় রোজারী প্রার্থনায় তুমি কঠোরভাবে নিয়মিত ছিলে ।

তুমি ছিলে একজন প্রেমিক পুরুষ, সহজ-সরল, আত্ম-নির্ভরশীল, কঠোর পরিশ্রমী, পরোপকারী, স্পষ্টভাষী, হিসাবী, দায়িত্বশীল, ভালো পরামর্শদাতা, সত্যবাদী, সকলের খোঁজ খবর রাখার একজন অনবদ্য ব্যক্তিত্ব। যে গুণগুলো বর্তমান যুগে বিলুপ্তির পথে। আমরা বিশ্বাস করি তুমি ঈশ্বরের নিকট অনন্ত সুখের রাজ্যে আছো। আমাদের আশীর্বাদ করো, আমরা যেন তোমার আদর্শে পথ চলতে পারি এবং সর্বদা সুস্থ থেকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি ।

তোমার পরিবারের পক্ষে

স্ত্রী : নির্মলা বারবারা পিউরীফিকেশন

ছেলে-বৌমা : হিউবার্ট নিপু-তন্দ্রা, নিলেট-নিশা, জেরী-ম্যাকলিন ।

নাতনিঃ নিদ্রা, নীলাদ্রি, নিথে, নিধি, ম্যালিসা ।

গ্রাম : তিরিয়া (দ্বার্কাভাঙ্গা), নাগরী , কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

নীড়
রিসোর্ট এন্ড রেস্টুরেন্ট
NEER RESORT & RESTAURANT
22/Ka, Block-A, Demurpara, Pubail ,Gazipur City Corporation, Gazipur-1370, Bangladesh
০১৭০-১০১০১৪১
Scan me!
সেবা সমূহ
ক্যাফেটেরিয়া
ঠান্ডা ও গরম পানির ব্যবস্থা
হেয়ার ড্রায়ার
২৪ ঘন্টা রুম সার্ভিস
কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট
ল্যাকুজি
সুইমিং পুল
স্পা
লিফ্ট
জীম
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ফ্রি ইন্টারনেট
রেস্টরেন্ট
পিক এন্ড ড্রপ সার্ভিস
স্মার্ট টিভি
'নীড় রিসোর্ট এন্ড রেস্টুরেন্টে আপনাদের স্বাগত
'নীড় রিসোর্ট এন্ড রেস্টুরেন্ট' ঢাকার অদূরেই স্বল্প সময়ের যাত্রাপথে গাজীপুরের পুবাইল- ডেমরাপাড়ায় অবস্থিত। রিসোর্টটি দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ-এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। এতে রয়েছে আপনার অবকাশকালীন সময়ে অথবা সভা- সেমিনার পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা। প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ত্রিশ বিঘা জমিতে প্রকৃতির অপরূপ মনোরম পরিবেশে নিরাপত্তা চাদরে ঘেরা; যা আপনাকে দিচ্ছে সর্বোচ্চ সেবা।
আপনার বা আপনার পরিবারের অবকাশকালীন সময়টুকুতে প্রশান্তি দিতে আমরা সর্বদা সচেষ্ট। সভা-সেমিনার, পিকনিকসহ যেকোন অনুষ্ঠানে আমরা দিচ্ছি আপনার প্রোগামের সার্থকতার নিশ্চয়তা।
A SISTER CONCERN OF
দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
THE METROPOLITAN CHRISTIAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
Regd. No. 282 Dated 06.06.0978
আর্চবিশপ মাইকেল ভবন, ১১৬/১, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ +৮৮ ০২ ৫৫০২৭৬৯১-৯৪ info@mcchsl.org www.mcchsl.org

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীকে বিভিন্ন প্রকার সহযোগীতা করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন যাঁরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই ।

সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্যবৃন্দ

ফাদার কমল কোড়াইয়া

মালাবিন ক্লারা বাড়ৈ

থিওফিল নিশারন নকরেক

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিদেশ প্রতিনিধিগণ

জেমস্ গমেজ (আদি)
আমেরিকা

ডেভিড স্বপন রোজারিও
আমেরিকা

বিপুল এলিট গনছালভেস
আমেরিকা

হিউবার্ট ডি'ক্রুজ
আমেরিকা

সুবীর কাম্মির পেরেরা
আমেরিকা

মিন্টু রোজারিও
অস্ট্রেলিয়া

শংকর ভাস্কর পালমা
ইতালি, ইউরোপ

সুমন জন গমেজ
কানাডা

বাংলাদেশে সকল ধর্মপল্লীর পুরোহিতগণ, ধর্মব্রতী/ব্রতীনিগণ, বিভিন্ন ধর্মপল্লীর স্বেচ্ছাসেবীবৃন্দ সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র উন্নয়নে সহায়তা করে চলেছেন। তাদের প্রতিও আন্তরিক ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা।

রত্নগর্ভা মা যোসফিন কোড়াইয়া

ঠাকু, তুমি ছাড়া কোনদিনই যে বড়দিন হয় না। বিশ্বাস করি তুমি আছো শিশু যিশুর সাথে পরম পিতার পাশে।

তোমার আশীর্বাদে আমরা সকলে (বড় বাবা-বড় মায়েরা, বাবা-মা, ছোট কাকা, পিসিমনিরা, দাদা-দিদিরা) যেন একত্রে সুখে থাকি। নিশ্চয় স্বর্গ থেকে তুমি তোমার ছোট নাতি ব্রাইট থিয়োটনিয়াসকে দেখছো ও আশীর্বাদ করছো।

শিশু যিশুর জন্মতিথীতে সবার জীবনে আসুক মিলন ও অনাবিল শান্তি। এ শুভ প্রত্যাশায় –

জুয়েল পি. রিবেরু ও লিজা বি. রিবেরু
প্রিয়ন্ত জে. রিবেরু ও ব্রাইট থিয়োটনিয়াস রিবেরু
রাঙ্গামাটিয়া পূর্বপাড়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

প্রভাতী ম্যাগডেলিন ডি'রোজারিও
জন্ম: ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
পুরান তুইতাল, নতুন বাড়ী
তেজগাঁও গির্জা, ক্রুশ নং-১৫৬

"মৃত্যু" অসুন্দর হলেও চিরন্তন সত্য। হাজার চেষ্টা করেও তা অস্বীকার করা যায় না। "জীবন" মানুষকে দেয় পরিচয়, নাম, যশ, খ্যাতি আর "মৃত্যু" দেয় সেই পরিবারকে একটা ক্রুশ নাম্বার।

মা, প্রিয়জনের অন্তরেই গাঁথা থাকে চিরদিন। চলে গেছে মা আমায় ছেড়ে ঈশ্বরের গৃহে। হাঁটতে শিখিনি আমি মাকে ছেড়ে। তাই প্রার্থনা করি পরম করুণাময়ের কাছে যেন মা-হীন পৃথিবীতে বেঁচে থাকার শক্তি প্রদান করেন।

তোমারই একমাত্র কন্যা, জামাতা
নাতি ও নাতীন।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র পরিবার থেকে সকলকে

MERRY Christmas And Happy New Year

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু
পরিচালক ও সম্পাদক

হিসাব বিভাগ

ডগলাস ডি, রোজারিও
প্রধান হিসাব রক্ষক

অমিত রোজারিও
সহকারী হিসাব রক্ষক

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

শুভ পেরেরা
সম্পাদনা সহযোগী

সজল বালা
সম্পাদনা সহযোগী

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
সার্কুলেশন ইনচার্জ

লিটন ইসাহাক আরিন্দা
সার্কুলেশন সহযোগী

প্রতিবেশী প্রকাশনী

পরেশ রোজারিও
সেলস্ ইনচার্জ

বিনয় কস্তা
সেলস্ এসিস্ট্যান্ট

টমাস কোড়াইয়া
সেলস্ এসিস্ট্যান্ট

বাণীদীপ্তি

ফাদার নিখিল গমেজ
কো-অর্ডিনেটর, আরভিএ

সিস্টার লাইলী আরএনডিএম
প্রযোজক, আরভিএ

রিপন আব্রাহাম টলেন্টিনু
প্রোগ্রাম প্রযোজক,আরভিএ

এছুনী তপন গমেজ
প্রধান শব্দগ্রাহক

জেমস্ গনছালভেস্
প্রোগ্রাম সহযোগী

সুনীল পেরেরা
জ্যোতি কম্যুনিকেশন

জেরী প্রিন্টিং

অজয় পিউস কস্তা
ব্যবস্থাপক

দীপক সাংমা
গ্রাফিক্স ডিজাইনার

নিশুতি রোজারিও
কম্পিউটার অপারেটর

আন্তনী অংকুর গমেজ
গ্রাফিক্স ডিজাইনার

পিতর হেম্ব্রম
সহযোগী

মো: হেমায়েত উদ্দীন
মেশিনম্যান

ফারুক মিয়া
মেশিনম্যান

মানিক রোজারিও
মেশিনম্যান

সেন্টু রোজারিও
মেশিনম্যান

আব্দুল খালেক
বাইন্ডার

সুশীল মারাক
বাবুর্চি

পরিমল টুডু
সিকিউরিটি গার্ড

পলিনুস কেরকেটা
সিকিউরিটি গার্ড

লিপি আক্তার
(আয়া)

উইলিয়াম কেরী ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
William Carey International School

Cambridge Assessment International Education
Cambridge International School

(An Exclusive English Medium School)
Govt. Reg. No. 23/English (EIIN: 903421

(Play Group to O' Level)

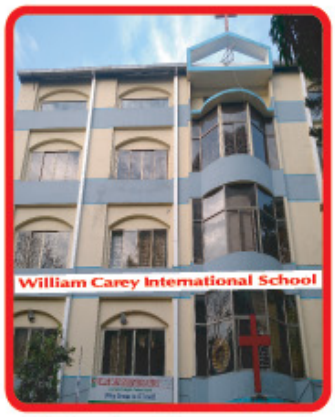

Dhaka Campus

Our Facilities

- Air Conditoned Classrooms.
- Secured With CCtv Camera.
- Wide playground.
- Use of Modern Teaching Metholodgy, Computer, Multimedia, Internet Etc.
- Special Care For Slow Learners.
- Extra Curricular Activities.
- Standby Power Supply.
- Limited Seats.
- School Vehicle Available.

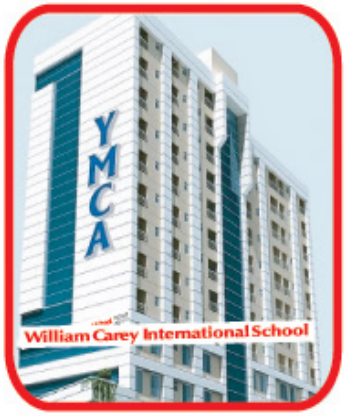

Savar Campus

You are welcome to visit the School Campus along with your kids

Admission Going on

Parents & Teacher Meeting

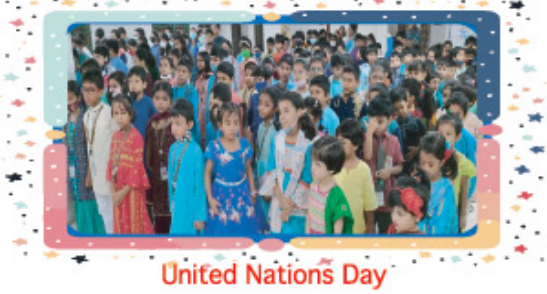

Science Fair

United Nations Day

School Picnic

Dhaka Campus: Bangladesh Baptist Church
70-D/1, Indira Road, (West Razabazar, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207
Contact: +88 02 222246708, 01989-283257

Savar Campus: YMCA International Building
B-2 Jaleswar, Near Radio Colony Bus Stand, Savar, Dhaka
Cell: 01709-127850, 01709-091205

Train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart it. Provers 22:6

বাবা/দাদু
আমরা তোমায়
অনেক অনেক ভালবাসি

প্রয়াত আলফন্স রোজারিও

জন্ম : ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ৬ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

(ইউনাইটেড হাসপাতাল, ঢাকা)

গ্রাম: কুচিলাবাড়ি

মঠবাড়ি মিশন, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

দেখতে-দেখতে তিন বছর চলে গেল, ফিরে এলো শুভ বড়দিন ও আরেকটি নতুন বছর। এতো তাড়াতাড়ি তুমি আমাদেরকে ছেড়ে এভাবে চলে যাবে, তা কোনদিন ভাবতেও পারিনি। তেমন কোন অসুস্থতার লক্ষণও তোমার মধ্যে আগে থেকে পরিলক্ষিত হয়নি। তারপরেও কঠিন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে- সব মিলিয়ে প্রায় এক মাসের মধ্যেই একজন জলজ্যান্ত মানুষ থেকে শুধুই ছবি হয়ে গেলে সবার কাছে। অনন্তের অসীম নীলিমায় হারিয়ে গেলে তুমি – আর কোনদিন ফিরে আসবে না, এই নশ্বর পৃথিবীতে। তোমাকে ছাড়া আমাদের কোন কিছুই আর পরিপূর্ণতা পায় না। কোন পার্বণ বা কোন পারিবারিক অনুষ্ঠান, কোন কিছুতেই না। একটা অপূরণীয় শূন্যতায় নিমগ্ন থাকে সবাই। খেতে গেলে ও সন্ধ্যা প্রার্থনার সময় তোমার চেয়ারখানা আজও খালি পড়ে থাকে। রাতে ঘরে ফিরতে দেরী হলে – আর তোমার কল বেজে ওঠে না। কেউ আর আদরমাখা গলায় বলে না "দেরী করতেছো কেন? তাড়াতাড়ি বাড়ি এসে খেয়ে বিশ্রাম করো।" আবার বাড়ি ফিরলে তোমার স্নেহমাখা স্নিগ্ধ হাসি দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যেতো – সব কালিমা দূর হয়ে যেতো। এখন সেইসব কিছুই একটা ছবিতে আবদ্ধ হয়ে আছে। হাসপাতালে থাকা অবস্থায় শত কষ্টের মধ্যেও কোনদিন বলো নাই- কষ্টের কথা। "কেমন আছো" - জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতে "আমি তো ভালই আছি।" শৈশবে মাকে হারিয়ে তুমি বেড়ে উঠেছিলে সীমাহীন অনাদরে – মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে। জীবনযুদ্ধে তুমি কখনও পিছু পা হওনি - ছোটবেলা হতে অধ্যবসায়ের দ্বারা কিভাবে বড় হওয়া যায় ও জীবনে উন্নতি করা যায় - তা তুমি আমাদেরকে শিখিয়েছ। অলসতা তুমি মোটেও পছন্দ করতে না। তুমি ছিলে কঠোরভাবে নিয়মানুবর্তী। সময়ের কাজ সময়ে ও নিজের কাজ নিজে করতে তুমি উৎসাহিত করতে সবাইকে। মা মারীয়ার প্রতি তোমার অসীম ভক্তি ছিলো। রোজই রোজারীমালা হাতে করে হাঁটতে বেরোতে এবং সন্ধ্যায় পরিবারের সবাইকে নিয়ে নিয়মিত রোজারীমালা প্রার্থনা করতে - নিয়মিত গির্জায় যেতে খ্রিস্টযাগ শুনতে।

তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো আমরা যেন তোমার আদর্শে জীবন পথে চলতে পারি এবং ঈশ্বরের পথ থেকে যেন বিচ্যুত না হই।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের বাবা / দাদু-কে স্বর্গে অনন্ত শান্তি দান করুন।

সবার প্রতি রইলো শুভ বড়দিন ও নববর্ষের অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

তোমার সহধর্মিনী
সিসিলিয়া রোজারিও

তোমার স্নেহধন্য –
পুত্র ও পুত্রবধূগণ এবং একমাত্র কন্যা ও জামাতা

তোমার অনেক আদরের নাতি-নাতনিরা ও নাতিন জামাই –
ঐশী ও ইভান্স, যাকোব, অর্থী, অস্থী, অহনা, প্রাপ্তি, কৃপা, অথৈ, অবনী, রাফেল, মার্সিয়া ও স্যাম।

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100 Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100 Phone : 47113885, E-Mail : wklypratibeshi@gmail.com, Web: www.wklypratibeshi.org, Facebook: Weekly Pratibeshi